সাধক কবি রামপ্রসাদ

সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী সমন্বিত

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সন্স্ লিমিটেড
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

স্মরণে

শ্রীমতী চম্পকলতা দেবী

সুখে-দুঃখে ছিলে নিত্য সঙ্গিনী আমার,
পরপারে দুইজনে মিলিব আবার।
যে দেশে যে ভাবে আছ আমি জানি মনে,
আমারে ভোলনি কভু অমর নন্দনে।
নয়ন বাহিরে কিন্তু রয়েছ অন্তরে,
জেগে আছ নিত্য তুমি স্মৃতির মন্দিরে।
কি দিব কি আছে বল কি সাধ্য আমার,
'প্রসাদের পুষ্পাঞ্জলি' দিনু উপহার।

সিদ্ধ সাধক কবি রামপ্রসাদের জীবনী ও তাঁহার রচিত প্রসাদ-পদাবলী, কালী-কীর্ত্তন, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, সীতা-বিলাপ ও বিদ্যাসুন্দরও এই সঙ্গে প্রকাশ করিলাম। আমাদের দেশে পূর্ব্বে জীবন-চরিত লেখার রীতি ছিল না। সেজন্য বাঙ্গালার অতীত যুগের অনেক মনীষীর কীর্ত্তিকথা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত বাঙ্গালাদেশের কবিদের জীবনী ও কাব্য, সঙ্গীত ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া 'সংবাদ-প্রভাকরে' প্রকাশ করিতে থাকেন, তাঁহারই অধ্যবসায় গুণে—আমরা রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র-রায় গুণাকর, রামনিধি (নিধু বাবু), হরু ঠাকুর, নিতাই দাস প্রভৃতি কবিগণের জীবন-চরিত, কাব্য ও সঙ্গীতের সহিত পরিচিত হইতে পারিয়াছি।

রামপ্রসাদের জীবনী সম্পর্কে গুপ্ত কবির পরে যাঁহারা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য হইতেছেন—দয়ালচন্দ্র ঘোষ ও অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। দয়াল বাবু ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভূত ছিলেন। ১২৮২ সালে, তিন বৎসরেরও অধিককালের পরিশ্রমের পর তাঁহার লিখিত 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ' সাধারণ্যে প্রচারিত হয় এবং বিশেষ সমাদর লাভ করে। এক বৎসর পরেই আবার উহার পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দয়ালচন্দ্রের প্রসাদ-প্রসঙ্গ সেকালের মনীষিগণ অমূল্য নিধিরূপে গ্রহণ করেন। ঋষি রাজনারায়ণ বসু মহাশয় প্রসাদ-প্রসঙ্গ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া বলেন: "রামপ্রসাদ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে 'কবিরঞ্জন' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তদপেক্ষা আর একটি সহস্র গুণে গৌরবাস্পদ উপাধি প্রাপ্ত হইবার যোগ্য—সে উপাধি "সাধুরঞ্জন"। 'কবি' শব্দ সাধু শব্দের প্রতিশব্দ হওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু মানববর্গের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হয় নাই। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাদের দেশে বিলুপ্তপ্রায় কবিদিগের কবিতা উদ্ধারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর বৈদ্য প্রেমাস্পদ গ্রন্থকার প্রতি এতদ্রূপ গাঢ় অনুরাগ অন্য কেহই প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়েন নাই।"

দয়াল বাবুর পরে অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ রূপে স্মরণীয়। তিনি বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়া তথ্য ও সঙ্গীত সংগ্রহ করিতেন। 'রামপ্রসাদ' গ্রন্থ ১৩৩০ সালে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত রামপ্রসাদ সত্য সত্যই অতুলচন্দ্রের এক অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি। মনোযোগ-সহকারে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে তাঁহার পাণ্ডিত্য, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা এবং রামপ্রসাদের প্রতি অসাধারণ ভক্তি ও ভালবাসার পরিচয় পাই। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে এই গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পর্য্যায়ে পড়িয়াছে।

রামপ্রসাদ মাতৃভাবে জগজ্জননীর আরাধনা করিয়া গিয়াছেন। মাতৃরূপে

ঈশ্বরের আরাধনা অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। মহেঞ্জো-দারোতে আবিষ্কৃত মূর্ত্তি ইত্যাদি হইতে মাতৃরূপ উপাসনার নিদর্শন পাই। ঐতিহাসিকেরা বলেন: 'The objects found at Mahenjo-Daro also teach us something about the religious faiths and beliefs of the people. The cult of the *Divine* Mother seems to have been widely prevalent, and many figurines of the Mother-Goddess have come to light.'

'This cult may not be exactly the same as the *Sakti*-worship of later days, but the fundamental ideas appear to be the same, viz., the belief in a female energy as the source of all creation.' (Ancient India pt. 1. Page 20. Dr. R. C. Majumdar and others.)

মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত মূর্ত্তি ইত্যাদি দৃষ্টে মনে হয় সে প্রায় ৫০০০ খৃঃ পূঃ অব্দে সেখানকার অধিবাসীরা জগৎপালিনী মাতারূপেই ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। পরবর্ত্তী কালে যে শক্তি উপাসনা দেখিতেছি, তাহার সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকিলেও বলা যাইতে পারে যে সৃষ্টি-স্থিতি-পালয়িত্রী-রূপে সর্ব্বব্যাপিনী বিশ্বজননী মাতৃশক্তির পূজাই ক্রমশঃ চলিয়া আসিয়াছে। সে সাধনার কথা যথাস্থানে বলিয়াছি। 'মনোময় প্রতিমা' গড়িয়া জগন্মাতা ব্রহ্মময়ীর শ্রীচরণে মন রাখিয়া প্রসাদ অনন্তে মিলাইয়া গিয়াছেন।

রামপ্রসাদ সেন গানের জন্যই বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। প্রসাদের গান এক একটি 'প্রসাদী' ফুল। রামপ্রসাদী সুরও তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার গান এত সরল ও সহজ, এমন ভাব-ভক্তি সংযুক্ত যে কতদিন চলিয়া গিয়াছে এখনও আমাদের হৃদয়ে ও মনে তাঁহার ভক্তি-বিগলিত সুরলহরী নিত্যনবরূপে প্রাণের মধ্যে এক নূতন আনন্দ ও উৎসাহের প্রেরণা জাগাইয়া দেয়। আমরা দেখিতে পাই কালী উপাসনা—রামপ্রসাদের কালী হইতেছেন স্নেহময়ী বিশ্বজননী। গানের মধ্যেই তিনি ত্রিভুবনময় মায়ের মূর্ত্তি দেখিয়াছেন। তিনি তাঁহার গানে—সীমার মধ্যে অসীম হইয়া আছেন।

আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু, সমালোচক ও সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: "রামপ্রসাদের আধ্যাত্মিক ভক্তিমূলক গানগুলি বাংলাতেই সীমাবদ্ধ রহিল বাংলার বাহিরে প্রচার লাভ করিল না। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, বাংলাদেশের জন্যই উহাদের জন্ম। যদিও কয়েকটী গানে বৃহত্তর জীবনের ইঙ্গিত আছে—মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্ন কষ্টবোধ্য Universal appeal আছে —তাঁহার সঙ্গীতের মধ্যে নিখিলের অনন্ত সৌন্দর্য্যের সন্ধান নাই, প্রকৃতির বন্দনার আলোক উৎসবে, আনন্দ কিংবা সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালোপযোগী আরাধনার ছন্দে ইহা সমুজ্জ্বল নহে।"

একথার উত্তর দিয়াছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, তাঁহার 'বাঙ্গালার গীতি-

কবিতা' শক্তিধারায় রামপ্রসাদ-প্রসঙ্গে। চিত্তরঞ্জন বলেন : 'রামপ্রসাদ একজন সাধক ছিলেন। তাঁহার সাধনাই তাঁহার কাব্যে ও গানে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। কালী মূর্ত্তির ধ্যান বাঙ্গালী জাতির একটি বিশেষ সাধনা, রামপ্রসাদের জীবনে ও কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামপ্রসাদই বিশ্বকবি, কেননা তাঁহার কাব্যে ও সাধনায় যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া তিনি প্রকাশ পাইয়াছেন। ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও বাঙ্গালার কবি বিশ্বকবি হইতে পারিয়াছেন।" এ কয়টি কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার বক্তব্য বিশেষভাবে বুঝাইয়াছেন। সে আলোচনা আমরা গ্রন্থ মধ্যেও করিয়াছি।

'প্রবাসী' ও 'Modern Review' সম্পাদক স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় "ধর্ম্মের প্রকাশ কি অতীতে আবদ্ধ" নামক প্রসঙ্গে বলেন : 'অনেকে মনে করেন—প্রাচীন যুগের ধর্ম্ম গ্রন্থগুলি প্রকাশিত শাস্ত্রের মধ্যেই চিরন্তন ভাবে ধর্ম্ম সব নিহিত কিন্তু তাহা নহে। যুগে যুগেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সাধু সন্তের জন্ম হয় এবং তাঁহারাও নূতন করিয়া সাধনার বাণী প্রচার করেন।'

"এই শাস্ত্রগুলির মধ্যে বেদ প্রাচীনতম, অন্যগুলি তদপেক্ষা পরবর্ত্তী কালের। কিন্তু সকলের চেয়ে আধুনিক যাহা, তাহা যখন প্রকাশিত ও রচিত হইয়াছিল, হিন্দু সমাজে তাহার পর আর কি নূতন ব্রহ্মবাণী অবতীর্ণ হয় নাই? তাহার পর হিন্দু সমাজের সাধকেরা ধার্ম্মিকেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি প্রাচীন কোন না কোন শাস্ত্রেরই অনুবাদ, পুনরুক্তি, রূপান্তর বা ব্যাখ্যা না নূতন কিছু?'

'অন্যান্য প্রদেশে তুলসীদাস, রবিদাস, দাদূ, তুকারাম, একনাথ প্রভৃতি যে সকল সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের গ্রন্থ ও উক্তি আমরা সকলে ভাল করিয়া না জানিতে পারি ; কিন্তু বঙ্গে যে সকল সাধক জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় আমরা কিছু বেশী জানি। * * রামপ্রসাদী গান বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচলিত। তাহাতে যে সকল পারমার্থিক তত্ত্ব আছে, তাহার সমস্তই কি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হিন্দু শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত? আমাদের ত তাহা বোধ হয় না। যদি কেহ সেরূপ মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহারা এক একটি রামপ্রসাদী গান লইয়া, তাহার পাশে শাস্ত্রীয় সংস্কৃত বাক্য বসাইয়া, উভয়ের অভেদ কিম্বা অন্ততঃ সাদৃশ্য দেখাইয়া দেওয়া উচিত। আমাদের বোধ হয়, উহা কেহই করিতে পারিবেন না। ইহাও স্বীকার্য্য যে রামপ্রসাদের পদাবলী হইতে হিন্দু সমাজ ভক্তিমার্গের নূতন পাথেয় পাইয়াছেন। সুতরাং ইহা প্রতীত হইবে, সংস্কৃত হিন্দুশাস্ত্রগুলি রচিত হইবার পরেও হিন্দু রামপ্রসাদ মানুষকে ভক্তিতত্ত্ব শুনাইয়াছেন, এবং তাঁহার দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের নূতন বিকাশ হইয়াছে।" (প্রবাসী-পৌষ-১৩২৩, ১৬শ ভাগ, ২০৭ পৃষ্ঠা)। রামানন্দ বাবুর রামপ্রসাদ সম্বন্ধে এই মতবাদ তাঁহার গভীর জ্ঞান ও তত্ত্বানুসন্ধানের পরিচয় দিতেছে।

রামপ্রসাদ সম্বন্ধে বাঙ্গালা-সাহিত্যে বহু গ্রন্থ, প্রবন্ধ যেমন প্রকাশিত হইয়াছে, সেইরূপ ইংরাজী ভাষায়ও তাঁহার জীবনী ও গানের অনুবাদ প্রকাশিত

হইয়াছে। ভগিনী নিবেদিতা রামপ্রসাদের সঙ্গীত-সুধা পান করিয়া বলিয়াছেন, "It is to reflect how a century and a half ago, almost a hundred years before the birth of European art, a great Indian singer and saint should have been deep in observation of the little ones, studying them, and sparing every feeling, almost without knowing himself. (By the Sister Nivedita,—Two saints of Kali—P—52. বাঙ্গালার গীতি-কবিতায় উদ্ধৃত হইয়াছে।)

এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে গিয়া নানাস্থান হইতে নূতন নূতন তত্ত্ব পাইয়াছি। দলিল পত্র ও অন্যান্য অনেক বিষয়ের সন্ধান মিলিতেছে সে সকলের প্রকাশ এই গ্রন্থে সম্ভবপর হয় নাই।

আমাকে এই গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে যাঁহারা বিশেষরূপে উৎসাহী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গুপ্তিপাড়া-নিবাসী শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন (এড্‌ভোকেট), হালিসহর-নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযোগেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅমূল্যকুমার গাঙ্গুলি, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং রামপ্রসাদের বংশধর শ্রীযুক্ত মানসরঞ্জন সেন ও তাঁহার পুত্র শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা আমাকে প্রসাদের বংশাবলী প্রদান করিয়াছেন। বিষয়-সূচীর পর তাহা প্রকাশ করিলাম। কলিকাতার জাতীয় পাঠাগারে (National Library) ও সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগার ও সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরী হইতে গ্রন্থাদি সম্পর্কে সাহায্য পাইয়াছি। শ্রীমান প্রাণকৃষ্ণ সেন, শ্রীমান্ জ্যোতিঃপ্রসন্ন সেন ও পণ্ডিত শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী এম. এ. এবং আমার পুত্রদ্বয় শ্রীমান সুধাংশুশেখর গুপ্ত ও শ্রীমান্ হিমাংশুশেখর গুপ্ত ও কন্যা শ্রীমতী সুনন্দা গুপ্ত এম. এ. নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন।

সাধক কবি রামপ্রসাদের এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে আমার জীবনের এক সুগভীর শোকস্মৃতি জীবিতকাল পর্য্যন্ত স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বিগত ২রা মে ১৯শে বৈশাখ যেদিন আমি আমার গ্রন্থে প্রসাদের তিরোভাবের বিষয় লিখিলাম, সেদিন সেই সময়ে আমার সহধর্ম্মিণীও মহাপ্রয়াণ করিলেন। আমি ব্যথিত মনে তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি :

ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী
আর কি ক্ষমতা রাখিস্ এলোকেশী।

স্নেহময়ী জগজ্জননী তাঁহাকে তাঁহার ক্রোড়ে স্থান দিয়েছেন—ইহাই আমার পরম সান্ত্বনা। ইতি।

কলিকাতা
২৫শে মাঘ শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬০
ইং ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিষয়-সূচী

এক

জমিদারী সেরেস্তায় মুহুরীগিরি, খাজাঞ্চীর মনিবের নিকট নালিশ—জমিদারের হিসাব পরীক্ষা ও 'আমায় দেও মা তবিলদারী' গান শুনিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ, রামপ্রসাদকে বৃত্তি দান—প্রসাদের কুমারহট্ট গমন। ১—৪

দুই

কবি ঈশ্বর গুপ্তের লিখিত 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত রামপ্রসাদের জীবনী—গীত রচনা—পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী—অলৌকিক কাহিনী—বৈরাগ্য ও বিবেক রচনার কথা—পদাবলী – আলোচনা—ভগবতীর রণবর্ণনা—কালীকীর্ত্তনের গোষ্ঠ-লীলা ও রাসলীলার অংশবিশেষ,—নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র—মাতৃসাধক প্রসাদ। ৫—৩৭

তিন

কুমারহট্ট পল্লীর বিবরণ—জন্ম সন তারিখ নির্দ্দেশ—কুমারহট্ট পল্লীর নামোৎপত্তির কাহিনী—কুমারহট্ট ও হালিসহর—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী—চৈতন্যডোবা রামপ্রসাদের আত্মপরিচয়—রামকৃষ্ণ ধাম। ৩৮—৪৭

চার

মুসলমান রাজত্ব ও রামপ্রসাদ—কুমারহট্টের পূর্ব্ব গৌরব ও সমৃদ্ধি—অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালাদেশ—রামপ্রসাদের ভদ্রাসন ও পঞ্চমুণ্ডী আসন—পিতৃবিয়োগ, কলিকাতায় কার্য্যগ্রহণ—মাতৃসাধনা। ৪৮—৫৩

পাঁচ

বীর সাধক রামপ্রসাদ—তন্ত্রের সাধনা ও রামপ্রসাদের সিদ্ধিলাভ। ৫৪—৬১

ছয়

বিবাহ, শিক্ষা-দীক্ষা—সংস্কৃত বাঙ্গলা ও পার্শী ও আরবী ভাষায় জ্ঞানলাভ—অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ—স্ত্রী-শিক্ষা—সমাজে নারীর স্থান—সাধারণ শিক্ষা, সতীদাহ ও সহমরণ—পল্লীপ্রীতি—ধার্ম্মিকগৃহী, অতিথিসেবা, উদারতা—রামপ্রসাদী সুর—প্রসাদ সঙ্গীতে বিশ্বজনীনভাব, বিষয় বৈরাগ্য—আত্মসমর্পণ—ধ্যান-ধারণা। ৬২—৭৯

সাত

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র—রামপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়—মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রস্তাবিত মাসিক বৃত্তি গ্রহণে অস্বীকার,—রামপ্রসাদের যশঃ ও প্রতিপত্তি—সঙ্গীতের প্রচার, সুভদ্রা দেবী,—মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রদত্ত ভূমি দানপত্রের আসল সনন্দের নকল—১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ—'কবিরঞ্জন' উপাধি, 'কবিরঞ্জন' বিদ্যাসুন্দর। ৭৯—৯১

আট

হালিসহর—শাক্তপ্রধান ও বৈষ্ণবপ্রধান স্থান—আজু গোস্বামী—অযোধ্যা রাম বা আজু গোঁসাই—আজু গোঁসাই ও রামপ্রসাদের সঙ্গীত বিতর্ক—উভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি—তান্ত্রিক শক্তি সাধনায় সুরাপান—আজু গোঁসাইর পরিচয়। ৯১—১০০

নয়

রামপ্রসাদের বংশ-পরিচয়—'চন্দ্রপ্রভা'—বৈদ্যকুলগ্রন্থ—গোপালকৃষ্ণ রায়—পূর্ব্ব পুরুষ পরিচয়। ১০০—১০৬

দশ

শক্তি সাধনা—সম্প্রদায় বিভাগ—বীরসাধক রামপ্রসাদ—সাধনের বিভিন্ন রূপ—তন্ত্র সার্ব্বজনীন—ষট্‌চক্রভেদ—ষট্‌চক্রবর্ণন—পরমার্থ সিদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায়—বিশ্বপ্রকৃতি ও অন্তঃ প্রকৃতির অপরূপ মাধুর্য্য উপলব্ধি। ১০৭—১২২

এগারো

অলৌকিক কাহিনী—গাব গাছে পদ্ম ফুল—রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধা—কাশীর অন্নপূর্ণার রামপ্রসাদের বাড়ীতে আগমন, বেড়াতে লেখা—নবাব সিরাজউদ্দৌলার রামপ্রসাদের মুখে শ্যামা মায়ের গান শোনা—দেবী চিত্রেশ্বরী কালিকা—মা না মহাশক্তি—শঙ্কর বৈরাগী তোর—শ্রীশ্রীচিত্রেশ্বরী—তোর সাধ থাকেতো ফিরে চা—কাশীযাত্রা—প্রত্যাগমন—কাশী গমন ও দর্শন—কাশীর বর্ণনা, বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শন—কাশীতে প্রসাদের সমাদর—শ্রোতা—কাশী-পরিক্রমা—বৈরাগ্য ও সিদ্ধি। ১২৩—১৩৬

বারো

রামপ্রসাদের তীর্থাদি দর্শন সম্পর্কে আলোচনা—বাঙ্গালা দেশে পূজিত দেব দেবী—শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম-প্রভাব। ১৩৭—১৫৯

তেরো

দারিদ্র্যের ক্লেশ—অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় সমাজ—বর্গীর হাঙ্গামা—পলাশীর যুদ্ধ, মীরজাফর—মীরকাসিম—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর—অরাজকতা—প্রসাদের নির্ভরশীলতা—ভক্তি ও বিশ্বাস। ১৬০—১৬৬

চৌদ্দ

রামপ্রসাদের শেষদিন, আত্মবিসর্জ্জন—ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদে দেহত্যাগ, মৃত্যু সম্বন্ধে বিবিধ কিংবদন্তী ও ইতিহাস, বিবিধার্থ সংগ্রহ—হরিমোহন সেন, ব্রহ্মময়ীর নাম করিতে করিতে ব্রহ্মারন্ধ্র ভেদে মৃত্যু। ১৬৭—১৭৩

পনেরো

চূড়ামণি দত্ত, রাজা নবকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণের কালী পূজা—মহারাজ নন্দকুমার—গোবিন্দ মিত্রের নবরত্ন মন্দির, সিদ্ধেশ্বরীর কালী—ঠনঠনিয়া, জয়নারায়ণ, রামশঙ্কর

ঘোষ, দুর্ভিক্ষ, ঝড় ও বন্যা, কুলার্ণব তন্ত্র, রক্তপাত দ্বারা শক্তি সাধনা অসঙ্গত—রামপ্রসাদের গানের বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচার। ১৭৪—১৮৫

ষোলো

পঞ্চমুণ্ডী আসন, হালিসহরে সংক্রামক জ্বর—পঞ্চমুণ্ডী আসন সংরক্ষণ, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ স্মৃতি ভাণ্ডার, পূর্ণিমা সম্মিলনী, রামপ্রসাদের বাস্তু ভিটা, হালিসহরে প্রসাদ ভিটা, অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপূজা ও প্রসাদী মেলা, শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—দয়ালচন্দ্র ঘোষ, ও শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী—রামপ্রসাদের জীবন ও সাধনা ও গীতাবলী সম্বন্ধে গবেষণা, রবিবাসর রামপ্রসাদের সম্পর্কে বিবিধ আলোচনা। ১৮৬—১৯৯

সতেরো

রামপ্রসাদ - বিভিন্ন ভণিতা—রামপ্রসাদ কয়জন ছিলেন ও কবিওয়ালা রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, চিনিশপুরের দ্বিজ রামপ্রসাদ, আর্য্যদর্শন—বংশ-পরিচয়, দ্বিজ রাম প্রসাদের কাল নির্ণয়, দেবোত্তর সম্পত্তি, গঙ্গাপ্রসাদ সেন, রাজমোহন—রাম প্রসাদ ব্রহ্মচারী, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—বৈদ্য দ্বিজ, বৈদ্যজাতির পরিচয়, দ্বিজ বৈদ্য সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রাজা রাজকৃষ্ণ, দ্বিজ রামপ্রসাদ চিনিশপুর ঢাকা, আর্য্যদর্শন, পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের শব্দের ব্যবহার, পশ্চিমবঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদ ও চিনিশপুরের দ্বিজ রাম প্রসাদের বিষয় গবেষণা ও সঙ্গীতের দ্বারা বিশ্লেষণ—অলৌকিক কাহিনী। ২০০—২৩৭

আঠারো

রামপ্রসাদ-সাধক কবি ও গীতকার, তাঁহার সঙ্গীতের ইংরাজী অনুবাদ—শ্রীশ্রীকালী কীর্ত্তন, কবিচরিত—রাজকিশোর—শ্রীশ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-কালিকামঙ্গল বা কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর, আলোচনা ও সমালোচনা, বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান সম্বন্ধে বিশ্লেষণ, বিদ্যা ও সুন্দরের বিবাহ, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের বিষয়, প্রসাদী-সঙ্গীত ও পদাবলী, রামপ্রসাদের সঙ্গীতে বাঙ্গলাগীতি-কবিতার সৌন্দর্য্য, জনপ্রিয়তা—প্রচার—রাম প্রসাদের সঙ্গীতে সার্ব্বজনীন বিশ্বপ্রেম। ২৩৮—২৮০

রামপ্রসাদের গ্রন্থাবলী

প্রসাদ পদাবলী	২৮৩—৩৬৭
আগমনী	৩৬৭—৩৬৮
বিজয়া	৩৬৮
শ্রীশ্রীকালী কীর্ত্তন	৩৬৯—৩৮৮
শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন	৩৮৮—৩৯০
সীতা বিলাপ	৩৯০—৩৯১
কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর	৩৯২—৪৭৩

[সাধক কবি রামপ্রসাদের বংশতালিকা। আমরা মূল গ্রন্থ মধ্যে ১০৫ পৃষ্ঠায় 'চন্দ্রপ্রভার' মতে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে রামপ্রসাদ পর্য্যন্ত (খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত) বংশধারা দিয়াছি। এখানে রামপ্রসাদের পরবর্ত্তী বংশধারা বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইল]

- রামরাম
  - (বৈমাত্রেয়) নিধিরাম
    - রামহরি
      - অভয়াচরণ
        - মধুসূদন
        - গুরুচরণ
        - গঙ্গাচরণ
          - দীননাথ
            - ক্ষেত্রকৃষ্ণ
            - জয়কৃষ্ণ
          - প্রিয়নাথ
            - ছয় পুত্র
          - যোগেন্দ্রনাথ
            - সুরেন্দ্রকৃষ্ণ
            - নরেন্দ্রকৃষ্ণ
          - রাধানাথ
            - হরিদাস
          - জানকীনাথ
            - অতুলকৃষ্ণ
          - রামনাথ
            - সুরথকৃষ্ণ
            - কমলকৃষ্ণ
            - কালীকৃষ্ণ
        - পঞ্চানন
  - অম্বিকা
  - ভবানী
    - জগন্নাথ
    - কৃপারাম
  - সাধক **রামপ্রসাদ**
    - পরমেশ্বরী
    - রামদুলাল
      - রাজচন্দ্র
        - গোবিন্দমণি
        - কালাচাঁদ
        - গোরাচাঁদ
    - জগদীশ্বরী
    - রামমোহন
      - জয়নারায়ণ
        - গোপালচন্দ্র (কৃষ্ণ)
          - কালীপদ
            - চিত্তরঞ্জন
              - প্রভাতরঞ্জন
            - মানসরঞ্জন
              - শৈলেন্দ্রনাথ
                - অসিত
                - আরতি
                - অঞ্জু
              - যতীন্দ্রনাথ
                - মঞ্জু
                - সলিল
              - ফনীন্দ্রনাথ
              - সুধীন্দ্রনাথ
                - দীপক
                - কৃষ্ণা
                - কিশলয়
                - স্বপ্না
              - সমরেন্দ্রনাথ
            - হৃদয়রঞ্জন
            - আশারঞ্জন
              - মণিকা
            - ৩ কন্যা
      - দুর্গাদাস (বৈমাত্রেয়)
        - অমরনাথ
          - রামরঞ্জন
          - বিষ্ণুচরণ
          - ২ কন্যা
  - বিশ্বনাথ (বংশতালিকা জানা নাই)

রামপ্রসাদের পঞ্চমুণ্ডীর আসন—সম্মুখভাগ

রামপ্রসাদের সাধন পীঠ—পঞ্চবটি—পশ্চাদ্ভাগ

এক

"আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমক্‌হারাম্‌ নই শঙ্করী"॥ —রামপ্রসাদ

কর্ত্তামশাই এ নূতন মুহুরীকে দিয়ে আমার কাজ চলবে না।

কর্ত্তা উত্তর করিলেন, কেন বলত!

লোকটা কিছুই কাজ করে না। পাকা হিসেবের খাতাখানা একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে। কি সব হিজিবিজি কথা লিখে। বারণ করলেও শোনে না। আপন মনে কি যেন কি ভাবে, গুন্‌ গুন্‌ করে গান গায়। এমন অকেজো লোক দিয়ে সেরেস্তার কাজ চলবে কি করে? খাতার একোণে ওকোণে আছে কত কি গান লেখা। আমি এমন লোক দিয়ে কাজ চালাতে পারবো না বলে দিচ্ছি। সেদিন হিসাবের খাতাখানা পরীক্ষা করতে গিয়ে ওসব দেখে রাগে খাতাখানি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম।

কর্ত্তা বলিলেন—এই যে নূতন মুহুরীকে কাজে বহাল করেছি, রামপ্রসাদ যাঁর নাম—তুমি কি তাঁর কথা বলছো?

আজ্ঞে হাঁ! হুজুর।

বেশ তাঁর খাতাখানা নিয়ে এসো ত একবার দেখি কি করেছে রামপ্রসাদ!

প্রভুর অনুমতি পাইয়া রামপ্রসাদের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী খাজাঞ্চী তৎক্ষণাৎ মহোৎসাহে সেরেস্তা হইতে রামপ্রসাদের লিখিত পাকা হিসাবের খাতাখানি আনিয়া প্রভুর হাতে দিলেন এবং দেখাইয়া দিলেন কেমন করিয়া এই নূতন মুহুরী—হিসাবের খাতাখানি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

জমিদার হিসাবের খাতাখানি হাতে লইলেন এবং মনোযোগ-সহকারে বিস্ময়-মুগ্ধ-চিত্তে পাতার পর পাতা উল্টাইয়া পড়িতে লাগিলেন! দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখের ভাবে ফুটিয়া উঠিল এক উজ্জ্বল দীপ্তি!—

এদিকে সেই কর্ম্মচারীটি বলিয়া যাইতেছিল, বাবুমশাই, আমি বারবার বলেছি, দেখ রামপ্রসাদ! এ জমিদারী সেরেস্তার কাজ, এখানে ওসব হিজিবিজি

দেখা চলবে না! —কিন্তু কিছুতেই কোন কথা শোনেনি। আপনি মালিক, আমাদের অন্নদাতা, আমরা কোন মতেই আপনার কোন অন্যায় হয় তা দেখতে পারবনা। আমি রামপ্রসাদকে বলেছি— রামপ্রসাদ, এই তোমার কাজ? ছিঃ, তোমার কি একটুও লজ্জা হয় না। আপনি নিজেই দেখুন হুজুর, আমি সত্য বলেছি—কি মিথ্যা বলেছি।

জমিদার একটি কথাও বলিলেন না। খাতার পৃষ্ঠা উল্টাইতে উল্টাইতে একটির পর একটি গান পড়িতে পড়িতে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় চোখের জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। যে গানের প্রতি তাঁহার প্রথমে দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল—সে গানখানি পড়িয়া একেবারে বিমোহিত হইলেন—জমিদার। সে গানটি হইতেছে—"আমায় দেও মা তবিলদারী"। প্রভু ছিলেন একজন পণ্ডিত, গুণগ্রাহী ও ভক্ত পুরুষ, তিনি কর্ম্মচারীকে বলিলেন: ও হে রামপ্রসাদকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো।

কর্ম্মচারী মনে করিলেন—এবার রামপ্রসাদের চাকরীটি নিশ্চয়ই যাবে—পরের অনিষ্ট করিতে মহা উৎসাহী সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ রামপ্রসাদের কাছে গিয়া বলিলেন—এসো হে রামপ্রসাদ, কর্ত্তামশাই তোমায় ডেকেছেন, এসো। —তাড়াতাড়ি এসো।

উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর কথায় বিস্মিত হইলেন রামপ্রসাদ!

তাঁহাকে জমিদার ডাকিলেন কেন? কই কোন অপরাধ করিনি তো! রামপ্রসাদ প্রভুর নিকট নির্ভীক চিত্তে গমন করিলেন।

রামপ্রসাদ প্রভুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্র, জমিদার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—এ সব গান কি তুমি লিখেছ রামপ্রসাদ?

প্রসাদ মাথা নীচু করিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিলেন:—আজ্ঞে মা লিখিয়েছেন! আমি ত সামান্য মানুষ:

বসো রামপ্রসাদ বসো।

বিস্মিত হইল তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী! একি মিষ্টি সম্ভাষণ। তিনি ভাবিয়াছিলেন, জমিদার রামপ্রসাদের এই অন্যায় অপরাধের জন্য তাঁহাকে বরখাস্ত করিবেন—এবং প্রভু তাহার এ কার্যের জন্য সন্তুষ্ট হইয়া বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। এত বড় ভুল দেখিয়াও কি জমিদার এমন অকেজো মুহুরীকে কাজে বহাল রাখিবেন? নিশ্চয় নয়। সে মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। দেখি জমিদার কি করেন!

এদিকে জমিদার মহাশয় বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলেন—রামপ্রসাদের

হিসাবের খাতা, দেখিলেন আয়-ব্যয়ের হিসাব ঠিক্ আছে, কোথাও কোন ভুল নাই, হিসাবের শেষে পাতায় পাতায় রহিয়াছে এক একটি জগজ্জননী শ্যামা-মাকে সম্বোধন করিয়া গান। রামপ্রসাদের প্রভু যে পাতাখানি প্রথমে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সে পাতায় হিসাবের শেষ দিকের এক কোণে এই গানটি লেখা ছিল :

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী॥
পদ-রত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি॥
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির, মাগো, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনের চাকর, কেবল চরণ ধুলার অধিকারী॥
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তো মা পেতে পারি॥
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাই তো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি॥

এই গানটি রামপ্রসাদের অন্নদাতা প্রভুর প্রাণে এমনি এক ভাবের ও ভক্তির তরঙ্গ তুলিয়াছিল যে, তিনি বিস্মিতভাবে ভক্তি গদগদ-চিত্তে রামপ্রসাদের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন :— রামপ্রসাদ,—তুমি ভক্ত, তুমি সাধক, জমিদারী সেরেস্তার হিসাব-নিকাশের খাতা লেখা, তোমার কাজ নয়। দেখ রামপ্রসাদ, তোমাকে আমার সেরেস্তার কাজ হতে মুক্তি দিচ্ছি, মুক্ত পাখীকে খাঁচায় পুরলে সে কি ইচ্ছে মত ডানা মেলতে পারে ? তুমি তোমার নিজ গ্রামে চলে যাও, নিজ বাড়ী গিয়ে মায়ের সাধনা কর। অনর্থক সংসারের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে তোমার শ্যামা মাকে ডাকো। আমি তোমার সাংসারিক ব্যয়ের ভার গ্রহণ করলাম। তোমাকে আমি মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করলাম। যাও ভাই বাড়ী ফিরে যাও।

ভক্ত ও গুণগ্রাহী প্রভুর অনুগ্রহে সেদিন হইতে রামপ্রসাদের যাবজ্জীবন মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। সাংসারিক চিন্তা হইতে মুক্ত হইলেন রামপ্রসাদ।

রামপ্রসাদের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া জমিদার বলিলেন :—তুমি ভুল বুঝেছ রামপ্রসাদকে, রামপ্রসাদ পাগল নয়, রামপ্রসাদ ত সামান্য মানুষ

নয়, সে সামান্য মুহুরী নয়, তুমি ভুল বুঝে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলে,—এ যে শ্যামা-মায়ের ভক্ত সন্তান—তুমি আমার কল্যাণকামী, আজ এই ভক্ত রামপ্রসাদের সঙ্গে তোমার জন্যই আমার সাক্ষাৎ হলো, তুমি যদি তাঁর অকর্ম্মণ্যতা ও পাগলামী দেখাবার জন্য খাতাখানি না আনতে তবে ত আমি এই ভক্তের সাক্ষাৎ পেতাম না। সেজন্য আমি তোমার বেতন বৃদ্ধি করে পুরস্কৃত কচ্ছি। তুমি যাও সেরেস্তার কাজ কর্ম্ম করো গিয়ে।

কর্ম্মচারী চলিয়া গেল। মনে মনে সে ভাবিল জমিদারও কি পাগল হইলেন নাকি?

জমিদার বলিলেন: রামপ্রসাদ, তুমি আমাকে তোমার শ্যামা-মায়ের নাম শোনাও—আমি পবিত্র হই—ধন্য হই। তোমার তবিলদারী গানটী শোনাও ভাই:

রামপ্রসাদ অমনি মুক্ত পাখীর মত মনের অনন্দে গান ধরিলেন:

আমায় দেও মা তবিলধারী।

গীত শেষে—ভক্ত জমিদার আসিয়া রামপ্রসাদকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন:—যাও রামপ্রসাদ, তোমার সাধন-তীর্থে যাও, যদি কখনো সময় বা অবসর হয়, তবে আমাকে তোমার মায়ের নাম শুনিয়ে যেয়ো। ভক্তির এক কণা আমাকে বিলিয়ে দিও। আমার সেরেস্তার তহবিলদারী কাজ তোমার জন্যে নয়। তোমার উপযুক্ত কাজ হচ্ছে, মায়ের তবিলদারী নেওয়া, যাও ভাই।

রামপ্রসাদ কৃতজ্ঞ-চিত্তে জমিদারকে ধন্যবাদ জানাইয়া নিজ জন্মভূমি হালিসহর-কুমারহট্টে চলিয়া গেলেন। মায়ের কৃপায় এই অসীম অনুগ্রহ লাভে এবং আর্থিক চিন্তা ও পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া প্রসাদ গাহিলেন:

দিবানিশি ভাবরে মন অন্তরে করালবদনা।
নীলকাদম্বিনী রূপ মায়ের এলোকেশী দিগ্বসনা॥

কুমারহট্টে নিজ বাস-পল্লীতে স্থাপিত হইল তাঁর সাধন-পীঠ। সাধকের চিত্তে জাগিল মায়ের অপরূপ রূপ! তিনি পরম সন্তুষ্ট চিত্তে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে মায়ের চরণে সমর্পণ করিলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে স্বতঃ নিঃসৃত হইল অপূর্ব্ব ভক্তি ও বিশ্বাসের বাণী:

ডুব দে মন কালী ব'লে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে॥

দুই

মন করোনা সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা॥

—রামপ্রসাদ

বামদিকে হালিসহর, দক্ষিণে ত্রিবেণী।
দু'কূলের যাত্রীর রবে কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোক এক ঘাটে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু কেহ করে দান॥"

—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

আমরা প্রথম অধ্যায়ে রামপ্রসাদের জীবনের একটি প্রচলিত কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছি। এইবার কে ছিলেন ঐ রামপ্রসাদ তাঁহার কথাই বলিব। বাঙ্গালাদেশে ও বাঙ্গালার বাহিরেও এমন খুব কম লোক আছেন, যাঁহারা রাম-প্রসাদের নাম শোনেন নাই। বাঙ্গালার সুদূর প্রান্তেও রামপ্রসাদের সুধামাখা সঙ্গীত প্রতিদিন গীত হইয়া থাকে।

রামপ্রসাদের আবির্ভাব হইয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে—সেকালে যে সকল কবি ও সাধকগণের কবিত্ব ও সঙ্গীত-মাধুর্য্যে বাঙ্গালাদেশে এক নূতন সাহিত্য-সাধনা, ভক্তি ও প্রেমের বন্যা বহিয়াছিল, তাহার সেই পুণ্য-পাবনধারা প্রবাহিত হইয়াছিল—রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, রামেশ্বর, প্রভৃতি কবি ও সাধক মহাপুরুষগণের কাব্যে গীতে ও গানে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহাদের গান শুনিতেন, কবিতা পাঠ করিতেন -কিন্তু কেহই তাঁহাদের জীবনব্যাপী সাধনা ও জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া যান নাই, সেজন্য আমরা সে সকল মহাপুরুষদের বিষয় অল্পই জানিতে পারিতেছি। সৌভাগ্যের বিষয় বাঙ্গালাদেশে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্ম হইয়াছিল, এই জন্য বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার কাছে ঋণী। মহাকবি ঈশ্বরগুপ্তই সর্ব্বপ্রথম রামপ্রসাদের জীবনের ঘটনা, কবিতা ও পদাবলী সংগ্রহে মনোযোগী হইয়াছিলেন।

এ সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বলেন, 'কোবিদ বৈদ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মাসিক প্রভাকরে প্রাচীন কবিগণের বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া অনেক তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধিৎসাবলেই ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণের বৃত্তান্ত ইদানীন্তন লোকে প্রথমে অবগত হইতে পারিয়াছেন, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

পরিশেষে সেই বৃত্তান্তে নির্ভর করিয়া অনেকেই প্রসাদের জীবন-চরিত বর্ণনে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু প্রসাদ-প্রসঙ্গকার ভিন্ন অন্য কেহ যে এই জন্য কিছুমাত্র পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা বোধ হইল না। সুতরাং আমরা প্রধানতঃ এই দুইজনের আখ্যায়িকা হইতেই প্রসাদ-কবির জীবন-বৃত্তান্ত সঙ্কলিত করিলাম।* কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবনী সম্বন্ধে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন শীর্ষক প্রবন্ধটি যেরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন—এখানে তাহা প্রকাশ করিলাম।†

রামপ্রসাদের জীবনী সম্বন্ধে গুপ্ত কবির পরবর্ত্তী কালে অনেকে আলোচনা করিলেও এ কথা স্বীকার্য্য যে পরবর্ত্তী কালের লেখকেরা সকলেই তাঁহার নিকট ঋণী।

গুপ্ত কবি লিখিয়াছেন :—

"আমরা আশ্বিন মাসের প্রথম দিবসীয় প্রভাকর পত্রে মহাত্মা ৺রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন প্রণীত কয়েকটি গীত প্রকটন করিয়াছিলাম; তৎপাঠে পাঠক মাত্রেই প্রেমানন্দে পূর্ণ হইয়াছেন, যেহেতু ইহার তুল্য বঙ্গভাষা-ভাষিতে অমূল্য গীতারত্নে পর্য্যন্ত কোন কবি কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই। বঙ্গদেশের মধ্যে যত মহাশয় কবিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে রামপ্রসাদ সেনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে, কারণ তিনি সকল রসের রসিক, প্রেমিক, ভাবুক ও ভক্ত এবং জ্ঞানী ছিলেন। ইনি কতকালের পুরাতন মনুষ্য ও কতকাল মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন তথাচ ইঁহার কৃত একটিও পদ অদ্যাপি পুরাতন হইল না, নিয়তই নূতন ভাবে পরিচিত হইতেছে; যখনি যাহা শুনা যায় তখনই তাহা নূতন বোধ হয়। গায়কেরা যখন গান করেন তখন শ্রোতৃবর্গের কর্ণে বর্ণে বর্ণে সুধা প্রবেশ করিতে থাকে। কোন সুগায়ক ব্যক্তি অপর কোন কবি রচিত গীত অতি সুস্বরে গান না করিলে শ্রুতি সুখকর হয় না, তাহাতে বাদ্য ও অন্যান্য যন্ত্রের আবশ্যক করে। রামপ্রসাদি পদে ইহার কোন বিষয়েরই প্রয়োজন করে না। কাকের ন্যায় অতি নিরস কর্কশ কণ্ঠ কোন মানুষ (যাহার তাল, মান, রাগ, সুর, কিছুই বোধ নাই) তাহার কণ্ঠ হইতে রামপ্রসাদি পদ নির্গত হইলে বোধ হইবে যেন কোথা হইতে অকস্মাৎ অমৃত বৃষ্টি হইতেছে। এই

* প্রসাদ-পদাবলী অর্থাৎ রামপ্রসাদের সমগ্র রচনা সংগ্রহ। শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সংগৃহীত। অনুক্রমণিকা দ্রষ্টব্য। সন ১৩০১ সাল।

† সংবাদ প্রভাকর—কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন শীর্ষক প্রবন্ধ ১২৬০ সালের ১লা পৌষ প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১—১৪ পৃঃ। প্রভাকর সংখ্যা ৪৮০১।

গানে যন্ত্র না হইলে যন্ত্রণার বিষয় কি। যিনি মানুষ হইবেন শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহার মন অমনি মুগ্ধ হইবেক, ভাবার্থ গ্রহণ করণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রেমাহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতে থাকিবেন। পৃথিবীতে যত প্রিয় পদার্থ আছে তৎকালে তাঁহার চিত্ত এতদপেক্ষা পরম প্রিয় বলিয়া আর কাহাকেই গ্রাহ্য করিবে না। কোন কোন রামপ্রসাদি পদের কোন কোন চরণের কোন কোন শব্দ ও কোন কোন ভাব এরূপ রমণীয় ও এরূপ অত্যাশ্চর্য্য কৌশল পরিপূরিত যাহার স্বরূপার্থ প্রকাশ হইলে বহু শাস্ত্রের মর্ম্ম অনায়াসেই গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং তদ্দ্বারা সিদ্ধান্ত সূর্য্যের সন্দীপণে সমুদয় সংশয়ধ্বান্ত অস্ত হইলে হৃদয়ারবিন্দ আনন্দমকরন্দ-ভরে প্রফুল্ল হইয়া কি এক অভাবনীয় অদ্ভুত ব্যাপারে অভিভূত করিতে থাকে।

কবিতা বিষয়ে রামপ্রসাদ সেনের অলৌকিক শক্তি ও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, ইনি চক্ষে যাহা দেখিতেন এবং ইঁহার অন্তঃকরণে যখন যাহা উদয় হইত তৎক্ষণাৎ তাহাই রচনা করিতেন, কস্মিন্‌কালে দৎকলম লইয়া বসেন নাই। মুখ হইতে যে সমস্ত বাক্য নির্গত হইত তাহাই কবিতা হইত। তিনি পরমার্থ পথের একজন প্রধান পথিক ছিলেন, অতি সামান্য সকল বিষয় লইয়া ঈশ্বর প্রসঙ্গে তাহারই বর্ণনা করিতেন, এই মহাশয় সদানন্দ পুরুষ ছিলেন, ব্রহ্মচিন্তা ব্যতীত তাঁহার অন্তঃকরণে অন্নচিন্তা বা অন্য চিন্তা মাত্রই ছিল না, বিষয়বিশিষ্ট সাংসারিক সুখকে অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করিতেন, পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও আহারের উত্তমতা বিষয়ে দৃষ্টি ছিল না, অতি জঘন্য দ্রব্য আহার করিয়াও অতি মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকিতেন। অবস্থার উন্নতিকল্পে মনোযোগ না থাকাতে সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই, তিনি যদ্রূপ অদ্বিতীয় কবি ছিলেন ও তাঁহার জীবিত সময়ে কবিতার যদ্রূপ সমাদর ছিল এবং তৎকালে এই দেশে যদ্রূপ ধনিলোকে মণ্ডিত ছিল, ইহাতে বিষয়বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র বাসনাবিশিষ্ট হইলে অক্লেশে বিপুল বিত্ত সংগ্রহপূর্ব্বক পুত্রপৌত্রাদিকে সমূহ সুখে সুখি করিয়া যাইতে পারিতেন। তিনি যে এক উচ্চ বিষয়ের বিষয়ী ছিলেন তাহাতে সহজেই সমস্ত বিষয়কে তুচ্ছ বোধ হইত, কেননা সমুদয় অসার ভাবিয়া কেবল কালী নাম সার করিয়াছিলেন, সুতরাং যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে পরম প্রকৃতির উপাসনা করেন অতি কুৎসিৎ যৎসামান্য রূপাসোনার উপাসনা তাঁহার মনে কি প্রকারে ভাল লাগিতে পারে?

রামপ্রসাদের পদী রামপ্রসাদের পদ হইয়াছিল। তিনি পদের বলেই পদে ছিলেন, ইহাতে সামান্য পদের প্রয়োজন কি? পদ পাইয়াই পদ পাইয়াছিলেন,

সেন সদাত্মার যে পদ তাহাই বিপদ, অথচ বিপদ নহে, বিপদনাশক বিপদ। যিনি যথার্থ দ্বিপদ, তিনিই এই পদ ও বিপদের মর্ম্মগ্রাহী হইবেন, নচেৎ অপর কেহই তাহার যোগ্য হইতে পারিবেন না।

রামপ্রসাদ সেন প্রথমাবস্থায় কলিকাতাস্থ বা তন্নিকটস্থ কোন বিখ্যাত ধনির গৃহে ধনরক্ষকের অধীনে এক মুহুরীর কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু বিষয়-বাসনা-বিহীনতা জন্য তৎকর্ম্মে তাঁহার মনের অভিনিবেশ মাত্র ছিল না, এ কারণ তিনি তহবিলদারের প্রিয় হইতে পারেন নাই, সর্ব্বদাই উভয়ের মধ্যে বাক্‌কলহ ও বিবাদ হইত, সেন-কবির চাকরি করা কিছু উদ্দেশ্য ও অভিপ্রেত ছিল না। তিনি মানসিক সংকল্পপূর্ব্বক যে পরম প্রভুর দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন শুদ্ধ তাঁহারি কার্য্য করিতেন, মানব প্রভু বিরক্ত হইলে উপস্থিত পদে বিপদ হইবে সেদিকে দৃক্‌পাত করিতেন না, প্রতি দিবস নিয়মিত কালে কার্য্যের আসনে উপবিষ্ট হইয়া খাতার পাতা খুলিয়া আগাগোড়া শুদ্ধ "শ্রীদুর্গা" "শ্রীদুর্গা" এই নাম লিখিতেন, এই প্রকারে যখন খাতার সমুদয় পাতা কেবল 'দুর্গা' নামে পরিপূর্ণ হইল, তখন সর্ব্বশেষে এই গানটি লিখিয়া বসিলেন। যথা—"আমায় দেও মা তবিলদারী।" [পূর্ব্বে এই গীতটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়াছি] খাতার শেষপত্রে এই কবিতা লিখিত হইলে তহবিলদার সেই খাতা দৃষ্টিকরতঃ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ব্যগ্র হইয়া আপনার প্রভুর নিকট কহিলেন, "মহাশয় একটা পাগল ও মাতালকে বিশ্বাসপূর্ব্বক কর্ম্ম দিয়া কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন! দেখুন এমন সুন্দর পাকা খাতাখানা একেবারে নষ্ট করিয়াছে, ইহাতে অঙ্কপাত মাত্র করে নাই, কেবল পাগলামি করিয়াছে, ইত্যাদি। উক্ত প্রভু তচ্ছ্রবণে খাতার আগাগোড়া সকল পাতা বিলক্ষণরূপে বিলোকন ও "আমায় দেও মা তবিলদারী" এই পদটি সমুদয় তিন চারিবার পাঠ করতঃ অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং খাজাঞ্চিকে কহিলেন, "তুমি পাগল ও মাতাল বলিয়া কাহার উপর অভিযোগ করিতেছ? এ ব্যক্তি তো কাঁচা কর্ম্ম করিয়া পাকা খাতা নষ্ট করে নাই, পাকা খাতায় পাকা কর্ম্মই করিয়াছে, তুমি কথার ইঙ্গিতে ও ভাবের ভঙ্গিতে এই সঙ্গীতের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পার নাই, আর তুমি বিষয়মদে মত্ততার জন্য ইঁহাকে চিনিতে পার নাই, রামপ্রসাদ সেন সামান্য কবি নহেন, সাক্ষাৎ দেবী পুত্র, অতি সাধু ব্যক্তি", পরে অতি প্রিয় বাক্যে সম্বোধনপূর্ব্বক কবিরঞ্জনকে কহিলেন, "রামপ্রসাদ! তুমি যে পদে পদার্পণ করিয়াছ তাহাতে এপদে বদ্ধ রাখায় কেবল তোমারি বিপদ করা হইতেছে, তুমি যাবজ্জীবন এ সংসার কাননে বিচরণ করিবে আমি তাবৎকাল তোমাকে ৩০ ত্রিশ মুদ্রা মাসিক বৃত্তি প্রদান

করিব, তোমার আর ক্ষণকাল এখানে থাকিবার আবশ্যক করে না, যাও তুমি এখনি আপনার গৃহে গিয়া স্বকার্য্য সাধন কর।"

কে এই দানশীল মহাপ্রাণ জমিদার ছিলেন তাহা সঠিক্‌ভাবে জানিতে পারা যায় না। এইস্থলে দুইপ্রকার প্রবাদ আছে, কেহ কেহ কহেন রামপ্রসাদ খিদিরপুরস্থ দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট, কেহ কেহ কহেন, কলিকাতাস্থ নবরঙ্গ কুলপতি ৺দুর্গাচরণ মিত্রের নিকট মুহুরীগিরি কর্ম্ম করিতেন। আবার এইরূপ জনপ্রবাদও প্রচলিত আছে যে বাগবাজারের মদনগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান গোকুলমিত্র ছিলেন রামপ্রসাদের মনিব। এবিষয়ে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে। আবার কাহারও মতে হুগলীতে গোকুল সরকার নামে একজন ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। প্রসাদ তাঁহার সেরেস্তায় ৮৲ টাকার মুহুরী নিযুক্ত হন। পাকা খাতা লইয়া গান লিখিতে আরম্ভ করেন। আমায় দেও মা তবিলদারী ইত্যাদি। খাজাঞ্চী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার খাতা কাড়িয়া লইয়া তাঁহার ঘাড় ধরিয়া তাড়াইয়া দেয় এবং গোকুল বাবুকে যাইয়া নষ্ট খাতার উপায় কি জিজ্ঞাসা করে। গোকুলবাবু গানটি পড়িতে বলেন। খাজাঞ্চী গান পড়িলে, তিনি প্রসাদকে হাজির করিতে বলেন। প্রসাদ হাজির হইলে, তিনি তাঁহাকে কোলে বসাইয়া বলেন, "আজ হইতে আর তোমাকে মুহুরীগিরি করিতে হইবে না। যে ৮৲ আট টাকা বেতন পাও, তাহা আমি মাসে মাসে তোমাকে দিব। তুমি যাইয়া গান রচনা কর। তবে মাঝে মাঝে আমাকে শুনাইয়া যাইও। প্রসাদকে নূতন বসন পরাইয়া বিদায় করিলেন।

রামপ্রসাদ সেন ৩০৲ ত্রিশ টাকা মাসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করত বাটীতে আসিয়া সানন্দচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পরিবার অধিক হওয়াতে ঐ স্বল্প বৃত্তি দ্বারা কোন প্রকারেই সুপ্রতুলরূপে সংসার নির্ব্বাহ হইত না, একারণে স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিজনেরা সর্ব্বদাই উপার্জ্জনের নিমিত্ত উত্তেজনা করিত, কিন্তু সে পক্ষে তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না, শুদ্ধ শক্তি ভক্তি সার করিয়া সঙ্গীতানন্দার্ণবে নিমগ্ন হইতেন। ফলে তাঁহার পরিবারে কোন দ্রব্যেরই অপ্রতুল ছিল না, নানাস্থান হইতে নানা ব্যক্তি যাহারা সংকীর্ত্তনাদি নানা বিষয়ক গীত লইতে আসিত তাহারা কালীর ও কবির প্রণামি স্বরূপ অনেক অর্থ ও বহু প্রকার দ্রব্যাদি অর্পণ করিত, তিনি নিজে অতিশয় দাতা এবং দয়ালু ছিলেন, স্নেহপাত্র, অনুগত এবং দীন দরিদ্র যাহাকে সম্মুখে দেখিতেন তাহাকেই তৎক্ষণাৎ সমুদয় দান করিয়া বসিতেন, এদিকে আপনার ঘরে হাঁড়ি চড়েনা, আহার অভাবে পরিজনগণ হাহাকার করিতেছে। তিনি প্রকৃত মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন, এজন্যই

তাঁহার দীনতার ক্ষীণতা হইত না, কন্যা. পুত্র, স্ত্রী কিংবা অপর কেহ নিতান্ত বিরক্ত করিলে জগদীশ্বর স্মরণপূর্ব্বক মনের ভাবে এক একবার এক একটা গান করিতেন। যথা:

তুমি এ ভাল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না।
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু, আমারে দিলে না॥
কিছু দিলে না, পেলে না, দিবে না, পাবে না,
তায় বা ক্ষতি কি মোর।
হোক্ দিলে দিলে বাজি,
তাতেও আছি রাজি, এবার এবাজি ভোর গো॥
এ মা দিতিস্, দিতাম, নিতাম, খেতাম, মজুরি করিয়ে তোর।
এবার মজুরি হোল না, মজুরা চাব কি,
কি জোরে করিব জোর গো॥
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা, মিছামিছি করি শোর্।
শুধু শোর্ করা সারা, তোর যে কুধারা,
মোর যে বিপদ ঘোর গো॥
এ মা ঘোর মহানিশি, মন যোগে জাগে, কি কাজ তোর কঠোর।
আমার একুল, ওকুল, দুকুল গেল, সুধা না পেলে চকোর গো।
এ মা, আমি টানি কূলে, মন প্রতিকূলে, দারুণ করম ডোর্।
রামপ্রসাদ কহিছে, পোড়ে দুটানায়, মরে মন ভুঁড়া চোর গো।

এই গীত যখন রচনা করেন তখন তাঁহার মনের ভাব কি চমৎকার হইয়াছিল তাহা ভাবজ্ঞ জনেরা বিবেচনা করিবেন। ইহার গূঢ়ার্থ যিনি প্রকাশ করিবেন তিনিই সুখী হইবেন। কারণ কোন বিষয়ের অভাবকালে স্বভাবকে স্বভাবে রাখিয়া সেই অভাবের অভাব করা অথবা সেই অভাবকে অভাবে রাখিয়া স্বভাবে রাখা বড় সহজ ব্যাপার নহে, যে কেহ হউন, এই সহজ তখন তাঁহার পক্ষে অতি সহজ হইবে যখন তিনি সহজে সহজকে জানিতে পারিবেন।* যথা:

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ যে মা সংসারী॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে, এই সংসার সবারি।
ওমা তুমিও কোন্দোল করেছ, বলয়ে শিব ভিখারী॥

---

* সহজ পরমাত্মা অর্থাৎ জীবের সহজ।

জ্ঞানধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্ম তদুপরি,
ওমা বিনা দানে মথুরাপারে, যান্‌নি সেই ব্রজেশ্বরী ॥
নাতোয়ানি কাচ্‌ কাচ মা, অঙ্গে ভস্ম ভূষণ পরি ॥
ওমা কোথায় লুকাবে বল, তোমার কুবের ভাণ্ডারী ॥
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হোলে ভারি।
যদি রাখো পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি ॥

তথা :—

তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহেমাত্র ঝুলিকাঁথা, সেটাও নিত্য নয় ॥
যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে, স্বর্ণ খাদে উড়ায়।
ওমা, তোর নামেতে তেমনি ধারা, তেমনিতো দেখায় ॥'
যেজন গৃহস্থলে দুর্গা বলে, পেয়ে নাশ ভয়।
এমা তুমি তো অন্তরে জাগ, সময় বুঝতে হয় ॥
যার পিতামাতা ভস্ম মাখে, তরু তলে রয়।
ওমা তার তনয়ের ভিটেয় টেঁকা, এ বড় সংশয় ॥
প্রমাদে ঘেরেছে তারা, প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে ভাই বন্ধু থেকোনা, রামপ্রসাদের আশায় ॥

কোন আত্মীয় ব্যক্তি একদিবস কথায় কথায় রামপ্রসাদ সেনকে কহিয়াছিলেন, 'সেন এতদিন দুঃখে গেল, এই ক্ষণে কিঞ্চিৎ সুখভোগ কর,' এই কথায় তিনি অপর কোন উত্তর না করিয়া তৎক্ষণাৎ একটি গান করিলেন, ঐ গীত তাহার প্রকৃত উত্তর হইল। যথা :—

মন করোনা সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা ॥

হোয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক, তেঁইতো শিবের দৈন্য দশা।
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে, মন সুখের আশে বড় কসা।
হোয়ে ধর্ম্ম তনয়, ত্যজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা ॥
হরিষে বিষাদ আছে মন, করনা এ কথায় গোসা।
ওরে সুখেই দুঃখ দুঃখেই সুখ, ডাকের কথা আছে ভাষা ॥
মন ভেবেছ কপট ভক্তি, কোরে পুরাইবে আশা।
লবে কড়ার কড়া তস্য, কড়া এড়াবে না রতিমাষা ॥

প্রসাদের মন, হও যদি মন, কর্ম্মে কেন হওরে চাষা।
ওরে মনের মতন কর যতন, রতন পাবে অতি খাসা॥

এই প্রকারে কত চমৎকার চমৎকার বিষয় আছে যাহার বর্ণনা করিতে হইলে অত্যন্ত বাহুল্য হইয়া উঠে।

এক দিবস দিবাভাগে কবিররঞ্জন কুলক্রিয়া সমাধা করত কুমারহট্টের বলরাম তর্কভূষণ নামক বিখ্যাত তার্কিক পণ্ডিতের টোলের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছিলেন, উক্ত অভিমানি পণ্ডিত তাঁহাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিলেন —"দেখ দেখ মাতাল ব্যাটা যাইতেছে।" তৎকালে তৎস্থানে অনেক সম্ভ্রান্ত বিদ্বান্ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা তটস্থ হইয়া দশনাগ্রে রসনাবিস্তার পূর্ব্বক বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি করিলেন, রামপ্রসাদ সেন অতি সাধু ব্যক্তি তাঁহাকে মাতাল বলিয়া উপহাস করিলেন?" এই কথা কহিতে না কহিতেই রামপ্রসাদ সেন হাস্য বদনে 'ও তার্কিক ভট্টাচার্য্য কি বলিতেছে?' এই বলিয়াই গান ধরিলেন। যথা:

রসনে কালী নাম রটরে।
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জঠরে।
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে।
কেবল বাদার্থমাত্র, ঘট পটরে॥
রসনারে কর বশ, শ্যামানামামৃত রস,
তুমি গান কর পান কর, সে পাত্র বটরে॥
সুধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্য ধাম,
করে জপনা কালীর নাম, কি উৎকটরে।
শ্রুতি রাখ সত্ত্বগুণে, (দ্বি অক্ষর কর মনে) অন্য নাম নাহি শুনে।
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া, কালী বলে কাল কাটরে।

তথা: সুরাপান করিনেরে, সুধা খাই কুতূহলে,
আমার মন্ মাতালে মেতেছে আজ্,
মদ্ মাতালে মাতাল বলে।"

আহা এইস্থলে রামপ্রসাদ সেন, কি বিচিত্র কবিত্ব পাণ্ডিত্য ও পরমার্থ রসের রসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন! বোধ করি জগদীশ্বর এবম্ভূত অদ্ভুত ক্ষমতা অপর কাহাকেই প্রদান করেন নাই, প্রসাদ কেবল একাই তাঁহার যথার্থ প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দৈবশক্তি দেবী অনবরতই ইঁহার কণ্ঠে জাগ্রতাবস্থায়

বিহার পূর্ব্বক নৃত্য করিতেন, ক্ষণমাত্র নিদ্রিতা ছিলেন না, নচেৎ এবম্প্রকার অসাধারণ ব্যাপার ঘটনার সম্ভাবনা কি প্রকারে হইতে পারে।

রামপ্রসাদ সেন চৈত্রমাসের সংক্রান্তির দিবস কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে চড়ক দেখিতে গিয়াছিলন, যখন চড়কি দেপাক্ দেপাক্ বলিয়া চড়ক্ গাছে ঘুরিতেছে তখন কেহ কেহ বলিলেন "সেন মহাশয়, দেখ কেমন সুন্দর ঘুরিতেছে"। প্রসাদ তাহাতে হাস্যপূর্ব্বক উত্তর করিলেন, "ভাই একি এক সামান্য চড়ক্ দেখাইতেছ, আমি দিবানিশি যে চড়কে ঘুরিতেছি তাহার নিকট এ চড়ক কোথায় লাগে!" তাঁহারা কহিলেন যে 'সে কিরূপ চড়ক ভাই?' তচ্ছ্রবণে তৎক্ষণাৎ সহস্র ব্যক্তির সাক্ষাতে মুক্ত কণ্ঠে এই গান ধরিলেন। যথা:

ওরে মন চড়কি, ভ্রমণ কর, এঘোর সংসারে।"*
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাঁহারে॥
যুগল স্বয়ম্ভু শম্ভু যুবতীর উরে।
মনরে, ওরে কর পঞ্চ বিল্বদলে, পূজিছ তাঁহারে॥
ঘরেতে যুবতীর বাক্, গাজনে বাজিছে ঢাক্।
মনরে, ওরে, বৃন্দাবলী, খ্যামটা ঢালী, বাজায় নানা সুরে॥ (১)
কাম উচ্চ ভারায় চোড়ে, ভাংলো পাঁজর পাটে পোড়ে॥
মনরে, ওরে এমন যাতনা করেছ তুচ্ছ, ধন্যরে তোমারে॥
দীর্ঘ আশা চড়ক্ গাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ।
মনের ওরে মায়া ডোরে বড়্শী গাঁথা, স্নেহ বল যারে।
প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার।
মনরে ওরে শিঙ্গে ফুঁকে শিঙ্গে পাবি, ডাক ফেলে মারে।

এই প্রেম ভক্তি পরিপূরিত পীযূষময় সাধু সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তৎকালে সকলেই সাধু সাধু সাধু শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক মোহিত হইলেন। আহা! এই স্থলে তাঁহার দিগ্যেই সাধু সাধু সাধু বলিয়াই সাধুবাদ প্রদান করিব যাঁহারা সাধু সাধক সেনের সুধাধার বদন বিনির্গত সঙ্গীত সুধা পান করত তৃপ্ত চিত্ত হইয়াছিলেন, অপিচ কি পরিতাপ! আমরা ঐহিক সুখময় অদ্ভুত ভুত, কালে ভূতরূপে উক্ত মহাভূতের অলৌকিক কার্য্য সকল সাক্ষাৎ দর্শন করিতে পারি নাই। সেই কাল প্রকৃত সত্যকালের ন্যায় কাল ছিল; যদিও এই কাল সেই কালি বটে, তথাচ একালের সহিত সেকালের তুলনা কোন মতেই

* কোন কোন রামপ্রসাদের সংগৃহীত গীতাবলীতে আছে—ওরে মন চড়কি চড়ক কর।
(১) পাঠান্তর বাজায় বারে বারে॥

হইতে পারে না, কারণ একালে কি কাল এবং কোন কালে কোন কালের সঙ্গে এই কালের উপমা হইবে তাহার নিশ্চয়তা করা দুঃসাধ্য হইতেছে। আমরা যে কালে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেকাল আমাদিগের পক্ষে কাল-স্বরূপ হইয়াছে, এই কাল রাথার পক্ষে পক্ষ হইয়া কালোর দেশের আলো নির্ব্বাণ করিয়াছে, সে স্বাধীনতা কোথা? সে সুখ কোথা? সে ধর্ম্ম কোথা? সে কর্ম্ম কোথা? সে বিদ্যা কোথা? সে কবিত্ব কোথা? সে সমাদর কোথা? সে সম্মান কোথা? এবং সে উৎসাহ ও অনুরাগ বা কোথা? স্বাধীনতা-সংহারের সঙ্গে সঙ্গেই কাল সমস্ত উদরস্থ করিয়াছেন। আমরা অধুনা রঘুকুলতিলক ভগবান্ রামচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। দ্বারকা-ধিপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং হস্তিনাধিপতি পাণ্ডুকুলপ্রদীপ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রসঙ্গ করিতে চাহিনা। নবরত্ন সভার অধীশ্বর মহারত্ন বিক্রমাদিত্যের নাম উচ্চারণ করিব না, কেবল নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের সময়কেই স্মরণ করিতেছি, ঐ সময়ে যে, যে ব্যাপার হইয়াছিল বর্ত্তমানকালে তাহা শতাংশের একাংশ থাকিলেও কত সুখের ব্যাপার হইত! উক্ত মহারাজ নানা শাস্ত্রালঙ্কৃত পণ্ডিত ও সজ্জনের হৃদয়পদ্ম প্রকাশকারী রবিস্বরূপ কবিগণকে সাতিশয় সমাদর করিতেন। গৌরবপূর্ব্বক গুণের পরীক্ষা করিয়া উৎসাহবর্দ্ধনার্থ সর্ব্বদাই পারিতোষিক ও বৃত্তি প্রদান করিতেন।

তৎসমকালে এই বঙ্গদেশে যে সকল ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী মহাশয়েরা সজীব ছিলেন তাঁহারাও তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিতেন, অর্থাৎ ভারতেই পণ্ডিত ও কবিদিগের যথাসাধ্য সম্ভবমত সাহায্য করতঃ সম্যক্ প্রকারেই অনুরাগের পথ পরিষ্কৃত করিতেন। এই কালে সেই কালের চিহ্ন কিছুই নাই। এইক্ষণেও অনেকে সুপণ্ডিত ও সুকবি হইতেছেন, কিন্তু কি আক্ষেপ! কেহই তাঁহারদিগ্যে আদর করেন না, উৎসাহ দেন না, গুণের পুরস্কার করা দূরে থাকুক, একবার আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসাও করেন না। অধ্যাপক পণ্ডিতেরা কোনরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলে এবং কোন কবি কবিত্ব দর্শাইলে, যত্নপূর্ব্বক তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করা চুলায় পড়ুক, বরং বিপরীত ভাবে হাস্যপরিহাস করিয়া সেই সকল প্রকৃষ্ট পদার্থকে রসাতলে নিক্ষেপ করেন। সম্প্রতি দেশ-কাল-পাত্র সকলি সমান হইয়াছে, সুতরাং যথার্থরূপে গুণের গৌরব ও গুণীর গৌরব প্রকাশ হইতে পারে না, জগদীশ্বর যাঁহার দিগ্যে ধনি করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অত্যল্প মহাশয় ব্যতীত প্রায় তাবতেরি ধ্বনি বলিয়া কেবল এক ধ্বনি মাত্র রহিয়াছে, ধনির কার্য্য প্রায় কাহারও নাই,

শুদ্ধ ধনীর কর্ম্মই দেখিতে পাই, শাস্ত্রালাপ একেবারে লোপ হইয়া গেল, অধিকাংশ মহাশয় শুদ্ধ অলীকামোদে কালহরণ করিতেছেন। প্রাচীন বা আধুনিক সুকাজ লইয়া আমোদ করা অভ্যাস নাই। যেহেতু তাহার বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারেন না। মনে বড় উল্লাস হইলে এক রাত্রি বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া যাত্রা দিয়া বসিলেন, যাত্রাওয়ালা কেলুয়া, ভেলুয়া, সং আনিয়া উপস্থিত করিল, তাহারা বহুবিধ অঙ্গভঙ্গি ও রঙ্গভঙ্গ করিয়া গীত ধরিল :

'কেন নকীব্ ডাকছ আমারে।
আমি হাজির আছি হুজুরে॥
কাঁহে বোলাতোঁ হোঁ।
কেঁই কেঁই কেঁই এং এং এং॥

বাবুরা এই প্রকারে সং, রং, ঢং, দেখিয়াও টং শুনিয়া আপনারা জং বাহাদুর সাজিয়া বসেন। পরে মালিনী আসিয়া গান ধরিল :

ব্যাটা বল কেটা তোর মাসী—
মাসী মাসী বোলে আমার গলায় দিলি ফাঁসি।

তথা : 'শাক্ দিয়ে মাচ্ ঢাকো তুমি,
সে সব কথা জানি আমি, ওলো মালিনী।'

এইরূপ গীতে আহ্লাদিত হইয়া পেলা দিবার কত ধুম পড়িয়া যায়।

কোন ক্ষমতাবান্ পুরুষ অনেক সম্ভাবিত সৎকর্ম্মে বঞ্চিত হইয়া গঙ্গাযাত্রার সময়ে এক সখের যাত্রা করিলেন।

যথা: ধোপানীকে একলা রেখে যেতে পারি নে'।

যেমন সময় তেমনি নৈবিদ্য, অধুনা যেমনি রসিক, তেমনি গীত হইয়াছে।

তথা: প্রাণনাথ এসেছ, ক্ষণিক বসো ঢেঁস্কেলে,
আমি প্রাণ যোড়া আছি হ্যাঙ্গেলে,
মনেতে করেছ বঁধু ফেলে পালাব।
পায়ে শিক্লি লাগাব,
আঁকা বাঁকা কোরে পানের খিলি বানাব।
প্রাণনাথকে খাওয়াব,
আর তোমায় আমায় কর্ব্ব মজা—
নিজ পতি ঘুম গেলে॥

কি করা যায়? সকলি কালের ধর্ম্ম, সকলি কালের কর্ম্ম, এই কালের মর্ম্ম বুঝিয়া যিনি মর্ম্মগ্রাহী হইতে পারিলেন এই জগতে তিনিই ধন্য হইলেন। সংপ্রতি

সর্ব্বত্রই শুদ্ধ ছলের বাজার ও খলের বাজার বসিয়াছে, কোনখানেই একখানা কলের দোকান দেখিতে পাই না। যেখানে সেখানে কেবল দলের আঁটাআঁটি বলের আঁটা আঁটি, কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া এবং হতাদর হইয়া পণ্ডিত ও গুণী লোকেরা আপনারাই অভিমানে মনে মনে ম্লান হইতেছেন। যে দেশের লোকেরা বস্ত্র পরিধান করে না সে দেশে রজকের অন্ন কখনই হইতে পারে না। গুণগ্রাহী না থাকিলে গুণের বিচার কে করে? যদি ভাগ্যধরেরা এ পক্ষে কিঞ্চিৎ অনুরাগী ও মনোযোগী হয়েন তবে এই পরাধীন অবস্থাতেও দেশের এত দুরবস্থা হয় না, অনায়াসেই সর্ব্বতোভাবে সুখ সৌভাগ্যের আধিক্য হইতে পারে। কর্ত্তারা তাহা না করিয়া মোসাহেব নামধারী কতকগুলি চমৎকার চিত্ত অবতার দিগ্যে আদর পূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকেন, সেই মালক্ষ্মীর বরপাত্র মহাপাত্র মহাশয়দিগের সাধনার কথা বর্ণনা করিতে হইলে লেখনীর মুখ আড়ষ্ট হইয়া যায়, তাঁহারা না পারেন ও না করেন এমন কর্ম্মই নাই। আহা! যখন আমরা কোন ধনির সভায় গান করিয়া তাঁহার সভাসদ্ ও পারিষদ সকলকে বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা, শীলতা, সৌজন্য প্রভৃতি সমুদয় গুণসম্পন্ন দেখিতে পাই তখন আমাদিগের অন্তঃকরণ কত আহ্লাদে স্ফীত হইতে থাকে, আমরা কত সুখী হইয়া সৌভাগ্য স্বীকার করিতে থাকি। যদি প্রত্যেক স্থানেই এরূপ দেখিতে পাই তবে আর সুখের পরিসীমা থাকে না, এককালেই দুঃখের অবসান হইয়া যায়। কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশে এরূপ সুখের স্থল অতি বিরল। দুই এক স্থানে এতদ্রূপ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত প্রায় সর্ব্বত্রই কেবল বিপরীত ফল দেখিতে পাই। যাহা হউক এইস্থলে এবিষয়ে আর প্রস্তাব বাহুল্য করণের প্রয়োজন করে না, যে এক সদ্বিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়াছি, তাহারি অন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলাম, সকলে নয়নান্তপাত করুন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের সভায় যদিও সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বুধগণ ও ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রভৃতি কবি ও অন্যান্য বিষয়ের অনেকগুলি লোক নিয়তই অবস্থান করিতেন যদিও ইঁহারা নিজ নিজ গুণাংশে স্ব স্ব প্রধান ছিলেন, তথাচ তিনি কুমারহট্ট নিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব এই রামপ্রসাদ সেনের প্রণীত পদ, কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন এবং বিদ্যাসুন্দরের কবিতা সকল লোকমুখে শ্রবণ করত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন, এবং ইঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য করিতেন।

"বলা ফেনচাটা' নামক একজন কীর্ত্তনওয়ালা রামপ্রসাদি কালীকীর্ত্তন গান করিত; ঐ ফেনচাটা এক দিবস কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে গিয়া কালীকীর্ত্তন গান করিয়া মধুবর্ষণ করত সকলের চিত্ত হরণ করিল, রাজা সেই গানে পুলকিত

হইয়া কীর্ত্তনকারীকে কহিলেন, 'বলরাম, এতদিন তোমার নাম ফেনচাটা ছিল, এইক্ষণে আমি তোমার নাম মধুচাটা রাখিলাম।' এতদ্রূপ রাজপ্রসাদে প্রফুল্ল হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বলরাম কহিল, "মহারাজ, আমি কৃতার্থ হইলাম, ফলে আক্ষেপ এই যে আপনি রাজা হইয়া আমার 'ফেন' ঘুচাইয়া দিলেন, 'চাটাটুকু' ঘুচাইতে পারিলেন না।" রাজা গায়কের এই উক্তিতে প্রসন্ন হইয়া তখনি তাহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিলেন। পরন্তু নবদ্বীপাধিপতির মনে এইরূপ ইচ্ছা হইল যে, রামপ্রসাদ তাঁহার অধীন হইয়া নিরন্তর থাকেন, কিন্তু সেই মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন নাই ; কারণ তৎকালে রামপ্রসাদের মন অধীনতা ও বিষয় বাসনা হইতে এককালেই বিরত হইয়াছিল। ঐ সময়ে রামপ্রসাদ সেনের প্রতি ও তাঁহার কবিতার প্রতি মহারাজের এতদূর প্রীতি জন্মিল যে তিনি মধ্যে মধ্যে হালিসহরে স্বয়ং আসিয়া নিজ স্থাপিত কাছারি-বাটীতে কিছুদিন বাস করত রামপ্রসাদ সেনকে আহ্বান করিয়া প্রচুরতর প্রযত্ন পুরঃসর তাঁহার কবিতা সকল শ্রবণ করিতেন এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কবিরঞ্জন অভিধান দান করিয়াছিলেন। কবিরঞ্জন রাজকৃপায় কবিরঞ্জন উপাধি পাইয়া নিজ বিরচিত বিদ্যাসুন্দরের নাম "কবিরঞ্জন" রাখিলেন। ইহাতেই স্পষ্টরূপে প্রমাণ হইতেছে মহারাজ রামপ্রসাদি বিদ্যাসুন্দর দৃষ্টি করিয়া ভারতচন্দ্রের প্রতি বিদ্যাসুন্দর রচনা করিবার আদেশ করিয়াছিলেন, রাজাজ্ঞায় ভারতচন্দ্র যে বিদ্যাসুন্দর প্ররচনা করেন, তাহা সমুদয় রাজ-পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়াছিল, এজন্য তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছে।

রামপ্রসাদ সেন দুঃখী ছিলেন এবং রচনাকল্পে কোন ব্যক্তির আনুকূল্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, আপনার মনে যেমন উদয় হইয়াছিল তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন, সুতরাং ভারতচন্দ্রি বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় তাঁহার বিদ্যাসুন্দর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইতে পারে, ফলে তিনি কবিরঞ্জনের এক এক স্থলে এমন সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন যাহা ভারতচন্দ্রি রচনার অপেক্ষা অনেক অংশেই উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ যেখানে পরমার্থ প্রসঙ্গ এবং কালীনামের গন্ধ পাইয়াছিলেন. সেই সেই স্থানে রচনার শেষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই মহাশয় যে কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন, তাহা বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা অনেক উত্তম, ফলে তাঁহার পদ সর্ব্বাপেক্ষাই উৎকৃষ্ট, তেমন উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, পূর্ব্বে রামপ্রসাদি পদ সম্বল করত ব্যবসার দ্বারা কত লোক কত সৌভাগ্য সঞ্চয় করিয়াছে এবং এই ক্ষণেও কত মনুষ্য এই উপলক্ষে ভিক্ষা করিয়া সমূহ সুখে দিনপাত করিতেছে—তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। বোধ করি রামপ্রসাদি পদ অদ্যাপি লক্ষ লোকের উপজীবিকা নির্ব্বাহ

করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গায়কের অভাবে ইদানীং কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহার রাগ সুরের উপদেশ করে এই ক্ষণে এমন লোক কেহই নাই, যদি কোন গুণী ব্যক্তি আপনি রাগ সুর প্রস্তুত করিয়া গান করাইতে পারেন, তবে একটা উত্তম কীর্ত্তি স্থাপন করা হয়।

পূর্ব্ব অঞ্চলে রামপ্রসাদি কবিতা অনেক প্রচারিত আছে, সে সকল পদ্য এখানে প্রচার নাই। ঢাকা, সেরাজগঞ্জ ও পাবনা প্রদেশের নাবিকেরা সর্ব্বদাই তাহা গান করিয়া থাকে, সে বিষয়ে তাহারদিগের এত ভক্তি যে, যখন অস্নাত থাকে তখন মুখাগ্রে উচ্চারণ করে না। কহে "বাসী কাপড়ে রামপ্রসাদের গান গাইলে নরকে যাইতে হইবে।"

বাঙ্গলা ১১৬৫ সালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় ১৪/ বিঘা ভূমি রামপ্রসাদ সেনকে প্রদান করেন, তাঁহার সনন্দ পত্রে লিখিত আছে, গর আবাদি জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিতে থাক।' পরন্তু তাহাতে রাজার মোহর ও নাম স্বাক্ষরিত আছে, এই ভূমি কুমারহট্টের অতি নিকটেই।

রাজা যখন কুমারহট্টে আসিতেন তখন রামপ্রসাদ সেন ও অজু গোঁসাইকে একত্র করিয়া উভয়ের সঙ্গীত যুদ্ধের কৌতুক দেখিতেন। রামপ্রসাদ পণ্ডিত ছিলেন, অজু গোঁসাই আদ্‌পাগলা ছিলেন, কিন্তু মুখে মুখে রহস্য কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। রামপ্রসাদ সেন জ্ঞানভক্তি বিষয়ে পদ বিন্যাস করিতেন, ইনি তখনি রহস্য ছলে তাহারি উত্তর করিতেন।

মহারাজ রামপ্রসাদকে ভূমি দান করিয়া কিছুদিন পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন সেনজী, সে ভূমি ভালরূপে আবাদ করিয়াছ কিনা?" প্রসাদ তাহার উত্তর ছলে এই গান গাহিলেন—

যথা:

তারার জমী আমার দেহ, ইথে কি আর আপদ্ আছে।
ওযে দেবের দেব, সুকৃষাণ হোয়ে মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে॥
ধৈর্য্য খোঁটা, ধর্ম্ম বেড়া, এ দেহের চৌদিক্ ঘেরেছে।
এখন কাল চোরে কি কর্ত্তে পারে, মহাকাল রক্ষক রোয়েছে॥
দেখে শুনে ছটা বলদ্ ঘরে হোতে বার হোয়েছে।
কালী নাম্ অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধারে পাপ তৃণ সব কেটেছে॥
প্রেম-ভক্তি সুবৃষ্টি তায় অহর্নিশি বর্ষিতেছে।
কালীকল্পতরু বরে, রে ভাই, চতুর্ব্বর্গ ফল ধোরেছে।

আমরা একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে রামপ্রসাদ ও অজু গোঁসাইয়ের সঙ্গীত—যুদ্ধের বিষয় প্রকাশ করিলাম। সেই সমস্ত কবিতা পাঠে পাঠকগণ সেনজী ও গোঁসাইজীর বিদ্যা ও গুণের তারতম্য বিবেচনা করিবেন। গুপ্ত কবি বলেন: "রামপ্রসাদ সেনের অবস্থা ভেদের পদ্য সকল অতি চমৎকার, ইনি ক্রিয়া-কাণ্ড কিছুই মান্য করিতেন না। ইঁহার সকল অবস্থার কবিতার দ্বারাই তাহার বিশিষ্টরূপ প্রমাণ হইয়াছে। ইনি তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, ফলভোগ-বিরাগী হইয়া সু-পবিত্র প্রীতিচিত্তে গীত ছলে পরমপূজ্য পরমেশ্বরের পূজা করিতেন। রামপ্রসাদি পদের অধিকাংশই জ্ঞানযুক্ত প্রেম-ভক্তি রসে পরিপূরিত। নিরাকারবাদিরা "ব্রহ্ম" শব্দ উল্লেখ পূর্ব্বক যাঁহার উপাসনা করেন ইনি "কালী" নাম উচ্চারণ করত তাঁহারি আরাধনা ও উপাসনা করিতেন, ইঁহাতে পুরুষ আর প্রকৃতি অথবা পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী, এই নামান্তর জন্য ভাব, রস, ভক্তি, প্রেম এবং জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য কিছুই হইতে পারে না, কারণ উভয় পক্ষেরি উদ্দেশ্য এক এবং যথার্থ পক্ষে উভয়েরী মর্ম্ম ও অভিপ্রায় এক হইতেছে।

রামপ্রসাদ সেনের শক্তি ভক্তি বিষয়ক উক্তি সকল শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে কালীর বর পুত্র বলিয়া বাচ্য করিতেন, এবং তৎকালে তাবতেই বলিতেন "অন্নপূর্ণা" প্রতি দিবসেই কাশী হইতে আসিয়া তাঁহার শিয়রে বসিয়া কথা কহিতেন, স্বপ্ন দিতেন, আর কন্যার বেশ ধরিয়া গান শুনিতেন, রন্ধন করিয়া দিতেন, এ বিষয়ে অপর একটা অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক কথা রাষ্ট্র আছে, যথা—"এক দিবস রামপ্রসাদ সেন, বাটীর বেড়াবন্ধনের জন্য দড়ি, বাঁশ, বাঁকারী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ঘরামীর অন্বেষণে গমন করিয়াছিলেন, ক্ষণকাল পরেই ঘরামী লইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখিলেন, বাঁশ, বাঁকারী, দড়ি প্রভৃতি আপনারাই যথা স্থানে সংলগ্ন হইয়া বেড়া বদ্ধ করিয়াছে। ইহাতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাসী ও গ্রামবাসীগণের মধ্যে কোলাহল শব্দ ঘোষণা হইয়া উঠিল যে "কাশীপুরেশ্বরী অন্নদা স্বয়ং আসিয়া রামপ্রসাদ সেনের বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছেন।" এই প্রকার চমৎকার চমৎকার ব্যাপার ঘটিত জনরব কত আছে, যাহার বর্ণনা করিতে হইলে একখানা পুস্তক ব্যতীত কোন মতেই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। এই সকল ঘোষণা প্রসাদ স্বয়ং করেন নাই, কেন না তাহা হইলে তাঁহার অসীম রচনার কোন স্থানে না কোন স্থানে অবশ্যই ইঁহার কোন কথা উল্লেখ করিতেন। অপিচ এমত জনরব যে কবিরঞ্জন এক লক্ষ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, কেবল তাঁহার প্রণীত একটি পদ সাক্ষী স্বরূপ হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে:

জানিলাম বিষম বড়, শ্যামা মায়েরী দরবার রে ॥
সদা—ফুকারে ফরেদি দাদি, না হয় সঞ্চার রে।
আরজবেগী যার শিরে সে দরবারের ভাস্ত কিরে মাগো।
মাগো ও মা যে দেওয়ান্ দেওয়ানা নিজে, আস্থা কি কথার রে ॥
লাক্ উকিল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া মাগো।
তোমায় তারা ডাকে আমি ডাকি, কান নাই বুঝি মার রে ॥
গালাগালি দিয়ে বলি, কান খেয়ে হোয়েছ (রোয়েছ) কালী মাগো।
রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী, করিলে আমার রে ॥

রামপ্রসাদ লক্ষ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে, অনেকাংশে সম্ভাবনার যোগ্য বটে, কারণ বাল্যকাল হইতে মৃত্যুর দিবস পর্য্যন্ত পদ-বিন্যাসে তিনি বিরত হয়েন নাই, মনে যাহা উদয় হইয়াছে, তাহারি কবিতা করিয়াছেন। কবিরঞ্জন, কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন, এই তিনখানি গ্রন্থ কেবল লিখিত হইয়াছিল, আর কিছুই লিপিবদ্ধ ছিল না। পূর্ব্বে দুই একটি করিয়া অভ্যাস করত সংগ্রহ পূর্ব্বক যিনি যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাহারি নিকটে তাহাই ছিল, এইক্ষণে তাহাও প্রায় লোপ হইয়া গিয়াছে, কারণ পূর্ব্বকালের লোকেরা ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় গোপন করিয়া যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতেন, প্রাণান্ত হইলেও কাহাকে দেখিতে দিতেন না, আহ্নিক, পূজা করণকালে সেই পুঁথির উপর ফুলচন্দন প্রদান করিতেন, অধুনাও দুই এক মহাশয় ঐ প্রকারে করিয়া থাকেন, আমরা সর্ব্বস্ব স্বীকার করিয়াও তাঁহাদিগের নিকট হইতে সে পদাবলি প্রাপ্ত হইতে পারি নাই, এইরূপ গোপনেই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।

ষট্ চক্রভেদের এই সঙ্গীতটি ঃ

কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী তারা তুমি আছগো অন্তরে,
'মা আছগো অন্তরে'।
এক স্থান মূলাধার, আর স্থান সহস্রার,
আর স্থান চিন্তামণি পুরে।* ইত্যাদি

যিনি তান্ত্রিক অর্থাৎ অন্তর্যাগ বিষয়ে যাঁহার সংস্কার আছে, তিনিই এই গীতামৃতের যথার্থ রসাস্বাদন প্রাপ্ত হইবেন, নচেৎ অন্যের সাধ্য নহে। এ বিষয় অত্যন্ত কঠিন, বিশেষ রামপ্রসাদিপদের নিগূঢ়াতিভিপ্রায় ও তাৎপর্য্য

---

* আমরা এই গানটির সম্পূর্ণাংশ অন্যত্র উদ্ধৃত করিয়াছি তাই সম্পূর্ণ গীতটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম না।

গ্রহণ করিয়া ভাব ব্যাখ্যা করেন ইদানীং ইহলোক হইতে তদ্রূপ মনুষ্যপ্রায় ভারতেই অপসৃত হইয়াছেন, কেবল দুই এক মহাত্মা আছেন।

রামপ্রসাদের প্রাচীন অবস্থায় এই গানটী অতি মনোহর। যথা :

কায্ হারালেম কালের বশে, মন মজিল রতিরঙ্গ রসে॥
যখন ধন উপার্জ্জন, করেছিলাম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু, দারাসুত, সবাই ছিল আমার (আপন) বশে॥
এখন ধন উপার্জ্জন না হইল দশার শেষে,
সেই ভাই বন্ধু দারাসুত, নির্ধনে বলে সবাই রোষে॥
যমদূত আসি, শিয়রেতে বসি, ধর্ব্বে যখন' অগ্রকেশে।
তখন সাজায়ে মাচা, কলসী কাঁচা, বিদায় দিবে দণ্ডিবেশে॥
হরি হরি বলি, শ্মশানেতে ফেলি, যে যার যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মল্লো, কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে॥

বৈরাগ্য ও বিবেক যখন তাঁহার অন্তঃকরণকে বিশেষরূপ অধিকার করিয়াছিল, বোধকরি তৎকালীন্ মনের স্বরূপানুরাগেই ঐ গানটি কণ্ঠ হইতে নির্গত করিয়াছিলেন। এই পুরুষের অন্তঃকরণে কাপট্য মাত্র ছিল না, অন্তর বাহিরে একরূপ ছিল, মুখে যাহা বলিতেন কার্য্যে তাহাই করিতেন, তাঁহার উক্তি দ্বারা ও প্রবাহ দ্বারা ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যে ব্যক্তি অকপটে সত্য পালন পূর্ব্বক ঈশ্বর সাধনায় কালক্ষয় করিয়াছেন, আহা! তিনি কি মহাপুরুষ ছিলেন।

শক্তিভক্তিসূচক উক্তি দ্বারা যুক্তিমতে সকলে রামপ্রসাদ সেনকে শাক্ত বলিতে পারেন, ফলে তিনি শাক্ত ছিলেন বটে, ভাক্ত ছিলেন না যথার্থই ভক্ত ছিলেন, কারণ উপাসনাকল্পে তাঁহার মনে দ্বেষ মাত্রই ছিলনা। নিম্নস্থ পদটিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হইতেছে। যথা—

মা আমার অন্তরে আছ, কে তোমায় বলে অন্তরে শ্যামা।
মা আমার অন্তরে আছ, তুমি পাষাণ্ মেয়ে বিষম্ মায়া,
কতই মা কাচ্ কাচাও গো কাচ, উপাসনা ভেদে তুমি, প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচেরে এক্ কোরে ভাবে, তার হাতে মা কোথা বাঁচ,
বুঝে ভার দেয় যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ।
যে কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভুলে পেয়ে কাঁচ।
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মাতা হবে, মনোময়ী হোয়ে নাচ॥

রামপ্রসাদ সেনের চিত্তের একাগ্রতা, বিশ্বাসের স্থিরতা ও ভক্তি এবং প্রেমের প্রগাঢ়তা কি পর্য্যন্ত ছিল এই পদের দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে।

রামপ্রসাদ সেনের জীবন বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম, তথাচ অদ্যতন পত্রের নিয়মিতস্থানে তাহা সম্পন্ন হইল না, এজন্য একখণ্ড অধিক প্রকাশ করিতে হইল, ইহাতে আমাদিগের অতিরেক ব্যয় অনেক হইয়াছে, কারণ অত্যন্ত ক্ষুদ্র অক্ষরে চারি ফর্ম্মা কাগজ প্রকাশ করিতে হইল, তত্রাচ এ বিষয়ে মনের আক্ষেপ কিছুমাত্র নিবারণ হয় নাই, যেহেতু বিস্তার করিয়া বাহুল্যরূপে লিখিতে পারিলাম না, অতি অল্পেই শেষ করিতে হইল।

এদেশের প্রাচীন যে যে মহাশয় বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করতঃ বিখ্যাত হইয়াছিলেন ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের তাবতেরি জীবন-চরিত লিপিবদ্ধ করণের মানস করিয়াছি, কিন্তু ইহা সুসিদ্ধ করা সুকঠিন হইয়াছে, কারণ সমুদয় ব্যাপার সংগ্রহ করা বড় সহজ নহে। প্রাচীন লোক কেহই জীবিত নাই, এবং যাঁহারা এইক্ষণকার বৃদ্ধ তাঁহারা অনেকেই তদ্বিশেষ অবগত নহেন, যদিও কোন কোন মহাশয় কিছু কিছু জানিতে পারেন কিন্তু আক্ষেপ এই যে, তাঁহাদিগের সহিত আমারদিগের এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ নাই। যাহা হউক, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এইরূপ করিয়া দেখিতে হইবেক। চেষ্টা ও যত্নদ্বারা যতদূর পর্য্যন্ত করিয়া তুলিতে পারি তাহার ক্রটি কখনই করিব না, ইহাতে শারীরিক শ্রমের তো কথাই নাই, যদি অর্থ ব্যয়ের আবশ্যক করে তাহাতেও সম্ভবমত বিত্তব্যয় অবশ্যই করিব। এই সঙ্কল্পিত কল্পে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে একটা প্রধান কর্ম্মই করা হয়, অতএব সর্ব্বসাধারণকে বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি; যদি কেহ এ বিষয়ে অস্মদাদিকে যথাযোগ্য সাহায্য করিতে সমর্থ হয়েন তবে যেন তাহাতে সম্ভাবিত কৃপা বিতরণে কৃপণতা না করেন। তাঁহারদিগের নিকট এতদ্রূপ আনুকূল্য প্রাপ্ত হইলে আমরা শ্রমসাফল্য-জ্ঞানে যাবজ্জীবন মহোপকার স্বীকার পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ রহিব, ইহাতে শুদ্ধ আমরাই উপকৃত হইব এমত নহে, দেশ শুদ্ধ সমস্ত লোকেই তাহার সমান অংশ প্রাপ্ত হইবেন, সুতরাং এই স্থলে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র। এই দেশহিতকর কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে সাধ্য-সত্বে কেহ যেন আলস্য পরবশ না হয়েন, ইহাতে আমারদিগের উপকার করিতে ইচ্ছা না হয় আপনারা স্বতন্ত্ররূপে করুন, তাহাতে হানি কি, যেরূপেই হউক, কার্য্য সিদ্ধ হইলেই চরিতার্থ হইব।

কীটের আঘাতে ও ভূতের দৌরাত্মে সমুদয় বিনষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ পোকায় কাটিয়াছে, জলে ও সদ্দিতে পচিয়াছে এবং আগুনে পুড়িয়াছে, যেমন ক্লীব

ব্যক্তি সুরূপসী কামিনী ক্রোড়ে পাইলে না আপনিই ভোগ করিতে পারে, না প্রাণ থাকিতে অন্যকেই দিতে পারে, ঐ বিষয়ের গোপনকারি মহাশয়েরা অবিকল তদনুরূপ করিয়া রামপ্রসাদি কীর্ত্তিকে এককালে উচ্ছন্ন দিলেন।

পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হইল আমরা রামপ্রসাদি পদ্য সংগ্রহ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, একাল পর্য্যন্ত প্রাণপণ করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, যেখানে যাহা প্রাপ্ত হই তাহাতেই এক একখানা বিড়ম্বনা দেখিতে পাই, হয় মাঝে মাঝে পোকায় কাটিয়াছে, নয় লেখকেরা লেখার দোষে প্রমাদ করিয়াছেন, ইহাতেই ভাবার্থ স্থাপন করনে ঘোরতর বিপদ ঘটিতেছে। এই স্থলে বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করি, সংপ্রতি যে যে মহাশয়ের নিকট এই মহাবস্তু আছে তাঁহারা যেন আর যক্ষের ন্যায় বক্ষে করিয়া রক্ষে না করেন, অবিলম্বেই অস্মাদাদির যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিবেন, আমরা সানন্দে সাদরে তাহা মুদ্রাঙ্কন করত সর্ব্বত্র ব্যক্ত করিব, তদ্দারা এই দেশের কত উপকার হইবেক তাহা অনির্ব্বচনীয়, যদিও আমরা অনেক কষ্টে অনেক হস্তগত করিয়াছি তথাচ আর দুই একখানা প্রাপ্ত হইলে পরস্পর ঐক্য করত মনের সংশয় ছেদন করিতে পারি।

৬০ বৎসর বয়সের কিঞ্চিৎ পরেই রামপ্রসাদ সেন মায়িক সংসার পরিহার পূর্ব্বক নিত্যধামে যাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যুর দিন গণনা করিলে ৭২ বৎসরের অধিক হইবে না। প্রাচীন লোকেরা কহেন, "তিনি শ্যামা প্রতিমা বিসর্জ্জন সময়ে পরিজন স্বজন বান্ধব সকলকে কহিলেন, অদ্য মায়ের বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিসর্জ্জন হইবে, অতএব তোমরা সকলে প্রতিমা লইয়া আমার সঙ্গে আইস, আমি পদব্রজে চলিলাম। এই বলিয়া বহুলোক সমভিব্যাহারে জাহ্নবী তটে গান করিতে করিতে আইলেন ; ত্রিদশতরঙ্গিণী তীরে যতক্ষণ জীবিত ছিলেন ততক্ষণ অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ভক্তি রসের বিদায়ি পদ অনেকগুলি রচনা করিয়াছিলেন, গঙ্গা-যাত্রার সময়ে পথিমধ্যে যে কয়েকটি গান করেন তাহার একটা গান এই :

যথা : কালী গুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে,
এ তনু তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা, মনকে কর নেয়ে॥
দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল,
অনায়াসে পাবে কূল, কাল রবে চেয়ে॥
শিব নহে মিথ্যাবাদী, আজ্ঞা করি অণিমাদি।
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী, পলাইবে ধেয়ে॥

তথা ঃ

বল্ দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে॥
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্যগণ্য মান্য কোরে সব খোয়ালে॥
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবিরে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হোয়ে সে মিশায় জলে॥

তীরে নীরে শরীর স্থাপন করত এই গান করিলেন।

যথা ঃ

নিতান্ত যাবে দিন, এদিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট কোরে বোসেছি ঘাটে,
ও মা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো।
দশের ভরা ভোরে নায়, দুঃখি জনে ফেলে যায়,
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো॥
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান্ দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো।

এরূপ প্রবাদ আছে যে নিম্নলিখিত গান করিয়াই তাঁহার মৃত্যু হইল।

যথা ঃ

তারা, তোমার আর কি মনে আছে।
মাগো, ওমা, এখন যেমন রাক্‌চো সুখে তেম্‌নি সুখ কি পাছে॥
শিব যদি হন সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি মাগো।
ওমা, ফাকির উপর ফাকি, ডান চক্ষু নাচে॥
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে মাগিতাম (সাধিতাম) নাই, মাগো।
ওমা, দিয়ে আশা, কাট্‌লে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে॥
প্রসাদ বলে মন্ দড়, দক্ষিণার জোর বড় মাগো।
মাগো ওমা, আমার দফা, হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে॥

"দক্ষিণা হয়েছে" এই উক্তি করিবা মাত্রই প্রাণের দক্ষিণা হইল, অর্থাৎ প্রপঞ্চ শরীর পরিহার করিলেন। প্রাচীন লোকের মধ্যে অনেকেই কহেন

তাঁহার মরণ সময়ে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়াছিল। এ বিষয়ের সত্য মিথ্যা আমরা কিছুই বলিতে পারি না।

রামপ্রসাদ সেনের জীবন বৃত্তান্ত বাহুল্যরূপে বর্ণনা করণের মানসে ছিল, কিন্তু স্বাবকাশাভাব ও স্থানের স্বল্পতা এই উভয় প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত অদ্য এ বিষয়ে অক্ষম হইলাম, সময় ক্রমে বিস্তারিত লিখিতে ত্রুটি করিব না। আমারদিগের এই বর্ত্তমান লেখাতে যদি কোন ভ্রম হইয়া থাকে তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক কেহ তাহা সংশোধন করিলে আমরা আনন্দচিত্তে সেই বিষয় প্রভাকরে প্রকাশ করিব।

রামপ্রসাদ সেন যখন কলিকাতায় আসিতেন তখন জোড়াসাঁকোর দোয়েহাটায় তাঁহার মাতুল বাড়ীতে বাস করিতেন। ৺চূড়ামণি দত্তের সহিত তাঁহার অত্যন্ত প্রণয় ছিল, সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট গিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতেন, তিনি অতি সুবক্তা ও প্রিয়ভাষী ছিলেন।

কবিরঞ্জনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন গীত অনেকের শ্রুতিপথে প্রবেশ করে নাই, এজন্য আমরা অবস্থা ভেদের পদ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া স্থানে স্থানে প্রকাশ করিলাম। এ সমস্ত গানের অধিকাংশই এ পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল। ভিখারি ও গানওয়ালারা না পাওয়াতে বাজারে ব্যক্ত হয় নাই। এই মহাশয় **"আগমনী"**, **"সপ্তমী"**, **"বিজয়া"** **"রাসলীলা"**, **"কৃষ্ণলীলা"**, **"শিবলীলা"** যাহা রচনা করিয়াছেন তাহাই অতি সুন্দর হইয়াছে, বিশেষতঃ বীর রসের কবিতা অর্থাৎ ভগবতীর রণ-বর্ণনা কবিতা পদাবলীর তুলনা দিবার স্থান দেখিতে পাই না, একারণ তাহাই সর্ব্বাগ্রে উদ্ধৃত করিলাম, সুধীজনেরা কবিরঞ্জন, কবিরঞ্জনের পদরঞ্জনকে নয়নাঞ্জন করিয়া মনের আক্ষেপ ভঞ্জন করুন।

রাগিণী—খাম্বাজ। তাল রূপক।

মা কত নাচগো রণে।
নিরূপম বেশ, বিগলিত কেশ, বিবসনা হোয়ে হরহৃদে! কত নাচগো রণে॥
তরুণ অরুণ শশী ঘনচয় প্রকাশে চারুচরণে।
সদ্যোহতদিতি-তনয়-মস্তকহারলম্বিত সুজঘনে
কত রাজিত কটিতটে, নরকরনিকর, কুণপশিশু শ্রবণে॥
অধর সুললিত, বিম্ব বিনিন্দিত, কুন্দবিকশিত সুদশনে।
শ্রীমুখমণ্ডল, কমল নিরমল, সাট্টহাস সঘনে॥
সজল জলধর, কান্তি সুন্দর, রুধির কিবা শোভা ও চরণে।
শ্রীরামপ্রসাদ ভণে, (প্রসাদ প্রবদতি) মম মানস নৃত্যতি, রূপ কি ধরে নয়নে॥

রাগিণী—বিভাষ। তাল তিওটে।

এলো চিকুর ভারে, এবামা মার মার, মার রবে ধায়।
রূপে আলো করি ক্ষিতি, গজপতি রূপগতি রতিপতি মতি মোহেরে (মোহ পায়)॥
অপযশ কুলে কালী, কুলনাশ করে কালী,
নিশুম্ভ নিপাতি কালী, সব সেরে যায়।
সকল সেরে যায়, একি ঠেকিলাম্ দায়, এ জন্মের মত বিদায়॥
কালী বলে এতকাল, এড়ালাম যে জঞ্জাল,সেই কাল চরণে লুটায়।
টেনে ফেলে রম্ভাফল, গঙ্গাজল, বিল্বদল,
শিব পূজার এই ফল, অশিব ঘটায়॥
অশিব ঘটায়, এই দনুজ ভটায়, কি কুরব রটায়॥
ভব দৈবরূপ শব, মুখে মাত্র নাহি রব, কার ভরসায় রব হায়।
চিনিলাম ব্রহ্মময়ী,
হই বা না হই জয়ী, নিতান্ত করুণাময়ী, স্থান দিবে পায়।
নিতান্ত মন তায়, এজন্ম কর্ম্মসায়॥
প্রসাদ বলে ভাল বটে, এবুদ্ধি ঘোটেছে ঘটে, এ সঙ্কটে প্রাণ বাঁচা দায়।
মরণে কি আছে ভয়, জন্মের দক্ষিণা হয়, দক্ষিণাতে মন লয়, কর দৈত্যরায়।
ওহে দৈত্য রায়, ভজ এই দক্ষিণায়, আর কি কাজ আশায়॥

রাগিনী—ঝিঁঝিট। তাল জলদ তেতালা।

আরে, ঐ আইল কেরে, ঘনবরণী।
কেরে নবীনা নগনা লাজবিরহিতা, ভুবনমোহিতা,
একি অনুচিতা, কুলের কামিনী॥
কুঞ্জবর গতি আসবে আবেশ, লোলিত বসনা গলিত কেশ,
সুরনরে শঙ্কা করে হেরি বেশ, হুঙ্কার রবেরে দনুজদলনী॥
কেরে নব নীল কমল কলিকাদল, বলি দংশন করিছে অলি।
মুখচন্দ্রে চকোরগণ, অধর অর্পণ, করত পূর্ণ শশধর বলি॥
ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ, এ কহে নীলকমল ও কহে চাঁদ,
দোঁহে দোঁহে করতঁহি নিনাদ, চিচিকি গুণ গুণ করিয়ে ধ্বনি॥
কেরে জঘন সুচারু, কদলীতরু নিন্দিত রুধির অধীর বহিছে।
তদূর্দ্ধে কটিবেড়া, নরকর ছড়া, কিঙ্কিণী সহ শোভা করিছে॥
করতল স্থল নলদল অতিশয়, বামে অসি মুণ্ড দক্ষিণে বরাভয়,
খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয় জয় জয় ডাকিছে সঙ্গে সঙ্গিনী॥

কেরে উর্দ্ধতর ভূধর, হেরি হেরি পয়োধর করিকুম্ভ ভয়ে বিদরে,
অপরূপ কি এ আর, চণ্ডমুণ্ডহার সুন্দরী সুন্দর পরে॥
প্রফুল্ল বদনে রদন ঝলকে, মৃদু হাস্ত প্রকাশ দামিনী নলকে,
রবি অনল শশি ত্রিনয়ন পলকে দক্ষে কম্পে সঘনে ধরণী॥
প্রসাদ কথয়তি, শুন দনুজপতি, কায নাহি সমরে।
যেইরূপ ভাব সেই দেবেশ ঐ দেখ শ্রীচরণ বরে।
গরল চিহ্ন গাল, ললাটে অনল, শিরোপরি—
গঙ্গা তরত টল টল, অকুল অনাদি পুরুষ মহাকাল কালভয় জিনিবারে আপনি॥

রাগিণী ললিত। তাল তিওট।

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে, বিগলিত কুন্তলজাল।
বিমল বিধুবর, শ্রীমুখ সুন্দর, তনুরুচি বিজিত তরুণ তমাল॥
যোগিনীগণ সকল ভৈরব সমর করে ধরে তাল।
ক্রুদ্ধা মানস উর্দ্ধে শোণিত পিবতি নয়ন বিশাল॥
নিগম সারিগম, গণ গণ গণ মবয়ব যন্ত্র মণ্ডল ভাল।
তা তা থেই থেই দ্রিমিকি
দ্রিমিকি, ধা ধা ডম্ফ বাদ্য রসাল॥
প্রসাদ কলয়তি, শ্যামা সুন্দরি, রক্ষ মম পরকাল।
দীনজন প্রতি কুরুকৃপালেশ, বারয় কাল করাল॥

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ, তরুণ বয়েস্।
দনুজদলনী ললনা সমরে শবে বিগলিত কেশ॥
ঘন ঘোর নিনাদিনী, সমর বিবাদিনী, মদনোন্মাদিনী বেশ॥
ভূত পিশাচ প্রমথ সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে,
রঙ্গিণীবর সঙ্গিনী, নগনা সমান বেশ॥
গজরথ রথী করত গ্রাস, সুরাসুর নর হৃদয় ত্রাস,
দ্রুত চলত চলত রসে গর গর, নরকর কটিদেশ॥
কহিছে প্রসাদ ভুবনপালিকে, করুণাংকুরু জননি কালিকে,
ভব পারাবার তরাবার তরে, হরবধূ হর ক্লেশ॥

রাগিণী—বিভাষ। তাল ঢিমে তেতলা।

শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে।
বিপরীত ক্রীড়া ব্রীড়াগতা সবে॥
গদ্ গদ রসে ভাসে, বদন তুলায়ে (ঢুলায়ে) হাসে,
অতনু সতনু জনু অনুভবে।
রবি সুতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি,
ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপুণ্য লবে।
অরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাঁদ গিলে,
অনলে অনল মিলে, অনল নিবে।
কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি,
নিরখিলে পাপতাপ, কোথা রবে॥

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

শ্যামা বামা কে?
তনু দলিতাঞ্জন শারদ সুধাকর-মণ্ডল-বদনীরে।
কুন্তল বিগলিত শোণিত শোভিত
তড়িত জড়িত নবঘন ঝলকে॥
বিপরীত একি কাজ, লাজ ছেড়েছে দূরে,
ঐ রথরথী গজ বাজি বয়ানে পুরে॥
মম দল প্রবল, সকল কৃত হতবল চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে॥
প্রচণ্ড প্রতাপ রাশি মৃত্যুরূপিণী, ঐ কামরিপু পদে এ কেমন কামিনী॥
লঙ্ঘে গগন ধরণীধর সাগর, ঐ যুবতী চকিতে নয়ন পলকে॥
ভীম ভবার্ণব তারণ হেতু, ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু।
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন কুরুকৃপালেশ, জননি কালিকে॥

রাগিণী—বেহাগ। তাল তেওটা।

শ্যামা বামা গুণধামা কামান্তক উরসি।
বিহরে বামা স্মর হরে।
সুরী কি অসুরী কি নাগী কি পন্নগী কি মানুষী॥
নাসে মুকুতাফল বিলোর, পূর্ণচন্দ্র কোলে চকোর,
সতত দোলত থোর থোর, মন্দ মন্দ হাসি।
একি করে কর্‌বা করে ধরে রণে পশি।
তনুক্ষীণা সুনবীনা বস্ত্রহীনা ষোড়শী॥

নীলকমল দল জিতাস্ত, তড়িত জড়িত মধুর হাস্ত,
লজ্জিত কুচকলি অপ্রকাশ্য, ভালে শিশু শশী ॥
কত ছলা, কত কলা, এ প্রবল চিত্তে বাসি।
রামা নব্যা ভব্যা অব্যাহত গামিনী রূপসী ॥
দিতি সুতচয় সমর চণ্ড সলিলে প্রবেশি।
এটা কেটা চিত্তে যেটা, হবে সেটা দুঃখরাশি ॥
মম সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করে একি সর্ব্বনাশী।
কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তিমিরপুঞ্জ নাশ,
হৃদয়কমলে সতত বাস, শ্যামা দীর্ঘকেশী।
ইহকালে, পরকালে জয়ীকালে তুচ্ছবাসি।
কথা নিতান্ত-কৃতান্ত-শান্ত শ্রীকান্ত প্রবেশি ॥

রাগিণী—ছায়া নটে। তাল খয়রা।

সমরে কেরে কাল কামিনী।
কাদম্বিনী বিড়ম্বিনী, অপরা কুসুমাপরাজিতা বরণী, কে রণে রমণী ॥
সুধাংশু সুধা কি শ্রমজ বিন্দু, শ্রীমুখ না একি শারদ ইন্দু,
কমল বন্ধু, বহ্নি, সিন্ধুতনয় এ তিননয়নী।
আমরি আমরি, মন্দ মন্দ হাস, লোক প্রকাশ, আশুতোষ-বাসিনী ॥
ফণী ফণাভরণজিনি, গণি দন্ত কুন্দ শ্রেণী,
কেশাগ্র ধরণী পরে বিরাজ, অপরূপ শব শ্রবণ সাজ,
না করে লাজ, কেমন কায,
মম সমাজে তরুণী।
আ মরি আ মরি, চণ্ডমুণ্ড মাল, করে কপাল, একি বিশাল,
ভাল ভাল কালদণ্ডধারিণী।
ক্ষীণ কটিপর নৃকর নিকর আবৃত কত কিঙ্কিণী।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত শোণিত বৃন্তে, কিংশুক ইব ঋতু বসন্তে।
চরণোপান্তে, মনতুরন্তে, রাথ কৃতান্ত দলনী।
আমরি আমরি সঙ্গিনী সকল, ভাবে ঢল ঢল,
হাসে খল খল, টল টল ধরণী।
ভয়ঙ্কর কিবা, ডাকিছে শিবা, শিব উরে শিবা আপনি ॥
প্রলয়কারিণী করে প্রমাদ, পরিহর ভূপ বৃথা বিবাদ,
কহিছে প্রসাদ, দেহমা প্রসাদ, প্রসাদ বিষাদনাশিনী ॥

ঝিঁঝিট-একতাল।

কে মোহিনী, ভালে ভাল শশী পরম রূপসী।
বিহরে সমরে বামা বিগলিত কেশী।
তনু অনু অমানিশা, দিগম্বরী বালা কৃশা,
সব্যে বরাভয়, বাম করে মুণ্ড অসি।
মরি কিবা অপরূপ, নিরখ দনুজ ভূপ,
সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী।
জয়ী হব যার বলে, সেই প্রভু শব ছলে,
পদে মহাকাল, কালরূপ হেন বাসি॥
নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে,
ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি।
ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণিকে আকাশে উঠে,
গিলে রথ-রথী গজবাজী রাশি-রাশি।
ভণে রামপ্রসাদ সার, না জান মহিমা যার,
চৈতন্যরূপিনী নিত্য ব্রহ্ম মহিষী।
যেই শ্যাম সেই শ্যামা, অকার আকারে বামা,
আকার করিয়া লোপ, অসি ভাব বাঁশী।

কালী-কীর্ত্তনের গোষ্ঠ লীলার একস্থানে রামপ্রসাদ সেন বর্ণনা করিয়াছেন:

পঞ্চাশৎ বর্ণ বটে, বেদাগম সার।
যোগির কঠিন ভাব্য, রূপ নিরাকার॥
আকার তোমার নাই, অক্ষয় আকার।
গুণভেদে গুণময়ী, হোয়েছ সাকার॥
বেদবাক্যে নিরাকারে, ভজনে কৈবল্য।
সেকথা না ভাল শুনি, বুদ্ধির তারল্য॥
প্রসাদের কালোরূপে, সদা মন ধায়।
যথা রুচি তাই কর, নির্ব্বাণ কে চায়॥

কবিরঞ্জন কালী-কীর্ত্তনের রাসলীলার স্থলে ভগবতীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন:

জগদম্বা কুঞ্জবনে, মোহিনী গোপিনী।
ঝলমল তনুরুচি, স্থির সৌদামিনী॥
শ্রমবারি বিন্দু বিন্দু, ঝরে মুখ চাঁদে।
সশঙ্ক শশাঙ্ক কেশ রাহু ভ্রমে কাঁদে॥

সিন্দূর অরুণ আভা, বিষম মানসী।
উভয় গ্রহণে যেন পূর্ণিমার নিশি॥
। [illegible]ঞ্চু, সুনাসিকা ভান।
ভুরু ভুজঙ্গম, শ্রুতি বিবরে পয়ান॥
ওরূপ লাবণ্য, জলনিধি, স্থির জলে।
নয়ন শফরী মীন, খেলে কুতূহলে॥
কনক মুকুরে কি, মাণিক্য রাগ প্রভা।
তার মাঝে মুক্তাবলী, ওষ্ঠ দন্ত শোভা॥
শ্রীগণ্ডে কুণ্ডল প্রতিবিম্ব শ্রীবদন।
চারুচক্র রথে চড়ি, এসেছে মদন॥
নাসাগ্রে তিলক চারু, ধরে অচলজা।*
মীননিকেতনে কি উড়িছে মীনধ্বজা॥
করিকর ভুজঙ্গ, মৃণাল হেমলতা।
কোন্ তুচ্ছ কমনীয়, বাহুর তুল্যতা॥
ভুজদণ্ড উপমার একমাত্র স্থান।
সুর তরুবর শাখা, এই সে প্রমাণ॥
হরি গঙ্গা প্রবাহ, যমুনা লোম শ্রেণী।
নাভীকুণ্ডে গুপ্তা সরস্বতী অনুমানি॥
মহাতীর্থ বেণী তীরে স্বয়ম্ভু যুগল।
স্নান করো মনরে অনন্ত জন্ম ফল॥
উত্তরবাহিনী গঙ্গা, মুক্তাহার বটে।
সুচারু ত্রিবলী বিরাজিত তার তটে॥
কবি করে বিবেচনা যে ঘটে যে জ্ঞান
মণিকর্ণিকার ঘাটে সুচারু সোপান॥
রসময় বিধাতায়, কিবা রুব কাণ্ড।
রূপসিন্ধু মন্থিবার, মধ্যদেশ দণ্ড॥
কাঞ্চিদাম রজ্জুতায়, বুঝহ প্রবীণ।
ঘর্ষণে ঘর্ষণে কটি ক্ষীণতর ক্ষীণ॥
মধ্যদেশ ক্ষীণ যদি, সন্দেহ কি তার।
সহজে জঘন ধরে, গুরুতর ভার॥

*অচলজা—হিমালয় দুহিতা

ভবস্থানে মনোভব, পরাভব হোয়ে।
তূণবাণ দ্বিগুণ, এসেছে বুঝি লোয়ে॥
জঙ্ঘা তূণ, পদাঙ্গুলি নখ ফলি শরে।
রতিকান্ত নিতান্ত জিতিবে বুঝি হরে॥

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২৬০ সালের 'প্রভাকরের' ১লা আশ্বিন সংখ্যায় মহাকবি কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের কয়েকটি সঙ্গীত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখানে তাহার দুই একটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—কেননা পদাবলী অধ্যায়ে সে সমুদয় সঙ্গীতই প্রকাশ করা হইয়াছে।

যথা ঃ

মনরে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া-পাখা হও করি স্তুতি॥
অবু তবু গিরি সুতা, পড়লে, শুন্‌লে দুধিভাতি
ওরে জাননা কি ডাকের কথা,
না পড়লে ঠেঙ্গার গুঁতি।

*　　　　*　　　　*

তথা ঃ　ওরে কাজ কি আমার কাশী।
ওরে কালীপদ, কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি॥
ওরে, হৃৎকমলে, ধ্যানকালে, আনন্দ সাগরে ভাসি।

*　　　　*　　　　*

নির্ব্বাণে কি আছে ফল,
জলেতে মিশায় জল,
চিনি হওয়া ভাল নয়,
চিনি খেতে ভালবাসি॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে,
করুণা নিধির বলে,
চতুর্ব্বর্গ করতলে,
ভাব্‌লে এলোকেশী॥

"মহাকবি মৃত রামপ্রসাদ সেন মহাশয় কিরূপ রসিক, কিরূপ প্রেমিক, কিরূপ ভাবুক, কিরূপ ভক্ত ও কিরূপ জ্ঞানী ছিলেন, এই সঙ্গীত দ্বারাই প্রেমভক্তিশালি-মহাশয়েরা সহজে তাহার মর্ম্মজ্ঞ হইতে পারিবেন। যাঁহারা নিরাকারাদি উপাসনা করেন তাঁহারাও এই গান শুনিয়া প্রেমার্দ্রচিত্ত হইবেন; যে হেতু ইহা

জ্ঞানযুক্ত প্রেমভক্তিরসে পরিভূষিত। ... এই স্থানে আর একটি পদ প্রকটন করিলাম, সকলে অভিনিবেশ পূর্ব্বক তাহার ভাবার্থ গ্রহণ করুন। যথা :

আর বাণিজ্যে কি বাসনা।
ওরে আমার মন বল না॥

ওরে ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী, সুখে সাধো সেই হলনা (লহনা)।
ব্যজনে পবন বাস, চালনেতে সুপ্রকাশ,
মনরে ওরে শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী, নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা।
কাণে যদি ঢোকে জল, বার করে যে জানে কল,
মনরে ওরে সে জলে মিশায়ে জল, ঐহিকের এরূপ ভাবনা
ঘরে আছে মহারত্ন, ভ্রান্তিক্রমে কাচে যত্ন,
মন্‌রে ওরে শ্রীনাথ দত্ত, কর তত্ত্ব, কলের কপাট খোলনা।
অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদীঘাতী, মন্‌রে।
মনরে ওরে জনন-মরণাশৌচ্ সন্ধ্যাপূজা বিড়ম্বনা॥
প্রসাদ বলে বারে বারে, না চিনিলে আপনারে,
মনরে, ওরে, সিন্দুর বিধবার ভালে, মরি কিবা বিবেচনা॥

এই কবিতার যথার্থ মর্ম্মগ্রহণ যিনি করিবেন তিনিই মহানাদসাগর-সলিলে মগ্ন হইবেন। এতদ্বারা কবিরঞ্জনের তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রচুররূপেই প্রকাশ পাইতেছে, তিনি ফলভোগ-বিরাগী অর্থাৎ নিষ্কাম্য হইয়া প্রগাঢ় ভক্তিভরে সুপবিত্র প্রীতিচিত্তে পরম পূজনীয় প্রেমময় প্রিয় উপাস্যের উপাসনা করিয়াছেন। সেন সদাত্মা স্বীয় কবিতায় স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন। যিনি জ্ঞানী তাঁহার সন্ধ্যাপূজায় কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না। "অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি, বুড়দাদা দিদিঘাতী, জনন-মরণাশৌচ, সন্ধ্যাপূজা বিড়ম্বনা।" এই পীযুষ-পূরিত পদের নিগূঢ়ার্থ ও ভাব যাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইবেক, তিনি অত্যন্ত প্রীত হইবেন। রামপ্রসাদী পদ সকল রত্নাকরবৎ, যত্নপূর্ব্বক তাহার ভিতরে যত প্রবেশ করা যায় ততই অমূল্য রত্নলাভ হইতে পারে।

পাঠকগণ অবধান করুন।

যথা :

মায়ার এ পরম কৌতুক।
মায়াবদ্ধজনে ধাবতি, অবদ্ধজনে লুটে সুখ॥
আমি এই আমার এই, এ ভাব ভাবে মূর্খ সেই।
মনরে ওরে, মিছামিছি সার ভেবে, সাহসে বাঁধিছ বুক॥

আমি কেবা আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা।
মনরে ওরে, কে করে কাহার সেবা, মিছা ভাব দুখ সুখ॥
দীপ জ্বেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পার করে।
মনরে ওরে, তখনি নির্ব্বাণ করে, না রাখেরে একটুক্॥
প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ।
রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলে দেখরে আপনার মুখ॥

তথা:

মন কি কর তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধর্ত্তে পারে।
মন অগ্রে শশি-বশীভূত, কর তোমার শক্তি সারে॥
রামপ্রসাদ বলে মাতৃভাবে, আমি তত্ত্ব করি যাঁরে.
সেটা চাতরে কি ভাংবো হাঁড়ি,
বুঝবে মন ঠারেঠোরে॥

তথা:

এই সংসার ধোঁকার টাটি,
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি।

* * * *

আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটি।
ও মা যা ইচ্ছা তাই কর, মা, তুমি পাষাণের বেটি॥

তথা: ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গ সঙ্গ।
কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্ক॥

অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময়ে ভজ,
মকরন্দ রসে মজ, ওরে মনোভৃঙ্গ॥
স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন, নিদ্রাভঙ্গে ভাব কেমন।
বিষয় জানিবে তেমন, হোলে নিদ্রা ভঙ্গ॥
অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কূপে পড়ে।
কর্ম্মীকে কি কর্ম্ম ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ॥
এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে।
তুমি যাও পরের ঘরে, এত বড় রঙ্গ॥
প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা।
অঙ্গহীন হোয়ে সেটা, দগ্ধ করে অঙ্গ॥

প্রসাদজীবনীর নিম্নাংশ ১২৬০ সালের 'প্রভাকরে'র ১লা মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, এখানে তাহাও উদ্ধৃত করিলাম। গুপ্ত কবি লিখিয়াছেন:

'মহাত্মাবর কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবন বিবরণ আমরা গত মাসের প্রথম দিবসীয় পত্রে (১লা পৌষ) যাহা লিখিয়াছিলাম তৎপাঠে অনেকেই আমাদিগের নিকট সন্তোষসূচক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। সেন কবি মহাশয় অদ্বিতীয় মনুষ্য ছিলেন, বহুকাল গত হইয়াছেন এবং এদেশ মধ্যে মহল্লোকদিগের জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার নিয়ম না থাকাতে আমরা তাঁহার বিষয় অনেক জানিতে পারি নাই, এ কারণ আমরা দেশবিদেশীয় পাঠকমহাশয়দিগের সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে, সেনকবি মহাশয়ের গীতাবলী যদ্যপি কাহার নিকট লিখিত থাকে এবং কেহ যদ্যপি তাঁহার জীবনের অন্য কোন ঘটনা জ্ঞাত থাকেন অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগের যন্ত্রালয়ে প্রেরণ করিলে আমরা অতিশয় সন্তোষ চিত্তে তাহা প্রকাশ করিব, আমাদিগের এই প্রার্থনানুসারে কোন আত্মীয়বন্ধু যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা সাদরে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম।'

"মহাত্মা রামপ্রসাদ সেনের জীবনবৃত্তান্ত উল্লেখে আপনি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তৎপাঠে অস্মদগণেরা কি গাঢ় পুলক প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা লিখনে লেখনী অসমর্থা, কেননা প্রকাশ্য পত্রে ঐ কবির গুণাবলী এরূপ আন্দোলন ও আলোচনা না হইলে কালে তাঁহার প্রকৃত গুণ ও অসাধারণ ক্ষমতা লোপ হইবার সম্ভাবনা। ইদানীন্তন ঐ মহাপুরুষ কেবল কতিপয় তত্ত্বজ্ঞ ও মর্ম্মগ্রাহী মনুষ্যের নিকট পরিচিত ছিলেন মাত্র, নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার দুই একটী গান জানিতেন, কিন্তু তাহার ভাব ও প্রকৃতার্থ বিষয়ে অনভিজ্ঞ প্রযুক্ত তাহার সমাদর করিতেন না, যাহা হউক আপনি যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া যে মহতী বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহাতে আপনার সমীপে আমরা চিরবাধিত হইলাম এবং ইহাও একপ্রকার আপনার কীর্ত্তি, যেহেতুক আপনি সেন কবির গ্রন্থচয়ে পুনর্জ্জীবন প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অপর কবিরঞ্জনের দৈবশক্তি ও পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বরসের ব্যাপারে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উৎকট বর্ণনা হয় নাই, স্বরূপাখ্যান হইয়াছে, কারণ রামপ্রসাদ সেন অস্মদ গ্রামস্থ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বিষয়ে আমরা অনেক জ্ঞাত আছি। অপিচ তাঁহার মাহাত্ম্য বিষয়ক আপনার রচনা গ্রামস্থ বিজ্ঞ ও বহুদর্শী অনুসন্ধানকারী এবং বৃদ্ধ মনুষ্যদের সপক্ষে পাঠ করিলে তাঁহারা অম্লানবদনে ব্যক্ত করিলেন যে এরূপ লেখা পরম্পর শ্রুতবাক্যানুযায়ী বটে, পরন্তু তিনি ঐশিক শক্তি প্রভাবে গীতাবলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহাতে

সন্দেহ বিরহ, শাস্ত্রাধ্যয়ন না করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রের শাসন দর্শন ও মর্ম্ম প্রকাশ করা কি সামান্য ক্ষমতার কর্ম্ম? শ্রুত আছি যে কবিবরের মিষ্ট স্বর ছিল না তথাচ তিনি যখন গান করিতেন ততক্ষণ তাঁহারা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ থাকিতেন। ঐশ্বরিক অনুকম্পা ব্যতীত এ বিষয়ে আর কি অনুমান করা যাইতে পারে?

একদা নবদ্বীপাধিপতি মহামতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর সেন কবি সমভিব্যাহারে নৌকারোহণে মুর্শিদাবাদে গমন করিয়াছিলেন, তথায় যে কয়েক দিবস রাজা অবস্থিতি করিয়াছিলেন সে কয়েকদিন তাঁহার বাস নৌকাতেই ছিল এবং রামপ্রসাদ সর্ব্বদাই ঈশ্বরের মহিমাসূচক গান করিতেন। এক দিবস স্বায়ংকালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা বায়ুসেবনার্থ তরি আরূঢ় হইয়া গমন করিতে করিতে রাজার নৌকার মধ্যে সেনের গানের ধ্বনি শ্রবণে, মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ নৌকা কাহার ও এ গায়ক বা কে? পরে পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সেনকে স্বযানে আহ্বান করিয়া গান করিতে অনুজ্ঞা দিলেন, কবিরঞ্জন নবাবের মনোরঞ্জনার্থে একটি খেয়াল ও একটি গজল গাইলেন, কিন্তু নবাব তাহাতে বৈরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন যে আমি তোমার খেয়ালাদি গীত শুনিতে ইচ্ছা করি না, কালী কালী শব্দে যে গীত আরম্ভ করিয়াছিলে, ঐ গীত আরম্ভ করহ। নবাবের আজ্ঞানুসারে রামপ্রসাদ স্বীয় রচিত ভক্তিপূরিত একটি শ্যামাবিষয়ক গান আরম্ভ করিলে তিনিও নয়ন-নীর নিবারণে অক্ষম হইলেন, পরে গান ভঙ্গ হইলে নবাব তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া কহিলেন যে রামপ্রসাদ তুমি প্রকৃত ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি তুমি আমার অধীনে থাক, আমি তোমাকে উচ্চপদস্থ করিব, কিন্তু রামপ্রসাদ বিষয়াকাঙ্ক্ষী নহেন এরূপ নবাবগোচর হইলে তেঁই তাঁহাকে আরো অধিক সাধুবাদ প্রদান করিলেন, এক্ষণে পাঠক-মহাশয়েরা বিবেচনা করুন যে রামপ্রসাদ কিরূপ মনুষ্য ছিলেন, সিরাজউদ্দৌলা কিরূপ দুর্দ্দান্ত ছিলেন তাহা কাহার অবিদিত এবং তিনিও যে প্রকার গুণগ্রাহী তাহাও বা কোন জনের অগোচর আছে, অতএব তাঁহাকে বঙ্গীয় ভাষা গানে বিমোহিত করা ও তাঁহার রচনা হইতে যশোঘোষণা করান দৈববল ভিন্ন অন্য কি শক্তি দ্বারা হইতে পারে। সেন কবির বিষয়ে এবম্প্রকার কত শত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য প্রবাদ আছে তাহা সমুদয় প্রকাশ করিলে একখানি পুস্তক হয়, এতাবত এস্থলে তাহা লেখা অনাবশ্যক। পরন্তু যদিও রামপ্রসাদ সেন প্রতি গানেই কালী, দুর্গা, তারা, শিবে ইত্যাদি দেবীর নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ ঐ নাম বদনে অহর্নিশি উচ্চারণ করিতেন, ফলতঃ তিনি

এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন; পরব্রহ্মের কাল্পনিক মূর্ত্তি ও রূপাদি মনে মনে ঘৃণা করিতেন, তবে দেশকালপাত্র বিবেচনানুসারে বাহ্যে কালী কালী শব্দ করিতেন, তেঁহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সহায় ছিলেন এবং তাঁহার অধিকারে বাস করিতেন, সুতরাং ভীত হইয়া প্রচলিত ধর্ম্মানুযায়ী প্রকাশ্য উপাসনাদি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবন্নিমিত্ত তিনি জগদীশ্বরের নিকট দোষী হইতে পারেন নাই, কারণ জগন্তরাত্মা তাঁহার আন্তরিক ভাব জানিতেন. লোকে দুর্গাই বলুক বা ঈশ্বরই বলুক বা খোদাই বলুক অথবা গডই বলুক সকলিই তাঁহারই উদ্দেশে বলিয়া থাকে, ইহাতে প্রকৃত কর্ম্মের হানি হয় না। যথা গোলাপ পুষ্পকে যে নামে উল্লেখ করা যাউক না কেন তাহার সৌরভের লাঘব হয় না। অপর সেন কবির কালীনামাদি উচ্চারণ যে মৌখিক মাত্র তাহা তাঁহার পশ্চাল্লিখিত গানে প্রামাণ্য হইতেছে।

মন কি কর তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধর্ত্তে পারে।
মন অগ্রে কর শশী বশীভূত, কর তোমার শক্তি সারে॥
ওরে আছে কোঠার ভিতর চোরকুঠারী, ভোর হ'লে সে লুকাবে রে।
ষড়দর্শনে পেলেম না দর্শন আগম, নিগম শাস্ত্র ধরে (তন্ত্র ঘোরে)॥
সে যে ভক্তি রসের রসিক, সদানন্দপুরে বিরাজ করে।
সে ভাব ল'তে (লোভে) পরম যোগী, যোগ করে যুগযুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে।
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে॥
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি, বুঝরে মন ঠারে ঠোরে॥*

রামপ্রসাদের সাধনার অন্তর্নিহিত মর্ম্মকথা যথাস্থানে আলোচনা করা হইয়াছে। মাতৃসাধক প্রসাদের আরাধ্য দেবী ছিলেন চিরকল্যাণময়ী সর্ব্বমঙ্গল-বিধায়িনী মা জগদম্বা—জগজ্জননী বিশ্বমাতা।

* পাঠান্তর—সদানন্দে বিরাজ কর পুরে।

তিন

প্রভু বোলে কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বরপুরীর যে গ্রামে অবতার॥ —চৈতন্যভাগবত

পবিত্রসলিলা সুরতরঙ্গিনী গঙ্গার তীরে প্রসিদ্ধ পল্লী পুণ্যতীর্থ কুমার হট্ট-হালিসহর গ্রামে ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা ১১২৯ সালে সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশে রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন ১১২৫-১১৩০ বঙ্গাব্দের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের জন্ম সন তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ প্রচলিত আছে। সুপণ্ডিত স্যার রমেশচন্দ্র দত্ত তৎপ্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (Literature of Bengal) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—Ramprasad Sen a Vaidya by caste, was born in Kumarhatta in Halisahar in the District of Nadiya, probably about 1720. (page 118-125)—রামপ্রসাদ সেনের জন্মকাল সঠিক নির্ণয় করা সহজ নহে। অনেকে অনুমান করেন, ১৬৪০—১৬৪৫ শকের মধ্যে কবিরঞ্জনের জন্ম হয়। সাধক-সঙ্গীত সংগ্রহকার—কৈলাসচন্দ্র সিংহ বলিয়াছেন : বহু যত্নে জানিতে পারা গিয়াছে যে কবিরঞ্জন ১৬৪২ শকে জন্মগ্রহণ করেন। অনেকেই মনে করেন যে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ আনুমানিক ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে বা ১১২৯ সালে গঙ্গাতীরবর্ত্তী কুমারহট্ট-হালিসহর গ্রামে, এক বিশিষ্ট বৈদ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম. এ. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৫ শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা (১৩৫২) 'রামপ্রসাদ' শীর্ষক প্রবন্ধে রামপ্রসাদের আবির্ভাব কাল আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন : রামরাম সেনের (প্রসাদের পিতা) জন্মাব্দ যদি ১৬৭০ খ্রী: বলিয়া অনুমান করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিধিরামের জন্মাব্দ ১৬৯৫ সনের পূর্ব্বে যাইবে না। নিধিরামের ৮ বৎসর কালে রামরামের দ্বিতীয় পরিণয় হয় (রামপ্রসাদ, প্রসাদীকথা, পৃ: ৩৩৬) এবং রামপ্রসাদ তাঁহার মাতার তৃতীয় সন্তান (ঐ পৃ: ৩২৫)। সুতরাং নিধিরামের সহিত রামপ্রসাদের বয়সের ব্যবধান ন্যূনকল্পে ১৫ বৎসর, ২০ বৎসর ধরাই যুক্তি-সঙ্গত। তদনুসারে রামপ্রসাদের জন্মাব্দ কিছুতেই ১৭১০-১৫ সনের পূর্ব্বে যাইবে না—ইহাই তাঁহার আবির্ভাবকালের ঊর্দ্ধতম সীমা বলিয়া ধরা যায়। বস্তুতঃ নিধিরামের জন্ম ১৭০০ সনের পূর্ব্বে যাইবে না। প্রথমতঃ হলওয়েল

(১৭৫১ হইতে) ও গবর্ণর ড্রেক (১৭৫২ হইতে) তাঁহাকে 'মীরমুন্সী' পদে প্রতিষ্ঠিত করেন (ঐ পৃঃ৩৩৭-৮)। সেই নিধিরামের বয়স তৎকালে অনধিক ৫০ বৎসর ধরাই যুক্তিযুক্ত। দ্বিতীয়তঃ, নিধিরামের প্র-পৌত্র গঙ্গাচরণ সেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮১৩-৮৫) সহাধ্যায়ী ছিলেন (ঐ পৃঃ ৩৩৬)। তাঁহার জন্ম ১৮১০ সনে ধরিলেও নিধিরাম হইতে গঙ্গাচরণ পর্য্যন্ত তিন পুরুষে ১১০ বৎসর হয়—অর্থাৎ এক পুরুষের গড়পড়তা হয় প্রায় ৩৭ বৎসর। সুতরাং নিধিরামের জন্ম ১৭০০-১০ সনে ধরিয়া রামপ্রসাদের জন্মাব্দ স্থূলতঃ ১৭২০-৩০ খ্রীঃ মধ্যে নির্ণয় করা যায়।

ঈশ্বর গুপ্ত (প্রভাকর, বঙ্গাব্দ ১লা পৌষ, ১২৬০, (পৃঃ ৯) রামপ্রসাদের জন্ম-মৃত্যুর কাল সূচনা করিয়া লিখিয়াছেন : ৬০ বৎসর বয়সের কিঞ্চিৎ পরেই রামপ্রসাদ সেন মায়িক সংসার পরিহার পূর্ব্বক নিত্যধাম যাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যুর দিন গণনা করিলে ৭২ বৎসরের অধিক হইবে না।

রামপ্রসাদ সেন যখন কলিকাতায় আসিতেন, তখন যোড়াসাঁকোর দোয়েহাটায় মাতুল বাটিতে বাস করিতেন। ৺চূড়ামণি দত্তের সহিত অত্যন্ত প্রণয় ছিল, সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট গিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতেন, তিনি অতি সুবক্তা ও প্রিয়ভাষী ছিলেন।

রামপ্রসাদের জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের লেখাই সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা প্রমাণিক। তদনুসারে রামপ্রসাদের মৃত্যু-সন গণনা করিলে ১১৮৯ বঙ্গাব্দের (১৭৮২ খ্রীঃ) পূর্ব্বে যাইবে না, ২।৩ বৎসর পরেও হইতে পারে। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম অনধিক ৬১।৬২ ধরিয়া তাঁহার জন্মাব্দ ১১২৮-৩২ সনের মধ্যে (১৭২১-৬ খ্রীঃ ও ১৬৪৩-৪৭ শক) নির্ণয় করিতে হইবে পূর্ব্বেও নহে, পরেও নহে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য মনে করি।

গঙ্গাতীরবর্ত্তী কুমারহট্ট-হালিসহর গ্রাম রামপ্রসাদের আবির্ভাব কালেও বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এই কুমারহট্ট-হালিসহর গ্রাম এক্ষণে হালিসহর নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে হালিসহর ২৪পরগণার অন্তর্গত হালিসহর পরগণার নৈহাটি থানার অধীন।

রামপ্রসাদের জীবনচরিত লেখকদের মধ্যে অনেকে তাঁহার বাসগ্রাম "হালিসহরের অন্তঃপাতী কুমারহট্ট বা কুমারহাটি," কেহ বা 'হালিসহর মহকুমার অন্তর্ব্বর্ত্তী কুমারহট্ট পল্লী' বলিয়া লিখিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে কুমারহট্ট ও হালিসহর এক ও অভিন্ন গ্রাম। 'কুমারহট্ট' গ্রামের নামোৎপত্তিরও কিন্তু ইতিহাস আছে।

প্রাচীনকালে হালিসহর গ্রাম পণ্ডিতসমাজে কুমারহট্ট নামে পরিচিত ছিল।

জনপ্রবাদ এইরূপ যে—যশোহর রাজবংশীয়েরা এই গ্রামে যোগাদি উপলক্ষে গঙ্গা স্নানে আসিতেন। এই জন্য যশোহর হইতে এই গ্রাম পর্য্যন্ত "জাঙ্গাল" নামে একটি প্রশস্ত রাজবর্ত্ম ছিল। অদ্যাপি স্থানে স্থানে এই জাঙ্গালের ভগ্নাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পুত্র কুমার উদয়াদিত্য গঙ্গা-স্নান উপলক্ষে বহু লোক সমভিব্যাহারে ঐ গ্রামে প্রায় প্রতি বৎসর আসিতেন। তাঁহার এই আগমন সময়ে কিছুদিন ধরিয়া তথায় হাট বসিত। ক্রমে সেই হাট স্থায়ী হয় এবং ঐ স্থান তদনুসারে কুমারহট্ট নামে অভিহিত হইতে থাকে। কেহ কেহ আবার বলেন, ঐ গ্রামে বহু কুম্ভকারের বাস-হেতু উহা কুমারহট্ট আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এ বিষয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে। আমরা এখানে সেই গল্পটি প্রকাশ করিলাম।

এক সময়ে নবদ্বীপের কতকগুলি পণ্ডিত এই গ্রামের পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এখানকার পণ্ডিতগণ বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে নবদ্বীপাগত পণ্ডিতগণকে কৌশলে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করেন। সমাগত পণ্ডিতগণকে তাঁহারা বাসা প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের পরিচর্য্যার জন্য জনৈক যুবা কুম্ভকারকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া পণ্ডিতগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করেন এবং একটি বালককে সেই স্ত্রী-বেশী পরিচারকের পুত্ররূপে সেই বাসায় রাখিয়া দেন, পণ্ডিতদিগের আগমনের পরদিন প্রাতে সেই স্ত্রীবেশী পরিচারক ঘর-দ্বার পরিষ্কার ও রন্ধনাদির আয়োজন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হয়। তখন প্রাতঃকাল। পণ্ডিতেরা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেছিলেন। ঐ সময় কতক-গুলি কাক চারিদিকে "কা কা" ধ্বনি করাতে ঐ স্ত্রীবেশী তাহার পুত্ররূপ বালককে পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে বলে, "কি জন্য কাক সকল এরূপ কলরব করিতেছে এবং তাঁহারা উত্তরে যাহা বলিলেন, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বালক যেন কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার নিকট ফিরিয়া আইসে। বালক শিক্ষা মত তদ্রূপ করে। পণ্ডিতেরা তাহা শুনিয়া বলেন, "ঐরূপ কলরব করা কাক জাতির স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম, তাই করিতেছে।"

বালক তাহা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঐ স্ত্রীবেশী পরিচারকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলে, "পণ্ডিতেরা জানেন না। মা, তুই বল্, কাক কেন এত ডাকিতেছে?" তাহাতে ছদ্মবেশী বলিল, "আমি আমাদের এখানকার পণ্ডিত-দিগের নিকট কাকের এইরূপ ডাকিবার কারণ যেরূপ শুনিয়াছি, বলিতেছি শোন্—

চৈতন্য ডোবা

ঈশ্বরপুরীর মঠ

তিমিরারিস্তমো হন্তি শঙ্কাকুলিতমানসাঃ।
'বয়ং কাকা বয়ং কাকা' ইতি জল্পন্তিবায়সাঃ॥

ওরে, সূর্য্যদেব অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া চতুর্দ্দিক আলোকিত করিতেছেন দেখিয়া কাকদিগের মনে ভয় হইয়াছে যে, তাহাদিগের অঙ্গের কৃষ্ণবর্ণকে অন্ধকার বিবেচনায় পাছে সূর্য্যদেব তাহাদিগকেও বিনষ্ট করেন, এই ভয়ে কাক সকল 'বয়ং কা কা বয়ং কা কা' অর্থাৎ 'আমরা কাক, আমরা কাক' বলিয়া চীৎকার করিয়া সূর্য্যদেবকে আপনাদিগের পরিচয় দিতেছে।" দূর হইতে পণ্ডিতগণ স্ত্রীবেশী পরিচারককে শুদ্ধ স্বরে ঐ শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে ও তাহার এরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন, সে ঐ শ্লোক কোথায় শিখিয়াছে? স্ত্রীবেশী বলিল, "শিখিব আর কোথায় বাবাঠাকুর, বাড়ীর নিকটেই পণ্ডিতের টোল চৌবাড়ী আছে, সেখানে পণ্ডিতেরা ছাত্রদিগকে পড়াইবার কালে যে সকল শ্লোক বলেন, তাই শুনিয়াই আমাদের শেখা।"

কুম্ভকার জাতীয় নারী যে গ্রামে এমন সংস্কৃত জানে, তখন না জানি পণ্ডিত-গণের বিদ্যা কত অধিক' এই চিন্তা করিয়া পণ্ডিতগণ বিদায়াশায় জলাঞ্জলি দিলেন এবং আহারান্তে তাঁহারা আপন আপন পুঁটলি লইয়া গোপনে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

কুম্ভকার যুবকের দ্বারা নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ এইরূপে পরাস্ত হওয়ায় হালি-সহরের পণ্ডিতগণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া গ্রামের সেই অংশের কুমারহট্ট নাম দিয়াছিলেন।* কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই গ্রামে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থাদি উচ্চ জাতীয় লোকের বাস এত অধিক এবং এককালে তাঁহাদিগের আভিজাত্যের ও ব্রাহ্মণের যেরূপ গর্ব্ব ছিল, তাহাতে তাঁহারা কুম্ভকার জাতির নামে আপনাদিগের গ্রামের পরিচয় দিতে সম্মত হইবেন বলিয়া বোধ হয় না।

কুমারহট্ট ও হালিসহর এদু'টি নামই প্রাচীন। এই দুই নামেই গ্রামখানি পরিচিত। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন্ত্রগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। মহাপ্রভু একবার তাঁহার গুরুদেব শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর বাস-পল্লী পুণ্যভূমি কুমারহট্টে—গুরুদেবের আশ্রম দর্শনে গমন করিয়াছিলেন।

---

* কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী—(বসুমতী হইতে প্রকাশিত ।● ৶● আনায় দ্রষ্টব্য) শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায় সাহিত্যনিধি। এই কাহিনাটি বহু জীবনী গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্তভাগবতের আদিখণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায়ে আছে :

"আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান্।
দেখিলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান ॥
প্রভু বোলে "কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বরপুরীর যে গ্রামে অবতার ॥"
কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেইস্থানে।
আর শব্দ কিছু নাই 'ঈশ্বরপুরী' বিনে ॥
সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্ব্বাসে বান্ধি এক ঝুলি।
প্রভু বোলে ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা মোহর জীবনধন প্রাণ ॥"

যে স্থান হইতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মৃত্তিকা তুলিয়াছিলেন, সেই স্থানটি 'চৈতন্য-ডোবা' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দেখাদেখি তাঁহার সঙ্গী ও বহু শিষ্যগণ-ও সেই স্থান হইতে মৃত্তিকা তুলিয়া লইয়াছিলেন, ইহাতে স্থানটি একটি খাদে পরিণত হয়। হালিসহরবাসীরা বলেন এই ডোবার জল গ্রীষ্মের দিনেও শুষ্ক হয় না।

কুমারহট্টের অন্য নাম কুমারহট্ট বা কুমারহাটা। আমাদের মনে হয় পূর্ব্বে এই স্থানে কুম্ভকারদের প্রস্তুতি হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি বিবিধ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দ্রব্যাদির বিক্রয় হইত এবং হাট বসিত, সেজন্য এ গ্রামের কুমারহট্ট বা কুমারহাটা নাম হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

আমরা পূর্ব্বে এ বিষয়ে একটি কাহিনী বলিয়াছি এখানে তদনুরূপ আর একটি কাহিনীও বলিতেছি।

প্রসাদ-প্রসঙ্গ রচয়িতা স্বর্গত দয়ালচন্দ্র ঘোষ বলেন :—"পূর্ব্বে এই কুমারহট্টে পাঁচশত কুমার বাস করিত। এই গ্রামের নাম কুমারহট্ট হইল কেন তাহাও শুনুন। একদা এই স্থান অতীব সমৃদ্ধশালী ছিল। বহু পণ্ডিত ও জ্ঞানীগুণীর বাসস্থান ছিল। তখন নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে এখানকার পণ্ডিতগণের সমদক্ষতা নিবন্ধন প্রায় পরস্পর তর্কবিতর্ক এবং বিচার চলিত। এক সময়ে নবদ্বীপের কয়েকজন পণ্ডিত এখানে বিচার করিতে আসিয়াছিলেন। কুমার-হট্টের পণ্ডিতগণ চক্রান্ত করিয়া, একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সুচতুর কুম্ভকারকে তাঁহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে নিযুক্ত করেন।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শজিনা ফলে দাল রন্ধন করিয়া আহার করিতে বসিয়াছেন। শজিনা ফলের এক এক খণ্ড একাধিকবার মুখে দিতে দেখিয়া সেই কুম্ভকার বলিল,—'ছিঃ ছিঃ, আপনারা পণ্ডিত হইয়া উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন। আপনাদের সঙ্গে আবার পণ্ডিতগণ কি বিচার করিবেন?' এই সূত্র ধরিয়া সেই কুম্ভকারই তাঁহাদিগকে নিতান্ত অপদস্থ করে। এইরূপে কুম্ভকার হইতে পণ্ডিতগণ হঠিয়া গেলেন বলিয়া স্থানের নাম কুমারহট্ট হইয়াছে।" এ সব কাহিনী যে বিশ্বাসযোগ্য নহে তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

অনেকের মতে হালিসহরের প্রথম নাম ছিল **হাবেলীসহর**। উর্দ্দু ভাষায় হাবেলী অর্থে দালান বা অট্টালিকা। মুসলমান রাজত্বকালে বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল জেলা, মহকুমা ও পরগণার চৌকি ইত্যাদি বিভক্তকালে, ২৪ পরগণার উত্তর সীমা বাগের খাল হইতে পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের শ্যামনগর ষ্টেসনের দক্ষিণ নবাবগঞ্জের খাল পর্য্যন্ত গঙ্গা তীরস্থ গ্রামগুলি '**হাবেলীসহর**' পরগণা নামে পরিচিত ছিল এবং উত্তরস্থ এই গ্রামখানি 'হাবেলীসহর' নামে বা হাবেলীনগরে পরিচিত হয়। কিন্তু লোকমুখে উচ্চারণ বৈষম্যে 'হাবেলীসহর' ক্রমে 'হালিসহরে' পরিণত হয়। প্রাচীন কোন কোন দলিল দস্তাবেজে, পরগণাও গ্রাম উভয়ই 'হাবেলীসহর' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। কালেক্টারীর তৌজীতে অদ্যাপি '**কুমারহট্ট হাবেলীসহর**' নাম দেখা যায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজে হালিসহর 'কুমারহট্ট' নামেই প্রসিদ্ধ। ইহা নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত সমাজ চতুষ্টয়ের অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক সময়ে ভট্টপল্লীর পণ্ডিতগণ আপনাদিগকে কুমারহট্ট সমাজের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দিতেন। বর্ত্তমান সময়েও ভট্টপল্লী সমাজের অনেক পণ্ডিত কুমারহট্ট সমাজের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।*

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন কুমারহট্ট ও

---

* Hali Sahar—Town in the Barrackpore subdivision of the District of the Twenty-four Parganas, Bengal, situated in '22°.56'-N and 88°.29E on the bank of the Hooghly river. Population (1901) 10,149. It was formerly called Kumarhata, and is a noted home of *Pandits*; among other devotees of Gauranga, Ramprasad Sen lived here. It was constituted a municipality in 1903. The income for six months of 1903-04 was Rs. 4200, of which Rs. 1600 was derived from a tax on persons (or property tax), Rs. 1400 from a conservancy rate, and Rs. 900 from a tax on houses and lands. During the same period the expenditure amounted to Rs. 2800. At Kanchrapara within this municipality are the workshops of the Eastern Bengal state Railway. Gazetteer—1909.

হালিসহর ছিল অভিন্ন পল্লী, একদিকে যেমন ধনেজনে পূর্ণ সমৃদ্ধিশালী ছিল, তেমনি এখানকার বিবিধ দেবমন্দির, প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা, নির্ম্মল সলিল পূর্ণ বিবিধ তড়াগ ও দীঘি ছিল—পুষ্করিণী ছিল, বহু জনাকীর্ণ ছিল এবং এই গ্রামখানি বিবিধ তরুশ্রেণী শোভিত থাকিয়া যেমন শ্যামল-শ্রীমণ্ডিত ছিল, তেমনি এখানকার পণ্ডিতগণের জ্ঞান-গৌরবের কথা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিল।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জন্ম সন ও তারিখ সম্বন্ধে যে নিশ্চিত রূপে জানা সম্ভবপর নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বে যে আলোচনা ও যে সনের উল্লেখ করিলাম তাহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। প্রভেদ বড় বেশী নয়। তবে রামপ্রসাদ সেন যে ১৬৪০ হইতে ১৬৪৫ শকাব্দের অর্থাৎ ১৭১৮ হইতে ১৭২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সত্য বলিয়াই মনে হয়।

রামপ্রসাদ সেন সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশ সম্ভূত ছিলেন। নিজ গ্রন্থ মধ্যেই নিজের ও স্বজনের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

ধন হেতু (পাঠান্তর ধনবন্ত) মহাকুল, পূর্ব্বাপর
শুদ্ধ মূল, কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্টশান্ত গুণানন্ত
প্রসন্না কালিকা কৃপামই॥
সেই বংশ সমুদ্ভূত, ধীর সর্ব্বগুণযুত, (পুরুষার্থ কত কব)
ছিলা কত শত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরল হৃদয়।
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তার, কহে পদে কালিকার,
কৃপাময়ী ময়ি কুরু দয়া।
(পাঠান্তর) তদাঙ্গজ এ প্রসাদে,
কৃপাময়ী ময়ি কুরু দয়া॥
জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী।
যাঁর পাদপদ্ম আমি রাত্রি দিবা সেবি॥
ভগ্নাপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস॥

ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম।
আমাতে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম॥
সর্ব্বাগ্রজা ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা।
তাঁর দুঃখ দূর কর জননী কালিকা॥
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
তাঁরে কৃপা দৃষ্টি কর মাতা জগন্মাতা॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া।
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাগো দেহি পদধূলি॥
শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্বজ্যেষ্ঠা সুতা।
শ্রীকবিরঞ্জনে ভনে কবিতা অদ্ভুতা॥
ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম।
তত্রমধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ ধাম॥
শ্রীমণ্ডপে জাগ্রত শৈলেশ পুত্রী যথা।
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা॥

কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর।

রামপ্রসাদের এই আত্মপরিচয় হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে কীর্ত্তিমান কৃত্তিবাস একজন শক্তি-ভক্ত উপাসক ছিলেন। ইনি দানশীল, দয়াবান্, শিষ্ট শান্ত ছিলেন এবং ইঁহার কীর্ত্তি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইহার পর এই বংশে বহু সর্ব্বগুণযুত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া বংশকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। অবশেষে রামেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন রামপ্রসাদের পিতামহ। রামেশ্বরও শক্তি-সাধক ও সরল হৃদয় ছিলেন। পরে তাঁহার পিতা 'মহাকবি গুণধাম' রামরাম জন্মগ্রহণ করেন। রামরাম সেনের দুই বিবাহ, তন্মধ্যে প্রথমার গর্ভে নিধিরাম নামক একটি পুত্র এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে রামপ্রসাদ ও বিশ্বনাথ নামে আর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই কাব্যের আর একস্থলে রামপ্রসাদ তাঁহার ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র এবং কন্যাদিগের নাম উল্লেখ ও পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নিধিরাম, রামরাম সেনের প্রথমা পত্নীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন, দ্বিতীয়ার গর্ভে সর্ব্বাগ্রজাভগ্নী শ্রীমতী অম্বিকা ও রামপ্রসাদের জ্যেষ্ঠা ভবানীদেবীর জন্ম হয় এবং তৎপরে রামপ্রসাদ ও তদনুজ বিশ্বনাথ সেন জন্মগ্রহণ করেন, কলিকাতা নিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের সহিত

রামপ্রসাদের ভগ্নী ভবানীর বিবাহ হইয়াছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ছিলেন পরম বৈষ্ণব। লক্ষ্মীনারায়ণের দুই পুত্র জগন্নাথ ও কৃপারামের মাতুল রামপ্রসাদের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান ছিলেন।

আমরা দেখিতেছি এই আত্মপরিচয়ে রামপ্রসাদ তাঁহার পত্নীর নাম কোথাও উল্লেখ করেন নাই।

রামপ্রসাদের রামদুলাল নামে এক পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নামে দুই কন্যা ছিল। তাঁহার রামমোহন নামেও আর একটি পুত্র ছিল। রামপ্রসাদ যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার শেষ বয়সের কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের নাম কোথাও দেখা যায় না। এই রামমোহনের বংশ অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া রামপ্রসাদের বংশের নাম রক্ষা করিতেছে। সে বংশাবলী পরে প্রদত্ত হইল, এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁহার কুল পরিচয়ও বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইবে।

রামমোহন সম্পর্কে 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ'কার দয়ালচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন :— "এই স্থানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন হইবে যে, যে রামপ্রসাদ ভাই, ভগিনী, ভগিনীপতি ও ভাগিনেয় প্রভৃতিরও নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং আপনার তিনটি সন্তানেরও নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার অপর একটি পুত্র থাকিলে, নাম উল্লেখ করিলেন না কেন? এই প্রশ্ন অবিকল এই ভাষায় আমি কবিরঞ্জনের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল কৃষ্ণ সেন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি। তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে "কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর" রচিত হওয়ার পরে তাঁহার পিতামহ জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং উক্ত পুস্তকে তাঁহার নামের উল্লেখ নাই।

বৃদ্ধবয়সে কবিরঞ্জনের স্ত্রী গর্ভবতী হইলে আজু গোঁসাই বলিয়াছিলেন, "তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা কাঁচায়েছ পাকা ঘুঁটি।" এখন দেখিতে পাইতেছি প্রসাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কন্যা পরমেশ্বরী, মধ্যমপুত্র রামদুলাল এবং কনিষ্ঠা কন্যা জগদীশ্বরীর পরে, রামমোহন সেন কবিরঞ্জনের সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন।

রামমোহনের জন্মের পর, রামপ্রসাদ "এ সংসার ধোঁকার টাটি, এই গানটি লিখিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

রামপ্রসাদ নিজ বাসপল্লীকে অত্যন্ত পবিত্র ও পুণ্যতীর্থ বলিয়া মনে করিতেন, জন্মভূমির প্রতি প্রীতি তাঁহার লিখিত কবিতা হইতেই জানিতে পারি। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন :

ধরাতলে ধন্য সেই কুমারহট্ট গ্রাম।
তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণধাম॥

শ্রীমণ্ডপে জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা।
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা॥

রামপ্রসাদ কুমারহট্ট গ্রামে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ ধামের কথা বলিয়াছেন। রামকৃষ্ণ ধাম বলিতে কি বুঝাইতেছেন? কে ছিলেন এই রামকৃষ্ণ?

রামকৃষ্ণ ধাম, সিদ্ধপীঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ইহা হইতে বুঝিতে পারিতেছি রামকৃষ্ণ বলিয়া কোন সিদ্ধ পুরুষের বাস স্থান ছিল বলিয়াই উক্ত স্থান—'রামকৃষ্ণ ধাম' নামে পরিচিত ছিল। কবিরঞ্জন কুমারহট্টের যে স্থানে বাস করিতেন, সে স্থানকে" সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণধাম' বলিয়াছেন। কথিত আছে, কবি যে বেদীতে বসিয়া সাধনা করিতেন, সেই সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণধাম নামে পরিচিত। ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে কবিরঞ্জনের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সাধক কুমারহট্টের ঐ স্থানেই ধ্যানধারণার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই রামকৃষ্ণধামের প্রকৃত মীমাংসা কেহই করিতে পারেন নাই।

কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন:—"যে স্থান হইতে মহাপ্রভু মৃত্তিকা তুলিয়াছিলেন; বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ এবং নিত্যানন্দ প্রভুকে রাম (বলরাম) বলিয়া জানেন। সম্ভবতঃ তৎপরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ ঐ স্থানকে এবং পরে কুমারহট্ট নগরকে **"রাক্নমক্ষধাম"** বলিয়া কহিতেন। রামপ্রসাদ মহাপ্রভুর বহু পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গাতীরে রামকৃষ্ণধামে সাধনা করিলে সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, এই আশায় 'সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণধামে' সাধন ভজন করিয়া ইষ্ট দেবীর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।* এ অনুমান প্রমাণসহ নহে।

* শ্রীসজ্জনতোষিণী পত্রিকা। ৭ম খণ্ড ৭ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

চার

মন তুমি দেখরে ভেবে।
ওরে আজি অব্দ শতান্তে বা অবশ্য মরিতে হবে
ভবঘুরে হয়ে রে মন, ভাবলিনে ভবানী ভবে।
সদা ভাব সেই ভবানী পদ যদি ভব পারে যাবে॥ —রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, সে সময়ে বাঙ্গালা দেশে চলিতেছিল মুসলমান রাজত্ব। রামপ্রসাদ সেন ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই আমরা যদি এখন ধরিয়া লই, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেছি—বাঙ্গলার নবাব যখন মুর্শিদকুলি খাঁ ছিলেন, তখন রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যু হইয়াছিল—১৭২৫ খৃষ্টাব্দে। এই সুযোগ্য নবাবের মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন বাঙ্গলার নবাব হইয়াছিলেন। সুজাউদ্দীন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ধার্ম্মিক এবং ন্যায়-বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। দিল্লীর সম্রাটের সহিত তাঁহার কোনরূপ দ্বন্দ্ব বা কলহ হয় নাই। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দীনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ হইলেন বাঙ্গলার নবাব। সরফরাজ খাঁ সব দিক দিয়াই অযোগ্য ছিলেন—এই অক্ষম নবাবকে বিহারের সুবাদার আলিবর্দী খাঁ যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বাঙ্গলার নবাব হইলেন। নবাব আলিবর্দী খাঁ দিল্লীর বাদশাহকে কর দেওয়া বন্ধ করিয়া স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই বঙ্গে, বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছিল। সে সময়ে রামপ্রসাদ যুবক ছিলেন। আলিবর্দী খাঁ ১৭৪০-৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। বর্গী বা মারাঠাদের অত্যাচার হইতে বাঙ্গলাদেশ রক্ষা করিবার জন্য নবাব আলিবর্দ্দী মারাঠাদিগকে উড়িষ্যা প্রদেশ প্রদান করেন এবং বার্ষিক বারো লক্ষ (১২ লক্ষ) টাকা চৌথ দিতে স্বীকৃত হইয়া মারাঠাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। (১৭৫১ খৃঃ)

আলিবর্দী খাঁর ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গলার নবাব হইয়াছিলেন।

আমরা দেখিতে পাইতেছি—রামপ্রসাদের জন্ম নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর নবাবী আমলে হইয়াছিল এবং তিনি নবাব সুজাউদ্দীন, সরফরাজ খাঁ, এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং কোম্পানীর আমল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

নবাব আলিবর্দ্দী সুবে বাঙ্গালা বিহারও উড়িষ্যার অধিপতি। স্বাধীন নবাব,

ছিলেন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীগণের সময়ে সেকালের সামাজিক জীবন, শিক্ষার রীতি-নীতির বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। এরূপ শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবর্ত্তন এবং সামাজিক পরিবেশ, যুগে যুগে শতাব্দীর পর শতাব্দীতে রাষ্ট্রবিপ্লবের ভিতর দিয়া আসে। বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠান তখন কিন্তু ছিলনা। শিক্ষানুরাগী, রাজা ও জমিদারদের অনুগ্রহ-পুষ্ট চতুষ্পাঠি, টোল, মক্তব, মাদ্রাসা ও পাঠশালা ছিল। গ্রামের গুরুমহাশয়েরা পাঠশালা পরিচালনা করিতেন। ছোট ছোট বালকদের প্রথম বিদ্যারম্ভ গুরুমহাশয়ের নিকট হইত।

রামপ্রসাদ সম্বন্ধে "শ্রীশ্রীকালীকুণ্ডলিনী" গ্রন্থ প্রণেতা সাধকপ্রবর ভুলুয়ার সন্ন্যাসী ভুলুয়া বাবা হালিসহরে গমন করিয়া রামপ্রসাদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যেরূপ শুনিয়াছিলেন তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। তাঁহাদের মধ্যে এমন বৃদ্ধও ছিলেন, যাঁহাদের পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনের রামপ্রসাদকে দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেনঃ "রামপ্রসাদের মাথায় বাব্‌রী ছিল। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিল। দোহারা শরীর এবং বলিষ্ঠ ছিলেন। গলায় স্ফটিক মিশান রুদ্রাক্ষের মালা ছিল। গোঁফ ছিল। অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। যে দেখিত সেই ভক্তি করিত। পঞ্চমুণ্ডী আসন ছিল। পঞ্চ ম-কারের সাধক ছিলেন। * * ছাগবলি দিতেন।"

এই শোনা কথা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নহে এবং প্রমাণসহ নহে। কেননা রামপ্রসাদ কোনদিন ছাগবলি দিয়া দেবীর পূজা করেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার এবং গ্রামের বংশপরম্পরাগত জনশ্রুতি এবং গীতাবলীই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

কুমারহট্ট গ্রামে শিবের গলিতে ছিল পিতা রামরাম সেনের ভদ্রাসন। তখন সত্য সত্যই 'ধরাতলে ধন্য ছিল কুমারহট্ট গ্রাম'। কত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, দেবমন্দির, বন-উবপন-বেষ্টিত সরোবর, দেবমন্দির, পল্লীর পথঘাট সোপান-শোভিত গঙ্গাতীর ছিল সর্ব্বত্র জন-কোলাহলে মুখরিত। কেহ আসিত গঙ্গাস্নান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে, কেহ আসিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতে, আনন্দময় ছিল কুমারহট্ট গ্রাম।

রামপ্রসাদের পিতা রামরাম সেন ধনী ছিলেন না, সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন একজন সত্যনিষ্ঠ, সর্ব্বলোক-হিতসাধক সমাজহিতৈষী মহাপ্রাণ ব্যক্তি। তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি নিজে মাত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ও ধর্ম্মজীবন সাধন করিয়া তৃপ্ত ও সুখী হইতেন না যাহাতে পরিবারের সকলেই ধর্ম্মপথে চলে, ধর্ম্মানুষ্ঠান করে সেদিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য

ছিল। তাঁহার জীবন ছিল আদর্শ জীবন। কথিত আছে, তিনি প্রতিদিন প্রত্যুষে নিদ্রা হইতে উঠিতেন এবং গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন এবং স্নানান্তে বাড়ী ফিরিবার পথে বিবিধ স্তব, স্তোত্র ও শ্লোকাদি পাঠ করিতে করিতে বাগানে পুষ্প-চয়ন করিতেন। তাঁহার বাসগৃহের চতুর্দ্দিক বেড়িয়া ছিল আম, নারিকেল, কাঁঠাল সুপারি, প্রভৃতি নানা ফলবান্ বৃক্ষ। পুষ্পাদি চয়নান্তে তিনি ভক্তিভরে সর্ব্বতত্ত্ব-সমন্বিতা মহাকালীর পূজা করিতেন, সর্ব্বশান্তিফলপ্রদা মহাদেবীর চরণ, চন্দন-কুঙ্কুমে চর্চ্চিত করিয়া দিতেন। তারপর ধূপ ও পঞ্চপ্রদীপ সংযোগে ত্রিলোক-জননী সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদাশুভদা সদাশিবময়ী জগদম্বার আরতি করিতেন। এই সময় অনেক দিন তাঁহার বালক পুত্র শ্রীরামপ্রসাদ মণ্ডপে বসিয়া থাকিত এবং কখন কখন সেও সহাস্যবদনে মায়ের রক্ত চরণে অঞ্জলি দিত।

পিতা রামরাম সেন—'মহাকবি' এবং গুণধাম ছিলেন একথা রামপ্রসাদই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তেজস্বী, সত্যনিষ্ঠ পিতা রামরাম পুত্র রামপ্রসাদকে শিক্ষা দিবার জন্য মনোযোগী ছিলেন। গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় শিক্ষা সমাপ্তির পর স্বজাতীয় আয়ুর্ব্বেদীয় ব্যবসায় অবলম্বনের জন্যই হউক কিংবা জ্ঞানলাভের জন্যই হউক, সে সময়ে ব্রাহ্মণ-বৈদ্যাদি জাতির সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইত। সেজন্য রামপ্রসাদ কিছুকাল নিজ গ্রামের এক চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার মধ্যে তাঁহার সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। পিতা রামরাম সেন দেখিলেন, পুত্র রামপ্রসাদের পৈত্রিক আয়ুর্ব্বেদ বা চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা-অর্জ্জনের প্রবৃত্তি একেবারেই নাই। সেজন্য তিনি তাঁহাকে তৎকালীন অর্থকরী বিদ্যা পারস্য-ভাষা শিখিবার জন্য একজন মৌলবীর নিকট প্রেরণ করেন। রামপ্রসাদ তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও মেধাশক্তি বলে অল্পদিনের মধ্যেই পারস্য ভাষা ও উর্দ্দু ভাষা শিখিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে 'মাধব ভাটের কাঞ্চীপুর গমনের' যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে পারস্য, হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় যে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল সে পরিচয় পাওয়া যায়। সেকালে পারস্য ভাষায় শিক্ষালাভ করিতে বালকেরা মনোযোগী হইতেন। অর্থকরীবিদ্যা হিসাবে পারস্য ভাষার সমাদর ছিল। হিন্দু-মুসলমান বালকেরা শৈশব হইতেই পারস্য ভাষা শিক্ষার জন্য মক্তব ও মাদ্রাসাতে গমন করিতেন। এ সম্বন্ধে ডাঃ কালীকিঙ্কর দত্ত মহাশয় তৎপ্রণীত "Alivardi and His Times" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন: "Education in Persian was apparently in a flourishing

condition. For the Muhammadans this was an important medium through which they could receive higher education and the Hindus as well sought to acquire some knowledge of it. As the language of the rulers, Persian had become the official language of the day; and many of the notable Hindus had to learn it as a matter of necessity to qualify themselves for posts under the Nawav's Government and the Company. Thus the poet Ramprasad Sen, formerly a clerk under the Company, mastered Persian within a short time through the help of a Maulavi. The Chapter on *Madhava Bhat's Journey to Kanchipura,* 'in his 'Vidyasundara' gives us some idea of his proficiency in Persian and Urdu such was the case with Bharat Chandra." *

সেকালে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তীকালে মুসলমান-আমলে পারস্য ভাষা শিক্ষা না করিলে সরকারী কাজ মিলিত না, এজন্ত অর্থকরী হিসাবেও পারস্য ভাষা শিক্ষার জন্ত হিন্দু ও মুসলমান তুল্যভাবে পারস্য ভাষা শিক্ষা করিত। মুসলমান বালক ও তরুণদের উচ্চশিক্ষা লাভের প্রধান সোপান ছিল পারস্য ভাষা শিক্ষা। সেকালে বহু খ্যাতনামা সম্ভ্রান্ত ও অর্থশালী ব্যক্তি পারস্য ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। সাধক কবি রাম-প্রসাদ অল্পসময়ের মধ্যে একজন মৌলবীর নিকট পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া-ছিলেন তাহার সে পরিচয় তদ্রচিত কাব্যেই পাইতেছি। কবি ভারতচন্দ্র গুণাকর ও পারস্য ভাষাভিজ্ঞ সুপণ্ডিত কবি ছিলেন। আমরা কালিকাবাবুর লিখিত বিবরণী হইতে একটি নূতন তথ্য পাইতেছি, তাহা হইতেছে—রামপ্রসাদ সেন কোম্পানীর অধীনে কার্য্য করিতেন, এ সংবাদটি নূতন। পাদটিকায় দেখিতে পাই তিনি এই তথ্যটি 'বঙ্গবাসী' হইতে প্রকাশিত রামপ্রসাদের জীবনী হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, এ বিষয়ের যুক্তিসহ কোন প্রমাণ আমরা পাই নাই। তবে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও একথার উল্লেখ করিয়াছেন।

১৩২০ সালে কলিকাতা নগরীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে শাস্ত্রী মহাশয়

* Alivardi and His Times, Page 239-240 By Kalikinkar Datta M.A., Ph.D. (Cal.) Published By Calcutta University.

তাঁহার অভিভাষণে প্রসঙ্গক্রমে রামপ্রসাদের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন—"কবিবর রামপ্রসাদ কলিকাতার কোন সওদাগরের বাড়ী চাকরী করিতেন। সুতরাং তাঁহাকে হিসাব রাখিতে হইত। তিনি কিন্তু হিসাবের খাতার চারি পাশে কালী-বিষয়ক গান লিখিয়া রাখিতেন। একদিন সওদাগর জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। তাই তিনি অতি দুঃখে লিখিয়াছিলেন :

যখন ধন উপার্জ্জন করেছিলাম দেশবিদেশে,
তখন ভাই বন্ধু দারাসুত, সবাই ছিল আমার বশে।
এখন ধন উপার্জ্জন নাই, আমায় দেখে সবাই রোষে।

রামপ্রসাদের কালীবিষয়ক কবিতাগুলি বড়ই মিষ্টি লাগে। ভিখারীরা যখন দ্বিপ্রহর বেলায় রামপ্রসাদী সুরে কালীবিষয়ক গান করে, তখন দারুণ গ্রীষ্মেও শরীর জুড়াইয়া যায়। রামপ্রসাদের পর কলিকাতার সাহিত্য যেন চুপচাপ হইয়া যায়।"

তবে একথা সত্য যে পিতৃবিয়োগের পর রামপ্রসাদকে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। কলিকাতা আসিয়া তাঁহার ভগ্নীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন কি তাঁহার মনিবের বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন তাহা কেহ সঠিকভাবে বলিতে পারেন না। তবে তিনি যে অল্পদিনের মধ্যেই একটি মুহুরী পদ পাইয়াছিলেন এবং সেই মনিব বাড়ীতেই বাস করিতেন, সে বিষয়ে সকলেই একমত।

কোন্ জমিদারের অধীনে কাজ করিতেন, তাহাও কেহ সঠিক্ বলিতে পারেন না। কেহ বলেন, ভূকৈলাসের রাজবাড়ীতে, কেহ বা বলেন গরাণহাটার দুর্গাচরণ মিত্রের বাড়ীতে তাঁহার চাকরী হইয়াছিল। আবার এ কথাও প্রচলিত আছে যে বাগবাজারের মদনগোপাল বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান গোকুল মিত্র রামপ্রসাদের মনিব ছিলেন। যাঁহার নিকটই হউক, সেই মহাপ্রাণ ব্যক্তির মহত্ত্ব প্রভাবেই তাঁহার জীবনে আদ্যাশক্তি ভগবতীর সেবা ও সাধনায় মননিবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। এ বিষয়ে পূর্ব্বেও আলোচনা করিয়াছি।

কলিকাতাতে আসিয়া এক ধনী ব্যক্তির গৃহে মুহুরীর কর্ম্ম পাইলেন। রামপ্রসাদ জমা খরচের হিসাব রাখিতেন। কিন্তু এ কার্য্য তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি প্রতিদিন কার্য্য শেষ করিয়া, খাতার যে যে স্থান খালি পাইতেন, সেই সেই স্থানে দেবতাদের নাম এবং স্বরচিত সঙ্গীত লিখিয়া রাখিতেন। একদা উল্লিখিত ধনী ব্যক্তির কার্য্যাধ্যক্ষ কার্য্যালয়ে আগমন পূর্ব্বক রামপ্রসাদ

কর্ত্তৃক লিখিত হিসাবের খাতা দেখিলেন। দেখিয়া রামপ্রসাদের পর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করিলেন। ইহাতেও তাঁহার ক্রোধ শান্তি হইল না। তিনি কর্ত্তার নিকটে গিয়া সবিশেষ বলিয়া, রামপ্রসাদকে কার্য্যচ্যুত করিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। ধনী ব্যক্তি খাতাখানি দেখিলেন, এবং এক একটি করিয়া যেমন সঙ্গীতগুলি পড়িতে লাগিলেন, রামপ্রসাদের ধর্ম্মভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া. তিনি আনন্দলাভ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিম্নোদ্ধৃত গানটি তাহার নয়ন গোচর হইল :

আমায় দেও মা তবিলদারী······

এই পদ্যটি পাঠ করিয়া গৃহস্বামী একেবারে মোহিত হইলেন। ইহার অপূর্ব্বভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি স্থির করিলেন যে, রামপ্রাদ সামান্ত ব্যক্তি নহেন এবং সামান্ত মুহুরীগিরি তাঁহার কার্য্য নহে। তিনি বিশ্বেশ্বরীর প্রকৃত কিঙ্কর। তাঁহার সেবায় জীবন যাপন করাই তাঁহার প্রকৃত কার্য্য। গৃহস্বামী যেমন ধর্ম্মপ্রবণ, তেমনি বদান্ত ছিলেন। তিনি রামপ্রসাদকে ডাকাইয়া বলিলেন --"পার্থিব প্রভুর কার্য্যে তোমার অমূল্য জীবন নষ্ট করা উচিত নহে। তুমি যে ব্রহ্মময়ীর পদ-রত্ন লাভের জন্ত ব্যগ্র হইয়াছ, যাহাতে তাহা প্রাপ্ত হও, সেই কার্য্য কর; তোমার ধর্ম্মপথে আমি কণ্টকস্বরূপ হইব না। তুমি মুহুরিগিরি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ কর, এবং তোমার অবশিষ্ট জীবন পরমাত্মার চিন্তায় অতিবাহিত কর। সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্ত তোমাকে অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে না। তুমি যতদিন জীবিত থাকিবে, আমি তোমাকে প্রতিমাসে ৩০্ টাকা করিয়া দিব।*

রামপ্রসাদ প্রসন্নমনে এইভাবে চাকরী হইতে অব্যাহতি পাইয়া, তাঁহার বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলেন এবং রামপ্রসাদ সেদিন হইতে মাতৃসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [কার্ত্তিক, সন ১৩০২] কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন—২৬-২৭ পৃঃ। আমরা প্রথম অধ্যায়ে এই বিষয়টি বলিয়াছি। বলা বাহুল্য যে প্রসাদ সম্বন্ধে এই কাহিনীটি সর্ব্বত্র প্রচলিত।

পাঁচ

ডুব দে মন কালী বলে।

হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে॥

রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না মেলে।

তুমি দম সামর্থে এক ডুবে যাও কুলকুণ্ডলিনীর মূলে॥—রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদ প্রফুল্ল মনে বাস-পল্লী কুমারহট্ট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাতৃ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। জীবিকা-অর্জ্জনের বিষম দায় হইতে মুক্তি লাভ করিয়া দিবানিশি শ্যামা-মায়ের নাম-সাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন। সংসারের ভাবনা ভাবেন না—অন্য কোন চিন্তা তাঁহার নাই, আপনার মনে মায়ের অর্চ্চনা করেন এবং সঙ্গীতের পর সঙ্গীত রচনা করেন। শ্যামা-মা যেন আপনি আসিয়া কবিত্বের পবিত্র-সঙ্গীত ধারায় তাঁহাকে অভিভূত করেন। শক্তি-সাধনা ও সঙ্গীত রচনায় পরমানন্দে তাঁহার দিন কাটে, সুরের সুরধুনী বহিয়া যায় তাঁহার মধুর কণ্ঠে। নূতন সুরসৃষ্টি হইল মায়ের কৃপায়, ভক্ত সাধকের সেই মধুর সুরধারা আজও বহিয়া চলিয়াছে গঙ্গার স্রোতোধারার মত দিকে-দিকে শ্যামা মায়ের মহিমা প্রচার করিতে করিতে; 'সরস্বতী তাঁহার মুখাগ্রে অবস্থিত করিতেন। তিনি ইচ্ছা করিবামাত্র তাঁহার মুখ হইতে সদ্ভাবপূর্ণ রসময়ী পদাবলী বহির্গত হইত। রামপ্রসাদ ছিলেন তান্ত্রিক। এজন্য তন্ত্র-মতাবলম্বীদের মত 'পঞ্চমুণ্ডী' আসন প্রস্তুত করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বাড়ীর নিকটে একটি বিবিধ তরুলতাগুল্মশোভিত নির্জ্জন স্থানে পঞ্চবটির স্নিগ্ধ শীতল ছায়ায় পঞ্চমুণ্ডী আসনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তন্ত্রের বিধানানুসারে পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রস্তুত করিতে হইলে দুইটি চণ্ডালের মুণ্ড, একটি শৃগালের মুণ্ড, একটি বানরের মুণ্ড এবং একটি সর্পের মুণ্ড দ্বারা পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রস্তুত হয়। এই পঞ্চমুণ্ডের আসনে বসিয়া জপ করিলে মন্ত্র সিদ্ধি হয়। দীর্ঘ প্রস্থে চারিবর্গ হস্ত পরিমিত স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া পূর্ব্বদিকে অশ্বত্থ, উত্তরে বিল্ব, পশ্চিমে বট, দক্ষিণে আমলকী এবং অগ্নিকোণে অশোক বৃক্ষ রোপণ করিতে হয়। ঐ স্থানের চারিদিকে রক্তজবার ফুলের বেড়া দিয়া তাহার পার্শ্বে মাধবীলতা কিংবা কৃষ্ণা অপরাজিতার বেষ্টনী দিতে হয়। এই পঞ্চবটীর ছায়ায় তন্ত্রোক্ত মতে পঞ্চমুণ্ডীর আসনের ব্যবস্থা করিয়া সাধক প্রসাদ মহা-শক্তির সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

যোগাসনে বসিবার সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে। তন্ত্র মধ্যে সাধকের আসন সিদ্ধির কথা আছে। এই আচার শাস্ত্রবিধি সম্মত স্বাধ্যায়, দেবতা পূজা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটিকে যোগাঙ্গ বলা হয়। এই অষ্টবিধ সাধন দ্বারা চিত্তের চাঞ্চল্য বা বিক্ষেপ ভাব দুরীভূত হয় এবং চিত্ত একাগ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। চাঞ্চল্য রহিত হইয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থিতিকে 'আসন' বলা হয়। যোগশাস্ত্রে চতুরশীতি লক্ষ আসনের কথা আছে। শারীরিক চাঞ্চল্য দূর এবং অনন্তে চিত্ত সাধন করিলে, আসন সিদ্ধি হয়। আসন সিদ্ধি হইলে আর যোগীকে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব দ্বারা অবিভূত হইতে হয় না। যোগাভ্যাস কালে মেরুদণ্ডের মধ্যেই যোগীর স্নায়ু প্রবাহ নূতন প্রবাহে ও নূতন পথে চালিত হয়। সুতরাং মেরুদণ্ডকে যে ভাবে ও যে অবস্থায় স্থাপিত করিলে চিত্তের বিক্ষেপ বৃত্তি দুরীভূত হইতে পারে, তাহাই বিভিন্ন আসন প্রণালীতে প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধক সাধনার প্রথম অবস্থায় চিত্ত শুদ্ধির জন্য আসন অভ্যাস করেন। আসন সম্বন্ধে পাতঞ্জল দর্শনে আছে। ৪৬শ সূত্র। স্থিরসুখমাসনম্। তদ্‌যথা পদ্মাসনং, বীরাসনং, ভদ্রাসনং, স্বস্তিকং, দণ্ডাসনং, পর্য্যঙ্কং, সোপাশ্রয়ং, ক্রৌঞ্চনিদনং, হস্তিনিষদনং, উষ্ট্রনিষদনং, সমসংস্থানং, স্থির সুখং, যথাসুখঞ্চ ইত্যেবমাদীতি।

রামপ্রসাদ পঞ্চমুণ্ডী আসনের উপর যোগাসনে বসিলেন এবং তন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সাধক রামপ্রসাদ অন্তরে আনন্দময়ী জননীকে স্মরণ করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া মন স্থির করিলেন। বীর সাধক মধুর কণ্ঠে আবাহন করিতে লাগিলেন— সেই 'ঘনবরণী নবীনা নগনা লাজবিরহিতা ভুবনমোহিতা, দনুজদলনী ভয়ঙ্করা জগমনমোহিনী শ্যামা মাকে। ভক্ত করযোড়ে স্তব করিতে লাগিলেন :

জননি পদপঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে, কৃপাবলোকনে তারিণি।
তপন-তনয় ভয় চয় বারিণী॥
প্রণবরূপিণী সারা, কৃপানাথ দারা তারা, ভব পারাবার তরণী॥
সগুণা নির্গুণা স্থূলা, সূক্ষ্মা, মূলা, হীন মূলা, মূলাধার অমলকমলবাসিনী॥
আগম নিগমাতীতা অখিলমাতা অখিলপিতা, পুরুষ প্রকৃতিরূপিণী।
হংস রূপে সর্ব্বভূতে, বিহরসি শৈলসুতে, উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি, ত্রিধাকারিণী।
সুধাময় দুর্গানাম, কেবল কৈবল্যধাম, অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী।
তাপত্রয়ে সদা ভজে, হলাহল কূপে মজে, ভণে রামপ্রসাদ তার, বিষফল জানি।

কখন সাধক—বিমুক্তকেশী চতুর্ভুজা দিগম্বরী আনন্দময়ী দক্ষিণার প্রিয়পুত্র সহস্রকমলে মায়ের চরণকমল পূজা এবং সুষম্নামার্গে কুলকুণ্ডলিনীকে উদ্বোধন ও সহস্রারবিন্দে তাঁহাকে ধ্যান করিয়া প্রফুল্লচিত্তে গাহিয়াছেন :

দিবানিশি ভাবরে মন অন্তরে করালবদনা।
নীলকাদম্বিনী রূপ মায়ের এলোকেশী দিগ্বসনা॥
মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে মন জাননা।
সদা পদ্মবনে হংসীরূপে আনন্দরসে মগনা॥
আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা।
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন ব্রহ্মময়ী রূপ দেখনা॥
প্রসাদ বলে ভক্তের আশা পূরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে নির্ব্বাণে কি গুণ বল না॥

রামপ্রসাদ ছিলেন বীর সাধক। বীর সাধক যাঁহারা, তাঁহাদের বীরতন্ত্রের মত অনুসারে কৃষ্ণ কিংবা শুক্ল পক্ষের অষ্টমী অথবা চতুর্দ্দশী তিথিতে বীর সাধন করিবে। বীর সাধন কৃষ্ণপক্ষে প্রশস্ত। সাধক সার্দ্ধপ্রহর রাত্রি গত হইলে চিতাস্থানে একটি শব আনিয়া মন্ত্রধ্যানপরায়ণ হইয়া স্বীয় হিত সাধনার্থ কার্য্য করিবে। এই সাধনকালে সাধকের চিত্তের দৃঢ়তা এবং নির্ভীকতা আবশ্যক। এবং কোনরূপ ভয়েই ভীত হইবে না। কোনদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না। হাস্য পরিহাস ত্যাগ করিবে। সে সময়ে একাগ্রচিত্তে মন্ত্র জপ করিতে হইবে। বীরতন্ত্র মতে কলিকালে বীর ভাবনার সাধনাই প্রত্যক্ষ ফলদায়ক। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের ৪র্থ উল্লাস ১৯ শ্লোকে আছে—'বীরসাধনকর্ম্মাণি প্রত্যক্ষাণি কলৌযুগে।'

এক মঙ্গলবার কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর গভীর-নিশীথে ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে সিদ্ধাসনে বসিয়া বীরসাধক রামপ্রসাদ নির্ভয়চিত্তে ধ্যানমৌনভাবে শ্যামা-মায়ের আরাধনা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ঘোর অন্ধকারে সূক্ষ্মশক্তি অবলম্বন করিয়া ভৈরববেতালাদি আবির্ভূত হইয়া প্রসাদকে ভয় দেখাইতে লাগিল। সাধক নিশ্চল, তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানমগ্ন,—অন্তরে শ্যামা মায়ের নাম জপ করিতেছেন। এমন সময় বড় বড় সর্প, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সেখানে আসিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। সে সময়কার শবসাধনার ভয়াবহ দৃশ্য রামপ্রসাদ নিজে বর্ণনা করিয়াছেন—একটি সঙ্গীতে :—

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো,
জগদম্বার কোটাল।

জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি,
বব বম্ বাজাইয়া গাল ॥
ভক্তে ভয় দর্শাবারে, চতুষ্পার্শ্বে শূন্যাগারে,
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল।
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদলম্বিত জটাজাল ॥
শমন সমান দর্প, প্রথমেতে চলে সর্প,
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল।
ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে,
সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল ॥
যেজন সাধক বটে, তার কি আপদ ঘটে,
তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল।
মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর, করালবদনী জোর,
তুই জয়ী ইহ-পরকাল ॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দসাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
বিভীষিকা সে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ করে ঢাল ॥

শ্রীরামপ্রসাদ "মা মা" ডাকে বিভীষিকা দূর করিয়া দিলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে ভূত প্রেত খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল—তাহারা সাধককে ভয় দেখাইয়া বলিল—"সাধক, এখনও এই পথ ছাড়, যদি না ছাড় এখনই তোমাকে খাব"—বলিয়া তাহারা প্রসাদকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিল। এইভাবে ক্রমাগত ভীষণ সংগ্রাম চলিতে লাগিল। সাধকের ভ্রূক্ষেপ নাই। কত ভয়, কত বিভীষিকা, মাতৃভক্ত এক হুঙ্কারে সব উড়াইয়া দিলেন। তখন জগদম্বার অহেতুকী করুণা ঘনীভূত হইয়া সেখানে অবতীর্ণ হইল, অভয়া মা ভক্তের প্রাণে সাড়া দিয়া মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "বৎস, মাভৈঃ, আমি আসিয়াছি। এখনই আমাকে হৃদয়-পদ্মে ভাবনেত্রে দেখিতে পাইবে।" বলিতে বলিতে সাধকের হৃদয় মন উজ্জ্বল করিয়া ভ্রান্ত জীবের যত কিছু মোহান্ধকার দূর করিয়া তাঁহার হৃদয়-পদ্মে—

"আগম নিগমাতীতা খিলমাতাখিল-পিতা
প্রকৃতি পুরুষরূপিণী।"

রুদ্রযামল তন্ত্রে আছে :

'আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজামুখে।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য তস্মাদাগম উচ্যতে॥'

শিবের মুখ হইতে আগত, গিরিজামুখে গত এবং বাসুদেবের অভিমত, তাহার নাম **আগম**। যাহা দেবী কর্তৃক কথিত ও শিব কর্তৃক শ্রুত তাহাকে **নিগম** বলে। গণপতি এই আগম নিগম লিখিয়া সংসারে প্রচারের জন্য সিদ্ধপুরুষকে দিয়াছিলেন।

সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিলেন রামপ্রসাদ। তাঁহার হৃদয় ও মনে জাগিল আনন্দময়ীর অনন্ত কৃপাধারা। সাধকের জ্ঞাননেত্র খুলিয়া গেল, তাঁহার হৃদয়ের আনন্দে বিশ্বপ্রকৃতি প্রসন্নমূর্ত্তি ধারণ করিল। তখন তিনি দেখিলেন সাধনাশক্তির উন্মেষক পবিত্র দৈবশক্তির প্রস্রবণ—অন্ধকারের সার্ব্বভৌম ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সর্ব্বার্থসাধিকা সর্ব্বশক্তিময়ী মা জগদম্বা অপূর্ব্ব জ্যোতিঃতে চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া ভক্তকে বরাভয় করে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। ধন্য হইল সাধক! ধন্য হইল তাঁহার সাধনা। দেখা পাইলেন—অচিন্ত্য, অব্যক্ত, মহিমময়ী ভবদুঃখ-নিবারিণী মুক্তিপ্রদায়িনী শ্যামা মাকে। রামপ্রসাদের হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। বীর-সাধক মায়ের সাধনা দ্বারা ব্রহ্মময়ীর রূপের ধ্যান ও নাম জপিতে জপিতে ভয়ভীতি দূর করিয়া ধন্য হইলেন সিদ্ধিলাভ করিলেন। আদ্যাশক্তি মহামায়ার চরণ-শতদলে যোগযুক্ত চিত্ত হইয়া হৃদয় মধ্যে শাশ্বতী শান্তির অনুভূতিতে ধন্য হইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—শ্রীরামপ্রসাদ ভক্তিতন্ত্র মতে কালীর উপাসনা করিতেন। তান্ত্রিক-মতাবলম্বীদের মত পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রস্তুত করিয়া সুরাপানাদি সহকারে তিনি উপাসনা করিতেন। উপাসনা ও সঙ্গীতেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। তিনি সাধনার নিগূঢ়-তত্ত্ব অবগত হইয়া যথাশাস্ত্র পুরশ্চরণাদি অনুষ্ঠান দ্বারা মন্ত্রশক্তি প্রভাবে প্রতিমায় চৈতন্যময়ী দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিধিমত ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি বাহ্যবস্তু দ্বারা মায়ের অর্চ্চনা করিতেন। তখন তাঁহার হৃদয়ে জাগিত অপূর্ব্ব ভাব ও ভক্তি, অন্তর-অম্বরে বিকশিত হইত শ্যামামায়ের শ্যামা মূর্ত্তি! অন্তর-অম্বরে কি দেখিতেন? তাঁহার সেই অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে নিম্নোদ্ধৃত সাধন-সঙ্গীতে—প্রসাদ ভক্তিপ্রণত চিত্তে গাহিয়াছেন :

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর-অম্বরে।
নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে॥

মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধারাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি, তড়িৎ শোভা করে
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ চাতকের তৃষ্ণাভয় ঘুচিল সত্বরে।
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে॥
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম হবে না জঠরে।

প্রত্যেক ধর্ম্মের সাধকেরা এই প্রার্থনা করেন যেন পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে না হয়। মুক্তি ও নির্ব্বাণ হইতেছে প্রত্যেক সাধকের কামনা। রামপ্রসাদও সেই প্রার্থনাই করিয়াছিলেন। সিদ্ধ মহাপুরুষ রামপ্রসাদ মায়ের প্রসাদ লাভ করিয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার পর মহানন্দে গাহিয়াছিলেন:—

হৃৎ কমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী (শ্যামা)
মন পবনে দুলাইছে দিবস রজনী (ওমা)॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা।
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী॥
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়।
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি॥
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল।
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী॥

রামপ্রসাদ ছিলেন বীরাচার সাধক। 'তন্ত্রশাস্ত্রে আচার এক প্রসিদ্ধ বিষয়। আচার শব্দে সাধনার পদ্ধতি বা প্রণালী বুঝায়। এই তান্ত্রিক অনুশাসন অবলম্বন করে' সাধককে অগ্রসর হতে হয়। প্রত্যেক আচার বিভিন্ন, তাতে বিভিন্ন নির্দ্দেশ আছে, যা অবলম্বন করে' আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মস্ফুরণ করতে হয়। আচার কৌশলবিশেষ। কুশলী পুরুষ আচার অবলম্বনে সিদ্ধিলাভ করে। আচারে সিদ্ধি নিহিত।

সাধকের শক্তিও চিত্তবৃত্তির গঠনানুসারে আচার বিভিন্ন। পশু আচার প্রাথমিক সোপান। সাধারণ জীবের জন্য এই আচারের ব্যবস্থা। পশু শব্দের অর্থ জীব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এ আচার শাস্ত্রবিধি সম্মত স্বাধ্যায়, দেবতা পূজা, যম, নিয়ম, ধ্যান ইত্যাদি। এ বিধিমার্গসঙ্গত অনুষ্ঠানপ্রধান আচার। অষ্টাঙ্গ যোগের ধ্যান, ধারণাও এতে অন্তর্ভুক্ত। ধ্যান দেবতার। পশুমার্গে জীবভাব থেকে যায়। জীবত্ব-শিবত্বে আরূঢ় বা লয় হয় না। জীবভাবের সংস্কারাদির সাধন হয় মাত্র, কিন্তু তার লয় হয় না।

'বীরাচার পশ্বাচার হতে দু'টী বিষয়ে বিশেষভাবে পৃথক্—ভাবেও ব্যবহারে। বীরাচারী সাধক জীবভাবের স্থলে শিবভাব প্রতিষ্ঠায় তৎপর। এই আচার প্রাণের সংযম ও নিয়মনের মধ্য দিয়া গভীর ধ্যানের দ্বারা অন্তর্নিহিত শিবত্বকে জাগরণ করে এবং ব্যবহারে তার পরীক্ষাও প্রকাশ করে। বীরভাবের সাধক শিব-অভিন্ন ভাব নিয়ে সাধনা করে, এবং চিন্তা শক্তি দ্বারা তার ভিতর অসীম শক্তি আকর্ষণ করে। পশু শক্তির দ্বারা চালিত—বীর শক্তির চালক। যে শক্তি অন্তরে সুপ্ত, বীর সাধক তাকে জাগ্রত করে, শিব ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বস্তুতঃ স্থূলাধারকে সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্মশক্তির আয়ত্বাধীন করা বীর সাধকের লক্ষ্য। তার সাধনাই স্থূলে—শরীর ও প্রাণে—অধ্যাত্ম শক্তিসম্পাত করে। তার স্বাভাবিক রূপ বদলিয়ে দেওয়া এবং সেখানেই আনন্দানুভব করা। এ জন্য বীর সাধকের প্রাণশক্তির প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত আবশ্যক। প্রাণই স্থূলকে পূর্ণরূপে নিয়মন করে। বীর সাধক স্থূল আধারে ক্রিয়াশীল ব'লে তার স্থূল জগতের সিদ্ধিলাভ সুগম। এ সিদ্ধিতে বীর সাধক স্থূল বিশ্বে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে। অবশ্য সূক্ষ্মে প্রতিষ্ঠাই শেষ পর্য্যন্ত স্থূলের উপর দেয় প্রতিষ্ঠাও শক্তি। পশ্বাচারী সাধক শক্তিতে শরণাপন্ন, ভক্তির ভাবে প্রতিষ্ঠ। বীরাচারী সাধক শক্তিকে আয়ত্ত করে' শক্তিকে চালিত করে। তার কাজই প্রাণ-জগতের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বিস্তার ; প্রাণের ও হৃদয়ের পূর্ণ নিয়মন এবং বীরভাবে তাদের পরিচালন।'

তন্ত্রের বীরমার্গ প্রকৃতিকে নিয়মিত ক'রে', ভোগের বৃত্তিগুলিকে অধিকৃত করতে চেয়েছে, কিন্তু বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ এতে হয় না। বীরমার্গে নিম্নপ্রকৃতি বশীভূত হয় বটে. পরন্তু পূর্ণরূপে দিব্য হয়ে ওঠে না। বৃত্তির উপাদানে তখনও থাকে অনমনীয়তা, বাধা। বীরমার্গে প্রকৃতি তার বশ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে যদিও তাকে দমন করে' বীরসাধক প্রকৃতির হাত হ'তে মুক্তি পায়, তবুও সেখানে প্রকৃতির দ্রোহিতার সম্ভাবনা থেকে যায়। বীরমার্গেই সাধকের জীবনে শক্তি-উল্লসিত, প্রাচুর্য্য-ভোগ ও সূক্ষ্ম শক্তি বাড়ে। সাধক অতিমানব (Superman) হয়, তার ইচ্ছা হয় অপ্রতিহত, ক্রিয়াশক্তি অদমিত, জ্ঞানের আবরণ সূক্ষ্মলোক হতে হয় উন্মোচিত।

তন্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে, সব ব্যবহারে সঙ্কীর্ণভাবও গতিকে প্রসারীভূত ভাব ও গতিতে পরিণত করে দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠা করা। এ সম্ভব হয় শক্তির গভীর প্রেরণা হতে, যাতে বিরাটের অভ্যুদয়। জীবনের প্রতি সঞ্চারে আছে যে

বিরাটের ছন্দ, তাকে ধরেই এই সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলার ইঙ্গিত তন্ত্রে যেমন সুস্পষ্ট এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না।

রামপ্রসাদ তন্ত্রের ভাষায় 'সাম্যরস বিধানে' পরম শক্তির সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সিদ্ধ মহাপুরুষ রামপ্রসাদ তন্ত্রের সাধনা দ্বারা দিব্য বিজ্ঞান (Divine wisdom) লাভ করিয়াছিলেন।

তান্ত্রিক সাধনার উচ্চতম সোপানে পৌছিয়াছিলেন—সাধক শ্রেষ্ঠ শ্রীরামপ্রসাদ। তখন তিনি সর্ব্বভূতে অব্যয় বিভু-আত্মাকে ও সর্ব্বমূর্ত্ত সংযোগী আত্মাতে সকল ভূত দর্শন করিয়া পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা জগন্মাতা বিশ্বশক্তির অর্চ্চনা করিবার প্রকৃত অধিকারী হইয়াছিলেন।*

রামপ্রসাদের কালী সাধনাও সিদ্ধিলাভের বাণী চারিদিকে প্রচারিত হইতে লাগিল—তাঁহার সাধনার মধ্যে ছিল—হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত। সেই মধুর সঙ্গীত-গুলির বা প্রসাদ-পদাবলীর অসাধারণ কবিত্ব, অবিকৃত ধর্ম্মানুরাগ, ভক্তি-বিশ্বাস, কল্পনার বৈচিত্র্য এবং তান্ত্রিক সাধনার নিগূঢ়তত্ত্ব, ভাবের চমৎকারিত্ব ও শব্দ-সম্পদের সরলতায় মুগ্ধ হইতে হয়। প্রসাদী-সঙ্গীত বাঙ্গালীর গৌরব—বাঙ্গলার গৌরব।

কালী কালী বল রসনা।

কর পদধ্যান, নামামৃত পান, যদি হতে ত্রাণ, থাকে বাসনা।

* প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত 'তন্ত্রের আলো' গ্রন্থে ১৭১-৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মনরে শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ॥
পরিহরি ধনমদ, ভজ পদ কোকনদ।
কালেরে নৈরাশ কর, কথা শুনে কথা রাখ!—রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদ কবি, সাধক এবং সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সুললিত তত্ত্বসঙ্গীত দ্বারা মধুর মাতৃভাবে সাধনার প্রবর্ত্তক ছিলেন রামপ্রসাদ। অবশ্য মাতৃভাবে সাধনার ইতিহাস অতি প্রাচীন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁহার সঙ্গীতের তুলনা মিলে না। মাতৃনাম গানে তাহা ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে।

সত্য কথা বলিতে কি—"রামপ্রসাদের সঙ্গীত যেমন, এমন আর কোন জাতীয় ধর্ম্মসঙ্গীতে, সাধুজনের মৃত্যুর প্রতি নির্ভরভাব—সুন্দর, সরল অথচ সৎসাহসপূর্ণ ভাষায় পরিব্যক্ত হয় নাই। রামপ্রসাদের গীতে কেমন এক সাহসিকতা ও নির্ভীকতা আছে, যাহা কোন কবির ভাষায় দেখা যায় না। অথচ সঙ্গীতের পদগুলি নিতান্ত সরল। সেই সকল পদমধ্য হইতে যেন রামপ্রসাদের অন্তর্ব্বল প্রকাশিত হইতেছে। রামপ্রসাদের তেজ, ধর্ম্মের এবং সাধু জীবনের বল, দর্প ও সাহস প্রকাশিত হইতেছে। পদগুলি পড়িলে বোধ হয় যেন রামপ্রসাদ ত্রিসংসার পরাজয় করিয়াছেন! কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এত সাহস, এত বল, এরূপ সামান্য ভাষায় কেমন প্রকাশিত হইয়াছে! বাস্তবিক্ রামপ্রসাদের বাগ্‌ভঙ্গি অতি চমৎকার; আর কোন কবির ভাষায় সেরূপ ভঙ্গি দেখা যায় না। মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান কেন, দেবতাকেও। তিনি, সাধনবলে এবং সাধুজীবনের সৎসাহসে পূর্ণ হইয়া, সন্তান যেমন জনক জননীকে নিতান্ত আপনার ভাবিয়া বলগর্ব্বিত বাক্যে উক্তি করে, তেমনি বলদর্পে সম্বোধন করিয়াছেন। যে গীতগুলি এইপ্রকার ধর্ম্মসাহসে পরিপূর্ণ, সেই গীতগুলি গাহিবার সময় আমরা যেন তদ্রূপ সাহসে পূর্ণ হই এবং দেবতাগণকে একবার আপনার জ্ঞান করি, মৃত্যুকে হেয় জ্ঞান হয় এবং দেবভাব অন্তরে উদ্রিক্ত হইয়া পশুভাবকে প্রতাড়িত করিয়া দেয়। তখন মনে হয়, আমরা দেবতার সন্তান, স্বর্গধাম আমাদিগের স্বদেশ, মৃত্যু তাহার সোপান। তবে মৃত্যুকে ভয় কি? দেব অসি করে ধারণ

করিয়া, মাতৃসদৃশ সমগ্র পাপবৈরী ছেদন করিতে পারিলে শিবও আপন বক্ষ পাতিয়া আমাদিগকে স্থান দান করিবেন। তখন মনে মনে আর একবার আমরা শ্যামাপূজা করি, ধর্ম্ম অথবা শক্তির উপাসক হই। রামপ্রসাদের হৃদয়ভাব আমাদের হৃদয়ে সমুত্থিত হয়। তাঁহার হৃদয় অমনি আমাদের হৃদয়ে মিলিয়া যায়। তখন আমরা শিবশঙ্করীকে দেবভাবে পর্য্যবেক্ষণ করি। প্রসাদে ঐশ্বরিক শক্তি দেখি। তাঁহাতে মানবীয় দেবভাব দেখি। তাঁহার ধর্ম্মের জয় দেখি, তাঁহাতে স্ত্রীজনসুলভ ভক্তিভাবের প্রাবল্য দেখি। শান্তশীল শিবের হৃদয় হইতে কালীরূপী শক্তি উদ্ভূত দেখি। দেবশক্তি কেমন প্রবল তাহা ধর্ম্মের অসি ও পাপবৈরীগণের মুণ্ডমালায় প্রতীত করি। তখন হৃদয় কালীময় হয়, শক্তিতে পরিপূর্ণ হয়। ভাবের ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্মের শান্তিভাব, শক্তিরই পদতলে। যাহার ধর্ম্ম শক্তি আছে—সম্পদ, শান্তি ও সুখ তাহার পদতলে; একবার এইভাবে প্রমত্ত হই। রামপ্রসাদের মত আমরাও ত্রিভুবন জয় করি। ইহা কি দেবপূজা না ভক্তি ও ধর্ম্মশক্তিতে পরিপূর্ণ হওয়া।"*

প্রসাদী সঙ্গীত তাঁহার জীবিতকালে যেমন জনপ্রিয় ছিল এবং বাঙ্গালী সকলেরই আদরণীয় ছিল, এখনও তেমনি আছে। রামপ্রসাদের জীবন ছিল বিচিত্র। তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়াছিল মাতৃরূপিণী চিন্ময়ী আদ্যাশক্তির স্নেহের আহ্বান। তিনি জগজ্জননীকে মাতৃরূপেই সাধনা করিয়াছিলেন।

স্নেহময়ী জননীর আহ্বানে শিশু যেমন খেলাধূলা ফেলিয়া মায়ের কোলে মা মা বলিয়া ছুটিয়া আসে,—ভক্ত সাধক রামপ্রসাদও মায়ের আহ্বানে তেমনি করিয়া মায়ের কোলেই ছুটিয়া যাইতেন। জগজ্জননীই ছিল তাঁর মা। শিশু যেমন তাহার সমুদয় আদর ও আবদার মায়ের কাছেই করে, রামপ্রসাদও স্নেহময়ী শ্যামা মায়ের ডাকে সংসারে থাকিয়াও ছিলেন সংসারে অনাসক্ত। সন্ন্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগ করিলেন না,—সংসারে থাকিয়া গৃহী হইয়াও, সন্তানের পিতা হইয়াও বিষয়ানুরাগী হইলেন না। সাধন রাজ্যের উচ্চজগতে প্রতিষ্ঠিত যিনি, জগজ্জননীর চরণতলে যিনি দেহ, মন ও প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার সংসারে ত ভয় করিবার কিছু নাই! মাতৃভক্ত সন্তান. অভাব-অভি[illegible] ও সব বিষয়েই মাতার নিকট আব্দার করিতেন। অনাসক্ত সন্তানের আব্দার জননী পালন করিতেন—অতুলনীয় মাতৃস্নেহ বশে। রামপ্রসাদের সঙ্গীতে ছিল উদার বিশ্বজনীন ভাব—তাই তত্ত্বজ্ঞ কবি দৃঢ়তার সহিত গাহিয়াছিলেন—

* 'আর্য্যদর্শন' সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

'মা বিরাজে ঘরে ঘরে।

*　　　*　　　*

জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে।

*　　　*　　　*

ষড়দর্শনে দর্শন মেলে না,

আগম নিগম তন্ত্রসারে।

রামপ্রসাদ—সেই যে ব্রহ্মময়ী মা, তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন ভক্তিরসের রসিকরূপে। তাঁহার অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম-দৃষ্টি দ্বারা সকলের মধ্যেই দেখিতে পাইয়াছিলেন বিশ্বজননীর বিকাশ। তাই সর্ব্বব্রহ্মময় জগৎরূপে দেখিয়াছিলেন তাঁহার শ্যামা-মাকে! তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন গ্রহতারাময় অনন্ত গগনে, সূর্য্য-চন্দ্র গ্রহ তারার বিবিধ গতির মধ্যে—নিখিল জগতের ঋতুলীলার বৈচিত্র্য সৃষ্ট ও রূপের ক্রমবিকাশের অপরূপ প্রকাশে—রসের অভিব্যক্তি। এই জন্যই ভোগবতীর স্বতঃ উৎসারিত পবিত্র ধারার ন্যায় সাধক কবির হৃদয় হইতে গীত হইয়াছিল বিশ্বব্যাপিনী ব্রহ্মশক্তি কালিকার অনন্ত রূপের প্রকাশ। তিনি যে সর্ব্বত্র রহিয়াছেন! মাতৃরূপিণী জননী তাঁহার বিচিত্র অভিব্যক্তি দ্বারা—জনগন-মনকে বিশ্বপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। প্রসাদ ছিলেন অসাধারণ মাতৃভক্ত ও মাতৃনামের উপাসক।

রামপ্রসাদ সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। সে বিষয়ে পূর্ব্বেও বলিয়াছি। সংস্কৃত ও পারসী সাহিত্যের রসাস্বাদন করিয়া তিনি যেমন কাব্যানুরাগী হইয়াছিলেন, সেইরূপ উপনয়নের পর দীক্ষা গ্রহণের শেষে সম্পূর্ণ ভাবে আদ্যাশক্তি ভগবতীর উপর ছিলেন নির্ভরশীল এবং জগজ্জননীকে মাতৃরূপে দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন দ্বারা শান্তি লাভ করিতেন এবং মনে যখন যে ভাবের উদয় হইত সেই ভাবেই সঙ্গীত রচনা করিতেন।

সেকালের সামাজিক রীতিঅনুযায়ী অতি অল্প বয়সেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নিধিরাম, নিজ সহোদর ভ্রাতা বিশ্বনাথ, প্রভৃতি লইয়া ছিল তাঁহার সংসার। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার জননী জীবিতা ছিলেন কিনা এসম্বন্ধে আমরা অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারি নাই। অনেকের মতে জীবিতা ছিলেন না। সংসার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্যই তাঁহাকে কলিকাতা যাইতে হইয়াছিল, এবং তাহাতে তাঁহার জীবনে যে শুভক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

রামপ্রসাদের বয়স যখন ১৭।১৮ বৎসর সে সময়ে ভাজনঘাট নিবাসী লোকনাথ

রামগুপ্তের কন্যা যশোদা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, কেহ বলেন পত্নীর নাম ছিল সর্ব্বাণী। রামপ্রসাদের পত্নী অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন, স্বামীর আদর্শে তাঁহার চরিত্র গঠিত হইয়াছিল। একদিন এই মহীয়সী মহিলা স্বপ্নে দেখিলেন—যেন জগদম্বা বলিতেছেন—'তোমার স্বামীকে রামকৃষ্ণ মণ্ডপের সিদ্ধপীঠে সাধন করিতে বল, তাহা হইলে আমি দেখা দিব।' পত্নীর প্রতি মায়ের প্রত্যাদেশ হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার হৃদয় যেমন আনন্দিত হইল, তেমনি শ্যামা মায়ের প্রতি তাঁহার অভিমানও হইয়াছিল। সে অভিমানের কথা রামপ্রসাদ নিজ মুখেই প্রকাশ করিয়াছেন :

ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এতো বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে—বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি।
আমি তুয়া দাস দাস দাসী পুত্র হই॥

হালিসহরের শিবের গলিতে একটু পতিত জমি ছিল, লোকে তাহাকে রামকৃষ্ণ মণ্ডপ বলিত। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এই স্থানে লক্ষ বার বলি, কোটিবার হোম এবং কোটিবার মহাবিদ্যার নাম জপ হইয়াছিল। রামপ্রসাদ এই সিদ্ধপীঠে পঞ্চমুণ্ডী আসন স্থাপন করিয়া সাধন আরম্ভ করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ, স্বপ্নে তাঁহার পত্নী যে রামকৃষ্ণমণ্ডপ সাধন পীঠ বলিয়া তাঁহাকে সেখানে সাধন করিতে বলেন—তিনি সেখানে বসিয়াই সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

এই সাধ্বী পত্নী যশোদাদেবী রামপ্রসাদের বৃদ্ধ বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ের অবস্থা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করিতেছি। সেকালে হিন্দুদের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল চতুষ্পাঠি, বহু প্রসিদ্ধ সহর ও পল্লীগ্রামে টোল ও চতুষ্পাঠি বিদ্যমান ছিল। সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। বাঙ্গালা দেশের এ সমুদয় বিদ্যাপীঠ সমূহের খ্যাতি তখন ভারতবর্ষের নানা দেশে প্রচারিত ছিল। এসকল চতুষ্পাঠিতে যাঁহারা অধ্যাপনা করিতেন তাঁহারা সকলেই বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের বিদ্যার খ্যাতি, শিক্ষাদান রীতির সুনামের জন্য দ্রাবিড়, উৎকল, কাশী, ত্রিহুত

প্রভৃতি স্থান হইতেও বিদ্যার্থীরা আসিতেন। রামপ্রসাদ তাঁহার 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যে সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ অধ্যায়ে সেকালের চতুষ্পাঠির অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন:

কল্পতরু তুল্য ভূপ, আধিপত্য নানারূপ,
দীন নাহি সে দেশে জনেক॥
চৌদিকে চৌপাড়িময়, পাঠ চায় পড়ুয়াচয়,
দ্রাবিড় উৎকল কাশীবাসী।
কারোবা ত্রিহোত বাড়ী, বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি,
আগমন বিদ্যা অভিলাষী॥
দেবালয় ঠাঁই ঠাঁই, অতিথের সীমা নাই,
ব্রহ্মচারী যতি বানপ্রস্থ।
বেদবেত্তা আগমজ্ঞ, ভূত ভবিষ্যতে প্রাজ্ঞ,
স্বধর্ম্মেতে নৈষ্ঠিক সমস্ত॥
অযাচক লক্ষ লক্ষ, বাসনা সাযুজ্য মোক্ষ,
ভক্ষণ কেবল মাত্র বায়ু।
প্রচণ্ড প্রতাপ তর, জ্যোতির্ম্ময় কলেবর,
যোগবলে দীর্ঘ পরমায়ু॥
প্রাচীন পণ্ডিত বৈদ্য, ঔষধ প্রয়োগে সদ্যঃ,
ব্যাধিমুক্ত, কালেতে বিয়োগ।
ভূপতির আস্থা আছে, যাতায়াত নিত্য কাছে,
চিরবৃত্তি সুখে করে ভোগ॥ *

সেকালে পাঁচ বৎসর বয়স হইলেই বালকের হাতেখড়ি হইত এবং পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট বর্ণমালা শিক্ষা, ব্যাকরণ, সামান্য সাহিত্য, পত্র লেখন, অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া টোল ও চতুষ্পাঠিতে শিক্ষালাভ করিত। সেখানে ব্যাকরণ, ভট্টিকাব্যম্, রঘুবংশম্, কুমারসম্ভবম্ প্রভৃতি কাব্য পড়ান হইত। এ সমুদয় কাব্য ও ব্যাকরণ অধ্যয়ন শেষে অলঙ্কার, ন্যায়, দর্শন, বেদান্ত ও বেদ অধ্যয়নের রীতি ছিল।

রামপ্রসাদের সমকালে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যম সময় যে সমুদয় কবি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজকবি

* কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর রামপ্রসাদ সেন কৃত। বহুপণ্ডিত কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ সংশোধিত। ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত। ১২৬০ সাল ২০ চৈত্র।

ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন, রামেশ্বর (শিবায়ন প্রণেতা) বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

সংস্কৃত শিক্ষার প্রধানতম কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ। সেখানে বহু খ্যাতনামা নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহাদের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং পাণ্ডিত্য প্রভাবে তর্ক-বিতর্ক দ্বারা সেকালের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ প্রচুর আনন্দ ও শিক্ষালাভ করিতেন। জ্যোতির্ব্বিদ ও জ্যোতিষীগণ পঞ্জিকা প্রণয়ন করিতেন। তাঁহাদের প্রচারিত পঞ্জিকা অনুসারেই বাঙ্গালাদেশে পূজা, পাল-পার্ব্বণ প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট দিন তারিখ অনুযায়ী সম্পন্ন হইত। নদীয়ার রাজা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তৎকালে সর্ব্ববিষয়েই একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁহারই সভার সভাকবি ছিলেন, তাঁহার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাঁহার সভায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের নাম এখনও অমর হইয়া রহিয়াছে।—এখানে কয়েক জনের নাম করিলাম:—হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্ব্বভৌম, প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, রামানন্দ বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, বীরেশ্বর ন্যায়-পঞ্চানন এবং গুপ্তিপাড়া নিবাসী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ছিলেন সভা কবি। সেকালে রামরুদ্র বিদ্যানিধি ছিলেন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ, তৎপ্রণীত 'সারসংগ্রহ' একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। নরসুন্দরকুলের গৌরব গোপাল ভাঁড়ও একজন সদস্য ছিলেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এ সমুদয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বিবিধ শাস্ত্রালাপে এবং সময় সময় তাঁহাদের সঙ্গে কাব্যালোচনা ও নিজে কাব্যরচনায় মননিবেশ করিতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তীকালে গ্রাম্য বালকদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল একমাত্র পাঠশালা। প্রত্যেক গ্রামেই সে সময়ে এক একটি পাঠশালা থাকিত। সেখানে সাধারণতঃ পঠন, পাঠন, অঙ্ক, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান সম্বন্ধে মোটামুটি শিক্ষা দেওয়া হইত। প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন খুবই বেশী ছিল। গ্রাম্য গুরুমহাশয়েরাই সাধারণতঃ পাঠশালা পরিচালনা করিতেন।

পারস্য ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষার প্রচলন ছিল অত্যধিক। কেননা হিন্দু-মুসলমান সকলেরই নবাব সরকারে কাজ করিবার জন্য উক্ত ভাষা শিক্ষা করিতে হইত। সেকালের নবাব ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ পারস্য ভাষা ও সাহিত্য প্রচারে পরম উৎসাহদাতা ছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দীর দরবারে অনেক সুপণ্ডিত পারস্যভাষাভিজ্ঞ হিন্দু ও মুসলমান শোভাবর্দ্ধন করিতেন। পাটনা সেকালে আরব্য ও পারস্য ভাষা শিক্ষার একটি শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র ছিল।

ইমামবারা ও মসজিদের মধ্যে পারস্য ও আরব্য ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

সকলেই সেকালে পারস্যভাষা অধ্যয়ন করিতেন। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পল্লীতে মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল এবং সেখানে সুশিক্ষিত মৌলবিরা শিক্ষা দান করিতেন। ইংরাজী শিক্ষার দিকে সেকালের লোকের তাদৃশ আগ্রহ ছিল না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যযুগে স্ত্রী-শিক্ষা একেবারে অপ্রচলিত ছিল না। রামপ্রসাদ ও তৎ প্রণীত 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থেও তাহার বর্ণনা আছে। মালিনী বিদ্যার রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া সুন্দরকে বলিতেছেন :

রূপবান্ বট বাবু গুণ কত ঘটে।
বিচারে জিনিতে পার তবে জানি বটে॥

মালিনী সুন্দরের নিকট হাটের হিসাব দিতে গিয়া বলিয়াছে—

খুজ্‌রার লেখা জোখা বড়ই উৎপাত।
স্নান করি খাই দাই লেখা দিব শেষে॥
উচক্ সময় এত মনে নাহি আসে॥

সে সময়ে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ছিল সীমাবদ্ধ। গৃহ-প্রাঙ্গণের ও সর্ব্বত্র তাঁহাদের গতিবিধ ছিলনা। স্বামীর ও গুরুজনের কর্তৃত্বাধীনেই তাহাদের থাকিতে হইত। এ বিষয়ে কবি ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের কবিতা ও কাব্য হইতে বিশদভাবে জানিতে পারি। সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীজাতির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। তাহারা হাটে-বাজারে পথে-ঘাটে স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করিত। পুরাঙ্গনারা তীর্থযাত্রা উপলক্ষে, গঙ্গাস্নানে, গঙ্গাসাগর স্নান, গয়া, পুরী, জগন্নাথ, কালীঘাটে, কালীদর্শনে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে গুরুজন বা অভিভাবক সহ যাতয়াত করিতেন,—বর্ত্তমান যুগের নারী-প্রগতির দিনে এখনও তাহার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। পল্লী-নারীদের অবস্থা ও গমনাগমন পূর্ব্ববৎই আছে। সেকালের অনেক পুরমহিলা রাজনীতিক্ষেত্রেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। রাণীভবানীর রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাব ও কর্ম্মক্ষমতা সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার জমীদারী-শাসনদক্ষতা, প্রজাপালন, বদান্যতা ও ন্যায়পরায়ণতার কথা, শিক্ষা বিস্তার প্রয়াস, দরিদ্রনারায়ণ সেবার জন্য কাশী প্রভৃতি পুণ্যতীর্থ স্থানে ছত্র-প্রতিষ্ঠা তাঁহাকে বরণীয়া করিয়া রাখিয়াছে। রাণীভবানীর নির্ম্মিত মঠ ও মন্দির, দেবালয় প্রতিষ্ঠা, সেকালের স্থাপত্য-নিদর্শনের গৌরবস্বরূপ হইয়া এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

বর্দ্ধমানের মহারাণী মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের জননী বিষ্ণুকুমারীর তেজস্বিতা, স্মরণীয়। কবি ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁহার সম্বন্ধে কোনরূপ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলে পর, মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের মাতা মহারাণী

বিষ্ণুকুমারী তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহার দুইজন রাজপুত সৈন্যাধ্যক্ষ আলমচন্দ্র ও ক্ষেমচন্দ্রকে প্রেরণ করেন এবং এইরূপ আদেশ দিয়াছিলেন, যে নরেন্দ্রনারায়ণের শিশু পুত্রকে বধ করিবে, নতুবা রাত্রিতেই ভুরস্যুট পরগণা অধিকার করিবে। মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর আদেশে রাজপুত সেনাপতিদ্বয় সেই রাত্রিতেই দুর্গ ভবানীর ও নরেন্দ্রনারায়ণের আবাস ভূমি পেঁড়ো অধিকার করে। মহারাণী বিষ্ণুকুমারী পরদিন নিজে পেঁড়োতে আসেন এবং পুর-মহিলাদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং নরনারায়ণের প্রতিষ্ঠাপিত এবং পূজিত কুলদেবতার পূজার সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থা করিয়া বর্দ্ধমান প্রত্যাগমন করেন। রঙপুর জেলার জয়দুর্গা চৌধুরাণী দেবীসিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। সে সময়ে মুসলমান মহিলাদের মধ্যেও নবাব সুজাউদ্দীনের বেগম জেবউন্নিসা—ছিলেন বিদুষী ও বুদ্ধিমতী এবং বিচক্ষণ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞা, তিনি রাজ্য শাসন ব্যাপারে সময় সময় স্বামীকে সাহায্য করিতেন। ওড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা মুর্শিদকুলির বেগম দুর্দ্দানা বেগম তাঁহার স্বামীকে নবাব আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সুবাদার আলিবর্দ্দীর বেগম প্রকৃতপক্ষেই ছিলেন একজন বীরাঙ্গনা। তিনি স্বামীর সহিত স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছেন। বর্গীর অত্যাচারে ও নিপীড়নে বাংলাদেশ যখন সন্ত্রস্ত ছিল, তখন আলিবর্দ্দীর বেগম বর্গীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইভাবে দেখিতে পাই যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নারীজাতির নির্ভীকতা ও সাহসিকতা সমাজে সমাদৃত হইত।

হিন্দু সমাজে নারীর ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত। নারী ছিলেন নেত্রী, গৃহকর্ত্রী। বাঙ্গালী মহিলার সরলতা, পতিব্রতা, সতীত্বের জন্য গৃহে গৃহে শান্তি বিরাজ করিত। অতিথি-সেবায়, গুরুজনের সেবা ও শুশ্রূষাকার্য্য ; অন্নপূর্ণারূপিণী বধূ ভগ্নী, ও মাতারা সর্ব্বজনপ্রিয়া ছিলেন। অসচ্চরিত্র ও কলহপরায়ণা নারী সমাজে নিন্দনীয়া এবং ঘৃণিতা হইতেন। সে সময়ে হিন্দুসমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রচলন ছিল। নারী আপনাকে স্বামী-সেবায় বা স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেই যে শুধু দৃষ্টি করিতেন তাহা নহে। পরিবারে প্রত্যেকের প্রতিই তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সেবা ও নিষ্ঠা সমাজে আদর্শস্থানীয়া ছিল। রামপ্রসাদের বিরচিত বিদ্যাসুন্দরে দেখিতে পাই বিদ্যা সহ সুন্দর যখন স্বদেশ গমন করিতেছেন, তখন বীরসিংহ রাজার রাণী কন্যাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা হইতে সে সময়কার

সমাজ-চিত্র অতি সুন্দর রূপে পাইতেছি। রাণী কন্যাকে কোলে করিয়া বলিতেছেন :

কন্যা কোলে করি রাণী, কহিলা গদগদ বাণী,
তুমি রাজলক্ষ্মী ছিলা মাতা।
ছাড়িয়া চলিলা দেশ, বুঝি পরমায়ুঃ শেষ,
ভূপতিকে বিমুখ বিধাতা॥
পতিপ্রাণা শাস্ত্রে উক্তি, তোমা বুঝিবার শক্তি;
ভূমণ্ডলে আর কারু নাই।
কিন্তু ব্যবহার আছে, তেঁই গো তোমার কাছে,
গোটা দুই কথা বাছা কই॥
পুরে গুরু লোক যত, তাহা সবাকার মত,
হবে রবে মানায়ে সেবায়।
দয়া পরিজন প্রতি, যার থাকে গুণবতী,
সেই সে গৃহিণী পদ পায়॥
জনক জননী পদ, ধরি করে সগদগদ,
কহে বিদ্যা সজল নয়নে।
এই তুমি জন্মদাতা, নিকটে বটেন মাতা,
দুঃখিনীরে যেন থাকে মনে॥

উপরোক্ত কয়েকটি চরণ হইতে সেকালে সমাজে নবপরিণীতা নারীদের কিরূপ ভাবে চলিতে হইত তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বালিকাদের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল পুষ্প-চয়ন, পূজার আয়োজন, ব্রতকথা। ব্রত নিয়ম পালন, আলপনা, সঙ্গীত প্রভৃতি শিক্ষা। স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলনের জন্য গ্রামে বালিকাবিদ্যালয়ের সংখ্যা অতি কমই ছিল। তাহারা রূপকথা, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের গল্প শুনিত, মঙ্গলকাব্য শুনিত, রান্নাবান্না ও গৃহস্থালীর কার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিত। দুপুরের সময় অতিথি অভ্যাগত, পিতা মাতা ও গুরু-জনের আহারও বিশ্রামের ব্যবস্থা হইলে পর—তাহারা আহার করিতে বসিত, গল্প করিত এবং অবসর মত টাকু ও চরকা লইয়া সূতা কাটিত। দীন দরিদ্র, মধ্য-বিত্তাবস্থাপন্ন ও ধনী মহিলারা সকলেই চরকা কাটিতেন। সঙ্গীত শিক্ষা করিতেন।

সে সময়ে সতীদাহ বা সহমরণ প্রথা বিদ্যমান যেমন ছিল, তেমনি গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জ্জন প্রথাও প্রচলিত ছিল। মৃত পতির চিতায় স্ত্রীকে দগ্ধ করার প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র এই নিদারুণ শোকাবহ প্রথা

বিদ্যমান ছিল। হালিসহর ও কুমারহট্ট পল্লীতে বহু সতীদাহ হইয়াছিল। ইংরাজ আমলে এই নিন্দিত-প্রথা দূরীভূত হইয়াছে।

বাল্যবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা প্রভৃতি নিন্দনীয় প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল। স্ত্রীজাতির বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে তাহাদের কোন মতামত গৃহীত হইত না। পিতামাতা ও অভিভাবকগণের ইচ্ছানুসারেই তাহা সম্পন্ন হইত। বহু বিবাহ, কন্যাপণ, প্রভৃতি বিবিধ দোষাবহ প্রথা সমাজে প্রচলিত থাকিয়া বহু অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছিল। নারীদের অসমঞ্জস বিবাহ হইত—কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে বারো তেরো বৎসরের বালক ও কিশোরের সঙ্গে তরুণী, প্রৌঢ়া এমন কি বৃদ্ধা মহিলাদেরও বিবাহ হইত। বকুলতলায় সুন্দর-দর্শনে নগরনাগরীদের বিলাপ উক্তির দ্বারা ও রামপ্রসাদ অতি সুকৌশলে সামাজিক চিত্র বর্ণনা করিয়াছেন।

রামপ্রসাদ নিজগ্রামে থাকিয়াই সাধন ভজন করিতেন। তাঁহার গৃহের অনতিদূরে এখনও পতিতপাবনী গঙ্গা বহিয়া যাইতেছেন। তিনি প্রতিদিন রাত্রিশেষে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্নান করিতে যাইতেন এবং আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া ভক্তিভরে উচ্চকণ্ঠে বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার জগজ্জননী শ্যামা-মাকে ডাকিতেন। মায়ের নিকটই আবদার করিতেন, কাঁদিতেন, হাসিতেন মনের অন্তর-বেদনা জ্ঞাপন করিতেন। নিত্য যে সকল গান রচনা করিতেন পরদিন তাহা গঙ্গাগর্ভে দণ্ডায়মান হইয়া গাহিতেন। যাহারা ঘাটে স্নান করিতে যাইত, তাহারা মুগ্ধ হইয়া তাহা শুনিত, নৌকারোহণে যাহারা স্থানান্তরে যাইত, তাহারা ক্ষণকালের জন্য ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া অতৃপ্ত কর্ণে সেই অপূর্ব্ব মধুর স্বরলহরীযুক্ত সঙ্গীত শুনিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিত।

রামপ্রসাদের সঙ্গীতের এমনই মোহিনী শক্তি ছিল যে লোকের মুখে মুখে বঙ্গের প্রায় পল্লী, নগরে সুদূর পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীহট্ট ও আসাম অঞ্চলে ও বন্দরে তাহা প্রসারিত হইতে লাগিল। তখন মুদ্রাযন্ত্রের সুবিধা ছিলনা, দেশ দেশান্তরে যাতায়াতের সুযোগ ও সুবিধা ছিল না তবু তাহা প্রচারিত হইত।

প্রতিভার এমনি আকর্ষণ, কবিত্বের এমনি মাধুর্য্য ও অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগের এরূপ সংক্রামকতা যে, চারিদিকেই প্রসাদী-সঙ্গীতের প্রচার হইতে লাগিল। লোকে গান শুনিয়াই মুগ্ধ হইত, গান সহজেই লোকের প্রাণে লাগিত, কাজেই চারিদিক হইতেই লোক আসিয়া ঐ সকল সঙ্গীত শুনিত, শিখিত ও গান করিয়া বেড়াইত। এই ভাবে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র তাঁহার গানের প্রচার হইতে লাগিল। ধন্য হইতে লাগিল কুমারহট্ট-হালিসহর।

"কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ" প্রবন্ধ রচয়িতা দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন:—

আদিম কাল হইতে কবিতা অতি পবিত্র ভাব ধারণ করিয়া আসিতেছে প্রাচীন কালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই কবিতায় পরমেশ্বরের স্তব করিতেন। প্রাচীন সময়ে অন্যান্য দেশেও উহার সম্মান ছিল। ইস্‌রেল বংশীয় দাউদ এবং অন্যান্য মহাত্মারা এই কবিতায় ভগবানকে ডাকিতেন। গ্রীস প্রভৃতি দেশের ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের আরাধনাকালে এই কবিতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। যে বাক্যে সদ্ভাব প্রকাশ করে, তাহাই সকলের আদরণীয়। প্রথম হইতেই বাক্য অতি পবিত্র ভাব ধারণ করিয়াছে। এই জন্য সরস্বতী বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া পূজিতা। তাঁহার বাক্য সঙ্গীতে পরিণত হইয়া সমুদয় সংসার পবিত্র করিয়াছে। কিন্তু মানুষ কি পামর। এমন দেবতার সে অনাদর করিয়া পবিত্র সংগীতকে অপবিত্রভাবে পরিণত করিল। মা সরস্বতীকে অন্তর হইতে দূর করিয়া দিল।

রামপ্রসাদ তাঁহার পদাবলীতে এবং সংকীর্ত্তনে কবিতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। তিনি পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণনে এবং তাঁহার উপাসনা সম্বন্ধে যে, সকল উচ্চ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায়। ঈশ্বরের আকার নাই। উপাসকের হিতের জন্য তাঁহার বিবিধরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। রামপ্রসাদও এই ভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—কালী-কীর্ত্তনে।

আকার তোমার নাই অক্ষয় আকার, গুণ ভেদে গুণময়ী হয়েছ সাকার।
বেদবাক্য নিরাকার জ্ঞান কৈবল্য, সেকথা না ভালবাসি বুদ্ধির তারল্য॥

তিনি স্বীয় সঙ্গীতে প্রতিমাযোগে ঈশ্বরের আরাধনার ও আবশ্যকতা দেখাইয়াছেন :

কালীরূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে,
ওরে সেই সে দুরন্তমন, না ডুবে চরণ তলে।
যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে।
ওরে না পূরে অঞ্জলি চন্দন জবা বিল্বদান।
সে চরণে কাজ কিবা, মিছা শ্রম রাত্রি দিবা।
ওরে কালী মূর্ত্তি যথা তথা ইচ্ছা সুখে নাহি চলে॥

স্থানান্তরে

দিবানিশি ভাবরে মন, অন্তরে করালবদনা।
নীলকাদম্বিনী রূপ মায়ের এলোকেশী দিগ্বসনা।

প্রসাদ বলে ভক্তের আশা, পূরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে নির্ব্বাণে কি গুণ বলনা॥

যোগপরায়ণ মানব তত্ত্বজ্ঞানের শেষ মাথায় পদার্পণ করিলে যে ঐশ্বরিক ভাবে পুলকিত হয়, সাধকবর রামপ্রসাদও সেই বেদান্ত প্রতিপাদ্য পবিত্র ভাবের সাধনা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার একটি সঙ্গীত এই :

মন কেন তোমার এই ভ্রম গেলনা।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ লেনা॥

ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি তা জাননা।
মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে মন করতে যাও তার উপাসনা॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয় দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁয়, আলোচাল আর বুট ভিজানা।
জগৎকে পালিতেছেন যে মা, সাদরে তাও কি জান না।
তুই কি করিবি বলি দিয়ে, মেষ মহিষ আর ছাগলছানা।
প্রসাদ বলে ভক্তি মন্ত্র, কেবল রে তাঁর উপাসনা।
তুমি লোক দেখানো করবে পূজা, মা ত আমার ঘুষ খাবে না।

আর একটি সঙ্গীতে তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাব :—

এমন দিন কি হবে তারা।

যবে তারা তারা তারা বলে, দুনয়নে পড়বে ধারা॥
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে টুটে।
তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা বলে হব সারা॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥
শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে।
ওরে আঁখি মেলি দেখি মাকে, তিমিরে তিমিরহারা॥

পাঠান্তর—ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির ভরা॥

এইরূপে রামপ্রসাদ নিরাকারভাবে তারার উপাসনা করিয়া, ঈশ্বরের সহিত একভাবাপন্ন হওয়া, আত্মার চরম অবস্থা বলিয়া, স্থির করিতেন। তিনি বলিয়াছেন :

গিয়েছিনা যেতে আছি আর কি পাবে ভবে।
আছে কাঠের মুরাদ থাড়া মাত্র গণনাতে সবে॥
প্রসাদ বলে আমি গেলে তুমিও সে হবে।
তথন আমি ভাল কি তুমি ভাল, তুমিই বিচারিবে॥

কোন কোন ভক্তকে দেখা যায় যে, তাঁহারা কোন সময়ে তাঁহাদের ইষ্টদেবতার ভাবে বিভোর হইয়া রোদন করিতেছেন এবং ভাবাবেশে নাচিয়া গাইয়া দেশকে মাতাইয়া তুলিতেছেন, আবার আর এক সময়ে নীতির পথত্যাগ করিয়াছেন। রামপ্রসাদ জানিতেন যে মনের কুপ্রবৃত্তিগুলির দমন করা আবশ্যক। এই জন্য তিনি বলিতেন :

রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় কর জয়।
মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা, দূর ছাই করে হাঁক॥

চরিত্র পবিত্র না হইলে যে, দেবতাকে বশীভূত করা যায় না, তাহা তিনি বলিয়াছেন :

ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার।
রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে, আম্র কি কথন ফলে॥

মনের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করা যে অতি অন্যায়, রামপ্রসাদ কবিতাতে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি শাক্ত ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার সময় শাক্ত ও বৈষ্ণবে ঘোরতর বিবাদ হইত। এই বিসংবাদে তিনি বলিতেন :

কাল বরণ ব্রজের জীবন ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী বাঁশী ত্যজে করে অসি॥

* * * *

প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে, কালো রূপে মেশামিশি।
ওরে একে পাঁচ, পাঁচেই এক, মন করোনাক দ্বেষাদ্বেষি॥

তাঁহার কালী-কীর্ত্তনেও, কৃষ্ণ ও কালীকে এক ভাবে দেখিয়াছেন—যথা :

একবার ভুলায়েছ ব্রজাঙ্গনা বাজাইয়া বেণু।
এবে নিজে ব্রজাঙ্গনা বনে রাখো ধেনু॥

রামপ্রসাদ শাক্ত হইয়াও তাঁহার মায়ের সমক্ষে পশুবলি দান সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

মেষ ছাগল মহিষাদি, কাজ কিরে তোর বলিদানে,
তুমি জয়কালী, জয়কালী বলো, বলি দেও ষড়রিপুগণে।

আর একটি সঙ্গীতেও তিনি সেকথাই বলিয়াছেন।

জগৎকে পালিছেন যে মা, সাদরে তাও কি জাননা।
তবে কেমনে দিতে চাস্ বলি, মেষ মহিষ আর ছাগলছানা।

*   *   *   *

যাঁহার বাক্যে এবং কার্য্যে সামঞ্জস্য আছে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত শ্রদ্ধার পাত্র। রামপ্রসাদের তাহাই ছিল। তিনি উচ্চ ধর্ম্মভাব সমূহের দ্বারা যেমন তাঁহার কবিতাগুলিকে উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যকলাপও তাঁহার জীবনকে সেই প্রকার প্রভাবিত করিয়াছে। সংসারের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া কি প্রকারে জীবনযাপন করা উচিত, রামপ্রসাদ তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। পরিজনকে প্রতিপালন করিবার জন্য তাঁহাকে বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, কিন্তু ইহার মধ্যে তিনি ব্রহ্মময়ীকে ভুলিলেন না। তিনি যেমন তাঁহার খাতায় টাকা জমা করিতে লাগিলেন, সেইরূপ ধর্ম্ম ধন সঞ্চয় করিবার আবশ্যকতাও তাঁহার মনোমধ্যে জাগরূক রহিল। যেমন তাঁহার হিসাবের মধ্যে টাকা জমা হইল, অমনি তাঁহার ইষ্টদেবতার নামরূপ ধন জমা হইতে লাগিল। খাতার প্রতি পৃষ্ঠায়, জগৎ-মাতার নিকট প্রার্থনা এবং তাঁহার মহিমা প্রকাশক বাক্য লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। এই স্বর্গীয় ভাবটি হৃদয়ঙ্গম করিলে, আমাদের হীনতা বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারি। আমরা যখন বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি, তখন কেবল পার্থিব প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধন জন্য ব্যগ্র হই, ভুলিয়াও একবার ঈশ্বরকে স্মরণ করি না। বিষয়কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের ভাব উপলব্ধি করা যে, প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য, রামপ্রসাদ আমাদের মনে তাহা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন।

রামপ্রসাদ ধার্ম্মিক গৃহী ছিলেন। অতিথিসেবা গৃহস্থের যে, একটি প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য, রামপ্রসাদ ইহা প্রকৃষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার গৃহ একটি অতিথিশালারূপে পরিণত হইয়াছিল। তৎ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কালীমাতার প্রণামীস্বরূপ যাহা পাইতেন, তাহা দ্বারা অতিথিসৎকার উত্তমরূপে সমাধা হইত না। তিনি তাঁহার মাসিক বৃত্তি হইতেও কিছু কিছু এই মহাব্রতে ব্যয় করিতেন। নিজের ক্লেশকে ক্লেশই জ্ঞান করিতেন না। অপরকে সুখী করা তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল।

সাংসারিক ক্লেশকে কি প্রকারে তুচ্ছ করা উচিত, রামপ্রসাদ তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার কোন কোন পদে অর্থাভাব জন্য কাতর উক্তি দেখা যায় বটে, কিন্তু কোন কোন সময়ে সাতিশয় কষ্টে পড়িয়াই যে, তিনি এবম্প্রকার ভাব

প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। তিনি ক্লেশকে তুচ্ছ বোধ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন :

আমি কি দুঃখেরে ডরাই
আমার দুঃখে দুঃখে জন্ম গেল,
আর কত দুঃখ দেও দেখি, চাই।

* * *

দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে,
আমি করি দুঃখের বড়াই॥

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ধনে ধনী, সেই যথার্থ ধনী, রামপ্রসাদ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি এক সময় মনকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন :

ও মন তুই কাঙ্গালি কিসে।
ও তুই জানিস্‌নেরে সর্ব্বনেশে॥

* * *

ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি,
দেখিস্‌নারে বসে বসে॥

ধার্ম্মিক ব্যক্তির যে, বিষয়-সুখের আশা করা উচিত নহে, তাহা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। যথা :

মন করোনা সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা॥

* * *

হরিষে বিষাদ আছে মন,
করোনা এ কথায় গোঁসা।
ওরে সুখেই দুঃখ, দুঃখেই সুখ,
ডাকের কথা আছে ভাষা॥

ধর্ম্মের উচ্চ মঞ্চে উঠিয়া, রামপ্রসাদ স্থির করিয়াছিলেন যে প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তির পক্ষে বিষয় সুখভোগ করা একেবারে অসম্ভব। তিনি তাঁহার একটি পদে বলিয়াছেন :

তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল্ রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা, সেটাও নিত্য নয়॥

রামপ্রসাদ উদার-প্রকৃতির লোক ছিলেন। লোকের দুঃখ কষ্ট দেখিলে তাহা দূর করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। তাঁহার মাসিক বৃত্তি হইতেও

দীন দরিদ্র জনগণের দুঃখ-ক্লেশ দূর করিবার জন্য অর্থ ব্যয় করিতেন। কালী ঠাকুরাণীর প্রণামী কিংবা কবির ভক্তগণ প্রণামী স্বরূপ যাহা দান করিত কিংবা তাঁহার রচিত কালী-কীর্ত্তন, শ্যামা-সঙ্গীত প্রভৃতি গাহিয়া যে সকল গায়কগণ উপার্জ্জন করিত, তাঁহারাও প্রসাদকে যাহা দিতেন তাহাই কবি দাতব্যে ব্যয় করিতেন। প্রকৃত ভক্ত চির দিনই ভগবানের উপর নির্ভর করেন। মুক্তিই তাঁহাদের থাকে কাম্য, সংসারের ধনসম্পত্তি নহে।

রামপ্রসাদের পত্নী যশোদা দেবীও সত্যপরায়ণা ধার্ম্মিক মহিলা ছিলেন। স্বামীর দানে ধ্যানে ও অতিথি-সেবায় উৎসাহশীলাই ছিলেন। রামপ্রসাদও তাই বলিয়াছেন :

ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে।

ইহা হইতেই রামপ্রসাদের ঘরণী যে ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। অর্থ যে অনর্থ তাহা বুঝিয়াই রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন :

তারা আমি নই আটাসে ছেলে।
আমি ভয় করিনে চোখ রাঙ্গালে॥
সম্পদ আমার ও রাঙ্গা পদ, শিব ধরে যা হৃদ্‌কমলে।
ওমা আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে॥
শিবের দলিল সৈ মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার করব নালিশ নায়েব আগে ডিগ্রি লব এক সওয়ালে॥

*　　　　*　　　　*

আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত করে লবে কোলে॥

মায়ের কোলই যে ভক্তকবির একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, সে কি অভয়পদে প্রাণ না সঁপিয়া না চিনিতে কাজের গোড়া লাভে মূলে সব খোয়াইতে পারে? সে কি কখনও সম্ভব?

রামপ্রসাদের বিরচিত সঙ্গীতগুলির অধিকাংশই মিশ্ররাগে গান করা যায়। আমরা সচরাচর এই সুরকে 'রামপ্রসাদী সুর' বলিয়া থাকি। রামপ্রসাদের পূর্ব্বে এই সুর প্রচলিত ছিল, কি রামপ্রসাদ এই সুরের প্রবর্ত্তন করেন, সে সমস্যার মীমাংসা করা সহজ নহে। কেননা রামপ্রসাদের প্রবর্ত্তিত সুরের পূর্ব্বে এই রামপ্রসাদী সুরের প্রচার সম্বন্ধে কোনও কথা জানিতে পারা যায় না। তবে বিভিন্ন গায়কেরা রামপ্রসাদের গানে বিভিন্ন সুরের সংযোজন করিয়া গাহিলেও রামপ্রসাদ যে সুরে তাঁহার রচিত গান গাইতেন তেমন সুমিষ্ট শোনায়

না। রামপ্রসাদী সুরে যে ভক্তির নির্ঝর-ধারা প্রবাহিত হইয়া চিত্তকে আনন্দে ও ভক্তিতে উদ্বেলিত করিয়া তোলে সঙ্গীত-বিশারদ সুরজ্ঞগণের ইচ্ছামত বসানো সুরে তাহার বিকাশ হয় না—রামপ্রসাদের সুরধারা যেন উপলখণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত নির্ঝর ধারার ন্যায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অবরুদ্ধ হয়।

রামপ্রসাদ ছিলেন ভক্তসাধক। সঙ্গীতের দ্বারাই তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আপনার মানস-পুষ্পে শান্তির নীড় রচনা করিয়া আপনার সৃষ্ট জগতেই বাস করিতে চাহিতেন।

তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন তাঁহার আরাধ্যা শ্যামা-মায়ের নিকট।

শাস্ত্রে আছে দান ও সত্য এই দুইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা যাঁহাদের আছে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ। মহাভারতে আছে—দান ও সত্য এবং অহিংসাও প্রিয়কার্য্য, ইহাদের মধ্যে কার্য্যের গুরুতা হেতু শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠ হয়। কোন দান যোগ হইতে সত্য, বিশিষ্ট হয়; এবং সত্যবাক্য হইতেও কোন দান, বিশেষ রূপ গণ্য হয়। এইরূপ কোন প্রিয় বাক্য হইতে অহিংসা এবং কোন অহিংসা হইতে প্রিয় কার্য্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিশ্চিত হয়। এইরূপ কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া ইহাদিগের গুরু লাঘব নিশ্চিত হইয়া থাকে।

হে বৎস! কর্ম্মানুযায়ী জীব এইরূপ গতিতে বিচরণ করে এবং দ্বিজ অর্থাৎ জ্ঞানীব্যক্তি নিত্যব্রহ্মেতে আত্মাকে বিলীন করেন।"

রামপ্রসাদ ছিলেন এই শ্রেণীর সাধক। তিনি শক্তি-ভক্তি-পরায়ণ সাধক ছিলেন, তিনি দান, ধ্যান, নিষ্ঠা এবং সত্যবাদিতা দ্বারা নিত্য ব্রহ্মময়ীর চরণে সমুদয় সমর্পণ করিয়া আত্মাকে বিলীন করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের আত্মসমর্পণের একটি সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, ইহাতে তাঁহার মন প্রাণ আত্মতত্ত্ব দূরে থাক্, দেহ ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত মায়ের চরণে সমর্পণ করিয়াছিলেন:

এ শরীরে কাজ কিরে ভাই! (যদি) দক্ষিণার প্রেমে না গলে।
ওরে, এ রসনার ধিক্ ধিক্ কালীনাম নাই বলে॥
কালীরূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে,
ওরে, সেই সে দুরন্ত মন, না ডুবে চরণতলে॥
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কাজ,
ওরে সুধাময় নাম শুনে, চক্ষু না ভাসালে জলে॥
যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে?
ওরে, না পূরে অঞ্জলি, চন্দন জবা আর বিল্বদলে॥

সে চরণে কাজ কিবা, মিছা ভ্রম রাত্রি দিবা

ওরে, কালী মূর্ত্তি যথা তথা, ইচ্ছা সুখে নাহি চলে ॥

ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার ?

রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে, আম কি কখন ফলে ॥

মহাতপা সাধক ছিলেন রামপ্রসাদ। নিজের ভক্তি ও সাধনার দ্বারাই তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

কাজ কি মা সামান্য ধনে।

ও কে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে ॥

সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে।

যদি দেও মা আমায় অভয় চরণ, রাখি হৃদিপদ্মাসনে।

—রামপ্রসাদ

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১৭১০ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রাজ্য লাভ বিধাতার বিধান। কেনন না তাঁহার পিতৃব্য রামগোপাল অতিশয় তাম্রকূট প্রিয় ছিলেন, তাহারই ফলে রাজ্যলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ নবাব দরবার হইতে রামগোপালকে রাজ সম্মান প্রদান করিবার জন্য উপস্থিত হইতে আহ্বান করা হইয়াছিল। রামগোপাল মুর্শিদাবাদ যথা সময়েই গিয়াছিলেন এবং নির্দ্ধারিত দিবসে রাজবেশ পরিধান করিয়া নবাব দরবারে যাইতেছিলেন, কিন্তু রাজপথের উভয় পার্শ্বের দোকানে সুগন্ধ তাম্রকূটের গন্ধ আঘ্রাণে তাঁহার মনে তামাকু সেবন-স্পৃহা জাগিয়া উঠিল, তিনি দরবারের কথা ভুলিয়া গিয়া পাল্‌কী হইতে নামিয়া এক দোকানে বসিলেন। দোকানের ভৃত্যেরা আলবোলায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট তামাকু প্রস্তুত করিয়া দিল। সময় চলিয়া গেল, ওদিকে নবাব-দরবারে, নবদ্বীপ-রাজাকে সনন্দ প্রদান করিবার আহ্বান আসিল। কিন্তু রামগোপাল অনুপস্থিত, কাজেই কৌশলে পিতৃব্যের অনুপস্থিতির সুযোগে নবদ্বীপের রাজা হইলেন এবং কৃষ্ণচন্দ্র নবাব দরবার হইতে সনন্দ লাভ করিলেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে ভাবেই রাজ্যলাভ করুন না কেন এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে যত বড় কূটনীতিই অবলম্বন করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকুন না—কেন, সে বিষয়ের আলোচনা আমরা এখানে করিব না। কৃষ্ণচন্দ্র কি রাজ্য শাসনে ও সংরক্ষণে, কি পাণ্ডিত্যে ও রাষ্ট্রিয়-ক্ষেত্রে যেইরূপ প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার

পরিচয় দিয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। সিংহাসনারোহণের সময় তাঁহার ঋণ দশ লক্ষ টাকার উপর ছিল, ইহা ছাড়া বার লক্ষ টাকা নজরাণার জন্ম মহাবৎজঙ্গ তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিলেন, তিনি এই সমস্ত ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার রাজ্য অনেক পরিমাণে বাড়াইয়াছিলেন। তিনি "শিবনিবাসকে' ইন্দ্রপুরীর মত সাজাইয়াছিলেন, তাঁহার উৎসাহে স্থপতি-বিদ্যার উন্নতি হইয়াছিল, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কোন কোন দেবমন্দির এখনও বঙ্গদেশের গৌরব।...কৃষ্ণচন্দ্র নিজে সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন ; তাঁহার সভায় কেবল কবিগণের আদর ছিল এমত নহে, দর্শন, ন্যায়, স্মৃতি, ধর্ম্ম—এসমস্ত বিষয়ই সেখানে চর্চ্চা হইত। তিনি এই সর্ব্বশাস্ত্র চর্চ্চাতেই নিজে যোগ দিতেন, এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিতগণের গুণের আদর করিতে জানিতেন, তিনি হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি ও রামগোপাল সার্ব্বভৌমের সঙ্গে ন্যায়ের কূট বিচার করিতে পারিতেন ; প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, গোপাল ন্যায়ালঙ্কার ও রামানন্দ বাচস্পতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশাস্ত্রের তত্ত্ব নিরূপণ করিতেন এবং শিবরাম বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ ও বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চাননের সঙ্গে ষড়দর্শন সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে সমর্থ ছিলেন ; বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তাঁহার সভায় রাজকবি ছিলেন ; কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সঙ্গে সংস্কৃত কবিতা প্রণয়ন করিতেন।

একবার এইরূপ মহাপণ্ডিত ও বিদ্যানুরাগী কৃষ্ণচন্দ্র যখন কুমারহট্ট অবস্থান করিতেছিলেন সে সময়ে একদিন সন্ধ্যাবেলায় রামপ্রসাদের গান শুনিতে পান, প্রসাদ আপন মনে গাহিতেছিলেন :

এখন সন্ধ্যা-বেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল।

সঙ্গীতের শেষ অংশটুকু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শুনিতে পাইয়া তাঁহার সঙ্গী ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন : হাঁরে তুই বলতে পারিস্ এ গান কোথা হতে আসছে ? কে গাইছে ?

ভৃত্য উত্তর করিল : মহারাজ, এখানে নিকটেই শিবেরগলি নামক স্থানে শ্রীরামপ্রসাদ সেনের বাড়ী। তিনি সাধক, সর্ব্বদাই শ্যামা-মাকে ডাকেন। এবং শ্যামা সঙ্গীত গান করেন। তিনিই গাইছেন।

মহারাজ বলিলেন—চল্, আমাকে বাড়ী দেখিয়ে দিবি, আমি এখনই সেই সাধকের সঙ্গে দেখা করবো।

ভৃত্য তখনই মহারাজকে সঙ্গে করিয়া প্রসাদগৃহে চলিল।

এইখানে আমরা কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কথা একটু বলিব। অষ্টাদশ শতাব্দীর আদি ও মধ্য যুগে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন অসাধারণ মনীষী ব্যক্তি।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই খ্যাতিসম্পন্ন মহারাজ নিজে যেমন বিদ্বান ছিলেন তেমনি নানাশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ও পারদর্শিতা ছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে বাঙ্গালাসাহিত্য সঙ্গীত ও বিবিধ সামাজিক সংস্কার হয়। সাহিত্যের প্রতি তাঁহার যেমন ছিল সহানুভূতি, তেমনি ছিল দান। কবি ও পণ্ডিতগণের প্রতি মাসিক বৃত্তি দান ছিল তাঁহার নিয়মিত ব্যবস্থা। রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার ন্যায় তাঁহার সভাতেও বহু জ্ঞানী, পণ্ডিত ও কবিরা সভার শোভা বর্দ্ধন করিতেন। নবদ্বীপের কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার, ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শান্তিপুরের রামমোহন গোস্বামী, গুপ্তিপাড়ার বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও কবি ভারতচন্দ্র প্রভৃতি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার সভার গৌরব ছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কুমারহট্ট পল্লীতে জমিদারি কার্য্যাদির তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত একটি কাছারি বাড়ী ছিল, অতি সুন্দর কারুকার্য্য খচিত বহু দেব-মন্দিরও তিনি সেখানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—আর ছিল সেখানে তাঁহার একটি মনোরম সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদ। সময়ে সময়ে গঙ্গাতীরবর্ত্তী এই সুরম্য পল্লীতে আসিয়া তিনি বাস করিতেন। একদিন তিনি শান্ত সুন্দর মৌন সন্ধ্যায় একজন ভৃত্য মাত্র সঙ্গে লইয়া গঙ্গা তীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এমন সময় শুনিতে পাইলেন—কোথা হইতে যেন সুমধুর ভক্তিমাখা একান্ত নির্ভরের সঙ্গীত-ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে।

'এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল্।' এ গান শুনিয়া তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল সে কথা প্রথমেই বলিয়াছি।

কৃষ্ণচন্দ্র, প্রসাদ-গৃহে আসিলেন। দেখিলেন—পঞ্চমুণ্ডী আসনের উপর বসিয়া ভক্ত সাধক এক মনে তাঁহার আরাধ্যা দেবী জগন্মাতাকে সম্বোধন করিয়া গাহিতেছেন :—

মন কেন মায়ে চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া॥

সেদিন আকাশে হাসিতেছিল পূর্ণচন্দ্র। জ্যোৎস্না পুলকিত সন্ধ্যা। আকাশে তারা হাসিতেছে। শ্যামল-তরুলতাগুল্ম-শোভিত প্রকৃতি আনন্দে নিমগ্ন। সাধক একবার আকাশের দিকে চাহিতেছেন—যেন তিনি অনন্ত নীলাম্বরের গায়ে দেখিতে পাইতেছেন অনন্ত ঐশ্বর্য্যময়ী জগজ্জননী শ্যামা মাকে। সাধক যেন এই পৃথিবীতে আর নাই। তখন তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভ করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া আছেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র পঞ্চমুণ্ডী আসনের পশ্চাতে অশ্বত্থ তরুমূলে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া সাধককে দেখিতেছিলেন। আসনের পশ্চাতে অশ্বত্থ বৃক্ষ তাহার সবুজ পত্রাবলীর সহায়ে চন্দ্রের অমিয় ধারা পান করিতেছে। অশ্বত্থ তরুশাখা দুলিতেছে—যেন ভক্ত সাধককে পরম স্নেহভরে বীজন করিতেছে! মুগ্ধ-বিস্মিত হইলেন মহারাজা।

একটি মহাপুরুষের অনুসন্ধান পাইয়া মহারাজার ইচ্ছা হইল যে তিনি সাধকের সহিত একটু আলাপ ও আলোচনা করেন। তিনি কিন্তু সাধকের ধ্যান ভঙ্গ করিতে সাহসী হইলেন না। কিছুক্ষণ পরে সাধকের ধ্যান ভঙ্গ হইল, তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন তখন মহারাজা করজোড়ে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

রামপ্রসাদ অপরিচিত একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা—করিলেন: মহাশয়, আপনি কে, এখানে কেন? আপনার কি আমার নিকট কিছু বলিবার আছে?

কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন—আপনার মধুময় সঙ্গীত শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমার ইচ্ছা আমি আপনার সঙ্গে কালীতত্ত্ব বিষয়ে আলাপ করি। তারপর উভয়ে আসিলেন চণ্ডীমণ্ডপে—ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে তন্ত্র ও কালীতত্ত্ববিষয়ে নানারূপ আলোচনা হইল। রামপ্রসাদ গানের পর গান গাহিয়া মহারাজাকে মুগ্ধ করিয়া দিলেন।

সেদিন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আত্মপরিচয় দিলেন না। ছদ্মবেশে যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনি ছদ্মবেশেই চলিয়া গেলেন।

সঙ্গীতই ছিল প্রসাদের শ্রেষ্ঠ সাধনা। সঙ্গীতই ছিল তাঁর ভক্তিযোগ—ভক্তি প্রকাশের পথ ও ধ্যান। সঙ্গীতের এই সম্মোহন সুরে তিনি জগন্মাতাকে আবাহন করিতেন, তাহাতেই ভক্তবৎসলা শ্যামা-মায়ের আসন টলিত—শরণাগতজনে কৃপাবলোকন করিতেন। দিনরাত কালী নামে বিভোর হইয়া গাহিতেন :—

'কালী বল রসনারে।'

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত রামপ্রসাদের সাক্ষাৎ হইবার কাহিনীটি অন্যরূপও শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, একদা নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নৌকারোহণে কলিকাতা অভিমুখে যাইবার সময় কিংবা সেখান হইতে ফিরিবার পথে হালিসহরের গঙ্গার তীরে, যে স্থান হইতে রামপ্রসাদের বাড়ী অনতিদূরে অবস্থিত ছিল, সেই স্নানের ঘাটের নিকট উপস্থিত হইয়া রামপ্রসাদের কণ্ঠোচ্চারিত শ্যামা-সঙ্গীত শুনিতে পাইলেন, যতক্ষণ রামপ্রসাদ

গান গাহিতে লাগিলেন, ততক্ষণ তাঁহার তরণী গঙ্গাবক্ষে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। রামপ্রসাদ ঘাটে উঠিয়া তীরে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে বসিলে মহারাজ তাঁহার নৌকা ঘাটে ভিড়াইলেন এবং রামপ্রসাদের পূজাহ্নিক শেষ হইলে, তিনি তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিলেন। এই আলাপ-পরিচয়ের ফলে, মহারাজের সহিত রামপ্রসাদের বন্ধুত্ব হইল এবং মহারাজের উৎসাহে তাঁহার কবিত্বশক্তি অধিকতর বিকাশ লাভ করিতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের অধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সাক্ষাতের যে কাহিনীটি বলিয়াছি, আমাদের মনে হয় তাহাই স্বাভাবিক। সেই সাক্ষাতের পর এবং আলাপ ও আলোচনার পর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে নিজ প্রাসাদে গমন করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে একজন ভৃত্য আসিয়া রামপ্রসাদের হাতে একখানি চিঠি দিল। চিঠিখানা পড়িয়া প্রসাদের ললাট একটু কুঞ্চিত হইল। তিনি উহা আসনের বাহিরে রাখিয়া দিয়া আকুল প্রাণে শ্যামা-মাকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন—'মা, মা, একি আমার প্রলোভন! গতরাত্রে কৃষ্ণনগরের মহারাজা এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে মাসিক বৃত্তি দিতে চান এবং আমাকে সভায় যাইতে বলেন। কেবল কি তাই, মহারাজা আমাকে নিষ্কর জমিও দিয়াছেন। না মা, আমি এই দান গ্রহণ করিতে পারিব না। তোমাকে ছাড়িয়া সংসারের ঐশ্বর্য্যে ডুবিয়া—না না তাহা কখনই হইবে না। এযে রাজার বড় ভুল! তখনই তাঁহার কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল—মনের বাসনা-ত্যাগের বাণী। প্রসাদ গাহিলেন:

> কাজ কি মা সামান্য ধনে।
> ও কে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে॥
> সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে।
> যদি দাও মা আমায় অভয় চরণ, রাখি হৃদি পদ্মাসনে॥

ঐশ্বর্য্য, পদগৌরব কিছুতেই সাধকের মন বিচলিত হইল না। তিনি রাজার ভৃত্যকে বলিলেন—তুমি রাজাকে বলিও, আমি রাজসভায় বসিবার অযোগ্য এবং মাসিক বৃত্তি গ্রহণ করিতে অসমর্থ। রাজার ভৃত্য এই সংবাদ লইয়া ফিরিয়া গেল।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার এই উপাখ্যান শুনিয়া দুঃখিত হইলেন না—এবং তিনি সর্ব্বত্যাগী সাধকের পক্ষে এই প্রত্যাখ্যান বিশেষ কিছু বিস্ময়ের কথা নয় মনে করিয়া সহৃদয় মহারাজা যাহাতে রামপ্রসাদ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে

ধ্যান-ধারণায় লিপ্ত থাকিতে পারেন, সেজন্য তাঁহাকে একশত বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। এই দান রামপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি এই যে তেতুলিয়ায় ১৫ বিঘা এবং মেদিনীপুর জেলায় ১০০ শত বিঘা জমি ছিল। এই দানের সনন্দের প্রতিলিপি আমরা প্রকাশ করিলাম।

রামপ্রসাদের সহিত সাক্ষাতের পর হইতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রীতি ও সৌহার্দ্দ অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তখন :—

চারিসমাজের পতি— কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
দ্বিজরাজ কেশরী রাঢ়ায়।
নদীয়া প্রভৃতি চারিসমাজের পতি
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধ শান্তমতি।

এই প্রসঙ্গে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"বৈদ্যবংশোদ্ভব রামপ্রসাদ সেন হালিসহরের অন্তঃপাতি কুমারহট্ট গ্রামে ১৭১৮—১৭২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামরাম সেন। রামরাম সেনের দুই বিবাহ; প্রথমপক্ষে নিধিরাম নামক পুত্র ও দ্বিতীয় পক্ষে অম্বিকা ও ভবানী নাম্নী কন্যাদ্বয় এবং রামপ্রসাদ ও বিশ্বনাথ নামক পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন; কলিকাতা-নিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের সঙ্গে রামপ্রসাদের দ্বিতীয়া ভগ্নী ভবানীর পরিণয় হয়—এই ভগ্নীর দুই পুত্র জগন্নাথ ও কৃপারামের নাম কবি উল্লেখ করিয়াছেন। রামপ্রসাদের রামদুলাল ও রামমোহন নামে দুই পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নামে দুই কন্যা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কবি তাঁহার পিতামহ রামেশ্বর এবং বংশের আদি পুরুষ কৃত্তিবাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; আমরা তাঁহার কাব্যে আরও জানিতে পাই যে, রামপ্রসসাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ধনাঢ্য ও প্রসিদ্ধ ছিলেন; —'শিশুকালে পিতা মৈল, মাগো রাজ্য নিল চোরে' বলিয়া কবি আক্ষেপ করিয়াছেন। কবির প্রিয়পুত্র রামদুলালের বংশ লুপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় পুত্র রামমোহনের পৌত্র ও কবির বৃদ্ধ প্রপৌত্র ৺কালীপদ সেন ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেন।"

"রামপ্রসাদ সেন কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজার সমসাময়িক। এই গুণজ্ঞ রাজা ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে রামপ্রসাদকে ১০০/ বিঘা ভূমি নিষ্কর দান করেন, তাহাতে 'গর আবাদী জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিতে রহ। যে বৎসর ইংরাজগণ পলাশীক্ষেত্রে জাতীয় সৌভাগ্যধ্বজা প্রথম

উত্থিত করেন; তাহার এক বৎসর পরে এই দানপত্র লিখিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র অনেক সময় কুমারহট্ট আসিতেন, তিনি রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়াছিলেন ও তাঁহাকে রাজসভায় আনিতে আগ্রহ দেখাইতেন। কিন্তু বিষয়-নিস্পৃহ কবি স্বীয় পল্লীতে বসিয়া শ্যামা-সঙ্গীত গানে নিজে মুগ্ধ থাকিতেন ও আর সকলকে মুগ্ধ করিতেন। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধ পালন করেন নাই।"

রামপ্রসাদের যশঃ কাব্য রচনার জন্য নহে, তিনি গান রচনা করিয়া এক সময় বঙ্গদেশ মাতাইয়াছিলেন, তাহাতে কালীদেবী স্নেহময়ী মাতার ন্যায় মধুর গুণ্ গুণ স্বরে কখনও তাঁহার সহিত কলহ করিতেন, কখনও মায়ের কর্ণে সুধা মাখা স্নেহকথা বলিতেছেন, জননীর ক্ষিপ্ত ছেলের মত কখনও মাকে গালি দিতেছেন—সেই কপট গালি—স্নেহ ভক্তি ও আত্মসমর্পণের কথা মাখা, —এখানে রামপ্রসাদ সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন কবি নহেন, এখানে তাঁহার ধূলিধূসর নেংটা শিশুর বেশ,—শিশুর কথা, তাহা পণ্ডিত ও কৃষকের তুল্য বোধগম্য; সেই সঙ্গীতের সরল অশ্রু-পূর্ণ আবদারে সাধক কণ্ঠের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিশু যেমন মায়ের হাতে মা'র খাইয়া 'মা' 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া মায়ের কোলে যাইতে চায়, রামপ্রসাদও সেইরূপ সাংসারিক দুঃখ সব মায়ের দান জানিয়াও 'মা', 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই নির্ভর-মিষ্ট সকরুণ গীতিমালা অত্যধিক হৃদয়াবেগে চির পবিত্র হইয়া রহিয়াছে।

শিশুর প্রতি মায়ের স্নেহের মাধুর্য্য এক দিকে। নির্ভরান্বিত শিশুর স্নিগ্ধ অভিমানপূর্ণ আবদার অপর দিকে, মায়ের প্রতি শিশুর সেই গঞ্জনাগুলি বড় মধুর—সেই গঞ্জনার বাহ্যিক কঠোরতা অশ্রুজলে ধৌত হইয়া কোমল হইয়া গিয়াছে। রামপ্রসাদের মায়ের প্রতি ক্রোধ অশ্রুজল-গঠিত, উহা নামে মাত্র ক্রোধ—উহা নিগৃহীত বালকের স্নেহের স্বত্ব স্থাপন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য প্রেমভক্তির বিশেষ লীলাভূমি। এই প্রেমভক্তি সময়ে সময়ে অঞ্জন-শলাকার ন্যায় লোক চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছে। রাজা রামমোহন রায় গভীর শাস্ত্রানুশীলন পূর্ব্বক যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ নির্ম্মল ভক্তি-বিহ্বলতায় তৎপূর্ব্বেই সেগুলি হৃদয়ে অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তিনি প্রেম-স্নিগ্ধ-হৃদয়ের অনুভূতির বলে পুস্তকগত বিষয়ের অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া নির্ম্মল সত্যরাজ্য ছুঁইতে পারিয়াছিলেন। কি কাজরে মন যেয়ে কাশী! নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রম মাত্র পথ হেঁটে। প্রভৃতি বাক্যে তিনি তীর্থযাত্রার সম্বন্ধে লৌকিক আস্থার প্রতি নির্ভীক ভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। 'ত্রিভুবন যে

মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তা জাননা। মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তাঁর করতে চাওরে উপাসনা। ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে।' প্রভৃতি কথা তিনি রাজা রামমোহনের পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত গানের সঙ্গে সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের 'আবাহন বিসর্জ্জন কর তুমি কার' প্রভৃতি গান একস্থানে রক্ষিত হইবার যোগ্য। 'বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, ষড়্‌দর্শনের সেই অন্ধগুলা' বাক্যে রামপ্রসাদ ভক্তের বলে বলীয়ান্‌ হইয়া শাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার নির্ম্মল অদ্বৈতবাদ সূচক অসংখ্য পদ আছে। যে বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়, সেই বৎসরের শেষভাগে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। রামপ্রসাদের কণ্ঠে যে গানের অবসান হইয়াছিল, তাহা পুনরায় রামমোহনের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া নব্যসমাজকে মাতাইয়া তুলিল।

রামপ্রসাদ বিগ্রহ পূজা করিতেন, কিন্তু তিনি সেই বিগ্রহের পদতলে বসিয়া অনন্তরাজ্যের ছায়া অনুভব করিতেন, যে ভোগসম্ভার তৎপদ প্রান্তে প্রস্তুত রাখিতেন, তাহা দেখিয়া কখনও ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক মনে মনে গাহিয়াছেন, 'জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা। ওরে কোন্‌ লাজে খাওয়াতে চাস তায়, আল চাল আর বুট ভিজানা" কখনও বা পুষ্প, বিল্বপত্র পদে দিতে উদ্যোগ করিয়া সেই উৎসর্গ অসম্পূর্ণ জ্ঞানে বলিয়াছেন :

বনের পুষ্প, বেলের পাতা, মাগো আর দিব আমার মাথা।

কালীমূর্ত্তি যে ভাবে তাঁহার মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ হইত, তাহা মহামহিম, গূঢ় রহস্যে ব্যক্ত অতি সুন্দর; তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি শব্দ ও উপমার জন্য লালায়িত হইয়াছেন; অপ্রস্ফুট সৌন্দর্য্যাবলী জড়িত হইয়া সেই মূর্ত্তি ক্ষণে ক্ষণে নবভাবে তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইয়াছে :

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে দ্রুতগতি,
দলে দানবদলে, ধরি করতলে গজগরাসে।
কেরে—কালীর শরীরে, রুধির শোভিছে,
কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে॥

প্রভৃতি গান ভক্তের কণ্ঠে শুনিলে মানসপটে মাধুর্য্য মিশ্রিত এক ভৈরব ছবি অঙ্কিত হয়।

সংসারক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ এখনও রামপ্রসাদের গানগুলি শুনিয়া সাশ্রু-নেত্রে তাহাদের প্রশংসা করিবেন। আমার মনে পড়ে, গৃহ-প্রাঙ্গণে বসিয়া শ্যাম সন্ধ্যাকালে যখন পরিচিত সুহৃদ্‌ কণ্ঠে,—

'নিতান্ত যাবে এ দিন কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো।"

প্রভৃতি গান শুনিতাম, তখন বাল্যকালের সুকোমল অন্তঃকরণে কত বিষাদ-মাখা, মহিমান্বিত ভক্তির কথা জাগিয়া উঠিত। 'ভবে আমার আশা কেবল আশা, আসা মাত্র হলো সার' প্রভৃতি গান সাংসারিক কষ্ট বিড়ম্বিত চিত্তের পক্ষে মাতৃ অবলম্বন জনিত সান্ত্বনার 'সুধাতুল্য।'

মা নামের পুণ্য প্রভাব রামপ্রসাদ তাঁহার জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। মুক্ত মহাপুরুষ রামপ্রসাদ তাঁহার সঙ্গীতের মধ্য দিয়া জগজ্জননী শ্যামা-মায়ের মহিমা প্রকাশ করিয়া ধন্ত হইয়াছেন। সে মহিমা বুঝিতে হইলে হৃদয়ে ভক্তি চাই, শ্রদ্ধা চাই, নির্ভর চাই, আত্মনিবেদন চাই। তিনি ছিলেন ভক্ত, ভাবুক, সিদ্ধসাধক, তাহার উপর ছিলেন তিনি মানবপ্রেমিক। তাঁহার সঙ্গীত ছিল সার্ব্বজনীন। মানুষের নির্ভর ও আশার বাণী ধ্বনিত হইয়াছে প্রত্যেকটি সঙ্গীতের সুরে সুরে।

মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে রামপ্রসাদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—'এক্ষণে আমরা একটি ধর্ম্ম সঙ্গীত-রচয়িতা সাধুপুরুষের নিকট আগমন করিতেছি। তাঁহার গীতগুলি অতি সহজ ভাষায় রচিত এবং বাঙ্গলাদেশে পরমার্থ সাধক বলিয়া অত্যন্ত ভক্তির সহিত গীত হইয়া থাকে। তাঁহার নাম কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। যখন কলিকাতায় রাতভিখারীদের মুখে তাঁহার রচিত গান শ্রবণ করা যায়, তখন চিত্তে অত্যন্ত ঔদাস্য জন্মে এবং সেই সকল গান মনকে 'পৃথিবীর এত উপরে লইয়া যায় যে তাহা বলা যায় না। রামপ্রসাদ সেন কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করেন। রামপ্রসাদ ধর্ম্ম সঙ্গীত ব্যতীত কালী সংকীর্ত্তন ও কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর নামক কবিতাদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রচিত সঙ্গীতের ন্যায় তাহা প্রসিদ্ধ নহে।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সঙ্গীতের ভক্ত ছিলেন। তাঁহার 'প্রসাদী সুর' এত সহজ ও সরল এবং হৃদয়ের মধ্যে এমন ভাবে ভক্তির আবেগ ফুটাইয়া তোলে যে, যে সঙ্গীত জানে না, সেও তাহা গাইতে পারে। অতি অল্প বয়সেই রামপ্রসাদ এই সুর সৃষ্টি করেন। রামপ্রসাদ যে বলিয়াছিলেন, 'ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎপরা' তাহা যথার্থ বটে।

রামপ্রসাদের সঙ্গীত আলোচনা-প্রসঙ্গে সে কথাই বলিব।

এখানে প্রসঙ্গ-ক্রমে আমরা রামপ্রসাদের ভূ-সম্পত্তি সম্বন্ধেও আলোচনা করিলাম। পূর্ব্বে ইহার উল্লেখ করিয়াছি।

রামপ্রসাদের ভূসম্পত্তি—"লর্ড কর্ণওয়ালিসের রাজত্বকালে বাঙ্গলার সমস্ত নিষ্কর ভূমির বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছিল। একটি আইন করিয়া (Act XIX of 1793, Article 25) নিষ্করের সনদাদি দলিল তলব করা হয়। তদনুসারে ১২০২ সন (১৭৯৫ খ্রীঃ) হইতে বাঙ্গলার সমস্ত জিলার সনদ-রেজিষ্টার, তায়দাদ প্রভৃতি বিপুল সংগ্রহ সঞ্চিত হয়। বিলুপ্যমান অনাদৃত এই সকল সংগ্রহের মধ্যে কিরূপ মূল্যবান তথ্য অন্তর্নিহিত আছে, তাহার একটি নিদর্শন এস্থলে প্রদর্শিত হইল। তৎকালে হাবিলিসহর পরগণা 'নদীয়া' জিলার অন্তর্ভূত ছিল। উক্ত জিলার তায়দাদের সংখ্যা ৪৩৫০০ বটে। শ্রীরামদুলাল সেন সাং কুমারহট্ট "সন ১২০২ সাল ১৯ অগ্রহায়ণ" তাঁহার পিতা রামপ্রসাদ সেন নামায় "মহাত্রাণ" সম্পত্তির বিবরণ চারিটি পৃথক সংখ্যায় দাখিল করেন। তাহাদের সারসংক্ষেপ এই :

তায়দাদ নং ১৮৩৪৭—৺সুভদ্রা দেবী ২ বৈশাখ ১১৬৫ সনে "দানপত্র" করিয়া রামপ্রসাদ সেনকে হাবিলিসহরে পরগণার নকুলবাটি গ্রামে "আন্দাজী" ১/০ বিঘা জমি দান করেন—দখলকার পুত্র রামদুলাল সেন।

তায়দাদ নং ১৮৩৪৮—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ৪ ফাল্গুন ১১৬৫ সনে তাঁহাকে ৫১/০ একান্ন বিঘা জমি "সনন্দ" করিয়া দেন।

যথা—	বাউলপুর	১৮/০	উখরা পরগণা
	পদ্মনাভপুর	১৭/০	ঐ
	মামুদপুর	১৬/০	হাবিলিসহর পরগণা।

তায়দাদ নং ১৮৩৪৯—দর্পনারায়ণ রায় ১৫ আষাঢ় ১১৬৫ সনে হাবিলি-সহর পরগণার "তালডোঙ্গা" গ্রামে ২/০ বিঘা জমি "সনন্দ" করিয়া দেন।

তায়দাদ নং ১৮৩৫০—দর্পনারায়ণ রায়, শ্রীরাম রায় ও কালীচরণ রায় একযোগে ১৭ চৈত্র ১১৬০ সনে ৮/০ বিঘা জমি "সনন্দ" করিয়া দেন।

যথা—	পলাসি	২/০	হাবিলিসহর পরগণা
	তেতুল্যা	২/০	ঐ
	বালিয়া	১/০	ঐ
	কাটা পুখরিয়া	১/০	ঐ
	ডাসি	২/০	ঐ

রাজনারায়ণ বসু লিখিত "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা" ১৮ পৃষ্ঠা।

রামদুলাল সেন প্রত্যেক তায়দাদের সঙ্গে "আসল সনন্দ" দর্শাইয়া নকল দাখিল করিয়াছিলেন। নদীয়া কালেক্টরীতে তন্মধ্যে প্রথম দুইটি নকল এখনও রক্ষিত আছে—শেষ দুটি নাই।

সুভদ্রা দেবীর দানপত্রের নকল। (নং ১৮৩৪৭)

শ্রীকৃষ্ণ নকল শ্রীরাম

শরণং

শ্রীরামদুলাল সেন

সাং কুমারহট্ট

স্বস্তি সকলমঙ্গলালয় শ্রীরামপ্রসাদ সেন

কল্যাণবরেষু লিখিতং শ্রীসুভদ্রা দেব্যা পত্র মিদং

কার্য্যঞ্চ আগে পরগণে হালিসহর সরকায় শাতগড়ি পরগণা ম (জ) কুরের নন্দনপুর নন্দনবাটি গ্রাম শর্ম্মঙ্গিয়ে (?) আমার বসতবাটীর দক্ষীণংসে শ্রীযুত রামহরি চক্রবত্তির ভদ্রাশনের দক্ষীণ চতুসিম্য-বৎছর্ম্ম সবৃক্ষা বাটী খারিজ জমা তোমাকে বসতি করিতে বৈদ্যত্তর মহাত্রাণ দিলাম তুমি বাটীতে বসতি করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পরমযুখে ভোগ করহ, আমার শহিত এবং আমার উত্রাধিকারীর সহিত কোন দয়া নাই বাটীর শামা নিরর্ঘয় উত্তরে রামহরি চক্রবত্তির ভদ্রাশনের দক্ষীন দ (ক্ষি) ণে শমেত পরিখা পশ্চীমে রামরায়ের মহত্ববাটী এই চতুসিম্যবৎছর্ম্ম বাটী তোমারে মহাত্রাণ দিলাম ইতি শন ১১৬৫ এগারো শওয়া পয়সষ্ঠী সাল তারিখ ২ দোসারা বৈশাখ—

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সনদের নকল। (নং ১৮৩৪৮)

নকল শ্রীশ্রীরাম

পারশী শরণং

১৫৮৩

ইঙ্গরাজী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়

শ্রীরামপ্রসাদ সেন সুচরিতেষু শুভাসীঃ প্রয়োজনঞ্চ বিশেষঃ এ অধিকারে তোমার ভূমিভাগ কিছু নাহি অতএব বেওয়ারিষ গরজমা জঙ্গল ভূমি সমেত পতিত পরগণে হাবেলীসহর ১৬ ষোল বিঘা এবং পরগণে উখড়ায় ৩৫ পয় ত্রিশ বিঘা একুনে ৫১ একান্ন বিঘা তোমাকে মহোত্তরাণ দিলাম নিজ জোত করিয়া ভোগ করহ ইতি সন ১১৬৫ তারিখ ৪ঠা ফাল্গুন শহর—

রামপ্রসাদের গ্রামবাসী চারিজন পৃষ্ঠপোষকের মধ্যে সুভদ্রা দেবীর পরিচয় অজ্ঞাত। বাকী তিনজন বিখ্যাত "স্নাবর্ণ চৌধুরী" বংশীয় বটে এবং সুভদ্রা

দেবীও ঐ বংশীয় হইতে পারেন। দর্পনারায়ণ রায় লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের অধস্তন সপ্তম পুরুষ।

গুপ্ত কবি (প্রভাকর, ১লা পৌষ, ১২৬০, পৃঃ ৭) সম্ভবতঃ কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্ধৃত সনন্দপত্রের কথাই পরিজ্ঞাত হইয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, যদিও হা... ১৩ বিঘার স্থানে ১৪ বিঘা হইয়াছে এবং সনন্দের পাঠ মিলিতেছে না।

এই সকল সনন্দ আবিষ্কারের ফলে রামপ্রসাদের জীবনী ঘটিত কতিপয় বিষয়ের মীমাংসা সম্ভব হইয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্রের সনন্দের তারিখ ১৭৫৯ খ্রীঃ। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কোন দলিলেই "কবিরঞ্জন" উপাধির উল্লেখ নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রদত্ত বহুতর সনন্দের মূল আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। দানভাজন ব্যক্তিদের উপাধি সর্ব্বত্রই লিখিত হইয়াছে।

পণ্ডিত শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের এই মত সর্ব্বত্র যুক্তিসঙ্গত নহে—অন্ততঃ রামপ্রসাদের এই 'কবিরঞ্জন' উপাধি উপলক্ষ্যে ইহা গ্রহণীয় নহে। প্রত্যেক দানপত্রেই উপাধি লিখিত থাকিবে এবং সর্ব্বত্র অনুসৃত হইবে তাহা নহে। রামপ্রসাদ তাঁহার রচিত সঙ্গীত অধিকাংশ স্থলেই 'কবিরঞ্জন' উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। কবিরঞ্জন তাঁহার উপাধি না থাকিলে তাঁহার কাব্যে ও সঙ্গীতে তাহা ব্যবহার করিবেন কেন? দানপত্রে উল্লেখ না থাকিলেই যে তাহা গ্রাহ্য হইবে না, ইহা প্রমাণসহও যুক্তিযুক্ত নহে।

বর্দ্ধমান রাজধানী ও গড়বর্ণনায় শেষ ভাগে রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন:

ধন্য ধন্য পুণ্য দেশ, কি কহিব সবিশেষ
সাক্ষাতে শঙ্করী হেন বাসি।
কালী-পাদ-পদ্মতলে, শ্রীকবিরঞ্জন বলে,
আনন্দিত কবি গুণরাশি॥

আবার ভগবতীর নৃত্য গীতিটির শেষাংশে আছে:

অরসিক অভক্ত অধম লোক হাসে।
করুণাময়ীর দাস প্রেমানন্দে ভাসে
শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন
রচে গান মোহ অন্ধের ঔষধ অঞ্জন।

রামপ্রসাদের এই 'কবিরঞ্জন' উপাধি প্রসঙ্গে বাঙ্গালা দেশের খ্যাতিনামা সাহিত্যগণ আলোচনা করিয়াছেন এবং একথা সত্য যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত কোন দলিল দস্তাবেজে তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু জনশ্রুতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি

প্রদান করেন। রামপ্রসাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য 'কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর' নামক কাব্য রচনা করিয়া মহারাজকে উপহার দিয়াছিলেন। স্বেচ্ছায় রামপ্রসাদ "কবিরঞ্জন" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন একথা আমাদের মনে হয় না। হয়ত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কোন এক শুভক্ষণে প্রসাদের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া,—তাহা বিদ্যা-সুন্দর রচনায় হউক কিংবা পদাবলী রচনায় হউক সভাস্থলে কিংবা হালিসহরে জনসমক্ষে 'কবিরঞ্জন' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকিবেন, তাহাই লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়াছে এবং প্রসাদও সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহার সঙ্গীতে ও কাব্যে ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। বর্ত্তমান সময়েও ইহার অন্যথা নাই। ভবিষ্যতে হয়ত কোন গবেষণাকারি এ সম্বন্ধে দলিলপত্রও পাইতে পারেন।

আট

এ সংসার ধোকার টাটি।
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি॥—রামপ্রসাদ
এ সংসার রসের কুটি।
হেথা খাই দাই আর মজালুটি॥—আজুগোঁসাই

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে হালিসহর ছিল শাক্ত প্রধান ও বৈষ্ণব প্রধান স্থান।—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে এবং তাঁহার তিরোভাবের পরেও শ্রীবাস পণ্ডিত, মুরারী গুপ্ত, শিবানন্দ সেন প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব পণ্ডিত ও সাধক কাঁচরাপাড়া বা কাঞ্চনপল্লীতে বাস করিতেন। তাঁহাদের প্রভাবে কাঁচড়াপাড়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী পল্লী-সমূহেও বৈষ্ণবধর্ম্ম সুপ্রচারিত এবং অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। শাক্ত ও বৈষ্ণবে ধর্ম্ম বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। রামপ্রসাদও বৈষ্ণবদের প্রতি কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই।

রামপ্রসাদের বাসপল্লীতে একজন প্রতিভাশালী কবি বাস করিতেন। এই কবির নাম ছিল অযোধ্যারাম বা রাজুগোস্বামী—সাধারণতঃ তিনি আজু গোঁসাই নামে পরিচিত ছিলেন। ইনি রামপ্রসাদের সমসাময়িক এবং স্বগ্রামবাসী ছিলেন। অযোধ্যারামকে সাধারণতঃ লোকে আজু গোঁসাই বলিত। ইনি বৈষ্ণব ছিলেন। ইঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ এবং পরিহাস-রসিকতা ও উপস্থিত ক্ষেত্রে সঙ্গীত রচনা

করিবার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। রামপ্রসাদের এক একটি সঙ্গীতের উত্তরে পরিহাসাত্মক এক একটি গীতি রচনা করিয়া এবং বহুস্থানে কৌতুকপ্রিয় বহুজনের চিত্তবিনোদন করিতেন, তাহাতে সফল হইয়াও ইনি কোনরূপ চিরস্থায়ী কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, যোগ্যতর কবি রামপ্রসাদের রচনা ও গীতিমালা নিতান্ত হৃদয়গ্রাহিণী বলিয়া তদ্বিরোধী গানগুলি কেহ যত্নপূর্ব্বক অভ্যাস করে নাই। অভ্যাস করিলেও ভক্তসমাজে, বিদ্বৎসমাজেও তদানীন্তন গুণগ্রাহীসমাজে প্রতিষ্ঠালোপ ভয়ে কেহই ঐ সমস্ত সঙ্গীতের বহুল প্রচার সাধনে প্রবৃত্ত হয় নাই। তথাপি হাস্যপরিহাস এবং কৌতুকের এমনি চমৎকারিত্ব ও জনপ্রিয়ত্ব যে, রামপ্রসাদ ও আজু গোঁস্বামীর সঙ্গীত সংগ্রামের রসভোগ করিবার জন্য শত শত মহাভক্ত উপস্থিত থাকিতেন এবং হয়ত স্ব স্ব প্রবৃত্তির অজ্ঞাতসারে আজু গোঁসাই কবির দুই একটি ছত্র স্মরণ করিয়া রাখিতেন।

আজু গোঁসাই তদানীন্তন বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট পরিচিত থাকিলেও উন্মত্ত বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। সুতরাং এসময়ে তাঁহার বংশাদি বিবৃতি দূরের কথা, বয়স ও পারিবারিক ইতিহাস সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। তাঁহার বিকৃত নাম ভিন্ন প্রকৃত নাম কি, তাহারও স্থিরতা নাই। কেহ বলেন অযোধ্যারাম গোস্বামী, কেহ বলেন অজয় গোস্বামী, কেহ বলেন অচ্যুতানন্দ গোস্বামী। তাঁহার বংশীয় কেহ নাই। সুতরাং আদৌ তাঁহার পুত্রকন্যা ছিল কিনা বলা যায় না। তাঁহার নিজ গ্রাম কুমারহট্টের লোকেরা ও তাঁহার বিশেষ খবর রাখে নাই। আমি এ বিষয়ে কুমারহট্টবাসী বহু ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন প্রামাণিক বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

আজুগোঁসাই বৈষ্ণব ও হরিভক্ত ছিলেন, সুতরাং শাক্তগণের প্রিয়পাত্র হইতে পারেন নাই। শাক্ত ও বৈষ্ণবের চিরাভ্যস্ত কলহের রীতিক্রমে রামপ্রসাদ ও গোস্বামীর দ্বন্দ্ব ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। 'প্রসাদ-প্রসঙ্গে' আছে 'কর্ম্মের ঘাট, তৈলের কাঠ, আর পাগলের ছাট মোলেও যায় না।' গোস্বামী তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দিলেন "কর্ম্মডোর, স্বভাব চোর, আর মদের ঘোর মোলেও যায় না।' বলা বাহুল্য রামপ্রসাদ একটু সুরাপান করিতেন সুতরাং তাঁহার উক্তিতে যেমন গোস্বামীর প্রতি শ্লেষ কটাক্ষ দেখা যায়, গোস্বামীর প্রত্যুক্তিতেও তদ্রূপ রামপ্রসাদকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এইরূপ উক্তি প্রত্যুক্তি প্রায়ই হইত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কুমারহট্টে অবস্থিতিকালে মধ্যে মধ্যে রামপ্রসাদ ও গোস্বামীর বিরোধ বাধাইয়া কৌতুক দেখিতেন। কিন্তু কালী ভক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া

পরিহাসপ্রিয়তা অবৈধ বিবেচনায় শক্তিপরায়ণ কৃষ্ণচন্দ্র বিষ্ণুপরায়ণ গোস্বামীকে তাদৃশ রচনায় একেবারে পরাঙ্মুখ হইতে অনুমতি করিতেন।

গোস্বামীর সঙ্গীতাদি এ পর্য্যন্ত কেহই সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং দুই একজনের স্মৃতি রক্ষিত বিকৃত উক্তি এবং বিবিধ পুস্তকে উদ্ধৃত আংশিক দুই এক চরণ ভিন্ন আর কোন সংগ্রহস্থল নাই। বহুকষ্টে যে কয়েকটি সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে তাহাই পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল।

এক পক্ষের উক্তি শুনিলে প্রচুর আনন্দের সম্ভাবনা নাই। সেইজন্ত গোস্বামীর প্রত্যুক্তিগুলির পূর্ব্বেই রামপ্রসাদের সঙ্গীতোক্তি প্রকাশ করা হইল। * * রামপ্রসাদের একটি গান এইরূপ:

ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন ; দুচার ডুবে ধন না মেলে।
তুমি দম সামর্থে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনী কূলে॥
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি কর কুড়িয়ে পাবে, শিবের যুক্তি মতন নিলে॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক হল্‌দি গায়ে মেখে যাও, ছোবে না তার গন্ধ পেলে॥
রতনমাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝাঁপ দিলে মন, মিলবে রতন ফলে ফলে॥

উহার উত্তরে আজু গোসাই গাহিয়াছিলেন—

ডুবিস্‌নে মন ঘড়ি ঘড়ি।
দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি॥
একে তোমার কফোনাড়ী ডুব দিওনা বাড়াবাড়ি।
তোমার হলে পড়ে জ্বরজাড়ি মন যেতে হবে যমের বাড়ী॥
অতি লোভে তাঁতি নষ্ট মিছে কষ্ট কেন করি।
ও তুই ডুবিস্‌নে ধরগে ভেসে শ্যাম কি শ্যামার চরণতরী॥

রামপ্রসাদের আর একটি সুন্দর ভাবাত্মক গীত নিম্নে প্রকাশিত হইল:

মনরে আমার এই মিনতি
তুমি পড়া পাখা হও করি স্তুতি॥
যা পড়াই তাই পড় মন, পড়লে শুনলে দুধিভাতি।
ওরে, জাননা কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি।

কালী কালী কালী পড় মন, কালীপদে রাখ প্রীতি।
ওরে, পড় বাবা আত্মারাম, আত্মজনের কর গতি॥
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে, গাছের ফলে কদিন চলে, কররে চার ফলের স্থিতি॥
প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন, শোন্ যুকতি।
ওরে বসে মূলে কালী বলে, গাছ নাড়া দেও নিতি নিতি।

আজু গোঁসাই ইহার উত্তরে এই গান ধরিলেন :—

হয়োনা মন পড়াপাখী।
ওরে বন্দী হলে হয় না সুখী॥

পাখী হলে তত্ত্ব ভুলে দিন যাবে পিঞ্জরে থাকি।
তুমি মুখে বল্‌বে পরের বুলি পরম তত্ত্বের জানিবে কি॥
ভক্তি গাছে মুক্তি ফলে সে ফলে উড়ে খাওগে দেখি।
খেলে মায়ার ফাঁদে পড়বে না আর, শমন ব্যাধে দিবে ফাঁকি॥

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ আর এক সময়ে গাহিয়াছিলেন :

আয় মন বেড়াতে যাবি।

কালী কল্পতরুতলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠপুত্র, তত্ত্বকথা তায় সুধাবি॥
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতামাতায় তাড়া দিবি।
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয় ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে, জ্ঞান খড়্গ বলি দিবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূরে রইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু! বাছা! বাপের ঠাকুর! মনের মতন মনটি হবি॥

রামপ্রসাদের এই সঙ্গীতটি যেমন সুন্দর, গোস্বামীকৃত নিম্নলিখিত ব্যঙ্গানুকৃতিও তদনুরূপ হইয়াছে :

কেন মন বেড়াইতে যাবি।
কারো কথায় কোথাও যাস্‌নেরে তুই, মাঠের মাঝে মারা যাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরে মন নিজে কভু না চিনিবি।
ও তুই মদের ঝোঁকে কোত্তে পারিস মাঝগাঙেতে ডুবাডুবি।
বাঁশ বনে গিয়ে ডোমকাণা হয় এ তত্ত্ব কবে বুঝিবি।
শেষে কল্পতরুর তলায় গিয়ে কি ফল নিতে কি ফল নিবি।

তান্ত্রিক মতে শক্তি-সাধনায় যে সুরা পানের বিধি আছে, তদনুসারে রামপ্রসাদ সুরা পান করিতেন। এইরূপ একটি প্রবাদ আছে। আজু গোঁসাই তাই উল্লিখিত গীতে তাঁহাকে একটু শ্লেষ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ শ্লেষের উত্তরেই রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—

মন ভুল না কথার ছলে।
লোকে বলে বলুক মাতাল বলে॥
সুরাপান করিনেরে, সুধা খাইরে কুতুহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ
মদ মাতালে মাতাল বলে।

রামপ্রসাদের কালী-কীর্ত্তনে ভগবতীর গোষ্ঠে গমন ও গোপবধূ বেশে একাম্রকাননে গোচারণের উল্লেখ আছে। যথা :

আজ্ঞা কর ত্রিনয়নে।
যাব হে একাম্র বনে॥
কাশী হৈতে হৈল কাশীনাথের আদেশ।
একাম্রকাননে মাতা করিলা প্রবেশ॥
চরাইতে ধেনু বেনু দান দিল ভব।
অধরে সংযোগ করি ঊর্দ্ধমুখে রব॥
সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে শুনে মার বেণু॥

সে বিষয়ে গোস্বামীর ব্যঙ্গ এই :

না জানে পরম তত্ত্ব, কাঁঠালের আমসত্ত্ব,
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে।
তা যদি হইত, যশোদা যাইত, গোপালে কি পাঠায়রে।

রামপ্রসাদের ভক্তিরসপূর্ণ আর একটি সঙ্গীত এই :—

এ সংসারে ধোকার টাটি।
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি॥
ওরে ক্ষিতি জল বহ্নিবায়ু শূন্যে পাঁচে পরিপাটি।
প্রথমে প্রকৃতিস্থূলা অহঙ্কারে লক্ষ কোটি।
যেমন সরার জলে সূর্য্যছায়া অভাবেতে স্বভাব যেটি॥
গর্ভে যখন যোগী তখন ভূমে পড়ে খেলাম মাটি।
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী মায়ার বেড়ি কিসে কাটি
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে, ইচ্ছা সুখে পান করে বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটি॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদ্ পুরুষের আদ্ মেয়েটি
ওমা যা ইচ্ছা হয়, তাই কর মা তুমি তো পাগলের বেটি॥

এই গীতটি লক্ষ্য করিয়া আজু গোঁসাই নিম্নলিখিত গীতটি রচনা করেন :

এ সংসার রসের কুটি।
হেথা খাই দাই আর মজা লুটি॥
ওরে যার যেমন মন তার তেমন ধন মন কররে পরিপাটি॥
ও হে সেন নাহি জ্ঞান বুঝ তুমি মোটামুটি।
ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটী।
রমণীরে বিষ ভেবেছ তাতেও তো দেখিনা ক্রুটি।
তুমি ইচ্ছা সুখে খেলে পাশা কাঁচিয়েছ পাকাগুটি।
মহামায়ার বিশ্ব ছাওয়া ভাবছো মায়ার বেড়ি কাটি।
তবে শ্যামের পদে অভেদ জেনো শ্যামামায়ের চরণ দু'টি॥

রামপ্রসাদের বৈরাগ্যব্যঞ্জক সঙ্গীতের উত্তরে গোস্বামী রহস্যের সহিত তত্ত্ব কথা ছাড়েন নাই। আর বৃদ্ধ বয়সে রামপ্রসাদের পত্নীর গর্ভ সঞ্চার হইয়াছিল, পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়েছ বলিয়া সেদিকেও কটাক্ষপাত করিতে ভুলেন নাই।

কবিরঞ্জন একবার গাহিয়াছিলেন :

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমায়।
গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় যে মা খেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটার একটা করে যাব।

হাতে কালী মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে, সেই কালী তার মুখে দিব।
খাব খাব বলি মাগো উদরস্থ না করিব।
এই হৃদপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব॥
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে, কালী বলে কালেরে কলা দেখাব॥
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভাল মত তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব॥

এই গান শুনিবামাত্র গোস্বামী গাহিলেন :

সাধ্য কি তোর কালী খাবি।
ওযে রক্তবীজের বংশ খেলে তার মুণ্ডমালা কেড়ে নিবি।
সর্ব্বাঙ্গে নয় উভয় গালে ভূষোকালী মেখে যাবি।
আবার কালেরে দেখাতে কলা নিজে যে কলা দেখিবি।

রামপ্রসাদ এক সময়ে তীর্থাদি পর্য্যটনের অনাবশ্যকতা সম্বন্ধে গাহিয়াছিলেন :

কাজ কিরে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্য রাশি॥
সার্দ্ধ ত্রিশ কোটি তীর্থ, মায়ের ও চরণবাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে শ্মশানবাসী॥

আজু গোঁসাই উত্তরে গাহিলেন :

পেসাদে তোর যেতেই হবে কাশী।
ওরে তথায় গিয়ে দেখ্‌বিরে তোর মেসো আর মাসী॥
ঘরে বসে থাকিস্‌ যদি, ধরবে তোরে যক্ষ্মা কাশী।
এই বেলা নে তল্‌পি বেঁধে পথের সম্বল রাশি রাশি॥

* * * * *

কথিত আছে আজু গোঁসাই রামপ্রসাদের বিখ্যাত গীত 'আমায় দেও মা তবিলদারী' গানটি শুনিয়া উত্তরে গাহিয়াছিলেন :

কেনে চাস্‌ ভাই তবিলদারী,
ওকাজে আছে ঝুঁকি ভারি।
দু'দিনকার মুহুরী হয়ে তাইতে এত বাড়াবাড়ি॥
পেলে তবিল, ভাঙতে এক তিল, তোমার আর সবে না দেরি।

পদরত্নভাণ্ডার সবাই লোটে তাইতে কেন হিংসে আড়ি।
দাতা যে বিলাচ্ছে সে ধন, পেট ফুলে মরে ভঁাড়ারি॥
কর্ম্ম অনুসারে পদ শ্যামার সরকার সুবিচারী।
বাপ দাদার নজির এখানে, হবে না হে কার্য্যকারী॥
হেথা যে যেমন লায়েক, সেই মোতাবেক পদের বিচার হয় হে তারি।
তোমার যেমন কর্ম্ম, তেমন কর্ম্ম, পদ পেলে কর্ম্ম অনুসারী॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর আর, সাধে কি শিবের মাইনে ভারি।
সে সকল ছেড়ে ঐ পদে যে বিকিয়েছে হয়ে ভিকারী।
আগে, বিন্‌মাইনে কাজ শেখে সবাই, হয়ে পদের অধিকারী।
যদি পদ পেতে চাও, কর্ম্ম শেখ, শেষে হবে মাইনে ভারি।

আমরা পূর্ব্বে রামপ্রসাদের 'হয়োনা মন পড়াপাখী' গানটি ও আজু গোঁসাই তাহার যে ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিয়াছি। ১২৭৭ সালের ১ম সংখ্যা 'মিত্রপ্রকাশ' পত্রিকায় আজু গোঁসাইর প্রদত্ত উত্তর নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল :

প্রসাদ করো স্তুতি নতি যতনে পড়াচ্চো কাকে ?
বিনে শুক সালিখ কি কালীকৃষ্ণ পড়ালে পর পড়ে কাকে।
তোমার মন এখনো কাক রয়েছে, সেই স্বভাব ভার কর্ম্মপাকে।

তুমি বল, পোড়তে আত্মারাম, সে স্বভাবে কা কা হাঁকে। ওহে চোরে-খেকো পাখীকে কেউ যদিও পিঞ্জরে রাখে তাতে মন ভোলে না, পোষ মানে না, খাঁচার কাঠি কাটতে থাকে।

ওহে শুকের প্রকৃতি কখন্ বল্লেই কি তা ধরে কাকে ?
পিটলে পড়ে গাধা কখন, ঘোড়া কি হয়ে থাকে ?

আজু গোঁসাই কৃত আর কোনও সঙ্গীত আমরা প্রাপ্ত হই নাই। অধুনাতন ভিক্ষুক গায়কদিগের মধ্যে প্রায় কেহই আজু গোঁসাই এর নাম পর্য্যন্ত জানে না। আমরা যে গানগুলি সংগৃহীত করিলাম, তদ্ভিন্ন আর কোন গীত পাওয়া যায় কিনা, বলিতে পারি না। যেগুলি আজু গোঁসাই কৃত বলিয়া মনে বিশ্বাস হইল তাহাই সন্নিবিষ্ট করিলাম। এ গুলিও কি পরিমাণে প্রকৃত বা বিকৃত অর্থাৎ কতদূর পরিশোধিত, পরিবর্ত্তিত, হৃতকায় বা পরাঙ্গ-পুষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইল বলিতে পারিনা, এই মাত্র বলিতে পারি গোস্বামী কবির রচনা এই ধরণের ছিল। উৎসাহের অভাবে এবং বিষয়-নির্ব্বাচন ও শক্তি প্রয়োগ বিষয়ে অপক্কতা নিবন্ধন, ইঁহার কবিত্ব বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং যোগ্যতর কবি রাম-

প্রসাদের সম্বন্ধ না থাকিলে ইঁহার নাম এ সময়ে কখনই সাধারণের শ্রুতিগোচর হইত না।*

আজু গোঁসাই সম্বন্ধে কেহ কেহ এইরূপ বলেন; রামপ্রসাদের সময় হালি-সহরে আজু গোঁসাই নামে এক রসিক বৈষ্ণব ছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম কি ছিল, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। কেহ বলেন, অযোধ্যানাথ গোঁসাই, কেহ বলেন, অচ্যুত গোঁসাই, আবার অন্যে বলেন, তাঁহার নাম ছিল রাজচন্দ্র বা রাজু গোঁসাই, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা "রাজুর" পরিবর্ত্তে 'আজু' বলিত। শেষে সেই নামেই তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি একজন গ্রাম্য কবি ছিলেন। ছড়া, গান ইত্যাদি বাঁধিবার তাঁহার শক্তি ছিল। কিন্তু সেজন্য তাঁহার প্রসিদ্ধি লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু

'অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে,
পুষ্প সহ কীট যথা উঠে সুর মাথে'।

সেইরূপ সাধক রামপ্রসাদের সংস্রবে আসিয়া আজু গোঁসাইও অমর হইয়াছেন। শাক্ত রামপ্রসাদ যে সকল গীত রচনা করিতেন, আজু গোঁসাই তাহার উত্তর স্বরূপ শাক্তের নিন্দা ও বৈষ্ণবের প্রশংসাসূচক পদ রচনা করিতেন। আজু গোঁসাইয়ের সেই সকল গীতের মধ্যে কোন ঈর্ষ্যা বা শ্লেষের ভাব দেখা যায় না। গানগুলি বিদ্রূপাত্মক ও হাস্যোদ্দীপক। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, আজু গোঁসাই একেবারে কবিত্ব শক্তি হীন ছিলেন না। তিনি যেমন পরিহাস-রসিক ছিলেন, তেমনি সুপণ্ডিত ও ভাবুক ছিলেন। কথিত আছে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও সময় সময় হালিসহরে গিয়া শাক্ত-বৈষ্ণবের বিবাদসূচক সঙ্গীত সংগ্রাম উপভোগ করিতেন।

*　　　*　　　*　　　*

আজু গোঁসাই সদানন্দ সরল-প্রকৃতির লোক ছিলেন, অনেকে তাঁহাকে পাগল বলিত, তাই একবার রামপ্রসাদ একটা কথার সূত্রে গোঁসাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—'কর্ম্মের ঘাট, তৈলের কাঠ ও পাগলের ছাট মলেও যায় না।' গোঁসাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—'কর্ম্ম ডোর, স্বভাব চোর, আর মদের ঘোর মোলেও যায় না।" গোঁসাই কিরূপ প্রত্যুৎপন্নমতি উপস্থিত বক্তা ছিলেন, ইহাতে তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। আজিকার দিনে এইরূপ উদার প্রাণ, রসজ্ঞ ও রসিক লোক বড়ই বিরল।

---

* প্রসাদপদাবলী—শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সংগৃহীত। ১৩০১ সাল। ১৬-২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণব আজু গোঁসাই যদিও শাক্ত রামপ্রসাদের গীতের কথার ছল ধরিয়া নানা বিদ্রূপ করিতেন, কিন্তু রামপ্রসাদ কখনও তাঁহার প্রতি সেরূপ ব্যবহারের পরিচয় দেন নাই। প্রসাদ, সাধনের যে উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা শাক্ত, বৈষ্ণব, সাম্প্রদায়িক বিবাদ-বিসংবাদ ও ভেদাভেদ জ্ঞানের অতীত। মানুষের এই ভেদ বুদ্ধি দূর করিবার জন্য তিনি আপনাকে উদ্দেশ করিয়া জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন :—

মন করোনা দ্বেষাদ্বেষি।
যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী॥
আমি বেদাগম-পুরাণে করিলাম
কত খোঁজ তল্লাসী।
এ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম
সকল আমার এলোকেশী।

এখন কথা হইতেছে যে আজু গোঁসাইয়ের রচিত যে সব সঙ্গীত গুপ্ত-কবি প্রথমে সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং পরে রামপ্রসাদের জীবনী লেখকগণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই আজু গোসাই কৃত মনে করিয়া আমরা মুদ্রিত করিলাম। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে আজু গোঁসাইয়ের এ সমুদয় গান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কতটা পরিবর্তিত হইয়াছে বলা কঠিন। তবে একথা সত্য যে রামপ্রসাদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক এবং এক গ্রামবাসী বলিয়াই আজু গোসাই স্মরণীয় হইয়া আছেন। আমরা এখানেই আজু গোস্বামীর কথা শেষ করিলাম।

নয়

তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তার, কহে পদে কালিকার
কৃপাময়ী ময়ী কুরু দয়া॥ —রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদ কুমারহট্ট হালিসহর গ্রামের অধিবাসী এবং বৈদ্যবংশীয় ছিলেন —একথা সকলেই জানেন—কিন্তু তাঁহার গোত্র, বংশ ও উপাধি সম্বন্ধে কেহ বড় একটা আলোচনা করেন নাই।

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত হালিসহর কুমারহট্ট একটি বৈদ্যপ্রধান স্থান ছিল এখনও আছে। এখানে বহু কৃতি বৈদ্যসন্তানের বাস। 'চন্দ্রপ্রভা' নামক বিখ্যাত বৈদ্য-কুল-গ্রন্থে হালিসহরের নাম আছে।

(১) তৎপক্ষেঽজনি কন্যৈকা **হালিসহর বাসিনে।**
শিবরামায় সেনায় সা দত্ত্বা দ্বয়ি সন্ততৌ।
(২) আত্মরামেশ্বরামাস্থা **হালিসহর বাসিনে।** (১)

বৈদ্য-কুল-পঞ্জী অনুযায়ী দেখা যায় যে কুমারহট্টে ধন্বন্তরী গোত্রের ধলহণ্ডীয় বিনায়ক বংশে সাধক রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। বিক্রমপুর নিবাসী বৈদ্যপ্রধান গোপালকৃষ্ণ রায় কবিবল্লভ পশ্চিমবঙ্গে সদর আমীন ছিলেন। তিনি বৈদ্যজাতির বংশ-পরিচয় ১২৫৬ সনের ১৯ ফাল্গুন (১৮৫০ খ্রীঃ) "অম্বষ্ঠসম্বাদিকা" নামক গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কুলনির্দেশ সহ রামপ্রসাদের মনোহর স্তুতিবাদ আছে যথা :

ধলহণ্ডীয়-বংশীয়ো হালীশহরবাসকৃৎ।
রামপ্রসাদসেনোঽভূত্তত্ত্বজ্ঞঃ সাধকঃ সুধীঃ॥
প্রসাদজ্জগদম্বায়াস্তত্ত্বজ্ঞানান্বিতানি বৈ।
রচিতানি সুগীতানি তেনাম্বানামপূর্ব্বকৈঃ॥
ন ভূতানি ন ভাব্যানি বর্ত্তমানানি নৈব চ।
তৎ সদৃশানি গীতানি চান্যৈঃ কৈশ্চিত কথঞ্চন॥' (পৃঃ ৬৯)

রামপ্রসাদ সেন তাঁহার বংশ-পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন :

ধন হেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধ মূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল গুণবন্ত, শিষ্টশান্ত গুণান্বিত,
প্রসন্না কালিকা কৃপামই।

সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের এই উক্তিটি প্রায় সকলেই নিজ নিজ গ্রন্থে জীবনী লিখিতে গিয়া উদ্ধৃত করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এই বংশ-পরিচয় বিষয়ে কেহই কোনরূপ অনুসন্ধান করেন নাই। কেহ কেহ বলিয়াছেন—"ইহা হইতেই পরিলক্ষিত হইবে যে রামপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষ কীর্ত্তিমান্' কৃত্তিবাস সেন একজন্ শক্তি-ভক্ত উপাসক ছিলেন।" কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই "কৃত্তিবাস" কে, 'শুদ্ধমূলই' বা কি তাহা নির্ণয় করিতে মনোযোগী হন নাই, এই মাত্র বুঝাইয়া গিয়াছেন যে, "কৃত্তিবাস" রামপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। তাঁহার ধন ও কুল

(১) চন্দ্রপ্রভা ২০২।৩ পৃষ্ঠা। (২) চন্দ্রপ্রভা ১৪৮ পৃষ্ঠা।

উভয়ই ছিল। এতদ্ব্যতীত আর কিছু অধিক বলিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে স্বর্গত ঐতিহাসিক আনন্দনাথ রায় মহাশয় 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন' নামক প্রবন্ধে (১৩০৬ সনের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আনন্দনাথ লিখিয়াছেন :

রামপ্রসাদ সেন যে মহৎকুলে জন্মগ্রহণ করেন, বৈদ্যসম্প্রদায় মধ্যে সেই কুলের সম্মানের ইয়ত্তা নাই। একজন রাজোপাধিধারী মহাপুরুষ সেই কুলতরুর স্রষ্টা। তাঁহার নাম শ্রীহর্ষ সেন, সেই সময়ে চিকিৎসা ব্যবসায়ে তৎসদৃশ লোক অতি বিরল ছিল। নবাব ফকিরুদ্দীন শাহ এই সময়ে (১৩৩৮-১৩৫০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত) বঙ্গের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর মৃতবৎসা দোষ নিবন্ধন সন্তান হইয়া তৎক্ষণাৎ কালগ্রাসে পতিত হইত। পরে চিকিৎসকপ্রবর শ্রীহর্ষ সেনের ঔষধ প্রভাবে নবাব-পত্নী নিরাময় হইয়া অচিরে একটি পুত্র রত্ন লাভ করেন। এই জন্য নবাব ফকিরুদ্দীন পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীহর্ষকে সেনভূম প্রদেশের জমিদারী ও রাজা উপাধি প্রদান করেন। *

রাজা শ্রীহর্ষ সেনের পুত্র প্রথম কমল সেন, দ্বিতীয় বিমল সেন। ভরত-মল্লিকের মতে পিতার মৃত্যুর পর বিমল রাজা হন, কিন্তু রামকান্ত কবিকণ্ঠহার কমলকে রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বিমল পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া রাঢ় প্রদেশে আগমন করেন। এই বিমল সেনের পুত্র বিনায়ক সেন।

এই মহাপুরুষ বিনায়ক সেনের বংশে শতাধিক পণ্ডিত ও বিষয়ী লোক জন্মগ্রহণ করিয়া তৎকুলকে সমধিক চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন; এখন রাঢ়ে ও বঙ্গে তাঁহার বংশধরেরা বাস করিতেছেন; তাঁহারা পরিচয়স্থলে আপনাদিগকে "বিনায়ক-ধন্বন্তরি" বলিয়া উল্লেখ করেন।

পূর্ব্বতন সময়ে এই মহাকুলে কবিরাজ হরিচরণ কণ্ঠাভরণ, মহামহোপাধ্যায়

* সেন ভূমাবভূদ্রাজা ধন্বন্তরিকুলোদ্ভবঃ।
শ্রীহর্ষস্তস্যতনয়ঃ কমলো বিমলস্তথা ॥
(কণ্ঠহার কৃত কুলপঞ্জিকা, ৪৬ পৃষ্ঠা

তোগলক সাহার পরবর্ত্তী ফকিরুদ্দীন সলাদার।
গ্রহণ করিল রাঢ়াদির রাজ্যভার ॥
সে সময়ে ধন্বন্তরি গোত্র পুণ্যবান।
সেনভূমে শ্রীহর্ষ সেনের অধিষ্ঠান ॥
(অম্বষ্ঠকুলসম্পাদিকা)

সেনভূম বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটি পরগণা, পঞ্চকোটী রাজ্যের অন্তর্গত।

ভরত মল্লিক, গোবিন্দ সেন, রবি সেন মহামণ্ডল, মহেশ্বর সেন, (সুবুদ্ধিখান), সদাশিব কবিরাজ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বৎসর কাল মধ্যে সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন, মহারাজা রাজবল্লভ সেন, জপসার সাধক কবি লালা রামগতি, কবি জয়নারায়ণ, কবি রাজনারায়ণ, বিদুষী আনন্দময়ী, গঙ্গামণি, সোমরার রাজকল্প রামচন্দ্র সেন, রামভদ্র রায় প্রভৃতি বিখ্যাত মহাত্মারা জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।—'চন্দ্রপ্রভা' গ্রন্থে এই সব মহাপুরুষদের বিশদ পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। ভরতমল্লিক সম্বন্ধে (চন্দ্রপ্রভায়) লিখিত আছে :—

* * পরো ভরতমল্লীকো দ্বিজ-বৈদ্যাঙ্ঘ্রিসেবকঃ।
ভূরিশ্রেষ্ঠমহীপালসভাপণ্ডিত বিশ্রুতঃ।

মহেশ্বর সেন সম্বন্ধে আছে :—

* * পরো মহেশ্বর সেনো বিশ্বাসঃ সুচিকিৎসকঃ।
সুবুদ্ধিখান ইতি তো বিখ্যাতো গৌড়মণ্ডলে॥

বৈষ্ণব গ্রন্থোল্লিখিত নবাব হোসেন সাহ সম্বন্ধে প্রবাদ প্রচারিত আছে যে তিনি সুবুদ্ধিখানের নিকট চাকরি করিতেন, সেই সুবুদ্ধি রায় কি এই মহেশ্বর সেন ছিলেন? যেই হউন সুবুদ্ধি রায় গৌড়প্রদেশে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ধন ও বিদ্যাখ্যাতি ছিল। সদাশিব কবিরাজ নিত্যানন্দ প্রভুর জামাতার গুরু ছিলেন। এই বংশের অনেক ব্রাহ্মণ শিষ্য আছে।

পূর্ব্ব লিখিত বিনায়ক সেনের পুত্র রোষ সেন, তৎপুত্র সাও সেন ও তৎপুত্র সরণি সেন, এই সরণি সেনের পুত্র কৃত্তিবাস সেন। মহাত্মা ভরতমল্লিক তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

যঃ কৃত্তিবাসঃ। সরণেস্তনুজস্তস্যাত্মজাঃ পঞ্চ বভুবুরেতে।
গৌড়েশ্বরীয়স্য চ শূলপাণের্দাসস্য পুত্রীজঠরপ্রসূতাঃ॥
ত এব পূর্ব্বং **ধলহণ্ডগোষ্ঠীং** সমাশ্রিতাস্তত্র তদীয়বংশ্যাঃ।
স্থিতাশ্চিরং তে কুলশীলভাজস্তন্নামতোঽদ্যাপি মতাশ্চ সর্ব্বে॥
আদ্যঃ পশুপতির্জাতো দ্বিতীয়ো রঘুনন্দনঃ।
রত্নাকরস্তৃতীয়োঽতুন্মুরারিস্তু চতুর্থকঃ।

(চন্দ্রপ্রভা—৫০ পৃষ্ঠা।)

কৃত্তিবাস সেন ধলহণ্ড গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া তাঁহার বংশধরেরা ধলহণ্ডীয় নামে প্রসিদ্ধ হয়।

সাও সেন হইতে দশম পুরুষে কৃষ্ণরাম যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন উক্ত সাও সেন হইতে একাদশ পুরুষে রামেশ্বর সেন বর্ত্তমান ছিলেন। ভরত মল্লিক

তৎপ্রণীত গ্রন্থে রামেশ্বরের বিবাহ পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সন্ততি জন্মগ্রহণ করে নাই। এখন দেখা যাউক রামেশ্বরের বিবাহ হইতে তৎপৌত্র রামপ্রসাদ সেন কত বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মল্লিককৃত চন্দ্রপ্রভা নাম্নী বৈদ্যকুলপঞ্জিকা ১৫৯৭ শকের পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল। ভরত মল্লিকের স্বহস্ত লিখিত পুস্তকে উক্ত শক দেওয়া রহিয়াছে।

উহা গ্রন্থ সমাপ্তিকালের শক। **কবি রামপ্রসাদ সেন ১৬৪৪ শকের** (১৭২৩ খৃঃ অঃ) সমসাময়িক কালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় ৪৭ বৎসরের পূর্ব্বে তাঁহার পিতামহ রামেশ্বরের বিবাহ হইয়াছিল। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে রামেশ্বরের পুত্র রামরামের ও তৎপুত্র রামপ্রসাদের জন্ম হওয়া অসম্ভব ও অসঙ্গত মনে হয় না। অনেক ভাগ্যবানের পক্ষে চল্লিশের পূর্ব্বেও পৌত্র মুখ সন্দর্শন ঘটিয়া থাকে।

এই বংশ-পরিচয় হইতে সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, কেন কবিরঞ্জন আপনার বংশ-পরিচয় দিতে বলিয়াছেন :

ধন হেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধ মূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।

রামপ্রসাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে কিরূপ সর্ব্বগুণান্বিত লোক ছিলেন তাহা ভরত মল্লিক প্রণীত 'চন্দ্রপ্রভা' গ্রন্থের শ্লোকাবলী পাঠ করিলেই অনুভূত হইবে। কৃত্তিবাস সেনের পুত্র ছিলেন রত্নাকর সেন।

রত্নাকরের পুত্র নিত্যানন্দ, তৎপুত্র জগন্নাথ, তৎপুত্র যদুনন্দন, তৎপুত্র রঞ্জন তৎপুত্র রাজীব, তৎপুত্র জয়কৃষ্ণ, তাঁহার পুত্র রামেশ্বর। অতএব কৃত্তিবাস হইতে নবম পুরুষে রামেশ্বরের জন্ম হয়। আমরা বাহুল্য ভয়ে 'চন্দ্রপ্রভা' হইতে কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিলাম। কেবল রামপ্রসাদের বংশাবলী ঠিক রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় উদ্ধৃত করিলাম। কৃত্তিবাসের পরে অনেক মহাত্মা জন্মিলে তৎপর যে রামেশ্বরের জন্ম হয়, তাহা রামপ্রসাদও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন :

সেই বংশ সমুদ্ভূত, ধীর সর্ব্বগুণ যুত,
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরল হৃদয়॥

'চন্দ্রপ্রভা'র মতে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বংশলতা :

রাজা শ্রীহর্ষ সেন

(খ্রীষ্টিয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী)

বিমল
|
বিনায়ক
|
রোষ
|
নারায়ণ
|
সাঙ
|
সরণি
|
কৃত্তিবাস
|
রত্নাকর
|
নিত্যানন্দ
|
জগন্নাথ
|
যদুনন্দন
|
রঞ্জন
|
রাজীবলোচন
|
জয়কৃষ্ণ
|
রামেশ্বর
|
রামরাম
|
রামপ্রসাদ

(খৃষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দী

[রামপ্রসাদের পরবর্ত্তী বিস্তারিত বংশধারা অন্যত্র প্রদত্ত হইল] রামেশ্বর ধলহণ্ড পরিত্যাগ করিয়া কুমারহট্টবাসী হইয়াছিলেন। '—চন্দ্রপ্রভা' পাঠে অনুমিত হয় যে এই বিপুল বংশের মধ্যে প্রথমে জয়কৃষ্ণ হীনাবস্থায় পরিণত হন এবং এজন্য তিনি বাধ্য হইয়া কন্যাগুলিকে নীচবংশে সম্প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা কন্যাকে আবার কুমারহট্টবাসী জগদীশ দাশের সহিত বিবাহ দেন এবং হীনাবস্থায় পতিত হইয়া জয়কৃষ্ণের পুত্র রাঘবও নীচবংশে বিবাহ

করিয়া কুমারহট্টে কুটুম্বাশ্রয়ে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জগদীশ দাশ সম্পন্ন লোক না হইলে কখনও উচ্চ ঘরে বিবাহ করিতে পারিতেন না। ধনীর পক্ষে কুটুম্ব পরিপোষণ করাও অস্বাভাবিক কার্য্য নয়। "শিশুকালে পিতা মৈল রাজ্য নিল চোরে" রামপ্রসাদ এইরূপ একটি কথার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, সাধারণতঃ উহা পাঠে বোধ হয় যেন রামপ্রসাদের পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহারা হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দৈন্যের বিষয়ে তাঁহার প্রপিতামহ জয়কৃষ্ণের সময় হইতেই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রামপ্রসাদ সেন কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই স্বীয় জন্মভূমি কুমারহট্টকে বলিয়া গিয়াছেন—'ধরাতলে ধন্য সেই কুমারহট্ট গ্রাম।'

রামপ্রসাদ আত্ম-পরিচয়ে "পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল" কথা কেন স্ববংশের সহিত যোজনা করিয়া গিয়াছেন? তাহার অর্থ এই যে বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সিদ্ধ ও সাধ্য, এই দুইটি থাক আছে। ধন্বন্তরি, শক্তি, মৌদগল্য ও কাশ্যপ এই চারিটি সিদ্ধ গোত্র; কিন্তু কর্ম্মের হীনতা প্রযুক্ত সিদ্ধবংশ হইতে অনেকে সাধ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা মধ্যবিধ, তাহারা মৌলিক বলিয়া পরিগণিত হয়। রামপ্রসাদের বংশ এই সম্মৌলিক বাচ্য ছিল। সাধ্যবৎ ভাবনা হওয়া প্রযুক্ত এবং মূলবংশের শুদ্ধতা হেতু তিনি স্ববংশকে শুদ্ধমূল বলিয়া উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বলা বাহুল্য রামপ্রসাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ধনী ও কুলীন ছিলেন। তৎসময়ে শ্রেষ্ঠত্বের যে কয়টি লক্ষণ ছিল, তন্মধ্যে কুলকার্য্যপরায়ণতাও একটি। কবিরঞ্জন সেজন্যই নিজ বংশ পরিচয়ে 'পূর্ব্বাপর শুদ্ধ মূল' এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে বৈদ্যেরা কেবল জাতীয় চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে রাজকর্ম্মচারী ও ভূম্যধিকারী ছিলেন। 'চন্দ্রপ্রভা' পাঠে এবং সেকালের ইতিহাস আলোচনা করিলে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ থাকে না।

'চন্দ্রপ্রভা'র বহু স্থানে কুমারহট্টের উল্লেখ আছে। তাহাতে দেখা যায় কুমারহট্টে বঙ্গীয় সমাজেরও কোন কোন বৈদ্য বাস করিতেন এবং রাঢ়ীয় সমাজের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান করিতেন।

রামপ্রসাদের বিষয়ে ও তাঁহার বংশ সম্বন্ধে যে পরিচয় আমরা (অম্বষ্ঠ-সম্বাদিকা) ও 'কুলদর্পণ' নামক বৈদ্য-ব্রাহ্মণ কুলপঞ্জিকা এবং ঐতিহাসিক আনন্দ নাথ রায়ের প্রবন্ধ হইতে পাইয়াছি তাহা এখানে প্রকাশ করিলাম।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ১৩০৬ সনের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় আলোচিত হইয়াছে।

দশ

শ্রীনাথ করুণাসিন্ধু অকিঞ্চন দীনবন্ধু
দেখালেন পাদপদ্ম কল্প গাছে। —রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বংশ ছিল শাক্ত। তিনি বংশপরম্পরাক্রমে সেই শক্তি উপাসনা এবং শাক্ত ধর্ম্মের অনুরাগী হইয়াছিলেন।

শক্তি সাধকগণ সাধারণতঃ দুই সম্প্রদায় বিভক্ত। বীরাচারী ও পশ্বাচারী সাত্ত্বিক ও রাজসিক ভেদে বলিও দুই প্রকার। যে শক্তি সম্প্রদায় উপাসনার সময় অফুরন্ত সুরাপানাদি তান্ত্রিক-প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা বীরাচারী, তদ্ভিন্ন অন্য শাক্ত পশ্বাচারী বলিয়া অভিহিত হন। রক্ত মাংস বিবর্জিত বলির নাম সাত্ত্বিক বলি, অন্যথা পশ্বাদি 'মৃগাশ্ছাগশ্চ মেষশ্চ লুলাপঃ শূকরস্তথা। শাল্লসী শশকো গোধা কূর্ম্মঃ খড়্গীদশস্মৃতা।'

শক্তি উপাসনা বীরাচারী ও পশ্বাচারী। উৎসর্গের নাম রাজসিক বলি। বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার প্রভৃতি আচারের অনুমোদিত উপাসনা প্রক্রিয়াদি এস্থানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই, তন্ত্রশাস্ত্রে ও তান্ত্রিকদের নিকট সমুদয় আচারের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়।

শক্তি সাধকগণ গুরুবাদের পক্ষপাতী। তাঁহারা তান্ত্রিক মহাসিদ্ধ সাধকগণের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। আমাদের বঙ্গীয়সমাজে বিশেষতঃ অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বর্ণের ব্যক্তিগণ শক্তিমন্ত্রে বংশপরম্পরাক্রমে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছেন। রামপ্রসাদও নিশ্চয়ই কোন সাধক তান্ত্রিকের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কোন্ মহা সাধক তাঁহার গুরু ছিলেন তাহা জানা যায় না। একটি গানে আছে :

মনরে ওরে, শ্রীনাথ দত্ত, ধরতত্ত্ব কলের কপাট খোল না।
শুনেছি শ্রীনাথের কথা, বট চতুর্ব্বর্গ-দাতা।
সহস্রদল কমলে শ্রীনাথ অভয় দিয়ে বসে আছে।
আছে শ্রীনাথ দত্ত, পটল সত্ত্ব, মধ্যে মধ্যে ঐটি চাবা।

শ্রীনাথ বসতি তথা,
শ্রীনাথ করুণাসিন্ধু অকিঞ্চন দীনবন্ধু,
দেখালেন কালী পাদপদ্ম কল্পগাছে।

কেহ কেহ এই অংশ হইতে মন্ত্রদাতা গুরুর নাম 'শ্রীনাথ নির্দ্দেশ করেন। রামপ্রসাদের কতকগুলি পদাবলীতে 'শ্রীনাথ' উল্লেখ দেখা যায়। উপরোক্ত শ্রীনাথ কে? ব্যক্তি বিশেষের নাম শ্রীনাথ থাকিতে পারে, কিন্তু প্রসাদের 'শ্রীনাথ' কোন ব্যক্তির নাম বলিয়া মনে হয় না। কারণ কোথাও লৌকিক গুরুর নামোল্লেখ করিতে শিষ্যকে দেখা যায় না। সাধারণতঃ দেখা যায় শিষ্য গুরুদত্ত বীজমন্ত্রই জপ করেন। মন্ত্রদাতার নাম লোকসমাজে সকলকে শুনাইবার জন্য বড় একটা কিছু করেন না। প্রসাদ কি অর্থে "শ্রীনাথ" পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা আমরা এখানে আলোচনা করিব। অভিধানে 'শ্রীনাথ' বলিতে বিষ্ণুকে বুঝায়। তন্ত্রে আছে :—

'ব্রহ্মাবিষ্ণুশ্চরুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ'।
ততঃ পরশিবো দেবি ষট্ শিবায়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব (মহেশ্বর) ও পরশিব এই ছয় শিব কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন সহস্রারে পরমশিব নামে সপ্তম শিব আছেন। এই মন্ত্রানুসারে 'শ্রীনাথ' শিব অর্থেও গ্রহণ করা যায়। যাহা হউক "শ্রীনাথ" গুরু অর্থে গ্রহণ করাই বিশেষ সমীচীন কিনা আলোচনার বিষয়ীভূত। সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সুকঠিন। পূর্ণানন্দ স্বামীর 'ষট্চক্র নিরূপণে' আছে :—

'হুঙ্কারেণৈব দেবীং যমনিয়মসমভ্যাসশীলঃ সুশীলো
জ্ঞাত্বা শ্রীনাথবক্ত্রাৎ ক্রমমিতি চ মহামোক্ষবর্ত্ম কর্ম্ম প্রকাশম্।

টীকাকার কালীচরণ ও বিশ্বনাথ 'শ্রীনাথবক্ত্রাৎ' ব্যাখ্যায় বলেন :— 'গুরুবক্ত্রাৎ', 'গুরুপদেশং বিনা ক্রমজ্ঞানং ন ভবতি।' শ্রীনাথবক্ত্রাৎ গুরুবক্ত্রাৎ ক্রমং জ্ঞাত্বা। ষটচক্র বিবৃতিতে 'শ্রীনাথ' গুরুকেই বলা হইয়াছে। গুরুপদেশ ভিন্ন তান্ত্রিক সাধনক্রম জানিবার অন্য উপায় নাই। তান্ত্রিক সাধক শ্রীরামপ্রসাদ নিজ দেহে গুরুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সত্তাসাগরে আত্মসত্তা নিমজ্জিত করিয়া গুরুতত্ত্বে অনুরাগ এবং গুরুচরণে একান্ত ভক্তিবশতঃ 'শ্রীনাথ' এই বাক্য—'গুরু' অর্থে পদাবলীতে গ্রহণ করিয়াছিলেন—কারণ তিনি গুরু দেবতাকেই 'তত্ত্ব', 'চতুর্ব্বর্গ', 'অভয়', পটল সত্ত্ব প্রভৃতির মূল

বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং সেই আভাসই তিনি পদাবলীতে দিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে 'ভিক্টোরিয়াযুগে বাঙ্গলা-সাহিত্য' গ্রন্থে—লেখক তদীয় শ্রীরামপ্রসাদ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—প্রসাদের গুরু বা উত্তরসাধক কে, এ প্রশ্ন কাহারো কাহারো মনে হয়। আমরা বলি, মহাপুরুষেরা নিজেরাই নিজের গুরু—অথবা তাঁহাদের ইষ্টদেবতা স্বয়ং গুরুরূপে যথাসময়ে তাঁহাদের সম্মুখে আসেন। প্রসাদের গুরু—মা ব্রহ্মময়ী স্বয়ং, 'কৃপানাথ' নামে লৌকিক কোন গুরু থাকিলেও থাকিতে পারেন। তবে মা স্বয়ং তাঁহাকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস। কালীর কৃপা না হইলে কালীভক্ত শাক্ত কখন সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না।*

প্রকৃতপক্ষে রামপ্রসাদের দীক্ষাগুরুর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। কাজেই কোন লৌকিক গুরুর নিকট হইতে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন এমন কথা কেহ বলিতে পারেন না।

রামপ্রসাদ পরমেশ্বরী কালীকাকেই আপনার গুরুরূপে গ্রহণ করিয়া শাক্তমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সাধনা করিয়া গিয়াছেন। এ অনুমান সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়।

প্রসাদ ছিলেন বীর সাধক। তিনি ভোগবাসনার পথ হইতে দূরে থাকিয়া নিবৃত্তি পথের যোগপথে সূক্ষ্ম পঞ্চমকারের সাধনার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চ-মকারের সূক্ষ্মতত্ত্ব বিশ্লেষণে তন্ত্র বলেন:

'সোমধারা ক্ষরেদ্ যস্ত ব্রহ্মরুদ্রাদ বরাননে।
পীত্বানন্দময়ীং স্তং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ।'

মদ্য—

অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যে অমৃতধারা ক্ষরিত হয়, তাহা পান করিলে লোকে আনন্দময় হইয়া থাকে। ইহারই নাম মদ্য সাধক।

মাংস

'মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংসান্ রসনাপ্রিয়ে।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ॥'

অর্থাৎ মা রসনা শব্দের নামান্তর, বাক্য তদংশসম্ভূত; যে ব্যক্তি সতত উহা ভক্ষণ করে, তাহাকে মাংসসাধক বলা হয়। মাংসসাধক প্রকৃত প্রস্তাবে বাক্‌সংযমী মৌনী যোগী।

---

* ভিক্টোরিয়া যুগে বাঙ্গলাসাহিত্য—রায়সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত।

'গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা

তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ

অর্থাৎ গঙ্গা যমুনার মধ্যে দুইটি মৎস্য নিয়ত চরিতেছে, যে ব্যক্তি এই দুইটি মৎস্য ভোজন করে, তার নাম মৎস্যসাধক। ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীকে গঙ্গা ও যমুনা বলে। শ্বাস ও প্রশ্বাস এই দুইটি মৎস্য; কৃত কুম্ভক ব্যক্তিই প্রকৃত মৎস্য সাধক।

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ।

আত্মাতত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমং॥

সূর্য্যকোটি প্রতীকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলম্।

অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনী যুতম্।

যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে॥

অর্থাৎ শিরঃস্থিত সহস্রদল পদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকাভ্যন্তরে শুদ্ধ পারদতুল্য আত্মা আছেন। যদিও তাঁগার তেজ, কোটি সূর্য্যের ন্যায়, কিন্তু স্নিগ্ধতায় তিনি কোটি চন্দ্র তুল্য। এই পরম পদার্থ অতিশয় মনোহর এবং কুণ্ডলিনী শক্তি সমন্বিত,—যাঁহার এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তিনিই প্রকৃত মুদ্রা সাধক।

'কুলকুণ্ডলিনীশক্তিঃ দেহিনাং দেহধারিণী।

তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্ত্তিতম্॥'

অর্থাৎ সহস্রারে অবস্থিত পরমাত্মার সহিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সংযোগ-জনিত পরমানন্দ অনুভব করাকেই মৈথুনসাধন বলে।

বীর সাধক রামপ্রসাদ এই সূক্ষ্ম পঞ্চ-মকার তত্ত্বের সাধনা করিয়াছিলেন।

তন্ত্রে জীবের আকৃতি ও আসক্তি অনুযায়ী অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক প্রভৃতি বিবিধ বিধান আছে—রামপ্রসাদ ছিলেন বীরসাধক এবং সাত্ত্বিক মতাবলম্বী।

শ্রীরামপ্রসাদ তন্ত্রশাস্ত্র মতে বিশ্বদেবতারূপ সমস্ত জগৎ স্ত্রীময় ও পুরুষ শিব এইরূপ অভেদ চিন্তা করিতেন। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তিযোগের সাধক যাঁহারা তাঁহারাই তান্ত্রিক সাধক। যখন সত্যস্বরূপিণী ত্রিভুবন-মোহিনী জগন্মাতার রূপের শ্যাম সৌন্দর্য্যচ্ছায়ায় সাধকের হৃদয় ভরিয়া যায়, সাধকের দিব্য চক্ষু খুলিয়া গিয়া মা-ময় হইয়া উঠে, তখন এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড শিব ও মায়ের স্বরূপে মিলিয়া যায়। তন্ত্রে প্রাতঃস্মরণ, স্নানবিধি ত্রিপুণ্ড্র-

ধারণ, ভূশুদ্ধি, ভূতসিদ্ধি, প্রাণায়াম, সন্ধ্যা, পুরশ্চরণ, করঙ্গন্যাস, তত্ত্বস্থ তর্পণ প্রভৃতি নানা বিষয় বর্ণিত আছে। সর্ব্বদাই মলমূত্রযুক্ত পঞ্চভূতাত্মক জীবদেহ স্বভাবতঃই অশুদ্ধ। সেই অশুদ্ধ দেহের বিশুদ্ধির জন্যই তন্ত্রোক্তক্রিয়া কর্ম্মের বিধান; এই ক্রিয়া-কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সাধক শিব ও শক্তির উপাসনা করেন। এই জন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছেন :

'সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী,
সংসারবন্ধহেতুশ্চসৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী।'

সেই সনাতনী পরমাশক্তি ব্রহ্মবিদ্যারূপে মুক্তির কারণ এবং মায়ারূপে তিনিই একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ভগবানের পরিপূর্ণ শক্তি যিনি মহামায়ারূপে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন ও যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবাঙ-মনসগোচরা, সর্ব্বতন্ত্রময়ী নিত্যা, নিত্যানন্দস্বরূপা অধ্যাত্মদীপরূপিণী ত্রিধামজননী শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী মহাবিদ্যারূপে জীবের মোহ দূর করিয়া তাহাকে পরম সিদ্ধি দান করেন, সেই মহামায়া ও মহাবিদ্যাস্বরূপিণী পরমাশক্তির উদ্বোধনই তন্ত্রের সাধনা। এই পরমাত্ম-জ্ঞানের সাহায্যে অবিদ্যাদি সংস্কার নষ্ট হইয়া যায়, সর্ব্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হয় অর্থাৎ তখন সাধকের জীবমুক্ত অবস্থায়—

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥'

তন্ত্র সার্ব্বজনীন। তন্ত্র সর্ব্ববর্ণের ও সর্ব্বজাতির সেব্য,—তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে সকল জাতিরই সমান অধিকার আছে, তবে অধিকারীভেদে মন্ত্রভেদ ঘটে মাত্র। তান্ত্রিক সাধনায় জাতি বিচার নাই, তন্ত্রোক্তচক্রে ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেই যোগদান করিতে পারেন। পরন্তু জাতিভেদ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণীর জীবকে অধ্যাত্মতত্ত্বে উন্নীত করিয়া সাধনমার্গের পথিক করিবার জন্যই তন্ত্রশাস্ত্রের প্রবর্ত্তন। উপাসনাতত্ত্বে বিশ্বসারতন্ত্র উদার মত প্রচার করিয়াছেন :

অশুচৌ বা শুচৌ বাপি সর্ব্বকালেঽপি সর্ব্বদা।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা সর্ব্বকর্ম্মসু সিদ্ধয়ে॥

শুচি অশুচি নাই, কালাকাল নাই, যখন যেখানে যে অবস্থায় ও যে ভাবে থাকিবে, সেই অবস্থায় ও সেইভাবে পরাভক্তির সহিত সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য পূজা করিবে।

ভক্তিরসাত্মক তন্ত্র বহু প্রাচীন। বেদের মূলতত্ত্ব তন্ত্রে প্রকাশিত। ইহা কোন স্বতন্ত্র শাস্ত্র নহে; ইহা বেদেরই রূপান্তর,—বিশেষতঃ সাংখ্যদর্শন তন্ত্র

ও বেদ উপনিষদের সার। অধিকন্তু প্রকৃত তন্ত্রশাস্ত্র যে বেদসম্মত তাহারও প্রমাণ আছে :

'দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।
তথা সমস্ত শাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমম্॥
সর্ব্বকামপ্রদং পুণ্যং তন্ত্রং বৈ বেদসম্মতং॥'

অথর্ব্ববেদের সহিত তান্ত্রিক যন্ত্র ও মন্ত্রের সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মনুর টীকাকার কুল্লুকভট্ট লিখিয়াছেন :

বৈদিকী তান্ত্রিকীশ্চৈব দ্বিবিধা শ্রুতিকীর্ত্তিতাঃ। বৈদিকী ও তান্ত্রিকী এই দুই শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং কুল্লুকভট্টের মতে তন্ত্রকেও শ্রুতি বলা যাইতে পারে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দারাপহারী শত্রুর প্রতি তান্ত্রিক আভিচারিক মন্ত্র প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। বেদের সর্ব্বস্বময় সম্পত্তি-আদি বীজ প্রণবের উপর তন্ত্রোক্ত বীজ প্রতিষ্ঠিত। যথা :

বেদানাং প্রণবো বীজং অর্থাৎ প্রণবই বেদের বীজ। প্রণব তিন প্রকার যথা,—**অপরপ্রণব, পরপ্রণব ও মহাপ্রণব**। প্রণবের উপর তন্ত্রোক্ত বীজ প্রতিষ্ঠিত ও পরিপুষ্ট। দত্তাত্রেয়, বিশ্বামিত্র, শ্রীকৃষ্ণ, নারদ, গৌতম, কপিল, কাত্যায়ন প্রভৃতি সকলেই তন্ত্র-মন্ত্রে দীক্ষিত এবং সিদ্ধ ছিলেন। মহর্ষি কাত্যায়নের তপঃ প্রভাবে ভগবতী মহিষাসুর সংহারের জন্য আশ্বিনের শুক্লা ষষ্ঠীতে সায়ংকালে বিল্ব মূলে স্বয়ং তেজোময়ী কুমারী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূতা হইয়াছিলেন; সেই অবধি মহিষমর্দ্দিনী দেবী কাত্যায়নী নামে শরৎকালে অর্চ্চিতা হইয়া থাকেন। এই কাত্যায়ন ঋষিই যজুর্ব্বেদের তন্ত্র কর্ত্তা। সুতরাং তন্ত্র যে, বৈদিক কাল হইতে আর্য্যসমাজে প্রচলিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ আসিতে পারে না।

প্রণব-প্রতীক-ঈশ্বরোপাসনা ও উপনিষদ প্রতিপাদিত নিগূঢ়ভাবে অতি সরল ও হৃদয়গ্রাহী রূপে জীবতত্ত্বের সহিত ঐক্য করিয়া তন্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তন্ত্রের যোগতত্ত্ব ব্যতিরেকে যোগদর্শনের জ্ঞানলাভ একরূপ অসম্ভব। সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব প্রভৃতি যাহা কিছু নিখিল শাস্ত্রের সারতত্ত্ব, সেই সমুদয়ের অভিব্যক্তি সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে তন্ত্রে বিকাশ লাভ করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলা তান্ত্রিক পঞ্চমকার সাধনারই অভিব্যক্তি। তান্ত্রিক পঞ্চম তত্ত্বের দ্বারা উপাসনার বিধান প্রদান করিয়া বলিয়াছেন :

"পূজয়েৎ বহু যত্নেন পঞ্চতত্ত্বেন কৌলিকঃ।
মকারপঞ্চকং কৃত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় :

রন্তু মনশ্চক্রে যোগমায়া মুপাশ্রিতঃ ॥

যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া আত্মাকায় হইয়াও রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি কামের অধীন হইয়া রাসলীলা করেন নাই। কাম-বিজয়ের জন্যই রাসলীলা। নিবৃত্তিপরায়ণ তান্ত্রিক সাধক ও ভোগ সাধন বস্তুনিচয়ের সহিত ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা নিজ নিজ প্রকৃতি ও আসক্তি অনুযায়ী পঞ্চমকারে সাধন করেন। রাসলীলার ন্যায় এই মকার সাধনায়ও কামগন্ধ নাই। ইহাই হইতেছে তত্ত্বকথা। তন্ত্রে যে

'মদ্য মাংস তথা মৎস্য মুদ্রা মৈথুনমেবচ।
—ম-কার পঞ্চকং কৃত্বা পুনর্জ্জন্ম ণ বিদ্যতে।'

—এই পঞ্চমকার সাধনের নিগূঢ় তত্ত্ব পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রামপ্রসাদ লোকের কথার ছলে আপনার মূল সাধনতত্ত্ব বিস্মৃত হন নাই, তাই গাহিয়াছিলেন :

'মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে ॥
সে যে ভাবের বিষয় ভবে অতীত।
অভাবে কি ধর্ত্তে পারে ॥

প্রসাদ অন্তর মধ্যে তাঁহার শ্যামা জননীকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাই বলিয়াছেন :

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা ॥

এতবড় বিশ্বাস ও ভক্তি যাঁহার তাঁহার ন্যায় সিদ্ধ পুরুষ কোথায়? যিনি আরাধ্যা দেবীকে অন্তরে রাখিয়াছেন, কি সাধ্য তিনি অন্তরে থাকিতে পারেন?

আমরা নিম্নে যে দু'টি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন কতবড় সাধক ছিলেন রামপ্রসাদ :

সেকি শুধু শিবের সতী।
যার কপালে কাল করে প্রণতি ॥
ষটচক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি।
সে যে সর্ব্বদলের দলপতি,
সহস্রদলে করে স্থিতি ॥

আবার বলিতেছেন :

শমন আসার পথ ঘুচেছে।
আমার মনের সন্ধ দূরে গেছে॥
ওরে আমার ঘরের নব দ্বারে, চারি শিব চৌকি রয়েছে।
এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে, তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে॥
সহস্রদল কমলে শ্রীনাথ, অভয় দিয়ে বসে আছে॥
দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা, চৌকিদারী ভার লয়েছে।
সে শক্তির জোরে চেতন করে তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে॥
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে কণ্ঠমূলে ভুরুমাঝে।
এ চারিস্থানে চারি শিব, নব দ্বারে চৌকী আছে॥
রামপ্রসাদ বলে এই ঘরে, চন্দ্র-সূর্য্য উদয় আছে।
ওরে তমোনাশ করি তারা হৃদ-মন্দিরে বিরাজিছে।

রামপ্রসাদ তাঁহার সঙ্গীতে যে ষট্‌চক্র ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন এখানে তাহার কথা বলিতেছি :

তন্ত্র বলেন :—

"মূলাধারে ত্রিকোণাখ্যে ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মকে।
মধ্যে স্বয়ম্ভুলিঙ্গন্তু কোটী সূর্য্য সমপ্রভং॥
তদূর্দ্ধে কামবীজন্তু কলশান্তীন্দুনাদকং
তদূর্দ্ধে তু শিখাকারা কুণ্ডলী ব্রহ্মবিগ্রহা।
তদ্বাহ্যে হেমবর্ণাভং বসবর্ণং চতুর্দ্দলং॥
দ্রুত হেম সমপ্রখ্যং পদ্মং তত্র বিভাবয়েৎ।
তদূর্দ্ধেঽগ্নিসমপ্রখ্যং পদ্মং ষড়দলং হীরক প্রভং॥
বাদিলান্ত ষড়র্ণেন যুক্তাধিষ্ঠান সংজ্ঞকং।
মূলমাধারষট্‌কানাং মূলাধারং ততোবিদুঃ॥
স্বশব্দেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততোবিদুঃ।
তদূর্দ্ধেনাভিদেশেতু মণিপূরং মহৎপ্রভং॥
মেঘাভং বিদ্যুদাভঞ্চ বহুতেজোময়ং ততঃ।
মণিবদ্ভিন্ন তৎপদ্মং মণিপূরং তথোচ্যতে॥
দশভিশ্চ দলৈর্যুক্তং ডাদি কান্তাক্ষরান্বিতং।
শিবেনাধিষ্ঠিতং পদ্মং বিশ্বালোকৈককারণং॥

তদূর্দ্ধেঽনাহতং পদ্মমুত্তাদাদিত্য সন্নিভং।
কাদিষ্ঠান্তাক্ষরৈরর্ক পত্রৈশ্চ সমধিষ্ঠিতং॥
তন্মধ্যে বাণলিঙ্গস্তু সূর্য্যাযুতসমপ্রভং।
শব্দ ব্রহ্মময়ং শব্দোহনাহতস্তত্রদৃশ্যতে॥
তেনাহতাখ্যং পদ্মং তন্মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতং।
আনন্দসদনং তত্তু পুরুষাধিষ্ঠিতং পরং॥
তদূর্দ্ধস্তু বিশুদ্ধাখ্যং দল ষোড়শ পঙ্কজং।
স্বরৈ ষোড়শকৈর্যুক্তং ধুম্রবর্ণে মহৎপ্রভং॥
বিশুদ্ধিং তনুতে যস্মাৎ জীবস্যহংসলোকনা।
বিশুদ্ধং পদ্মমাখ্যাতমাকাশাখ্য মহাদ্ভুতং॥
আজ্ঞা চক্রং তদূর্দ্ধে তু আত্মনাধিষ্ঠিতং পরং।
আজ্ঞাসংক্রমণং তত্র গুরোরাজ্ঞেতি কীর্ত্তিতং॥

ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামে তিনটি নাড়ী আছে। শরীরস্থ মেরুদণ্ডের বাম দিকে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যে সুষুম্নার অবস্থিতি। তন্মধ্যে সুষুম্না মেরুদণ্ড-বাহিনী। মধ্যে সূক্ষ্মা বজ্রাখ্যা এবং বজ্রাখ্যার অভ্যন্তরে সূক্ষ্মতরা চিত্রিনী নাড়ী বিরাজিত। নাড়ীসন্নিবেশের সমষ্টি বা আবর্ত্তকে নাড়ীচক্র কহে। নাড়ীর ছয়টি চক্র আছে। ১। মূলাধার, ২। স্বাধিষ্ঠান, ৩। মণিপুর, ৪। অনাহত, ৫। বিশুদ্ধ, ৬। আজ্ঞাখ্য। এই ছয় চক্রের বৃত্তান্ত, উপরি উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। এই ছয় চক্রের মধ্যে মূলাধার গুহ্যদেশে অবস্থিত। উহা চতুর্দ্দল, উহাতে লিঙ্গরূপী মহাদেব অবস্থিত এবং তাঁহার সুধাক্ষরণ স্থলে মুখ সংলগ্ন করিয়া সর্পাকারা কুণ্ডলিনী শক্তি সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন। স্বাধিষ্ঠান নামক পদ্ম, লিঙ্গমূলে অবস্থিত। ইহা ষড়্দল, ইহাতে বারুণী নাম্নী শক্তি বিরাজ করিতেছেন। মণিপুর পদ্ম নাভিদেশে অবস্থিত; মণিপুর ভিন্ন, ইহার দশদল ও তন্মধ্যে ত্রিকোণ অগ্নিমণ্ডল ও তন্মধ্যে শিব অধিষ্ঠিত। ইহাতে লাকিনী শক্তি থাকেন। আহত পদ্ম হৃদয়ে স্থিত ও দ্বাদশদল। ইহাতে বাণলিঙ্গ ও কাকিনী শক্তি বিরাজ করিতেছেন। বিশুদ্ধ নামক পদ্ম কণ্ঠে স্থিত। ইহা ষোড়শ দল, ইহাতে জীব হংসাবলোকন করে ও ইহা শাকিনী শক্তির স্থিতি স্থল। আজ্ঞাখ্য পদ্ম ভ্রূ মধ্যে অবস্থিত ও দ্বিদল। ইহাতে ত্রিকোণাকৃতি মধ্যে শিব বিরাজিত হাকিনী শক্তি বাস করেন। এই ছয় চক্র ভেদ করিলে কৈলাস ও বোধিনী মধ্য দিয়া ব্রহ্মতালুতে অবস্থিত সহস্রদল মধ্যে পরমহংস শিব বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমে বায়ুযোগে ও অন্তর্ব্বর্ত্তী অগ্নির আনুকূল্যে মূলাধার পদ্মের কুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্বোধিত ও ধ্যান বলে সচেতন করিয়া সুষুম্নার চিত্রিণী নাড়ী অবলম্বনে ক্রমশঃ ছয়টি পদ্ম ও তিনটি শিবকে ভেদ করিয়া সহস্রদলস্থিত পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত করিতে হইবে। পরে ঐ মিলনে যে পরমামৃত নিঃসৃত হইবে, তাহা পান করিয়া পুনরায় পূর্ব্বতিক্রান্ত পথ দিয়া সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধার পদ্মে আনয়ন করিতে হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম ষট্‌চক্রভেদ। এই সব প্রক্রিয়া গুরু সাহায্য ব্যতীত করা সম্ভব নহে। ষট্‌চক্রভেদ প্রণালী গুরূপদেশ সপেক্ষ। নতুবা হিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনাই বেশী।

রামপ্রসাদ এই ষট্‌চক্রভেদের কথা নিজে বুঝিয়া একটি সঙ্গীতে অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ষট্‌চক্র বর্ণন

আমার মনের বাসনা জননি !

ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে, হ, ল, ক্ষ, ব্রহ্মরূপিণী ॥

মূলে পৃথী ব, স, অন্তে, চারি পত্রে মায়া ডাকিনী।

সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে শিরে ঘেরে কুণ্ডলিনী ॥

স্বাধিষ্ঠানে ব, ল, অন্তে ষড়দলোপরবাসিনী।

ত্রিবেণী বরুণ, বিষ্ণু, শিব ভৈরবী ডাকিনী ॥

ত্রিকোণ মণিপুরে, বহ্নিবীজধারিণী।

ড, ফ, অন্তে দিগদলে, শিব ভৈরবী লাকিনী ॥

অনাহতে ষট্‌কোণ, দ্বিষড়দলবাসিনী।

ক, ঠ, অন্তে বায়ুবীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী ॥

বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ ষোড়শদল পদ্মিনী।

নাগোপরি বিষ্ণু আসন, শিবশঙ্করীশাকিনী ॥

ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে মম, শিবলিঙ্গ চক্রযোনী।

চন্দ্রবীজে সুধা ক্ষরে, হ, ক্ষ, বর্ণে হাকিনী ॥

আবার ষট্‌চক্রভেদ সঙ্গীতে, কিভাবে সাধকের ষট্‌চক্রভেদ করিতে হয়, সে কথা বলিয়াছেন।

ষট্‌চক্র ভেদ

কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী তারা তুমি আছ গো অন্তরে,

মা আছ গো অন্তরে।

এক স্থান মূলাধার আর স্থান সহস্রার,
আর স্থান চিন্তামণিপুরে।
শিব শক্তি সব্যে বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে॥
ভুজঙ্গ রূপা (বা ভুজঙ্গণা) লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা,
এই ধ্যান করে ধন্য নরে।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান,
অনাহতে বিশুদ্ধাখ্য বরে॥
বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স, ব, ল, ড, ফ, ক, ঠ,
ষোল স্বর কণ্ঠায় বিহরে।
হ, ক্ষ, আশ্রয়-ভুরু, নিতান্ত কহিলা-গুরু
চিন্তা এই শরীর ভিতরে॥
ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি,
ক্রমে বাস পদ্মের উপরে।
গজেন্দ্র মকর আর, মেষবর কৃষ্ণসার,
আরোহণ দ্বিতীয় কুঞ্জরে॥
অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ,
গুঞ্জে মত্ত মধুব্রত স্বরে।
ধরা জল বহ্নি বাং, লয় হয় অচিরাৎ,
যং রং লং বং হং হোং স্বরে॥
ফিরে কর কৃপা দৃষ্টি, পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি,
চরণযুগলে সুধা ক্ষরে।
তুমি নাদ, তুমি বিন্দু, সুধাধার যেন ইন্দু,
এক আত্মা ভেদ কেবা করে॥
উপাসনা ভেদাভেদ, ইথে কোন নাহি খেদ,
মহাকালী কাল পদ ভরে।
নিদ্রা ভাঙ্গে যার ঠাঁই, তার আর নিদ্রা নাই,
থাকে জীব শিব কর তারে॥
মুক্তি কন্যা তারে ভজে, সে কি (আর) বিষয়ে মজে,
পুনরপি আসিয়া সংসারে।

আজ্ঞাচক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ,

হংসীরূপে মিল হংসবরে ॥

চারি ছয় দশ বার, ষোড়শ দ্বিদল আর,

দশশতদল শিরোপরে।

শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনি প্রসাদের কথা,

যোগী ভাসে আনন্দ সাগরে ॥

রামপ্রসাদের এই সব সঙ্গীত হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে তিনি ষট্‌চক্র সাধন দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ষট্‌চক্র সাধনায় যোগীগণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্ফূর্তিরূপ এই সময় আনন্দের পূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে। তান্ত্রিকী সাধনার ইহাই অন্তর্যা, সাধক 'মাল্যং পদ্ম সহস্রস্তু মনসা প্রস্তুতি' মনঃকল্পিত সহস্র-পদ্মের মাল্য ইষ্টদেবতাকে প্রদান করেন। ষট্‌চক্র সাধন-প্রণালীর অন্তর্গত মানস পূজা সম্বন্ধে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

মহাসাধক রামপ্রসাদ—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই ষট্ চক্র বিভাবন পূর্ব্বক হৃদয়ে সহস্রদল পদ্মস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তি বেষ্টিত রাজরাজেশ্বরী ব্রহ্মময়ী মহাকালীর বিরাট তত্ত্ব অবগত হইয়া চৈতন্যময়ী দেবীর সৌন্দর্য্য সাগরে ডুবিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া মা—মা বলিয়া সুধাকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন :—

কালী বল মনরে।

(পাঠান্তর) (কালী কালী বল রসনারে)

ও মন ষট্‌চক্র রথমধ্যে, শ্যামা মা মোর বিরাজ করে ॥

তিনটে কাছি কাছাকাছি, যুক্ত বাঁধা মূলাধারে।

পাঁচ ক্ষমতার সারথি তার রথ চলে দেশদেশান্তরে ॥

ঘুড়ি ঘোড়া দৌড় কচ্চে দিনেতে দশকুশী মারে।

সে যে সময় শির নাড়িতে নারে কলে বিকল হলে প'রে ॥

তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করো নারে।

ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈসে শীতল হবে অন্তঃপুরে ॥

পাঁচজনে পাঁচ স্থানে গেলে, ফেলে রাখবে প্রসাদেরে।

ও মন এই ত সময় মিছে কাল যায় (যত) ডাকতে পার দু-অক্ষরে ॥

শ্রীরামপ্রসাদ তন্ত্রোক্ত ষট্ চক্র সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মহামায়া চৈতন্য-স্বরূপিনী মহেশ্বরীর উপাসনা করিতে করিতে মাকে অন্তরে ও বাহিরে লাভ করিয়া সম্পূর্ণরূপে মায়ের চরণে দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। পার্থিব

জননীকে যেমন সাক্ষাৎরূপে পাইয়া সন্তান কতই না আবদার করেন,—প্রসাদও তেমনি ভাবে মাতৃভক্তির মহাভাবতন্ময়তায় হৃদয় মনে প্রাণে পাইয়াছিলেন চৈতন্যরূপিণী প্রেমময়ী আনন্দময়ী জগজ্জননীর কাছে, তাইত সাধক প্রসাদের এত নির্ভর, এত আবদার ও বিশ্বাস, ভক্ত কণ্ঠ ছাড়িয়া গাহিলেন :

হৃৎ কমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী (শ্যামা)
মন পবনে দুলাইছে দিবস রজনী (ওমা)।
ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা।
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ওমা॥
আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে মায়।
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ওমা॥
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল।
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী ওমা॥

রামপ্রসাদ ব্যতীত কে এমন বাণী বলিতে পারেন ? সাধক তাঁহার আরাধ্য দেবীকে লাভ করিয়াছেন—তাই আনন্দময় চিত্তে গাহিয়াছেন :

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর-অম্বরে।
নৃত্যতি মানস শিখা কৌতুকে বিহরে॥
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধারাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি তড়িৎ শোভা করে॥
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ চাতকের তৃষা ভয় ঘুচিল সত্বরে॥
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম হবে না জঠরে॥

ভক্তের হৃদয়ে কালো মেঘের উদয় হইয়াছে। তাই মানস-শিখী আনন্দ-কৌতুকে নৃত্য করিতেছে। মা—মা ধ্বনি শোনা যাইতেছে, দিকে দিকে তড়িতের মত উজ্জল মধুর প্রেমানন্দের হাসি বিকাশ পাইয়াছে অন্তর-অম্বরে, প্রেমাশ্রু আনন্দে ঝর্ ঝর্ ধারে ঝরিয়া পড়িতেছে, পিপাসী চাতকের তৃষ্ণা মিটিল, —রামপ্রসাদের আর কিসের ভয়—বহু জন্মের পরে আজ তাঁহার এই জন্ম সার্থক, কননা মায়ের কোলে যে আশ্রয় পাইয়াছে তাঁহার কি আর পৃথিবীর এই মর ংসার-বুকে জন্ম হইতে পারে ? সে যে মায়ের কোল লাভ করিয়াছে।

শাস্ত্রে আছে—'মনুষ্য দিগের কর্ম্মানুসারে জন্ম হয়। কর্ম্মানুযায়ী মানুষ বন ধারণ করে এবং ইহকালের দেহত্যাগান্তর পরকালে শুভ বা অশুভ

কর্ম্মফলে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। সত্য ও দান, ধর্ম্ম ও নিষ্ঠা যাহার তাহার কি আর জন্মগ্রহণের কোন বাসনা থাকিতে পারে—সেই জন্যই ত্রিভুবন-ব্যাপিনী জননীর মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন—সাধক রামপ্রসাদ। তাঁহার কাছে মা কেমন? শ্যামা-মা কি ভাবে তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেন সে পরিচয় পাই তাঁহার সঙ্গীত-সুরতরঙ্গিনীর কলগতির সুমধুর কলতানে। আমরা দেখিতে পাই জগৎ, ব্রহ্ম, জীব সম্বন্ধে শ্রীরামপ্রসাদের ধারণা কিরূপ ছিল, তাহা তাঁহার পদাবলী হইতেই বুঝিতে পারি। প্রসাদ গাহিয়াছেন:

> অপরা জন্মহরা জননী।
> অপারে ভব সংসারে এক তরণী॥
> অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব, ভেদভাবে শিবা শিব।
> উভয়ে অভেদ পরমাত্মাস্বরূপিণী।
> মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনাহেতু কায়া।
> দীনদয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী।

রামপ্রসাদ শিব ও শিবার পুরুষ ও প্রকৃতির শক্তিমান্ ও শক্তির অর্থাৎ ব্রহ্ম ও মায়ার পরমার্থিক ভাবে স্বরূপতঃ অভিন্নতা স্বীকার করিয়া নিয়াছেন—কিন্তু "বেদান্ত প্রতিপাদ্য অদ্বৈততত্ত্বরূপে সময় সময় তাঁহার ব্রহ্মোপলব্ধি হইলেও তিনি জ্ঞানযোগে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক দ্বারা যোগমার্গে চিত্তবৃত্তির নিরোধ দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের পক্ষপাতী ছিলেন না। করুণাময়ী জন্মহরা আদি জননীর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া মায়াতীত হইয়াও তিনি ভক্ত সন্তানের উদ্ধারের নিমিত্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই বিশ্বজননীর প্রকট বিগ্রহের উপাসনা জ্ঞানে ভক্তিপথে অগ্রসর হইয়াও তিনি পরমার্থ সিদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন:

> বেদবাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য।
> সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য॥
> প্রসাদ বলে কালরূপে সদা মন ধায়।
> যেমন রুচি তেমনি কর নির্ব্বাণ কে চায়॥

এই গানটিতে শ্রীরামপ্রসাদ একদিকে যেরূপ স্বীয় উপাস্য দেবতার রূপ-ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকিবার নিমিত্ত একটি প্রগাঢ় ঐকান্তিকতার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি রুচিভেদে যাঁহারা জ্ঞানপথে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া অথবা যোগবলে অব্যক্ত তত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিয়া কৈবল্য

বা নির্বাণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহাদের প্রতি উদারতার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

রামপ্রসাদের কণ্ঠে সেইজন্যই শুনিতে পাই :

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
যে দেশেতে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি।
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে ঘুমেরে ঘুম পাড়িয়েছি॥
সোহাগায় গন্ধক মিশায়ে সোনাতে রং ধরায়েছি।
মণি-মন্দির মেঝে দিব মনে এই আশা করেছি॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথায় রেখেছি।
এবার শ্যামা নাম ব্রহ্মজেনে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি॥

এই আত্মনির্ভর ও আত্মসমর্পণ রামপ্রসাদের ভক্তির ছিল বিশেষত্ব। সেই জন্যই ভক্ত সাধক প্রসাদ গাহিয়াছিলেন :—

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর অম্বরে।
নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে॥

সেই লীলাময়ী আদরিণী মহাকালীর কালমেঘরূপ মহাভাব প্রসাদের হৃদয়াকাশে উদিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া লৌকিক মেঘোদয়ে কলাপীর ন্যায় ভক্তের মন প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছে, যে আনন্দের সহিত বিষয়-ভোগজনিত ক্ষণস্থায়ী আনন্দের তুলনা হয় না। অন্ধকার রজনীতে আকাশের গায়ে মেঘ সঞ্চিত হইলে চন্দ্রের সহিত অপরাপর গ্রহ নক্ষত্র একেবারে ঢাকিয়া যায়, সেইরূপ যখন সাধকের হৃদয় ইষ্টদেবতার ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, যখনই পরমাত্মারূপী আমিই এই জগৎ, আমার সত্তাই জগতের সত্তা, তদ্ভিন্ন জগতের আর পৃথক সত্তা নাই—এইরূপ যথার্থ সত্য জ্ঞানের দ্বারা জগতের আর পৃথক সত্তা নাই—এইরূপ যথার্থ সত্য জ্ঞানের দ্বারা জগতের সত্যতা ঢাকিয়া ফেলা হয়, তখন প্রবৃত্তির বহির্মুখী ক্রিয়া থাকে না এবং বহির্মুখী ক্রিয়া না থাকিলে সাধকের মন-প্রাণ অনির্ব্বচনীয় প্রেমানন্দ রসে ডুবিয়া যায়।

সেই অবস্থায় সাধকের হৃদয়,

'নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে'

তখনই সাধক পরিপূর্ণ আনন্দ-বিভোর চিত্তে দৃঢ়নিষ্ঠ মনে গাহেন :

ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে,
রামপ্রসাদ বলে আমার জন্ম, হবে না জঠরে।

এই ভাবেরই প্রতিধ্বনি মুণ্ডকোপনিষদে আছে :

ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ,
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।

অর্থাৎ সেই পরাবর ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে পরদ্রষ্টার অবিদ্যাদি সংস্কার নষ্ট হইয়া যায়, সর্ব্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং প্রারব্ধ ভিন্ন কর্ম্মরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তখন ভক্ত ও কবির কণ্ঠে সমভাবে গীত হয় : বিশ্বপ্রকৃতি ও অন্তর্প্রকৃতির অপরূপ মাধুর্য্য মাখা ও অসীমের অনন্ত প্রকাশ।

রামপ্রসাদের নৃত্যতি মানস-শিখী কৌতুকে বিহরে পড়িতে পড়িতে আপনা হইতেই মনে পড়ে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের,

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচেরে!
শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ,
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচেরে।
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচেরে

এগার

মা ভক্ত ছলিতে নেবে এলেন,

বেঁধে গেলেন ঘরের বেড়া। —রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদ গান রচনা করিতেন তাঁহার মায়ের জন্ত। করুণাময়ী জগজ্জননী ছিলেন প্রসাদের কাছে তাঁহার ইহলোকের দেহধারিণী জননীরই মত,—তাই সাধকের সেই জগৎজননী চিরস্নেহময়ীর চরণেই ছিল সমুদয় আশা ও নির্ভর, 'সরল ভাবে, সোজা কথায়, হৃদয়ের সুরে তিনি মাকে আপনার সুখ-দুঃখ জানাইয়াছেন—মায়ের উপর কখনও অভিমান করিয়াছেন, কখনও তাঁহার চিরপ্রসারিত বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়াছেন, মাতৃস্নেহে পূর্ণ হৃদয় লইয়া মরণের বিভীষিকাকে অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছেন। সেই জগৎ-জননী চিরস্নেহময়ীর চরণেই রামপ্রসাদের সকল আশা ভরসা। রামপ্রসাদ এইরূপ নির্ভরশীল ছিলেন বলিয়াই তাঁহার জীবনে অনেক অলৌকিক কাহিনীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক মহাপুরুষ ও সাধকের জীবনে ঐরূপ পরিচয় পাই। আমরা এখানে তাহারা কয়েকটি কাহিনী বলিব।

শ্রীরামপ্রসাদ প্রতিদিন প্রত্যূষে ষোড়শোপচারে মাতৃনাম জপ করিতে করিতে মায়ের পূজা করিতেন। ধ্যান করিতে করিতে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতেন, তখন তাঁহার মনে বহির্জগতের কোন সম্বন্ধ থাকিত না। তিনি কিছু মাত্র দেখেন না, বলেন না, গন্ধ আঘ্রাণ করেন না তদগতচিত্ত হইয়া থাকিতেন।

একদিনের কথা। শ্রীরামপ্রসাদ শ্যামামায়ের মন্দিরে পূজা করিতেছেন। পুষ্প, ধূপ, জল, হোম প্রভৃতির দ্বারা পূজা করিতেছিলেন। সেইদিন তাঁহার মনে বড় সাধ হইল যে পদ্ম ফুল দিয়া জগৎজননীর চরণ পূজা করিবেন। মাকে পদ্মফুল দিয়া পূজা করিতে না পারিলে তাঁহার প্রাণ কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে-ছিল না। প্রসাদ শিশুর মত কাঁদিয়া মাকে বলিলেন:—মা, মা, তুই সত্য, তুই সর্ব্বনিয়ন্তা তোর ভিতরেই না জগৎ বিধৃত হইয়া আছে, তুই আমার বাসনা পূর্ণ করে দে মা, তোর রাঙ্গা চরণে পদ্মফুলের অঞ্জলি দিবার জন্ত আমার প্রাণ যে বড়ই ব্যাকুল মা। বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষু হইতে দরদরধারে

অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন সাধকের প্রাণের ভিতর কে যেন সাড়া দিয়া বলিল—'প্রসাদ, তুমি একটি কাজ কর, ঐ যে তোমার বহির্ব্বাটির এক কোণে গাছটি দেখিতেছ উহা হইতে পদ্মফুল লইয়া আইস', প্রসাদ মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন পদ্মফুলের গাছ কোথায়ও নাই সেখানে একটি গাব গাছ আছে। গাব গাছে কি কখনও পদ্মফুল ফোটে?—প্রসাদের মনে কোনরূপ সন্দেহ জাগিল না, তিনি গাব গাছের উপর উঠিয়া দেখিলেন, কি যেন কি অলৌকিক শক্তি প্রভাবে গাবগাছের মাথায় শত শত পদ্মফুল ফুটিয়া উঠিল। প্রসাদ আনন্দে অধীর হইলেন, তিনি হাসিমুখে সাজি ভরিয়া পদ্মফুল তুলিলেন। এবং প্রাণ ভরিয়া ভক্তি-গদগদচিত্তে স্নেহময়ী বিশ্বজননীর পূজা সমাপন করিলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে আনন্দে সুরের মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইল।

ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।

আশ্চর্য্য কিছুই নয়। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে, ধনপতি সওদাগর সিংহল যাত্রা পথে যাইতে যাইতে

উপনীত হৈল সাধু নিমাই তীর্থ ঘাটে।
নিম্ব বৃক্ষেতে যথা ওর পুষ্প ফুটে!

রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধিতেছেন। ঘরের বেড়া খসিয়া পড়িতেছে। না বাঁধিলে চলেনা। তাই প্রসাদ বেড়া বাঁধিতেছেন। জগজ্জননীর পূজার আসন যেখানে প্রতিষ্ঠিত, সে ঘরের বেড়া বাঁধিবেন। দুপুর বেলা কন্যা জগদীশ্বরীকে ডাকিয়া বলিলেন:—মা চল্‌তো আমার সঙ্গে মায়ের ঘরের বেড়ার বাঁধগুলি ফিরায়ে দিবি।

জগদীশ্বরী বলিল: চল বাবা।

পিতা ও কন্যা মায়ের পূজামণ্ডপ গৃহে আসিলেন। প্রসাদ বেড়া বাঁধিতেছেন, আর দিক্ হইতে কন্যা জগদীশ্বরী বাঁধগুলি ফিরাইয়া দিতেছেন। এইভাবে বেড়া বাঁধা চলিতেছে, রামপ্রসাদও বেড়া বাঁধিবার সঙ্গে সঙ্গে গান গাহিয়া চলিয়াছেন। বেড়া বাঁধাও চলিতেছে। ক্ষুদ্র বালিকা জগদীশ্বরী বাঁধ ফিরাইয়া দিতে দিতে কোন্ সময় যে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গিয়া সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলা করিতেছিল, প্রসাদ ইহা জানিতেন না, তিনি তখন মায়ের নাম কীর্ত্তনে বিভোর ছিলেন। কোন্ জগদীশ্বরী যে তাঁহার বেড়ার বাঁধ আর দিক্ হইতে ফিরাইয়া দিতেছিলেন, প্রসাদ তাহা কেমন করিয়া বুঝিবেন? জগদীশ্বরী কিছুক্ষণ পর ফিরিয়া আসিয়া দেখিল বেড়া বাঁধা প্রায় শেষ হইয়াছে। সে চারিদিকে

চাহিয়া দেখিল নিকটে কেহই নাই, পিতা গান গাহিতেছেন আর বেড়া বাঁধিয়া চলিয়াছেন, তখন সে বিস্মিত হইয়া পিতাকে বলিল—বাবা, একি ! তোমার বেড়া বাঁধাত প্রায় শেষ হইয়াছে। কে তোমাকে বাঁধ ফিরাইয়া দিলে ? তখন প্রসাদ বলিলেন, 'কেন মা, তুইইত বেড়ার দড়ি ফিরিয়ে দিচ্ছিলি ?'

জগদীশ্বরী, পিতার কথায় বিস্মিত হইয়া বলিল : না, বাবা, আমিত অনেক-ক্ষণ এখানে ছিলাম না।

কন্যার কথা শুনিয়া প্রসাদ বিস্মিত হইলেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল,—তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এযে তাঁহার শ্যামা মায়ের বিচিত্র লীলা। স্বয়ং মহামায়া জগদীশ্বরী কন্যারূপে দড়ি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ভক্ত সাধক তখন ভক্তি গদগদচিত্তে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া ব্যাকুল অন্তরে গান করিলেন :

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি বাঁধ দিয়ে ভক্তি দড়া ॥
নয়ন থাকতে না দেখলে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া ॥
ভক্তে ছলিতে নেবে এলেন, বেঁধে গেলেন ঘরের বেড়া ॥
[পাঠান্তর, মা ভক্তে ছলিতে তনয়া রূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া।]

*   *   *

সেই ধ্যানে একমনে, সেই পাবে মা তোমায় তারা।
তখন একবার এসে কন্যা রূপে, রামপ্রসাদের বেঁধো বেড়া।

আর একটি প্রবাদ আছে যে, একদিন স্বয়ং অন্নপূর্ণা এক সামান্য স্ত্রীলোকের বেশে তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং তাঁহার গান শুনিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রামপ্রসাদ তখন গঙ্গাস্নানে চলিয়াছিলেন, এজন্য স্ত্রীলোকটিকে তিনি ক্ষণকালের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলেন এবং স্নানান্তে আসিয়া তাঁহাকে গান শুনাইবেন। কিন্তু প্রসাদ চক্ষুর অন্তরাল হইলে, অন্নপূর্ণা তাঁহার চণ্ডিমণ্ডপের দেওয়ালে নিম্নোক্ত কথা কয়টি লিখিয়া অন্তর্হিত হন ; আমি কাশীর অন্নপূর্ণা, তোমার গান শুনিতে আসিয়াছিলাম, তোমার কথামত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, পুনরায় কাশী গেলাম, তুমি সেখানে গিয়া আমাকে গান শুনাইবে।' রামপ্রসাদ গৃহে ফিরিয়া দেওয়ালের গায়ে লেখা দেখিয়া আর বিলম্ব করিলেন না, কাশী যাত্রা করিলেন। কিন্তু ত্রিবেণী পর্য্যন্ত যাইলে, তাঁহার এক প্রত্যাদেশ হইল, 'তোমাকে কাশী যাইতে হইবে না, তুমি ঘরে বসিয়া আমাকে গান শুনাইও।' এই উপলক্ষে তিনি গীত রচনা করিয়া গাহিয়াছিলেন :—

আর কাজ কি আমার কাশী ?

মায়ের পদতলে প'ড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী ॥

হৃৎকমলে ধ্যানকালে, আনন্দ-সাগরে ভাসি ॥

ওরে কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি ॥

* * *

কাশীতে গেলেই মুক্তি,
এ বটে শিবের উক্তি,
ওরে সকলের মূল ভক্তি,
মুক্তি হয় মন তাঁর দয়ায়।
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন,
চিনি খেতে ভাল বাসি।
ওরে চতুর্ব্বর্গ করতলে
ভাবিলে হয় এলোকেশী।

রামপ্রসাদ সম্বন্ধে একটি প্রচলিত কাহিনী আছে তাহা বলিতেছি :

রামপ্রসাদ প্রতিদিন প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন এবং গঙ্গাতীরে সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপন করিতেন এবং গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া নিজের অভিনব সুরে নব নব রচিত সঙ্গীত গাইয়া যেমন আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেন তেমনি গঙ্গাস্নান করিতে যাঁহারা আসিতেন, তাঁহারাও ঐ সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন এমনি ছিল প্রসাদের সঙ্গীতের অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি। তাঁহার মুখে সেই সময়ে শ্যামা সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে অতি বড় পাষণ্ডেরও হৃদয় বিগলিত হইত।

কথিত আছে একবার নবাব সিরাজউদ্দৌলা নৌকারোহণে মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতা যাইতেছেন, সেই সময়ে নৌকা যখন হালিসহরের কাছে আসিল, তখন শুনিতে পাইলেন রামপ্রসাদের মধুর কণ্ঠে মায়ের নাম গান !

মুগ্ধ হইলেন নবাব ! জিজ্ঞাসা করিলেন একজন পারিষদকে—কে গান করিতেছে জান ?

পারিষদ বলিলেন—অবগত নহি। তবে অনুসন্ধান করে দেখতে পারি। পারিষদ নৌকার বাহিরে আসিলেন এবং দেখিতে পাইলেন গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া একজন হিন্দু গান করিতেছে। নবাব তখনই তাঁহার নৌকা কূলে লইয়া যাইতে আদেশ করেন এবং তথায় কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে প্রসাদের গান শুনিয়া পরে তাঁহাকে তাঁহার নৌকায় উঠিতে অনুরোধ করিলেন। প্রসাদ নবাবের অনুরোধে

নৌকায় উঠিলেন। তখন নবাব প্রীতমনে কহিলেন :—আমি আপনার গান শুনিতে চাই। রামপ্রসাদ অমনি একটি হিন্দী গান করিলেন। নবাব গানটি শেষ হইলে বলিলেন :—আমি আপনার কাছে হিন্দী বা উর্দ্দু গান শুনতে চাই না। আপনি গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া যে গান গাহিয়াছিলেন, সেই গান করুন।

রামপ্রসাদ মধুর কণ্ঠে গাহিলেন শ্যামামায়ের গান। গাহিতে গাহিতে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দরদর ধারে অশ্রুধারা বহিয়া যাইতেছিল। মুগ্ধ হইলেন নবাব। অনুরোধ করিলেন, চলুন আপনি আমার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ।

প্রসাদ সে অনুরোধ স্বীকার করিলেন না। হালিসহর এবং নিকটবর্ত্তী নানা স্থানে প্রসাদ সম্বন্ধে এইরূপ বহু গল্প ও কাহিনী প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে কতটা ঐতিহাসিক সত্য আছে বলা কঠিন।

এই কাহিনী সম্বন্ধে আর একজন লেখক লিখিয়াছেন :—'নিজের গানগুলি রামপ্রসাদ খুব ভাবের সহিত গাইতেন। শুনা যায়, রামপ্রসাদের কণ্ঠস্বর বিশেষ সুমিষ্ট ছিল না, কিন্তু তাঁহার ভাবে লোকে মুগ্ধ হইত। এমন কি, নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে নাকি স্বরচিত সঙ্গীতে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা একদিন নৌকাবিহারে বাহির হইয়াছেন, রামপ্রসাদ সেন তখন হৃদয় খুলিয়া ভাগীরথীবক্ষে কালীকীর্ত্তন করিতেছেন। কালীকীর্ত্তন শুনিয়া সিরাজের মনে কি ভাবের উদয় হইল কে জানে—তিনি প্রসাদকে আপনার নৌকায় আনাইয়া গান গাহিতে বলিলেন। রামপ্রসাদ গাহিলেন ধ্রুপদ; সিরাজের তৃপ্তি হইলনা। রামপ্রসাদ গাহিলেন খেয়াল, গজল্; নবাবের ভাল লাগিল না। তখন নবাব তাঁহাকে সেই কালীর গান গাহিতে আদেশ করিলেন। রামপ্রসাদ প্রাণের ভিতর হইতে গাহিলেন। মুসলমান নবাবের হৃদয় গলিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।" *

আর একটি গল্প প্রচলিত আছে—একবার রামপ্রসাদ কলিকাতা আসিতেছেন, নৌকাতে মায়ের সঙ্গীত করিতেছেন—দেবী চিৎপুরেশ্বরী কালিকা সেই সঙ্গীত শুনিয়া অমনি তাঁহার মুখ ফিরাইয়া দক্ষিণ দিকে চাহিয়াছিলেন। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের সাধক মহাপুরুষদের সম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে।

রামপ্রসাদের জীবনের এই সমুদয় অলৌকিক কাহিনীর বিষয় আলোচনা করিতে গেলে একটি কথা মনে আসে—তাহার মূলে রহিয়াছে বিশ্বাস ও ভক্তি। 'ইষ্টদেবতা সম্পর্কে বা ঈশ্বরের উপর অভিমান—আবদার, বিরাগ ও অনুরাগ প্রকাশ ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। যে দেশে বা যে ধর্ম্মে ইষ্টদেবতা বা ঈশ্বরকে "মা" বলিয়া ডাকিতে জানে না, সে দেশের বা সে ধর্ম্মের লোক ত এরূপ

* বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অভিমানের মর্ম্মই বুঝিতে পারিবে না; কারণ, "পিতা" বলিতেই যে ভাবটি আমাদের মনে আসে তাহার সহিত ভক্তির সম্পর্কই অধিক। কিন্তু মাতা? "মা"—ঐ একটি অক্ষরের শব্দের ভিতর কি অপার, অগাধ, অতলস্পর্শ স্নেহের প্রকৃত মহাকাব্য অবরুদ্ধ রহিয়াছে! তিনি আমাদের ভক্তির বিষয় কি আব্‌দারের বিষয়, তাহা আমরা জানি না, জানিতে চাহিও না, তিনি আমাদের মা, তাঁহার সুকোমল বক্ষচ্ছায়ায় আমরা দিন দিন প্রতিপালিত, দিন দিন বর্দ্ধিত, দিন দিন উল্লসিত। তিনি ভিন্ন ব্যক্তি হইলেও আমি তাঁহার দেহের অঙ্গীভূত, তাঁহার হৃদয়ের রুধির, তাঁহার প্রাণের প্রাণ। সুখ হইলে উল্লাসে তাঁহার বক্ষে গিয়া পড়িব, দুঃখেতে তাঁহারই বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিব, অনুরাগে তাঁহার কোলে মাথা রাখিব, আবার রাগে তাঁহার উপর উপদ্রব করিব। বালককালে যখন আমরা মায়ের উপর অভিমান করিয়া ভাত খাইতে চাহিতাম না, তখন ভাত না খাইলে যে আমাদের কষ্ট হইবে, তাহা ত ভাবিতাম না। কিন্তু আমি ভাত খাইতামনা বলিয়া মায়ের মনে যে আঘাত লাগিবে, সেই আঘাতের উপর লক্ষ্য করিয়াই ত আমরা দূরে দূরে থাকিতে পারিতাম। যেন মনে মনে বুঝিতাম যে, আমার ক্ষুধার যাতনার অপেক্ষাও মায়ের মর্ম্মযাতনা অধিকতর তীব্র হইবে, এবং সেই জ্ঞানেই—সেই অহঙ্কারেই আমরা ভাত ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতাম। আজ যদি আমার ইষ্টদেবতাকে সেই আমার মা ভাবে না দেখিতে পারিলাম ত আমার থাকা আর না থাকা—আমার ভরসার পক্ষে, উল্লাসের পক্ষে প্রায়ই সমান হইয়া পড়ে। যাঁহারা জগদীশ্বরকে প্রকৃত মা বলিয়া জানেন, যাঁহারা সংসারের অত্যাচারে, বিপদের ঘূর্ণ্যাবাত্যায়, হৃদয়ের শূলবেদনায় অস্থির হইয়া ইহলোকের মা অপেক্ষাও মাতৃতর ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকিয়া উঠেন, তাঁহাদের মনের সাহস ও ভরসা, উল্লাস ও শান্তি অনিবার্য্য। তবে মায়ের উপর অভিমান হইবে কেন?—তাহারও আবার বিলক্ষণ কারণ আছে।

বিশ্বাস দুই প্রকার—একটি মনের বিশ্বাস, আর একটি মর্ম্মের বিশ্বাস। মা-সম্পর্কে অনেক সময়ে আমাদের মর্ম্মের বিশ্বাস ঠিক্ থাকিলেও কোন বিশেষ অবস্থাগত ব্যবহারে মনের বিশ্বাস চঞ্চল হইয়া পড়ে। যখন নানা প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে পড়িয়া আমরা আপনাদিগকে নিতান্ত নিঃসহায় মনে করি, তখন এই ভাবি যে, আমার অমন "মা" থাকিতে কেনই বা যন্ত্রণা পাইব—অথচ যন্ত্রণা পাইতেছি, কল্পনার যন্ত্রণা নহে প্রকৃত কঠোর যন্ত্রণায় ভুগিতেছি; তখন আমার ইষ্ট-দেবতার স্নেহের উপর কতকটা মনের অবিশ্বাস আসিয়া পড়ে, কিন্তু মর্ম্মের বিশ্বাস একেবারে যায় না, এবং যায় না বলিয়াই আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল,

নিঃসহায়, আশ্রয়হীন শিশুর মত এই বলিয়া দারুণ অভিমান ভরে কাঁদিতে থাকি :

'মা' 'মা' বলে আর ডাক্‌ব না।
ওমা, দিয়েছ, দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
বারে বারে ডাকি 'মা'-'মা' বলিয়ে
মা বুঝি আছগো অচৈতন্য হ'য়ে !
মাতা বর্ত্তমানে, এ দুঃখ সন্তানে
মা বেঁচে তার কি ফল বল না ?
ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আরো কি ক্ষমতা রাখিস সর্ব্বনাশি ! (পাঠান্তর—এলোকেশী)
না হয়, দ্বারে দ্বারে যাব,
ভিক্ষা মেগে খাব,
মা ম'লে কি ছেলে বাঁচে না ?
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের কি ও সূত্র,
'মা' হয়ে হলি মা, ছেলেরি শত্রু !
তাই, দিবানিশি ভাবি, আর কি করিবে
না হয়, বারে বারে দিবি জঠর-যন্ত্রণা !

রামপ্রসাদের এমনি ছিল জগজ্জননী শ্যামা মায়ের প্রতি আবদার, অভিমান, এমনি ছিল তাঁর নির্ভর ও বিশ্বাস—সম্পূর্ণভাবে ত্যাগের মহত্ব প্রসাদ পদাবলীতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। কবির অন্তর্দৃষ্টি, প্রকৃত ভক্তির হৃদয়-উচ্ছ্বাস তাঁহার সঙ্গীতেই প্রকাশ পাইয়াছে। বহু উদাহরণ দ্বারা তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

আমরা উপরে যে সঙ্গীতটি উদ্ধৃত করিলাম, তাহার মধ্য হইতে মায়ের স্নেহময়ী মূর্ত্তির প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি—যে মূর্ত্তি নিতান্ত দুর্ব্বল, নিঃসহায় শিশুর একমাত্র আশ্রয়স্থল, সেই মাতৃরূপিণী মহাশক্তির উপাসনাই করিয়াছিলেন রামপ্রসাদ।

রামপ্রসাদের জীবনের কয়েকটি অলৌকিক ঘটনার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখানে আর একটি কাহিনী বলিতেছি।

একবার রামপ্রসাদ কলিকাতা হইতে নৌকাযোগে গান গাহিতে গাহিতে গঙ্গার উপর দিয়া কুমারহট্ট যাইতেছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার মুখ-নিঃসৃত মা তারিণী শঙ্কর বৈরাগী তোর নাং—

এই পদাবলী শুনিয়া গঙ্গার পূর্ব্ব তীরস্থ দেবী চিত্রেশ্বরীর মূর্ত্তি মন্দির-সহিত দক্ষিণ মুখ হইতে পশ্চিম মুখে ঘুরিয়া যায়। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া সাধক লজ্জায় প্রথমোচ্চারিত অশ্লীল গান ছাড়িয়া 'মা তারিণী গো, শঙ্করী ভবানী তোমার নাম। এই গানটি গান। তখন দৈববাণী হইল, প্রসাদ, এই গান নয়, প্রথম গানটি গাও।' প্রসাদ পূর্ব্বের গানটিই গাহিলেন। *

রামপ্রসাদের সমকালে কলিকাতার দক্ষিণে ও উত্তরে দুইটি প্রাচীন কালীমন্দির বিদ্যমান ছিল। প্রথমটি কালীঘাট, দ্বিতীয়টি চিৎপুরে চিত্রেশ্বরী। চিত্রেশ্বরী দেবী যে কোন্‌কালে এবং কাহার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিলেন বলা যায় না। কলিকাতার প্রাচীন ইতিবৃত্ত লেখকেরা বলেন, কিংবদন্তী শোনা যায় ইনি চিত্ত বা চিতে ওরফে চিত্রেশ্বর নামক দস্যু দলপতির দ্বারা স্থাপিত। তাঁহার নামানুসারে দেবীর নাম হইয়াছে চিত্রেশ্বরী। দস্যুদলপতি চিত্রেশ্বরী দেবীর পূজা করিয়া সম্মতিসূচক আশীর্ব্বাদ পাইলে জলে স্থলে লুণ্ঠন করিতে যাইত। মন্দিরটি প্রথমে একেবারে গঙ্গার তীরে ছিল। এক্ষণে নদী হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এখানে নিবিড় বন ছিল। অনেক নরবলি এই দেবীর স্থানে হইয়াছে। শ্রীরামপুরের বিখ্যাত পাদ্রী ডবলিউ ওয়ার্ড (W. Ward) তৎপ্রণীত 'A view of the History, Literature and Religion of the Hindoos' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭২ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে লিখিয়াছেন :

"At Chitpooru and at Kali-ghatu, near Calcutta, it is said that human sacrifices have been occasionally offered. A respectable native assured me that at Chitpooru near the image of Chittreshwuree, about the year 1788, a decapitated body was found, which in the opinion of

* এবিষয়ে মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—কিংবদন্তী আছে আমরা যাহাকে অশ্লীল বলি, সেই অশ্লীলতাপূর্ণ পদ ভবানীভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন। ভাবের প্রবাহে মহানবমী সঙ্গীতে গীতের এক চরণ সিদ্ধ কবির কণ্ঠ হইতে বাহির হয়। পরে ভয় আসিল ভবানী সম্বন্ধে এমন কথা বাহির হইয়াছে। পদ পরিবর্ত্তিত করিয়া গীত হইল। মা তারিণি গো শঙ্করী ভবানী তোমার নাম। ভাবের পদ ছিল 'মা তারিণি' গো শঙ্কর ভিখারী তোমার নাং।' শোনা যায় পদ পরিবর্ত্তনে দৈববাণী হইয়াছিল—রামপ্রসাদ আগে যাহা গাহিয়াছিলি—তাহাই গা। গিরিশবাবু মূর্ত্তির মুখ ফিরার ও মন্দিরের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ করেন নাই। [গিরিশ গ্রন্থাবলী। প্রথম ভাগ—৩০১ পৃষ্ঠা। "নৃত্য" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]।

the spectators, had been evidently offered on the preceding night to this goddess." অর্থাৎ স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বলিলেন—চিৎপুর এবং কালীঘাটে সময় সময় নরবলি হইত। কলিকাতায় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছি যে চিত্রেশ্বরীদেবীর মন্দির সন্নিকটে একটি মস্তকবিহীন শব পড়িয়া ছিল। সে অঞ্চলের লোক অনুমান করেন পূর্ব্বদিন রাত্রিতে ইহাকে দেবীর নিকট বলি দেওয়া হইয়াছিল।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Calcutta Review' vol. III 1845. Page 454 এ লিখিত আছে : "......the village of Chitpore...... It was then written Chittrupoor, and was noted for the temple of Chittresuree Dabee, or the goddess of Chittru, known among Europeans as the temple of Kalee at Chitpore. Accordiug to popular and uncontradicted tradition, this was the spot where the largest number of human sacrifices was offered to the goddess in Bengal before the establishment of the British Government."

ওয়ার্ড সাহেবের বইয়ের প্রকাশকাল ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ। 'Calcutta Review"তে তাহার ত্রিশ বৎসর পরেও চিত্রেশ্বরী দেবীর মন্দিরে নরবলির উল্লেখ রহিয়াছে।

রামপ্রসাদের মুখে সঙ্গীত শ্রবণেচ্ছু দেবী চিত্রেশ্বরী বর্ত্তমানকালে নানারূপ অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া ৯নং গান ফাউণ্ডারী রোডে অবস্থিতা আছেন। বর্ত্তমানে মন্দিরটি বৃহৎ তোরণ, নাটমণ্ডপ, পূর্ব্বের পঞ্চমুণ্ডী আসন ইত্যাদি সহ বিরাজিতা এবং বহু ভক্তগণ দ্বারা প্রতিদিন পূজিতা হইয়া আসিতেছেন।

রামপ্রসাদ সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী এই—একদিন রামপ্রসাদ ভোরে গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন যে, কে একজন স্ত্রীলোক তাঁহার মুখে শ্যামা সঙ্গীত শুনিবার জন্য চণ্ডীমণ্ডপে অপেক্ষা করিতেছেন। সাধক চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া দেখিলেন তথায় কেহই নাই, কেবল দুইটি বালিকা খেলা করিতেছে। প্রসাদ উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে কোনও স্ত্রীলোককে কি তোমরা দেখিয়াছ? তাহারা বলিল, হাঁ, একটা মেয়ে মানুষ তোমার গান শুনিতে আসিয়াছিল সে তোমাকে কাশীতে গিয়া গান শুনাইতে বলিয়া গিয়াছে বলিয়া বালিকা দুইটি অদৃশ্য হইল। অনুরূপ কাহিনী পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি।

মাতৃভক্ত সাধক মায়ের আদেশ কি উপেক্ষা করিতে পারেন? পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রদক্ষিণ করিলেন, গ্রামবাসী সকলের নিকট বিদায় লইলেন, কি আনন্দ! মা তাঁহার গান শুনিতে চাহিয়াছেন!

দেবী অন্নপূর্ণাকে রামপ্রসাদ গান শুনাইতে কাশী চলিলেন। হালিসহরে গঙ্গার বুকে নৌকায় চড়িলেন—গঙ্গার জলে ঢেউয়ের বুকে নাচিতে নাচিতে ছুটিল তাঁহার তরণী, সারা পথে মাতৃনাম গাহিতে গাহিতে চলিলেন প্রসাদ।—সেকালে নৌকাযাত্রা ত নিরাপদ ছিল না, পদে পদে দস্যু-ডাকাতের ভয় ছিল, মাঝিরা রাত্রি হইতেই একটি বন্দরে নৌকা ভিড়াইলেন। রাত্রিতে স্বপ্নে দেখা দিলেন দেবী অন্নপূর্ণা—বলিলেন—প্রসাদ তোমার আর কাশী আসিতে হইবে না, তুমি তোমার আসনে বসিয়াই গান শুনাইও—তাহা হইলেই আমি শুনিতে পাইব। অমনি প্রসাদ গান ধরিলেন :—

কাজ কিরে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্য রাশি।
সার্দ্ধ ত্রিশ কোটি তীর্থ মায়ের ও চরণবাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী।
হৃৎকমলে ভাব বসে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি।

সেবার প্রসাদের আর কাশী যাওয়া হইল না। কুমারহট্টে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু দিন যায়, হঠাৎ তাঁহার প্রাণে জাগিল এক অভিনব প্রেরণা। তাঁহার হৃদয় অবিমুক্তধাম বিশ্বনাথ পুরী দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইল—তিনি গাহিলেন :

মন আমার যেতে চায় গো আনন্দ কাননে।
বট মনোময়ী সান্ত্বনা কেন কর না এই মনে॥
শিবকৃত বারাণসী, সেই শিবপদ বাসী,
তবু মন ধায় কাশী, রব কেমনে॥

সেকালে কাশী-যাত্রা ত বড় সহজ ছিল না। অতি দূর যাত্রা। পথে পথে বর্গী, ঠগ, দস্যুডাকাতের ভয়। সেজন্য বড় নৌকাতে চড়িয়া দল বাঁধিয়া তীর্থ-যাত্রীরা যাতায়াত করিতেন। সে সময়ে কেহ যাইতেন পুরী-জগন্নাথ, গয়াকাশী, প্রভৃতি তীর্থধামে পায়ে হাঁটিয়া, কেহ যাইতেন নৌকা-পথে। তীর্থযাত্রীরা এইরূপ

দৃঢ় চিত্ত এবং ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন যে কোনরূপ শারীরিক ক্লেশকেই তাঁহারা ক্লেশ বলিয়া অনুভব করিতেন না, কতজন পথে রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইতেন, কতজন হিংস্রজন্তুর মুখে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেন, তারপর কৌশলী ঠগ দস্যুরা অতি নির্ম্মম ভাবে পথিকদের প্রাণ লইত,—সে সময়ে মায়ের ভক্ত রামপ্রসাদ সর্ব্বপ্রকার আপদ-বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কাশী যাত্রা করিলেন।

মায়ের দুলালি ছেলে প্রসাদের ভয় কি? তিনি দিনের পর দিন মায়ের নাম গাহিতে গাহিতে কাশীর দিকে অগ্রসর হইলেন। শস্যেপূর্ণ হরিৎ ক্ষেত্র, কত পল্লী, কত মঠ, কত দেবমন্দির, কত কি নূতন দৃশ্য, নূতন স্থান দেখিতে দেখিতে চলিলেন—মাঝে মাঝে ভক্ত-সন্তানের প্রাণ কাঁদিত সেই ছায়াশীতল পঞ্চমুণ্ডীর আসনের দিকে, একবার পথে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন—ভাবিলেন বুঝি আর কাশীধামে পৌছিতে পারিবেন না, তখন মনের দুঃখে গাহিলেন:

মাগো আমার কপাল দোষী।
দোষী বটে গো আনন্দময়ী॥
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে,
যেতে নারলাম বারাণসী!
নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে, মোর ভাগ্যেতে একাদশী!

বোধ হয় রোগ বা খাদ্যাদির দরুণ ক্লেশ ভোগ করিয়াই তাঁহার মনে হইয়াছিল বুঝি কাশী যাওয়া তাঁহার হইল না। তাই ঐরূপ গান গাহিয়াছিলেন।

তারপর একদিন রামপ্রসাদ ও তাঁহার সঙ্গীয় তীর্থযাত্রীদের নৌকা আসিয়া ভিড়িল কাশীর রাজঘাটে। সাধক কবি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি জাহ্নবীর তীরবর্ত্তী কাশী দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। ঘাটের পর ঘাট, মন্দিরের পর মন্দির শোভা পাইতেছে, প্রফুল্ল রৌদ্র কিরণে ঝলসিতেছে—বরুণা ও অসি দুই দিক হইতে মৃদু কুলু কুলু নাদে প্রবাহিতা হইয়া আসিয়া গঙ্গার স্রোতোধারার সহিত মিলিত হইয়াছে। বেণীমাধবের ধ্বজা—উচ্চ চূড়া লইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। বিশ্বেশ্বরের স্বর্ণচূড় মন্দির, দেবী অন্নপূর্ণার মন্দির, তীর্থযাত্রীদের বৃহৎ ছত্রতলে উপবিষ্ট পাণ্ডা পুরোহিতদের নিকট স্নানান্তে মন্ত্রপাঠ ধ্বনি প্রসাদের কর্ণে সুধাধারা বর্ষণ করিতেছিল। বারাণসীধাম পুণ্যক্ষেত্রে আসিয়া ভক্তের হৃদয় আনন্দে ও ভক্তিতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল! তিনি সঙ্গীতের ভিতর দিয়া সংক্ষেপে পুণ্যতীর্থ কাশীধামের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বর্ণনায়, ভক্তির অনবদ্য প্রকাশে এবং শব্দসম্পদে অতুলনীয়। রামপ্রসাদ সুমধুর সুরপ্রবাহে চারিদিকে

ভক্তির সুধা বিলাইলেন। পাঠক দেখিতে পাইবেন, অতি অল্প কথায় প্রসাদ কাশীধামের কি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন :

অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী।
শিব ধন্য, কাশী ধন্য, ধন্য ধন্য গো আনন্দময়ী ॥
ভাগীরথী বিরাজিত, প্রবাহে অৰ্দ্ধ শশী।
উত্তরবাহিনী গঙ্গা জল চলেছে দিবানিশি ॥
শিবের ত্রিশূলে কাশী, বেষ্টিত বরুণা অসি।
তন্মধ্যে মরিলে জীব শিবের শরীরে মিশি।
কি মহিমা অন্নপূর্ণার, কেউ থাকে না উপবাসী।
ও রামপ্রসাদ অভুক্ত তোমার, চরণ ধূলার অভিলাষী ॥

পুণ্য সলিলা জাহ্নবীর পবিত্র নীরে স্নান ও আহ্নিক ইত্যাদি সমাপন করিয়া, ভক্ত প্রসাদ কাশী-পরিক্রমায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে গভীর ভক্তির সঞ্চার হইল, এই ত তাঁহার সেই দেবী অন্নপূর্ণার কাশী, যিনি একদিন দয়া করিয়া তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি কুমারহট্টে গিয়াছিলেন, ধন্য তিনি জগন্মাতা অন্নপূর্ণার প্রিয় বাসভূমি কাশীধামে আসিতে পারিয়াছেন। তাঁহাকে গান শুনাইবেন কি সৌভাগ্য! বোধ হয় কাশীধামে পৌঁছিয়া তাঁহার কোনরূপ অসুবিধার কারণ হইয়াছিল, তাই গানের একটি পদে সেইভাব প্রকাশ করিয়াছেন :

কি মহিমা অন্নপূর্ণার, কেউ থাকে না উপবাসী।
ও রামপ্রসাদ অভুক্ত তোমার চরণ ধূলার অভিলাষী ॥

সেই দুইশত বৎসর পূর্ব্বের বারাণসীধামের সহিত বর্ত্তমান কাশীর তুলনা চলে না। তখনকার দিনে কাশী ছিল অপ্রশস্ত গলি ঘুঁজিতে পূর্ণ। সংকীর্ণ পথের দুই পাশে ছিল দোকানের পর দোকান, কত যে দেবালয়, কারুকার্য্য-খচিত মন্দির, দেবায়তন, রাণী ভবানী ও অহল্যাবাঈয়ের প্রতিষ্ঠিত ছত্র, মন্দির, বিদ্যাপীঠ, পণ্ডিতমণ্ডলীর চতুষ্পাঠি, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, দর্শন, বেদ-শিক্ষার প্রতিষ্ঠান তাঁহার অবধি ছিল না। সেকালে বাঙ্গালার বহু মনীষী খ্যাতনামা পণ্ডিত কাশীতে বাস করিতেন, বহু বাঙ্গালী বিদ্যার্থী সেখানে অধ্যয়নার্থ আসিতেন। সেই সব পণ্ডিত ও তাঁহাদের শিষ্যগণেরা যখন জানিতে পারিলেন—বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ ভক্ত-সাধক মহাসিদ্ধ পুরুষ রামপ্রসাদ কাশীধামে তীর্থ দর্শনোপলক্ষ্যে আসিয়াছেন, তখন সকলে মিলিয়া ভক্ত প্রসাদকে তীর্থদর্শনে সাহায্য করিয়াছিলেন।

প্রসাদের হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দে অভিষিক্ত হইল, ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হইল। দেখিলেন ভারতবর্ষের নানা দেশ হইতে নদীর স্রোতোধারার মত প্রতিদিন যাত্রীদল আসিতেছে—যাইতেছে, গঙ্গার শ্রান্তিহরা পুণ্যধারায় সকলে অবগাহন করিয়া 'গঙ্গা মাইকি জয়' গান করিতেছে, আর রাজপথে, মন্দির, দেবালয় প্রতিধ্বনিত করিয়া জয়ধ্বনি করিতেছে—"জয় বিশ্বনাথজী কি জয়', 'অন্নপূর্ণা-মায়িকী জয়" ও জয় কাশীধাম কি জয় নিনাদে চারিদিক ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

রামপ্রসাদ মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিলেন, বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার পূজা করিলেন। দেখিলেন—কত শত লোক ভক্তি ভরে, জয় বিশ্বেশ্বর, জয় বিশ্বেশ্বর, রবে মন্দির-কক্ষ মুখরিত করিয়া, গঙ্গার পবিত্র সলিল ধারায় শিবের শীর্ষদেশ বিধৌত করিতেছে। কেহ ঢালিতেছে দুগ্ধের ধারা, কেহ আনিয়াছে সপ্ততীর্থের পবিত্র নীর,--কেহ ভক্তি ভরে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া পূজা করিতেছে। সকলেরই দৃষ্টি—জ্যোতির্ম্ময় স্বয়ম্ভু লিঙ্গ মূর্ত্তির প্রতি নিবদ্ধ। বম্ বম্ রবে আকাশ বাতাস আনন্দে মুখরিত হইতেছে। রামপ্রসাদের কণ্ঠ হইতে বহিয়া আসিল সুরের নির্ঝরিণী :

হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া।
শিঙ্গা করিছে ভভ ভম্ ভম্,
ববম্ ববম্ বব বম্ বব বম্ গাল বাজিয়া॥

* * * *

বিভূতিভূষণ মোহন বেশ
ভরুণ অরুণ অধর দেশ
শব আভরণ গলায় শেষ
দেবের দেব যোগিয়া।
বদন ইন্দু ঢল ঢল ঢল,
শিরে দ্রবময়ী করে টল টল,
লহরি উঠিছে কল কল কল,
জটাজুট মাঝে থাকিয়া।
প্রসাদ কহিছে এ ভব ঘোর,
শিয়রে শমন করিছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম ডোর
নিজ গুণে লহ তরিয়া।

রামপ্রসাদ কাশীর বিশ্বেশ্বর দেবকে পূজা করিলেন, তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া ধন্ত হইলেন। বিশ্বেশ্বরের মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন—এবং মাতা অন্নপূর্ণাকে দর্শন করিয়া আত্মহারা হইলেন। সদানন্দময়ী অন্নপূর্ণা যিনি সমস্ত জগৎকে খাওয়াচ্ছেন, এই সে মা! বিশ্বজননীর প্রফুল্লবদন কমল দেখিলেন, ভক্তের কাছে এক ভাব-মধুর দিব্যমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। কাণে প্রবেশ করিল মধুর ধ্বনি, রামপ্রসাদ আমাকে গান শোনাও! তখন সাধক বিশ্বপালয়িত্রী দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন ঃ—দে মা আমাকে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও সিদ্ধি! মা কি তাঁহার ভক্তের বাসনা অপূর্ণ রাখিতে পারেন? গানের পর গান গাহিতে লাগিলেন—যাত্রিগণ মন্ত্রমুগ্ধ—মায়ের মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠিল। ধন্ত হইলেন রামপ্রসাদ, অন্নপূর্ণার মন্দিরে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও সিদ্ধির প্রার্থনা করিয়া। এইভাবে তিনি কাশীর সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখনও কাশীর বিভিন্ন ঘাটে-ঘাটে স্নান করেন, প্রত্যহ বিশ্বেশ্বর ও দেবী অন্নপূর্ণাকে দর্শন করেন, কখনও কেদারেশ্বরের মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভাববিহ্বল চিত্তে মায়ের নাম করেন। তাঁহার মধুর ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত শুনিবার জন্ম শত শত লোক আসিয়া জড় হয়! তিনি মনের আনন্দে গান করেন—

আর ভুলালে ভুলবোনাগো!
আমি অভয়পদ সার করেছি, ভয়ে হেলব-দুলব নাগো?

কতদিন রামপ্রসাদ কাশীতে বাস করিয়াছিলেন, সে কথা জানিবার উপায় নাই, এবং আদৌ কাশী গিয়াছিলেন কি না বলা কঠিন, তবে তাঁহার গানের ভিতর দিয়া বুঝিতে পারি যে তিনি কাশীধামে গিয়াছিলেন। আমরা এ বিষয়ে প্রাচীন পুঁথিপত্রে কিংবা মুদ্রিত কোন বিবরণী পাই নাই। গানের পদাবলী হইতে মনে হয় প্রসাদ কাশীধামে তীর্থদর্শন মানসে গিয়াছিলেন, সে বিষয়ে যে তাঁহার আগ্রহ ছিল, তাহা বুঝিতে পারি সঙ্গীতের শব্দ-বিন্যাসে। তাহা হইতেই জানিতে পারি রামপ্রসাদ কাশী তীর্থ দর্শনে গিয়াছিলেন।

বারো

কেন গঙ্গাবাসী হব !
ঘরে বসে মায়ের নাম গাহিব।
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করিব।

—রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদের তীর্থাদি দর্শন সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ জানা যায় না। সাধারণ লোকের ন্যায় তীর্থদর্শনাভিলাষী ত ছিলেনইনা এবং তীর্থ দর্শন করিলেই সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয়, এ সকল ছিল রামপ্রসাদের মত বিরোধী। কেন না গানের মধ্য দিয়া তিনি যে মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তীর্থ দর্শনে ভ্রমণ অপেক্ষা প্রেম ও ভক্তির দ্বারা জগন্মাতাকে হৃদয় মধ্যে গ্রহণ করাকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন।

এই হৃদ্‌পদ্মে বসাইয়ে মনো মানসে পূজিব॥

তাঁহার বহু সঙ্গীতে এইরূপ ভাবের প্রকাশ রহিয়াছে। একটি গানে আছে :—

কেন গঙ্গাবাসী হব !
ঘরে বসে মায়ের নাম গাহিব।
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করিব।

আর একটি গানে আছে :

মন কি যাবি জগন্নাথে।
খাবি আনন্দবাজারে ভাত, ভক্তি রেখে আপন সাথে।
জগন্নাথ আত্মারাম, হৃদিপদ্ম তাঁর ধাম।
পূর্ণ হবে মনস্কাম ভজলে তাঁরে অন্তরেতে॥
ঘরে আছে পরম রত্ন, ভ্রান্তিক্রমে কাচে যত্ন।
ওরে মিছে কেন ভ্রমণ করা, ভ্রান্তি সে ত সাথে সাথে॥
গুরু বাক্য শিরে ধর, আত্মতত্ত্ব তত্ত্ব কর।
বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব, রাখ নিয়ে পাতে পাতে॥
প্রসাদ বলে যাব কোথা, মাথা নেই তার মাথা ব্যথা।
ওরে এ যেন রাতকাণার কথা, উড়ে বেড়ায় রাতে রাতে॥

আবার কোন কোন সঙ্গীতে বলিয়াছেন :

হওরে মন কাশীবাসী।
দেখ হৃদকমলে বারাণসী॥
উত্তরে ইড়া বরুণা, দক্ষিণে পিঙ্গলা অসি।
সুষম্না মণিকর্ণি, পূর্ব্বে গঙ্গা অর্দ্ধশশী॥
ব্রহ্মচারী ভাব বিচারী, নিবাস সন্তোষপুরী।
বিশ্বেশ্বর রাজ্যবাসী, বিশ্বেশ্বর রাজমহিষী॥
প্রসাদ ভণে, ও চরণে জবা দেও রাশি রাশি।
মায়ের চরণ তলে পড়ে ভোলা, গয়া গঙ্গা বারাণসী॥

তাঁহার কাশী তীর্থ দর্শনে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আবার আর একটি গানেও দেখিতে পাই :—

শমন কি ভয় দেখাও আসি।
আমি যাব কাশীনাথের কাশী॥
শেষে বব বম্ বম্ শিব মুখে বলে হব সন্ন্যাসী॥
বারাণসী থাকবো বসি, দূরে যাবে পাপরাশি।
আমি কালী বলে কাটিব কাল, কাল বেড়াও কি আমায় শাসি॥
মহাকাল সেই রাজ্যের রাজা, পঞ্চাননের পঞ্চক্রোশী।
নাহি কালের ভয় তথা আছে, মা মোর কালী কাল বিনাশী॥
হালিসহর পরগণায় বসত্, কুমারহট্ট গ্রামবাসী।
সে যে রামপ্রসাদ কিঙ্কর, ভদ্রকালী পদ অভিলাষী॥

আমরা এখানে যে কয়টি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে রামপ্রসাদের তীর্থ দর্শন সম্বন্ধে বিশেষতঃ যেমন কাশীবাস সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতও দেখিতে পাই, আবার তাঁহার সঙ্গীত হইতে একথাও মনে হয় যে প্রসাদ কাশী দর্শনাভিলাষী ছিলেন এবং হয়ত কাশীধামে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠানভূমি দর্শন করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত গানটিতে একটি নূতন পদ যোজনা দেখিতে পাই—

'হালিসহর পরগণায় বসত্, কুমারহট্ট গ্রামবাসী', নিজ গ্রামের উল্লেখ প্রসাদের আর কোনও সঙ্গীতে দেখিতে পাই নাই, সে দিক্ দিয়াও এ গানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মানুষ যে যুগে, যে সমাজ ও রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে, তাহার উপর সেই রাষ্ট্র ও সমাজের প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই আসে—তাহার গতিরোধ করা সম্ভবপর

নহে। রামপ্রসাদ সেন ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক, কাজেই তাঁহার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সমাজ, পূজা, অনুষ্ঠান প্রত্যেক দৈনন্দিন ব্যাপারেই সেকালের সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রভাব যে আসিবে তাহাত স্বাভাবিক।

বাঙ্গলাদেশের মাটি যেমন উর্ব্বরা, সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা, তেমনি বাঙ্গালীর মনও ভাবপ্রবণ অতি সহজেই যে কোন ধর্ম্ম বা সমাজকে, আচার ও অনুষ্ঠানকে গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করে না। এক সময়ে বাঙ্গালাদেশে ব্যাপক ভাবে তান্ত্রিক সাধনা প্রচলিত ছিল, এবং বহুল পরিমাণে তন্ত্রগ্রন্থও সর্ব্বত্র পাওয়া গিয়াছে। এক বিক্রমপুর অঞ্চলের বিভিন্ন পল্লী হইতে হাজার হাজার তন্ত্রগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। আমাদের বাস-পল্লী বিক্রমপুরস্থ মূলচর, কামারখাড়া প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী পল্লী হইতেই আমি শতাধিক তন্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বাঙ্গলাদেশের বিভিন্ন পুঁথিশালায় সে সমুদয় পুঁথি বিক্ষিপ্ত ভাবে রহিয়াছে। এ বিষয়ে বিশদ ভাবে আজ পর্য্যন্তও আলোচনা হইতেছে না। আলোচিত হইলে বহু বিষয় আমরা জ্ঞাত হইতে পারিতাম।

রামপ্রসাদ ছিলেন শক্তি মন্ত্রের উপাসক—শাক্ত। তাঁহার সময় বাঙ্গালাদেশে বড় দুঃসময় গিয়াছে। সে যুগ ছিল বিদ্রোহ ও বিপ্লবের যুগ। তখন শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি বিবিধ ধর্ম্মমতের ছিল প্রচলন। এই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় আবার বিভিন্ন উপধর্ম্ম ও শাখা প্রশাখায় ছিল, বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন এবং বিভক্ত। নদীর বিভিন্ন গতিমুখী শাখার ন্যায় চারিদিকে এ সমুদয় উপধর্ম্ম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গালী স্বভাবতঃ ভাব-প্রবণ, তাহার ভাবপ্রবণতার ফলে সহজ সরল দৈহিক তৃপ্তি ও সুখদায়ী ইন্দ্রিয়-লোলুপতা ও ধর্ম্মের নামে বীভৎস আকারে বিদ্যমান ছিল। এখনও নাই একথা বলিতে পারি কি?

হিন্দুর প্রধান দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব যেমন অতি প্রাচীনকাল হইতে পূজা পাইয়া আসিতেছেন, সেইরূপ, ইন্দ্র, যম, গণেশ, কার্ত্তিকেয়, সূর্য্য, অগ্নি, পবন, বরুণ, সমুদ্র, পৃথিবী, আকাশের গ্রহনক্ষত্র, নবগ্রহ, প্রভৃতি পূজিত হইতেছেন। শনিগ্রহের প্রতি বাঙ্গালী হিন্দুর ভয় ও ভীতি, পুরাণে, কাব্যে, সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, এখনও পল্লীর নিভৃত নিকেতনে প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় শনির পাঁচালী পাঠ ও 'শনির সেবা' হইয়া আসিতেছে।

বাঙ্গলাদেশে যে সকল দেব ও দেবী নিত্য পূজিতা হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুর্গা, কালী বা শ্যামা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শীতলা, মনসা, ষষ্ঠি, কৃষ্ণ, জগন্নাথ, রাম, শ্রীচৈতন্য, কামদেব, (স্থল বিশেষে হয়), সত্যনারায়ণ, পঞ্চানন (শিব), ধর্ম্মঠাকুর, কালুরায়, অর্দ্ধনারীশ্বর, কৃষ্ণকালী, গুরুপূজা, এ

সমুদয় যেমন পূজিত ও বিভিন্ন মাসে অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছেন, তেমনি আবার হনুমান, সারমেয়, শিবা প্রভৃতি পশু, গরুড়, জটায়ু, অরুণ. হংস, পেঁচক, ময়ূরও পূজালাভে বঞ্চিত হন না।

হিন্দুসমাজে যে সমুদয় বৃক্ষ দেবতারূপে পূজা পাইতেছে তাহাদের ভিতর তুলসী, অশ্বত্থ, দেবতারূপে পূজিত হয়। নদ-নদীর মধ্যে—গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী, নর্ম্মদা, গোমতী, সরযূ, গণ্ডকী, বরাহী, বিপাশা, গৌতমী, চন্দ্রভাগা, সিন্ধু. শোণ, তুঙ্গভদ্রা, তাম্রপর্ণী, বৈতরণী প্রভৃতি নদী দেবীরূপে অর্চ্চিতা হন, এবং বিশেষ কোন তিথি উপলক্ষ্যে এইসব পুণ্য নদীতে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয় এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত। যে সকল দেব-দেবী, বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদী, পশু-পক্ষী পূজিত হয়, তাহাদের প্রত্যেকের সহিতই একটা পৌরাণিক ইতিহাস রহিয়াছে। ধর্ম্মের নামে নানারূপ প্রাণহানিকর আচার ও অনুষ্ঠান বহুকাল হইতেই বাঙ্গলাদেশে তথা ভারতবর্ষে প্রচলিত, ইংরাজ শাসনকালে তাহার কোন কোনটি দূর হইলেও, যে সকল আচার অনুষ্ঠান দীর্ঘকাল যাবত সমাজের বুকে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে কে তাহা উন্মূলিত করিবে?

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙ্গলাদেশে ও বাঙ্গলার বাহিরে যে প্রেমের ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রভাবেও বাঙ্গলার সর্ব্বত্র সেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরিগৃহীত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেব পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—(১৪৮৬ খৃঃ, ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জন্ম-গ্রহণ করেন।) সেদিন ছিল ফাল্গুনী-পূর্ণিমা।

শ্রীচৈতন্যদেব-নিমাই নবদ্বীপের শিরোমণি হইয়া রহিয়াছেন এবং চিরন্তন থাকিবেন। নিমাই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, লোকানুরাগ, সমাজসেবা প্রভৃতি যেমন সেকালের নবদ্বীপবাসীর গৌরবস্থল ছিল, তেমনি সেই অপূর্ব্ব গৌরকান্তিবিশিষ্ট পণ্ডিত ও মেধাবী নিমাই ছিলেন ধর্ম্মপ্রাণ, ঈশ্বরভক্তিতে ছিল তাঁহার হৃদয় পূর্ণ, সেজন্য শচীদেবী পুত্রকে বিবাহ দিয়া সংসার বন্ধনে-বাঁধিয়া রাখিতে যত্নবান্ হইয়াও বাঁধিয়া রাখিতে পারিলেন না। প্রথম স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুর পর শ্রীচৈতন্যদেব বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু প্রেমোন্মত্ত পুরুষ গয়াধামে বিষ্ণু-পাদপদ্মে অঞ্জলি দিতে গিয়া যে ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন এবং যে ভাবে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা হইতেই তাঁহার হৃদয়ের ভক্তিপ্রবণতার ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। সঙ্গিগণের চেষ্টায় তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে পর, তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে সঙ্গিগণকে বলিলেন,—"তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি আর সংসারে যাইব না, আমি প্রাণেশ্বরকে দেখিতে মথুরায় চলিলাম। বন্ধুগণ

তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন, কিন্তু গৃহে আসিয়া নিমাই মাতার নিকট গয়াধামের অপূর্ব্ব উপলব্ধি ভাবাবেগে বিভোর হইয়া বলিতে পারিলেন না, মাতার নিকট তাঁহার বাক্যস্ফূরণ হইল না—তিনি ঘন ঘন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এবং কিছুদিন পরে কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ ও সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। এ সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ২৪ বৎসর ছিল।

শ্রীচৈতন্যদেব যে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তাহা সাম্য এবং বিশ্বজনীন মহানুভবতার অপূর্ব্ব নিদর্শন। তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও সেকালের ব্রাহ্মণসমাজের আভিজাত্য ও অন্যান্য বর্ণের জাতির উপর ঘৃণা ও অবহেলা দূর করিয়া বলিয়াছিলেন, জাতিকুল ক্রিয়া ধন কিছুই নহে—প্রেমধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। 'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য' প্রণেতা ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন :—'সেই সময়ের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণতনয় সমাজের মস্তকে ও চরণে—ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে সমবেদনাসূচক প্রীতি জাগাইয়া দিয়াছিলেন। প্রেমের অভয় পতাকা উড্ডীন করিয়া 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্ত পরায়ণঃ' বলিয়া বেড়াইয়াছিলেন। ইতর জাতির উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলে সামাজিক খর্ব্বতা হউক কিন্তু হরিভক্তির হানি হয় না,—একথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। সপ্তগ্রামবাসী সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কালিদাস, হাড়ির উচ্ছিষ্ট খাইয়াছিলেন—মহাপ্রভু তাহাতে প্রীত হইয়াছিলেন। চৈতন্যভাগবতে উক্ত হইয়াছে জাতিভেদের অসারতা দেখাইবার জন্য তিনি হীন শূদ্র রামরায়কে দিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করাইয়াছিলেন। তদীয় অনুচর ভক্তকবিগণ নিজেদের ব্রাহ্মণ্য অভিমান লুপ্ত করিয়া শুধু 'দাস' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং ঈশান নামক ব্রাহ্মণ নিজের উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাঁহাদের সেবার অধিকারী হইয়াছিলেন।" আমার ও আমার সেবকদের কোন জাতি নাই" এই কথা তিনি অটল নির্ভীকতার সহিত প্রচার করিয়াছিলেন। [বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—১৭৪২ পৃষ্ঠা] সমাজের সংকীর্ণতা, অস্পৃশ্যতা, মানুষ হইয়া মানুষের প্রতি ঘৃণা প্রভৃতি অনুদার ভাব দূরীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনের ধর্ম্মনীতি ও চরিত্রের উদারতা ও মহত্ব প্রভাবেই সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে একটা নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময়েই জীবনী লেখার সূত্রপাত হয়। জীবন-চরিত সাহিত্যের সৃষ্টি বা সাহিত্যের চরিত-শাখা সেই সময় হইতেই এক নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। তখন মানুষ জাতিবর্ণ ভুলিয়া যোগ্যতমের পূজা করিয়াছেন। নরহরি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু তিনি অসংখ্য প্রণিপাত

সহকারে নরোত্তমের ন্যায় ভক্ত কায়স্থের জীবন-আখ্যান বর্ণনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কাজেই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রভাবে কি রাষ্ট্র, কি সমাজ, কি ধর্ম্ম সকলের মধ্যে এক মহামিলনের ভাব প্রচারিত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালে আর একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহার নাম কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। বাঙ্গলাদেশে আগমবাগীশ কালী মূর্ত্তির পূজার প্রবর্ত্তক বলিয়া কথিত আছে। এ সম্বন্ধে ওয়ার্ড সাহেব লিখিয়াছেন:
Agam Vageeshu, a learned Hindoo, about five hundred years ago, formed the image of Kaliee according to the preceding description, and worshipped it monthly, choosing for this purpose the darkest nights in the month: he made and set up the image, worshipped it, and destroyed it, on the same night. At present the greater number of the worshippers of Kalee hold a festival to her honour on the last night of the decrease of the moon in the month Kartiku, and Called it the Shyama festival. Shyama a name of Kalee, meaning black.*

আগমবাগীশ শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। সে সময়ে নবদ্বীপে যে তিনজন মহাপুরুষের জন্মে নবদ্বীপ খ্যাতিমান হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, রঘুনাথ শিরোমণি বলিয়া প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। যদিও এ বিষয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

আগমবাগীশ যে কালী মূর্ত্তির রূপ কল্পনা করিয়া প্রচার করেন, সেই মূর্ত্তিই বাঙ্গালাদেশে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। 'বিদ্যাসুন্দরে' সুন্দরের চৌত্রিশাক্ষরে কালীস্তুতির মধ্যে আগমবাগীশের আরাধ্যা মূর্ত্তির রূপই প্রকটিত:—রামপ্রসাদের বর্ণনায় তাহা উজ্জ্বল হইয়া আছে। দুর্গা ও কালীর স্তব একসূত্রেই গ্রথিত। কালীপূজা কতদিনের পুরাতন বলা সহজ নহে। দুর্গার কথা আমরা সর্ব্বপ্রথম 'মহাভারতে' পাই। অনেকে মনে করেন কালী, ভগবতী বা দুর্গারই রূপান্তর। চণ্ডী পাঠ করিলে মনে হয়, রক্তবীজের কাহিনী হইতেই তাঁহার উৎপত্তি। কালী, রক্তবীজ অসুরকে নিধন করিয়া আনন্দে এমন নৃত্য করিয়াছিলেন যে সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হইতেছিল, পৃথিবী ধ্বংস হয় আর কি! অবশেষে দেবতাগণের অনুরোধে মহাদেব রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং যেখানে নিহত দৈত্যগণের শব পড়িয়াছিল, তিনি সেখানে গিয়া শয়ন করিলেন, দেবী চণ্ডীকা নৃত্য করিতে করিতে সহসা দেখিতে পাইলেন যে শঙ্করের অর্থাৎ

* The Hindoos By W. Ward, Volume II. Serampore. Printed at the Mission Press. 1815. P. 122.

পতির বক্ষোপরি দাঁড়াইয়াই তিনি নৃত্য করিতেছেন। অমনি লজ্জায় জিহ্বা বাহির করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মানা হইলেন। বাঙ্গালাদেশে যে কালীমূর্ত্তির পূজা হয় তাহা আগমবাগীশের কল্পিত মূর্ত্তিরই অনুরূপ। দক্ষিণাকালীর ধ্যান—

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥

ইত্যাদি।

কালীপূজা বা শ্যামাপূজা একসময়ে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে হইত। শক্তি-উপাসকেরা শাক্ত নামে অভিহিত। শ্রীচৈতন্যদেব যেমন সাম্যভাব দ্বারা বিশ্বজনীন ভাবে জনসমাজের মধ্যে ঈশ্বর আরাধনার এক নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, শক্তির উপাসনা, বা তন্ত্রের প্রধান লক্ষ্য শক্তির উপাসনাও তাই। এই শক্তির জ্ঞান ও স্বরূপ এবং তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বসমূহ অত্যন্ত প্রাচীন। উহা বুঝিতে হইলে গুরুর সাহায্য প্রয়োজন। প্রেম ও ভালবাসা দ্বারা মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করেন—তান্ত্রিক সাধনাবলম্বী শাক্তদের মধ্যেও সেই সাম্যভাব বিদ্যমান। তন্ত্রসার, ব্রহ্মানন্দের শাক্তানন্দতরঙ্গিনী ও তারারহস্য, পূর্ণানন্দের শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, শ্যামারহস্য, প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রাণতোষিণী ইত্যাদি আদর্শ স্থানীয় তন্ত্রগ্রন্থ। বিবিধ তন্ত্রগ্রন্থ আলোচনা করিলে যুগে যুগে যে উহার পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সকল পুঁথিতে বিবিধ আচার, যেমন শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার, ইত্যাদি আছে, তেমনি কুলধর্ম্ম, অভিষেক-বিধি, গুরুক্রম, চক্রানুষ্ঠান, যন্ত্র-সংস্কার, যোগমাহাত্ম্য, অষ্টাঙ্গ-যোগ লক্ষণ, আসন নিরূপণ, ব্রহ্মজ্ঞান, ধ্যানতত্ত্ব সাধনা ও সিদ্ধির বিষয় আছে। তাহা অধ্যয়ন ও লিখিত তদনুযায়ী কার্য্য সম্পাদন, অনুষ্ঠান, ইত্যাদি করা বড় সহজ নহে। তন্ত্র সাধনার প্রধান ভিত্তি হইতেছে কুণ্ডলিনী যোগ। 'কুণ্ডলিনী' মানুষের ভিতর সুপ্ত অধ্যাত্মশক্তি। কুণ্ডলীর বলয়াকৃত রূপ থাকে বলিয়াই ইহাকে বলা হয় কুণ্ডলিনী। এ শক্তি মূলাধারে সংগৃহীত ভাবে থাকে। এই শক্তি সর্ব্বত্রই বিরাজমান। এ বিশ্বশক্তি অণু পরমাণুর ভিতরেও আছে। মানুষের ভিতর এ অত্যন্ত কার্য্যকরী। এই সংগৃহীত সর্ব্বব্যাপী শক্তির তুলনায় যে শক্তি আধারের ভিতর ক্রিয়াশীল, তাহা মহাসমুদ্রে বিন্দুর ন্যায়। এই সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করেই মানুষের অভিব্যক্তির আরও উর্দ্ধতর উজ্জ্বলতর প্রকাশ সম্ভব। তন্ত্রের অধ্যাত্ম-কৌশল এই শক্তিকেই জাগ্রত করা।**

* See Wilkin's, Hindu Mythology. The Sakta's by E. A. Payne page 7

যেখানেই জীবনের স্পন্দন আছে সেখানেই এই শক্তি প্রক্রিয়াশীল। জীব-জগতের সকল স্তরেই ইহা বিদ্যমান, কিন্তু এর পূর্ণ বিকাশ অধ্যাত্ম-জীবনেই দেখা যায়—সেখানে ইহার প্রবাহ, ইহার বিস্তৃতি এবং বিকাশ অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয়। অধ্যাত্ম জীবনে প্রবেশের সাথে সাথে ইহার স্পন্দন অনুভব করা যায়। এর আকর্ষণ—নবীন জীবনীশক্তি এবং জ্ঞান সঞ্চার। প্রাণস্পন্দন কুণ্ডলিনী জাগরণে দ্রুততর হয় এবং ধীরে ধীরে এই কুণ্ডলিনী শক্তি, প্রাণকে এমনিভাবে সংযত ও চালিত করে যে—এ ক্রমশঃ হয়ে ওঠে ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়া মনোবুদ্ধির গোচর এই বাহ্য জগতকে প্রত্যক্ষ করিতেছে।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শক্তি-পূজা প্রচলিত। বাঙ্গালাদেশে ও আসামেই তন্ত্রের প্রাধান্য বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত। কোথায় আসাম, কোথায় কুমারিকা-অন্তরীপ সর্ব্বত্র শক্তি পূজা প্রতিষ্ঠিত। উত্তর প্রদেশের মির্জ্জাপুর সহরের সন্নিকটবর্ত্তী বিন্ধ্যপর্ব্বত নিবাসিনী বিন্ধ্যাচলবাসিনী, কোথায় চিতোর, কোথায় বেলুচিস্থানের হিংলাজ, কলিকাতার বিখ্যাত শাক্ত-তীর্থ কালীঘাট সর্ব্বত্র শক্তি উপাসনা চলিতেছে। হিংলাজ সম্বন্ধে কোন কোন বিদেশী লেখক লিখিয়াছেন: In the west, at Hinglaj in Baluchistan Parvati is worshipped by many pilgrims and even by the local Muhammadens অর্থাৎ বেলুচিস্থানের হিংলাজে পার্বতী দেবীর নিকট যেমন সহস্র সহস্র হিন্দু-তীর্থযাত্রীরা দেবীর পূজা করেন, তেমনি স্থানীয় মুসলমানেরাও দেবীর পূজা করেন।

এক কথায় সতী তনুত্যাগ করিলে তাঁহার দেহের একান্নঅংশ ভারতের যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানই মহাতীর্থে বা শক্তি পূজার কেন্দ্র বা পীঠস্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। শক্তি এবং শাক্ত (Sakti and Sakta) নামক গ্রন্থে সার জন উড্‌রফ (Sir John wood rootfe) বলেন 'The Shakta faith or worship of Shakti, is I believe, in some of its essential features one of the oldest and most widespread religions in the world.' Though very ancient, it is yet, in its essentials, and in the developed form in which we know it to-day, harmonius with some of the teachings of modern philosophy and science; not that this is necessarily a test of its truth. It may be here noted that in the West, and in particular in America and England, a large number of books are now being published on "New Thought', 'Will Power,' "Vitalism, Creative Thought," "Right thought," Self Unfoldment," 'Secret of Achievment,' 'Mental Therapeutics and

the like, the principles of which are essentially those of some forms of Shakti Sadhana both higher and lower."

ভাবার্থ এই যে শাক্ত ধর্ম্ম বা শক্তি উপাসনাকে পৃথিবীর মধ্যে বহু ব্যাপক প্রাচীন ধর্ম্ম বলা চলে। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তিত থাকিলেও বর্ত্তমান দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত ইহার অপূর্ব্ব ঐক্য রহিয়াছে, ইহাই যে এক-মাত্র প্রাচীনতার সাক্ষ্য তাহা নহে, বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে বহু মনীষী তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থাবলীই তাঁহার প্রমাণ।

এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, এমন কোন মহাদেশ বা দেশই নাই যেথানে তন্ত্র-শাস্ত্রের শক্তিতত্ত্ব ও সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা না হইয়াছে। মহাচীন তন্ত্রের কথা ত (চীনআচার) ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন। মহামতি উড্রোফ, তাঁহার গ্রন্থে তন্ত্রশাস্ত্র ও বেদ, শক্তি ও শাক্ত, চীনে তন্ত্রশাস্ত্র, চিৎশক্তি, মায়াশক্তি, শক্তি ও মায়া, শক্তি-মন্ত্র, বর্ণমালা, শাক্ত-সাধনা, পঞ্চতত্ত্ব, মতমস্ত্র, কুণ্ডলিনী শক্তি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের অবতারণা অত্যন্ত নিপুণ ভাবে বৈজ্ঞানিক-প্রণালী অনুযায়ী করিয়াছেন।

রামপ্রসাদের সঙ্গীত আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, তিনি তাঁহার গানের মধ্য দিয়া চিৎশক্তি, মায়াশক্তি, পঞ্চতত্ত্ব, কুণ্ডলিনীশক্তির উদ্বোধন ও তাঁহার অতি সুন্দর বর্ণনা সহজ সরল ভাবে করিয়াছেন। প্রসাদ তাঁহার সঙ্গীতের মাধ্যমে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন (একত্রে অন্তঃকরণ, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতত্ত্ব, ক্ষিতি, (Earth), অপ্ (water), তেজ (Fire), মরুৎ (air) ব্যোম (Ether) প্রভৃতি পঞ্চমহাভূত, প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন, এইগুলিই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমরা আমাদের জগৎ সম্পর্কিত বা জাগতিক জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা বা মনোনিবেশ করিলে যে উপাদানগুলি পাই, এই তত্ত্ব গুলির দ্বারা সেই গুলির নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক জাগতিক জ্ঞান বা প্রত্যয়ের মধ্যেই স্থিরত্ব ও একটা অস্থিরতার ভাব আছে। মূল প্রকৃতির সহিত অবিযুক্ত হইয়া আমাদের যে আত্মা বা বিযুক্তি আছে, তাহারই ফলে আমাদের প্রত্যয়গুলির মধ্যে একটা স্থিরত্বের ভাব সর্ব্বদা অনুস্যুত থাকে। এই আত্মাই সর্ব্ব-ভূতস্থিত চৈতন্য। মূল প্রকৃতি বা মায়াশক্তির ফলেই অস্থিরতা বা পরিণাম। ইহার কার্য্যভূত তত্ত্বগুলিকে বিষয় ও বিষয়ীর দিক্ দিয়া অথবা চলিত ভাষায় বলিতে গেলে জড় ও মনের দিক্ দিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। বিষয়ী তত্ত্বগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া

যায়, যে একা ব্যক্তিত্ব বা অহঙ্কার (Individuality) ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়া মনোবুদ্ধিগোচর (the material of its precepts and concepts) এই বাহ্য জগতে প্রত্যক্ষ করিতেছে।—সৃজন পঞ্চতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন। পঞ্চ মহাভূতের সমবায়ে নির্মিত এই বৈকৃত সৃষ্টিকেই জ্ঞানের বিষয় বা জড় (matter) বলা হইয়া থাকে। সাংখ্যমতে তত্ত্ব পরিণাম বলিয়া ইহাদের কোনটিকে সত্য বলিবার উপায় নাই।

রামপ্রসাদের বহু সঙ্গীতে এই গভীর তত্ত্ব অতি সহজ সরল ও সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা—

ভূতের বেগার খাটবো কত।
তারা বল্ আমায় খাটাবি কত॥
আমি ভাবি এক, হয় আর সুখ নাই মা কদাচিত।
পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়, এ দেহের পঞ্চভূত।

আবার বলিতেছেন :

ভাল ব্যাপার মন কত্তে এলে।
ভাসিয়ে মানবতরী কারণ জলে॥
বাণিজ্য করিতে এলে, মন ভবনদীর জলে,
ওরে কেউ করিল দুনো ব্যাপার, কেউ হারালে লাভে মূলে॥
ক্ষিত্যপতেজঃ মরুৎ ব্যোম বোঝাই আছে নায়ের খোলে॥

রামপ্রসাদ তাঁহার সাধনায় কি চাহিয়াছিলেন? চাহিয়াছিলেন, বিদেহ মুক্তি (bodiless liberation) লাভ করিয়া মায়ার নিগড় হইতে মুক্তি। সেই মুক্তি লাভ করিয়া জীব যখন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইয়া যায় তখন আর তাহার পক্ষে ঈশ্বরের কোনও সত্তা থাকে না। জীব এবং পরমাত্মা সম্পূর্ণ অভিন্ন। রামপ্রসাদ মৃত্যু সম্বন্ধে বলেন :—

বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খোয়ালে।
এক ঘরেতে বাস করিছে পঞ্চজনে মিলে জুলে।
সে যে সময় হইলে আপনা আপনি, যে যার স্থানে যাবে চলে॥
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবিরে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে॥

রামপ্রসাদের অল্প কয়েকটি কথায়—ঈশ্বরের শরীরিভূত এই মায়াশক্তি যখন

নিত্য ও সত্য পদার্থ বলিয়া স্থিরীকৃত তখন ঈশ্বরের সত্যতা ও নিত্যতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের কারণ নাই।

উডরোফ্ সাহেব তন্ত্রের এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বলেন: 'Man's soul is a mortal thing consisting of Memory, Intelligence and will. It dies with the body disappearing as might a mist. Man is free and therefore no one can enchain his free spirit. The only Heaven and Hell which exists in the world. After death there is neither pleasure nor suffering.'

রামপ্রসাদের বহু সঙ্গীতেই রহিয়াছে এই দৃঢ় সত্যের অভিব্যক্তি। রামপ্রসাদ ছিলেন মাতৃভাবের সাধক। তাই বলিয়াছেন:

প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।

তন্ত্র শব্দের সহজ অর্থ হইতেছে বিধি, নিয়ম, শাস্ত্র এই অর্থেই তন্ত্র শব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মহাদেব, রুদ্রস্বরূপ। তিনি মহাকাল। মহাকাল বা মহাদেব যে কেবল সংহারের বা ধ্বংসের দেবতা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি তাহা নহে, সাধকেরা তাঁহাকে মনে করেন শিবস্বরূপ, মঙ্গলময় দেবাদিদেব। প্রাচীন কালের ঋষিরাও বলিয়াছেন:—"রুদ্র যৎ তে দক্ষিণং মুখ তেন মাং পাহি নিত্যং।" এই মহাদেবের মহাশক্তি মহাদেবী বলিয়া পুজিতা। এই মহাদেবীর পূজাই হইতেছে তন্ত্রের বিশেষত্ব ও প্রতিপাদ্য। মাতৃরূপে আদি কারণ বা অনাদি শক্তির পূজা, তন্ত্রের বিশেষত্ব। অন্য কোনও প্রকার পূজাবিধিতে এই সুমধুর ভাবটি নাই। খ্রীষ্টানের সাধনায় মা বলিয়া পূজা নাই; মা বলিয়া দেব সম্বোধনে খ্রীষ্টানের অত্যন্ত আপত্তি। হর দুর্গা অভেদ মূর্ত্তিতে পিতা ও মাতা; এবং মাতৃস্বরূপ স্রষ্ট সন্তানের নিকট অধিক প্রিয়। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী শক্তি অসহায় সন্তানের মাতা, এই ভাবটি শাক্তের, তন্ত্র-শাস্ত্রের প্রধান কথা। বৈষ্ণব-ধর্ম্মে পুত্ররূপে* পূজা আছে, পতিরূপে পূজা আছে, কিন্তু মাতৃরূপে নাই।

---বেদপাঠক বৈদিক অনুষ্ঠানে স্ত্রী-পুত্রাদির অধিকার ছিল না। ব্রাহ্মণীরাও দেবালয়ে বা গৃহে প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণেরা মন্ত্র পাঠ করাইলে অর্ঘ্য বা অঞ্জলি দান করিতে পারেন। তন্ত্রের বিধানে স্ত্রী হউক, শূদ্র হউক, সকলেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে, এবং নিজে যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া শিবাদি ইষ্টদেবতার পূজা করিতে পারে। দেবপূজায় এই সাধারণ অধিকারের বিস্তৃতি তন্ত্রশাস্ত্রের দ্বিতীয় বিশেষত্ব।

তন্ত্রে যে সকল গুপ্ত-সাধন-বিধি আছে, বামাচার আছে, তাহার আলোচনা

সাহিত্য—১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। আষাঢ়, ১৩১২—তন্ত্র। বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

করিবার ইচ্ছা নাই। শক্তির (power) উপাসক যাঁহারা তাঁহারাই শাক্ত। ঈশ্বরকে মাতৃরূপে পূজাই হইতেছে তান্ত্রিক বা শাক্ত ধর্ম্ম। রামপ্রসাদ এই মাতৃমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। তাঁহার প্রত্যেকটি গানেই তাহার পরিচয়।

যিনি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী—যাঁকে বলা হয় (Supreme Power which creates, sustains and withdraws the universe). তাঁহার উপাসনাবিধিই হইতেছে শাক্তধর্ম্ম, শক্তি পূজা, বা শক্তিবাদ বা শাক্ত দর্শন নামে পরিচিত। ঈশ্বরকে মহাদেবী বা মাতৃস্বরূপিণী রূপে অর্চ্চনা শাক্ত ধর্ম্ম বা তন্ত্রের সাধনা। ঈশ্বর নিত্য এবং লিঙ্গবিহীন (God is beyond sex) মাকে অন্তরে রাখিয়া অর্থাৎ মনকোষে ধারণ করিয়া সাধক মহাদেবী বিশ্বমাতার চরণ-শতদলে আত্মনিবেদন করেন। যে দেবীর চরণ রেণুতে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে শত শত বিশ্ব, এই গ্রহ-উপগ্রহ জ্যোতির্ম্ময় জগৎ, মঙ্গলময়ী শক্তিরূপিণী, তাঁহারই প্রভাবে প্রভাবান্বিত দেহ ও মন ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়ার অধীন। অচিন্ত্য অপার, সেই মহাশক্তি—ক্রিয়াশীল পরিবর্ত্তনময় জগতেও নিত্যস্থিতা। জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা জ্যোতির্ম্ময় সূক্ষ্ম দেহ—বা জ্যোতিঃ দেহের অংশ, মানস-শক্তি, দেহের ক্রিয়া ও কর্ম্ম সকলই হইতেছে মহাশক্তির প্রেরণা বা প্রকাশ। ইহাকে বলা চলে আত্মস্বরূপ। শাক্ত দর্শন এক প্রকারে অদ্বৈতবাদের কথাই বলিতেছে। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নিত্য চলিতেছে শক্তির প্রসারতা, বিবিধ পরিবর্ত্তন নানাভাবে তাহাকে মায়াশক্তির দ্বারা পরিচালিত করে। অবাধ তাহার গতি।

তন্ত্র বলিতে কোনও রূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ দর্শন শাস্ত্র বুঝিলে ভুল হইবে। আগম-নিগমাদি বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ সমূহ ও স্মৃতি সংগ্রহ দ্বারা আমরা ভারতের ইতি-হাসের কোন এক যুগের শিক্ষা-দীক্ষার সভ্যতার পরিচয় পাই। তন্ত্রে যেমন বিবিধ আচার-পদ্ধতি, গার্হস্থ্যনিয়ম, ব্যবহারবিধি, ভেষজ-সংগ্রহ, বশীকরণ, ইন্দ্রজাল (Magic) প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা আছে তেমনি ইতিহাসের দিক্ দিয়াও তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনা ও গবেষণার বিষয়। সাধন, যোগ, এবং দৈহিক ও মানসিক যে নিয়মের দিক্ দিয়া শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট ত্রিকাণ্ডার্গত উপাসনাকাণ্ডের অঙ্গস্বরূপ, তন্ত্র সাহিত্যের আলোচনা না করিলে—তন্ত্র শাস্ত্র সম্বন্ধে উপলব্ধি হইতে পারে না। অনেকে মনে করেন তান্ত্রিক ধর্ম্ম বা আচার, অনুষ্ঠান ও অভিচার ও ব্যভিচারপূর্ণ, কিন্তু যাঁহারা গভীরভাবে তন্ত্র-শাস্ত্রের গভীর গহনে আলোকবর্ত্তিকা লইয়া প্রবেশ করিবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন—কত গভীর দার্শনিক তত্ত্ব তাহার মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। রামপ্রসাদের সেই উপলব্ধি হইয়াছিল

তাই আমরা তাঁহার প্রত্যেকটি গানে পাই তন্ত্র-শাস্ত্রের গভীর-তত্ত্বের সুমধুর ব্যাখ্যান এবং নিগূঢ় মর্ম্মকথা।

—গুণ সাম্যের নাম মূল প্রকৃতি। মূল প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব আছে, কিন্তু চৈতন্য নাই। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের চৈতন্য আছে, কিন্তু কর্ত্তৃত্ব নাই। ইহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উভয়কে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিতে গেলে, উভয়েই পরস্পর স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন। উভয়ই আবার পরস্পর অভিন্নভাব (unseperateness) সম্বন্ধে অবস্থিত। ব্রহ্ম ছাড়াও প্রকৃতি নাই, প্রকৃতি ছাড়াও ব্রহ্ম নাই। কেহবা পরচেতনাকে প্রকৃতি বলে। কেহ ইহাকে শিব বলিয়া উপাসনা করে, কেহবা শক্তি বলিয়া উপাসনা করে। উভয়েই এক এবং অভিন্ন। চিৎএর দিক্ হইতে দেখিতে গেলে ইনি শিব এবং মায়ার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইনিই শক্তি। সেই পরম অদ্বয়, তিনি পুরুষও নয় স্ত্রীও নয়, তাঁহারই দুইভাগ, ব্রহ্ম ও প্রকৃতি, স্ত্রী ও পুরুষ, অকাল এবং কাল, শিব এবং শক্তি। ব্রহ্ম বা আত্মাশক্তির যাহারই সাধনা করিনা কেন সেই অদ্বৈতেরই সাধনা। প্রকৃতি-বিযুক্ত ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় এবং ব্রহ্মবিযুক্তা প্রকৃতি জড়া। সাঙ্খ্যের মতে যেমন প্রকৃতি নিত্য, শঙ্কর মতেও তেমনি মায়া নিত্যা। তন্ত্রমতে নির্গুণ ব্রহ্মকে নিষ্কল শিব এবং সগুণ শরীরি ব্রহ্মকে সকল শিব বলা হয়।

সাঙ্খ্যে যাহাকে মূল প্রকৃতি বা ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বলে এবং বেদান্তে যাহাকে মায়া বলে, তন্ত্রে তাহাকেই বলে, কলা। কিন্তু মূল প্রকৃতি বা মায়াস্বরূপা কলা নিত্যা। অতএব নিষ্কল শিব বলিলে ইহা বুঝায় না যে সেই অবস্থায় বা কোন অবস্থায় কলার কোনও অস্তিত্ব নাই। কারণ এই কলা নিত্যা; এখানে নিষ্কল শিব বলিতে আমরা এই পরিণামাত্মিকা প্রকৃতি হইতে অন্য স্বতন্ত্র ব্রহ্ম পদার্থকেই বুঝিয়া থাকি। এই ব্রহ্মের মধ্যে মায়াশক্তি তখন অব্যক্তভাবে তিরোহিত হইয়া থাকেন, 'কুলচূড়ামণিতে' দেবী বলিতেছেন, "অহং প্রকৃতিরূপা চিদানন্দপরায়ণা।" বিশ্বপ্রকাশিকা ব্যাপারবতী প্রকৃতির সহিত যখন শিব সংযুক্ত হন তখনই তাঁহাকে সকল শিব বলা হইয়া থাকে। একের মধ্যে কলা ব্যাপারময়ী, ব্যক্তা, অপরের মধ্যে তিনি নির্ব্যাপারা, অব্যক্তা ও লীনা। দুই শিবও অভিন্ন একই শিব। তিনি একদিকে যেমন সগুণ অপর দিকে আবার নির্গুণ। তান্ত্রিক যোগগ্রন্থ ষটচক্রনিরূপণের মতে, জীবাত্মা পরমাত্মারই একটি পর্য্যায় বা বিভিন্ন নাম বিশেষ। এবং ইহাদের উভয়ের একাত্ম-বিধানের নামই মূল বিদ্যা। ব্রহ্মের ব্যক্তাবস্থার নামই শক্তি, এবং এই মহিমাময়ী শক্তির ধারণার উপরেই তন্ত্রশাস্ত্র নির্ভর করিয়া আছে।

পারা অর্থের শক্ ধাতু হইতে শক্তি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। যে শক্তি দ্বারা ব্রহ্ম নিজকে অভিব্যক্ত এবং জগদাকারে প্রকাশ করিতেছেন, সেই শক্তি এবং ব্রহ্ম এই উভয়েই এক পদার্থ। কারণ শক্তি ও শক্তিমান্ (Possessor of Sakti) উভয়ে অভিন্ন। শক্তি এবং ব্রহ্ম যখন একই হইল তখন শক্তি ও সগুণ এবং নির্গুণ। নির্গুণ শক্তিকে চিৎশক্তি বলে; সৃষ্টি প্রক্রিয়ার নিমিত্তভূতা (efficient cause) ব্যাপারারূঢ়া প্রকৃতির সহিত চিৎ সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। আর বিশ্বের উপাদানও নিমিত্তকারণভূক্তা (material instrumental) সৃষ্টি ব্যাপারারূঢ়া মায়ারূপা শক্তিকে মায়াশক্তি বলা হয়। মহামায়া ঈশ্বরী যেমন পরমা মুক্তিদায়িনী, এই মায়াশক্তি আবার তেমনি অবিদ্যা-উৎপাদিনী। সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে শক্তির এই যুগ্মভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন চিৎ এর শরীরের মধ্যে ব্রহ্মের দিক্ দিয়া চেতন আত্মা (spirit) রহিয়াছে, মায়ার দিক্ দিয়া আবার তেমনি অন্তঃকরণ জড় (unconscious) মন, শরীর প্রভৃতি তদীয় বিকার-সমূহ রহিয়াছে। শুধু শক্তি বলিলে যে চিৎ-শক্তি মায়া-শক্তির সহিত সংযুক্ত স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই জগজ্জননী মহামায়া দেবী অথবা ঈশ্বরকে বুঝাইয়া থাকে। এই কথাগুলি মনে রাখিলে শাক্তেরা যে কেবলমাত্র জড়ের উপাসনা করেন, এই ভুল ধারণাটি আর থাকিবে না। শক্তি ধর্ম্ম জগতের অতি প্রাচীন ধর্ম্ম, কত প্রাচীন তাহা বলা কঠিন। ঈশ্বর বা ঈশ্বরী এবং অচিৎ এক বস্তু নয়। সত্ত্বগুণাত্মক অচিৎ এর দ্বারা তাঁহার দেহ নির্ম্মিত। মূল প্রকৃতি অর্থে মায়াশক্তি অচিৎ।

তন্ত্রে, শক্তি শিবের অধীনা ক্রীড়াপুত্তলিকা বা দাসী নহেন। শক্তি এবং শিব, ঈশ্বর এবং ঈশ্বরী অভিন্ন। ঈশ্বর যেরূপে জগতের পালয়িত্রী জগজ্জননীরূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই রূপের নামই ঈশ্বরী বা শক্তি। শিব-শক্তিস্বরূপ পরব্রহ্ম যেরূপে অগোচর অবিষয় হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারই নাম শিব এবং যেরূপে তিনি কার্য্যাত্মিকা জগৎস্বরূপিনী হইয়া রহিয়াছেন তাহারই নাম শক্তি। এক শিব-শক্তি স্বরূপ ব্রহ্মই শিব ও শক্তি এই দুই বিভিন্নরূপে বিরাজ করিতেছেন। কাজেই ইহারা উভয়েই শিবশক্তি স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। কুলচূড়ামণি নিগমে ভৈরবী ভৈরবকে বলিতেছেন—"তুমিই সকলের গুরু, আমি তোমার দেহে প্রবেশ করিয়াছিলাম (শক্তিরূপে) এবং তাহার ফলেই তুমি প্রভু (Lord) হইয়াছিলে। আমি ছাড়া কার্য্যবিভাবিনী আর কেহই নাই। সেইজন্য সৃষ্টি-কালে তোমাতেই প্রভুত্ব আরোপিত হয়। তুমিই পিতা, তোমারই ইচ্ছায় আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, তুমি একমাত্র কার্য্য বিভাবক অর্থাৎ শক্তিই সেই নিত্যানন্দের

অমৃত প্রবাহের আধার স্বরূপ। শিব ও শক্তির সংযোগে সৃষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়; 'শিবশক্তি সমযোগাৎ জায়তে সৃষ্টি কল্পনা'। হে মহেশ্বর, জগতের সকল বস্তুই শিব শক্তিময়, কাজেই তুমি ও আমি উভয়েই সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছি। সেই সৃষ্টি স্পন্দন নিজের গর্ভেই নিজ বীজ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন।*

পরবর্ত্তীকালে বহু তন্ত্রের সৃষ্টি হয়, বাঙ্গালাদেশে যে কত তন্ত্র গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। শ্যামারহস্য, তারারহস্য, চামুণ্ডাতন্ত্র, বগলাতন্ত্র, ছিন্নমস্তারহস্য, মহানির্ব্বাণতন্ত্র, কুলার্ণবতন্ত্র, কামাখ্যাতন্ত্র, বৃহৎ কালীতন্ত্র, নীলতন্ত্র, বৃহন্নীলতন্ত্র, কামধেনুতন্ত্র প্রভৃতি বহু তন্ত্র আছে। মনীষী ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন:—"তন্ত্রশাস্ত্র প্রথমতঃ বঙ্গদেশেই প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে সংশয় করিবার প্রয়োজন নাই। বাঙ্গালাদেশে কামধেনুতন্ত্র নামে একখানি তন্ত্র আছে। বাঙ্গালার বাহিরে এই তন্ত্রখানির নাম অজ্ঞাত। তন্ত্রগ্রন্থ মাত্রেই জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সাধনার অধিকার লিখিত আছে। সাধনার্থ যে সমুদয় বিধান তাহাতে আছে, তাহারই ফলে তন্ত্রের বীভৎসতা সমাজকে কলঙ্কিত করিয়াছিল—সাধনার্থ কামিনী গ্রহণে আচণ্ডাল সকল জাতিই দ্বিজতুল্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

'মহানির্ব্বাণতন্ত্র', তন্ত্র মধ্যে একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।—অনেকে মনে করেন যে সময়ে বাঙ্গালাদেশে কতকগুলি অর্ব্বাচীন তন্ত্র প্রদর্শিত কদাচার অবলম্বিত হইয়াছিল তখন সামাজিক দুষ্ক্রিয়া দূর করিবার নিমিত্ত মদ্য-মাংসাদি পরিহার-পূর্ব্বক কুলাচারের নূতন ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল, এবং মানস-পূজা বা মোক্ষপথের জন্য আদর্শ সাধনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তান্ত্রিক প্রথায় শৈব বিবাহের বিধান করিয়া অনেক অপবিত্রতা পরিহারের পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। একদিকে কামাখ্যা তন্ত্রাদির ফল যে, পরস্ত্রী না হইলে "সুধীয়" সাধনা হইবে না, অন্যদিকে এই তন্ত্রের উপদেশ যে, ভৈরবী চক্রে হউক, যেখানে হউক, পরস্ত্রী স্পর্শ করিলেই ঘোর নারকী হইতে হইবে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে যে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, উহা জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে ঈশ্বর বিশ্বাসীর নিকট চিরদিন আদৃত হইবে। এই তন্ত্রোক্ত মোক্ষতত্ত্ব প্রাচীন অদ্বৈতবাদ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রামপ্রসাদ ছিলেন পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্ভূত তন্ত্রমতানুযায়ী বীরসাধক।

* 'বিজয়া' আষাঢ়, ১৩২২ ৩য় বর্ষ দশম সংখ্যা। সার জে, সি উড্‌রোফ মহোদয়ের পঠিত "Creation as explained in the Tantra"—তন্ত্রে সৃষ্টির প্রক্রিয়া প্রবন্ধ হইতে কোন কোন অংশ গৃহীত হইয়াছে।

'জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী নিত্যানুষ্ঠান-তৎপর।
কামাদি-বলিদানশ্চ সবীর ইতি গীয়তে॥'

যিনি জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী এবং নিত্যানুষ্ঠান-তৎপর এবং কামাদি সকল প্রকার রিপুকে বলিদান, অর্থাৎ জয় করিয়াছেন, তিনিই বীর সাধক। স্যার জন উড্রোফ ইহার অতি সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন: 'He is a Hero who has controlled his senses, and is a speaker of truth; who is ever engaged in worship and has sacrificed lust and all other passions.' তান্ত্রিক সাধনার ইহাই হইতেছে মহাসিদ্ধি।

রামপ্রসাদ জিতেন্দ্রিয়, এবং প্রকৃত বীরধর্ম্মী শক্তিসাধক ছিলেন। বাঙ্গলা-দেশে যে সময়ে তান্ত্রিক উপাসনার নামে জঘন্য ব্যভিচার, কারণ গ্রহণ, নরবলি, ভৈরবীচক্র প্রভৃতির প্রচলনে সমাজে ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার প্রবর্ত্তিত ছিল। সেই সময়ে রামপ্রসাদ আপনাকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে মাতৃনাম মহাশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত শাক্ত ছিলেন—ধর্ম্মের নিগূঢ় সাধন-তত্ত্ব তাঁহার উপলব্ধি হইয়াছিল।

তন্ত্রে কালীর যে সব নাম পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কালী, কপালিনী, কুল্লা, চামুণ্ডা, শ্মশানকালী, মানবীকালী, ভদ্রকালী, উগ্রচণ্ডী, আনন্দময়ী, নবপত্রিকা, ভীমাচণ্ডী, অপরাজিতা, বিমলা, সিদ্ধেশ্বরী, বৃহৎকালীতন্ত্রে দশমহাবিদ্যার পূজা-বিধি আছে। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, ভৈরবী, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলাত্মিকা প্রভৃতি। আমাদের এই সব বিভিন্ন দেবীর বিষয় আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানে—এমন অনেক কালিকা দেবীর মন্দির আছে, যেখানে দেবী বিভিন্ন নামে পরিচিতা হইলেও পশুবলি ব্যতীত নরবলিও তাঁহার অর্চ্চনার অঙ্গীভূত ছিল। কালীঘাটের কালীমন্দিরে এক সময়ে নরবলি হইত। কালীঘাটের কালী সম্বন্ধে শ্রীরামপুরের পাদ্রী উইলিয়াম ওয়ার্ড সাহেব লিখিয়াছেন: 'At Kalee-ghatu, near Calcutta, is a celebrated image of this goddess', whom (in the opinion of the Hindoos) all Asia, and the whole world worshippeth.' একথা মিথ্যা নয়, এখনও যাঁহারা নিয়মিতভাবে কালীঘাটের কালী দর্শন করেন, তাঁহারা এসিয়ার নানা দেশবাসীকেই কালী-মন্দিরে পূজা দিতে দেখিয়াছেন। আমি নিজেও ঐরূপ পূজার্থীদের কালী-মন্দিরে দেখিয়াছি—একদিন কয়েকজন চৈনিককে দেখিয়াছিলাম, আর একদিন একজন কাবুলিকে কালী-মন্দির হইতে

বাহির হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম, পরে জানিতে পারিলাম,—সে আফগানিস্থানের অধিবাসী একজন ব্রাহ্মণ।

পূর্ব্বে কালীঘাটের মন্দিরে নরবলি হইত সে কথার উল্লেখ করিয়াছি। ওয়ার্ড ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন যে পূর্ব্বে কালীঘাটে নরবলি হইত এখন উহা অতীতের কথা, সেকথা সত্য নয়। এ বিষয়ে শাক্ত (The Saktas) গ্রন্থ প্রণেতা আর্ণেষ্ট এ পেইন (Earnest A Payne) বলেন, 'In the sixteenth century the Muhammadans found the offering of human beings common in Bengal. * * * but as late as 1824 Bishop Heber met people who had seen boys sacrificed at the gates of Calcutta, and the Abbé Dubois, whose work is a trustworthy authority on the state of India south of the Vindhya mountains between 1792 and 1823, speaks particularly of the sacrifice of girls. Since 1835 the whole practice has been illegal, and it is now generally repudiated by Sāktas themselves, but to this day in parts of Assam, and even in Bengal and Rajputana, there is danger of the more primitive peoples secretly maintaining the Custom". (The Sāktas—page-9).

তন্ত্র সাধনায় অতি প্রাচীন সময় হইতেই নরবলি প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত-সাহিত্যে তাহার বহু পরিচয় আছে। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' সপ্তম শতাব্দীর রচনা। তাহাতে মনুষ্য মাংস বিক্রয়ের কথা ও আছে। চীন পরিব্রাজক ইউয়ান চাঙ-হিয়োয়েন সাঙ—গঙ্গানদীর জলদস্যুগণ কর্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বিন্ধ্যবাসিনীর নিকট বলিদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কোনক্রমে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ভবভূতির 'মালতীমাধব' অষ্টম শতাব্দীর রচনা, তাহাতেও নরবলি, মনুষ্যমাংস বিক্রয়ের কথা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপাল-কুণ্ডলা' বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বঙ্কিম, সম্রাট্ আকবরের ও জাহাঙ্গীরের সময়ের কাহিনী অবলম্বনে 'কপালকুণ্ডলা' রচনা করিয়াছেন। তাহাতে কাপালিক চরিত্র, তাহার পূজাবিধি, প্রভৃতি বিষয় অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তন্ত্রোক্ত ব্যভিচার এবং ঘৃণিত আচরণের বিশদভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন বঙ্কিম তাঁহার 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে, কৌতূহলী পাঠক যদি নূতন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' বইখানি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন তাহা হইলে তন্ত্রের সাধনার তৎকালীন হীন বীভৎস আচরণের পরিচয় পাইবেন।

'কালিকাপুরাণে'র 'রুধিরাধ্যায়' ও 'বলিদান' অধ্যায় পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে সর্ব্বপ্রকার জীবের বলিদানের ব্যবস্থাই ছিল।

চণ্ডিকাং বলিদানেন তোষয়েৎ সাধকঃ সদা।
পক্ষিণঃ কচ্ছপা গ্রাহাচ্ছাগলাশ্চ বরাহকা॥
মহিষো গোধিকা শোষা তথা নববিধা মৃগাঃ।
চামরঃ কৃষ্ণসারশ্চ শশঃ পঞ্চাননস্তথা॥
মৎস্যাঃ স্বগাত্ররুধিরৈশ্চাত্যধা বলয়ো মতাঃ।
অভাবে চ তথৈবৈষাং কদাচিদ্বিয় হস্তিনৌ॥
ছাগলাঃ শবরাশ্চৈব নরশ্চৈব যথাক্রমাৎ।
বলির্মহাবলিরিতি বলয়ঃ পরিকীর্ত্তিতা॥

অর্থাৎ বলিদান দ্বারা চণ্ডিকাকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট করিবে। পক্ষী, কচ্ছপ, কুম্ভীর, নব প্রকার মৃগ :—যথা—বরাহ, ছাগল, গোধা, শশক, বলয়, চমর, কৃষ্ণসার, শশ, সিংহ, মৎস্য, স্বগোত্র স্বগাত্র রুধির এবং ইহাদের অভাবে হয় এবং হস্তী এই আটপ্রকার বলি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ছাগল, শবর এবং মনুষ্য ইহারা যথাক্রমে বলি, মহাবলি নামে প্রসিদ্ধ।

রামপ্রসাদের জীবিতকালে শ্যামা পূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আদেশে কৃষ্ণনগরে অর্থাৎ নদীয়া জেলার এক হাজার বাড়ীতে শ্যামাপূজা হয়। সেই শ্যামাপূজার এক রাত্রিতে দশ হাজারের উপর পশুবলি হইয়াছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পৌত্র ঈশানচন্দ্র রায় একবার শ্যামাপূজা উপলক্ষে, চল্লিশ হাজার মণ সন্দেশ তদুপযোগী চিনি, সহস্র স্ত্রীলোককে বস্ত্র দান, রেশম বস্ত্রদান, তৎসহ চাউল, কলা, প্রভৃতি বহুবিধ পূজোপকরণ, এবং এক হাজার পাঁটা, এক হাজার মেষ বলিদান করিয়া শ্যামাপূজা করিয়াছিলেন এই পূজার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ তাঁহার পৈত্রিক জমিদারীর অধিকাংশ বিক্রয় করিতে হইয়াছিল।

সুবিখ্যাত রাণী ভবানীর দত্তকপুত্র নাটোরের মহারাজা রামকৃষ্ণ ছিলেন রামপ্রসাদের প্রায় সমসাময়িক, তিনি রবাহনগরে কালিকা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে একলক্ষ টাকা ব্যয় করেন। পূজার ব্যয় ও মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বহার্থ তিনি যে দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থা করেন, তাহার দ্বারা প্রতিদিন ৫০০ শত দীন দরিদ্র ও অতিথিগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হইত। এইরূপে দেবী পূজার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া রাজা রামকৃষ্ণ নিঃস্ব অবস্থায় পরিণত হন। এক সময় তিনি কোম্পানিকে রাজস্ব হিসাবে বায়াম লক্ষ টাকা প্রদান করিতেন।

কালীঘাটের কালী-মন্দিরে রামপ্রসাদের জীবিতকালে আনুমানিক ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজা নবকৃষ্ণ এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কালীমাতার পূজা দিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে দশ হাজার টাকা ব্যয়ে কালীমাতার জন্য একটি স্বর্ণহার নির্ম্মাণ

করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহুবিধ স্বর্ণালঙ্কার ও রৌপ্য নির্ম্মিত বাসন-কোষণ দান করেন এবং সহস্রাধিক লোককে পরিতোষসহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন। [রাজা নবকৃষ্ণ—১৭৩২—১৭৯৭ খৃঃ]।

খিদিরপুরের জয়নারায়ণ ঘোষাল (ভূ-কৈলাস) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আনুমানিক ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৫,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া কালীমাতার অর্চ্চনা করেন। মায়ের নিকট পঁচিশটি মহিষ, একশত আটটি পাঁটা, পাঁচটি মেষ বলিদান করিয়াছিলেন এবং দেবীকে রৌপ্য হস্ত, দুইটি স্বর্ণ চক্ষু এবং অনেক প্রকার স্বর্ণ ও রৌপ্য অলঙ্কার দিয়া অর্চ্চনা করেন। আনুমানিক ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গীয় একজন ধনী মহাজন কালীঘাটে ৫০০০ টাকা ব্যয় করিয়া পূজা দিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে ১০০০ হাজার পাঁটা বলি দেওয়া হয়। আমরা জানিতে পারিতেছি ১৮১০ সালে পূর্ব্ববঙ্গের অন্য একজন ধনী ব্রাহ্মণ দেবীকে সোণার হার উপহার দিয়াছিলেন—সেই হার ছিল স্বর্ণনির্ম্মিত নৃমুণ্ডমালা দ্বারা গ্রথিত। ১৮১১ সনে গোপীমোহন নামে একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ কালীঘাটে কালীমাতার পূজার জন্য ১০,০০০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব বলিয়া বলিদান করেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমরা ওয়ার্ড সাহেব প্রদত্ত কালীঘাটে কালীপূজার মাসিক ব্যয়ের পরিমাণ ৬০০০ টাকা এবং বার্ষিক ব্যয় ৭২০০০ বায়াত্তর হাজার টাকা দেখিতে পাইতেছি।

কামাখ্যা, বিন্ধ্যবাসিনী, রাজরাজেশ্বরী, যোগাদ্যা, করুণাময়ী প্রভৃতি দেবীর নিকট পূর্ব্বে নিয়মিত ভাবে নরবলি হইত। যোগাদ্যা সম্বন্ধে ওয়ার্ড সাহেব বলেন—'Human sacrifices, I am informed, were formerly offered to the Goddess.'

কলিকাতার বিভিন্ন স্থানের কালী-মন্দিরেও নরবলি হইত। সেকালে কলিকাতা দস্যু-ডাকাতের একটি প্রধান আড্ডা ছিল। ডাকাতেরা ডাকাতি করিতে যাইবার পূর্ব্বে কালীপূজা করিত এবং নরবলি দিত।

ওয়ার্ড সাহেব নিজে কালী পূজার সময় কালীপূজা বিধি এবং বলিদান দেখিবার জন্য কালীশঙ্কর ঘোষ নামক একজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ী গিয়াছিলেন, তিনি যে বর্ণনা দিয়াছেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—
'A few years ago, I went to the house of Kalee-shunkuru Ghosh at Calcutta, at the time of the Shyama festival, to see the animals sacrificed to Kalee. The buildings where the worship was performed were raised on four sides, with an area in the

middle. The image was placed at the north end with the face to the south ; and the two side rooms, and one of the end rooms opposite the image, were filled with spectators, in the area were the animals devoted to sacrifice, and also the executioner, with Kalee-shunkuru, a few attendants, and about twenty persons to throw the animal down. and hold it in the post, while the head was cut off. The goats were sacrificed first, then the buffalos, and last of all two or three rams. In order to secure the animals, ropes were fastened round their legs ; they were then thrown down, and the neck placed in a piece of wood fastened into the ground, and made open at the top like the space betwixt the prongs of a fork. After the animal's neck was fastened in the wood by a peg which passed over it, the men who held it pulled forcibly at the heels, while the executioner, with a broad heavy axe, cut off the head at one blow, the heads were carried in an elevated posture bv an attendant, (dancing as he went) the blood running down him on all sides, into the presence of the goddess. Kalee-shunkuru at the close, went up to the executioner, took him in his arms and gave him several presents of cloth, etc. The heads and blood of the animals, as well as different meat-offerings, are presented with incantations as a feast to the goddess, after which clarified butter is burnt on a prepared altar of sand. Never did I see men so eagerly enter into the shedding of blood, nor do I think any butchers could slaughter animals more expertly. The place literally swam with blood. The bleating of the animals, the numbers slain, and the ferocity of the people employed, actually made me unwell, and I returned about midnight, filled with horror and indignation. *

ওয়ার্ড সাহেব বলেন : আমি শ্যামাপূজা উপলক্ষে পশু বলি ও পূজা দেখিবার জন্য কলিকাতা নিবাসী কালীশঙ্কর ঘোষের বাড়ী গিয়াছিলাম। পূজার মণ্ডপের চারিদিকে মাটি ফেলিয়া উচ্চ বেদী তৈরী করা হইয়াছিল। উত্তরদিকে দেবীকে দক্ষিণমুখী করিয়া রাখা হইয়াছিল। দুই দিকে দুইটি ঘর ছিল, একটি ঘর ছিল দেবীর আসনের বিপরীত দিকে এবং অন্য ঘরটিতে পূজা-দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিরা সব বসিয়াছিলেন ; বাড়ীর কর্ত্তা কালীশঙ্কর, বলিদানকারী এবং কয়েকজন

* A view of the History, Literature and Religion. The Hindoos, By W. Ward. 1815 Page 123.

লোক পুজা-মণ্ডপের পাশে বসিয়াছিলেন। হাড়িকাঠটি দেবীর সম্মুখে মুক্ত প্রাঙ্গণে পোতা ছিল। প্রথমে পাঁটাবলি হইল, পাঁটার পশ্চাতে ও সম্মুখের পা বাঁধিয়া হাড়িকাঠের মধ্যে মাথা প্রবেশ করাইয়া একটি কাঠ ছিদ্রপথে গলাইয়া দিয়া বলি আরম্ভ হইল। 'মণ্ডপী' বা বলিদাতা তীক্ষ্ণধার খড়্গ দিয়া একে একে পাঁটা, মহিষ ও কয়েকটি মেষ কাটিয়া ফেলিল। একজন লোক পশু বলি হইয়া গেলে একটির পর একটি মাথা তুলিয়া লইয়া নৃত্য করিতে করিতে দেবীর সম্মুখে উপস্থিত করিতে লাগিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে রক্তের ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। কালীশঙ্কর বলিদান পর্ব্ব শেষ হইলে মহানন্দে বলিদাতাকে আলিঙ্গন করিল এবং তাহাকে বস্ত্রাদি নানা দ্রব্য দ্বারা পুরস্কৃত করিল। দেবীর সম্মুখে বলিদানের পশুসমূহের মাথাগুলি উপস্থাপিত করিবার পর বালি সংস্থাপনপূর্ব্বক বিভিন্ন পশুর মাংস, ঘৃত ইত্যাদি দ্বারা যজ্ঞ করা হইল। যজ্ঞের অগ্নিতে ঘন ঘন প্রচুর পরিমাণে ঘৃতাহুতি দেওয়া হইল। দেবীকে এইরূপে মাংস ভোগ দ্বারা পরিতুষ্ট করা হইলে পর,—নৃত্য, গীত, উৎসব ও ভোজন দ্বারা পূজার সমাপ্তি ঘটিল। আমি জীবনে প্রাণীহত্যা করিতে এতদূর আনন্দ ও নির্ম্মমতা কোথাও দেখি নাই। যে বলিদান করিল, সে ব্যবসায়ী কসাই অপেক্ষাও কৃতী,—পূজা স্থান, প্রাঙ্গণ, সমুদয় রক্তে ভাসিয়া গিয়াছিল। পশুর করুণ আর্ত্তনাদ, বলিদানের বীভৎসতা, লোকজনের চীৎকারে আমার বিশেষ অস্বচ্ছন্দতা বোধ হইতেছিল।'

আমাদের অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্যামা পূজার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে রামপ্রসাদের বিরাট চরিত্র বুঝিতে হইলে তৎকালীন সমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞান আবশ্যক, এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেও কিছু বলিয়াছি। বাঙ্গালী হিন্দু মাত্রেই তখন শ্যামাপূজার পক্ষপাতী, ঘরে ঘরে শ্যামা পূজা হয়, পশু বলি হয়, তান্ত্রিক ব্যভিচার চলে, ধর্ম্মসাধনা কোথায় ? যে সমাজে শত শত পশু বলি হয়, নরবলি হয়, মদ্যভাণ্ড, মৎস্য, মাংস বা সুন্দরী রমণীর সঙ্গ চাই, নববিধ কন্যা তান্ত্রিক সাধনার জন্য প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। দেশের সম্ভ্রান্ত ও ধনী ব্যক্তিরা যে সময়ে কালীঘাটে কালী পূজা করিতে গিয়া শত শত পশু বলির দ্বারা দেবীর কৃপা লাভ করিতে উৎসুক ছিলেন—সেই যুগে মহাসাধক রামপ্রসাদ সেন গাহিলেন অপূর্ব্ব সঙ্গীত—কালীকে তিনি বিশ্বব্যাপিনী মাতৃরূপে পূজা করিলেন—কণ্ঠে ধ্বনিত হইল সেই যুগে বিদ্রোহের সঙ্গীত,—প্রচলিত আনুষ্ঠানিক বীভৎস বামাচার, ভৈরবীচক্রের বিরুদ্ধে তেজঃব্যঞ্জক মহাবাণী—সে বাণী অহিংসার।—সে বাণী বিশ্বজনীন প্রেমে মহিমামণ্ডিত। গাহিলেন 'মা' শব্দের মহিমা ! মা শব্দ কেমন—মা—মমতাযুত !

'মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত!' রামপ্রসাদ ছিলেন ভক্ত সাধক, তাঁহার সঙ্গীতে তিনি বিশ্বজননীর বিশ্বপ্রেমের কথা প্রচার করিয়াছেন। প্রসাদ ছিলেন বাহ্যিক আড়ম্বরপ্রিয় পূজার বিরোধী! বিশ্বপালয়িত্রী জননী কি নিরীহ ছাগশিশু, মেষ ও মহিষের বলি গ্রহণ করিয়া পরিতুষ্ট হইতে পারেন? রামপ্রসাদ সত্য সত্য মহাপুরুষ ছিলেন, নির্ভীক ছিলেন; তিনি তাই সেই যুগে বলিলেন—তোমরা দেবী পূজার নামে কি ভ্রম করিতেছ? হারে মূর্খ, হারে অন্ধ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মানুষ, তোমরা প্রকৃত ধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিতেছ না বলিয়াই জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর নানা খাদ্য দিয়ে, তোমরা কিনা সেই মায়ের কাছে নিরীহ পশুদের বলি দান করিয়া তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিতে চাহিতেছ? তাই তিনি গাহিয়াছেন:

জগৎকে পালিছেন যে মা, সাদরে তাও কি জাননা।
তুই কি করিবি বলি দিয়ে, মেষ, মহিষ আর ছাগল-ছানা।

রামপ্রসাদ কালীর উপাসক ছিলেন বটে, কিন্তু তার মায়ের নিকট এই প্রার্থনা ছিল যাহা প্রত্যেক ধর্ম্মের ভক্ত সাধকেরই কামনার জিনিষ—

আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি,
নামটি কভু নাহি ভুলি।

কি অগাধ বিশ্বাস! তাঁহার কাছে তারা নিখিল-জননী, তিনি বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী। সেকালে যে নরবলি দিয়া কালীর পূজা হইত তাহা আমরা বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছি। রামপ্রসাদের একটি গানেও তাহার ইঙ্গিত আছে, মহামায়াকে তিনি নানারূপে দেখিতে পাইয়াছেন, কোথাও দেখিয়াছেন:

কালীঘাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধা প্যারী, গোকুলে গোপিনী গো।
পাতালেতে ছিলে মাগো, হয়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো।

ঐরূপ পূজার পক্ষপাতী রামপ্রসাদ ছিলেন না! আত্মার অধ্যাত্ম-সাধন দ্বারা তিনি জীবনকে উন্নত, অভিমানশূন্য, ক্রোধশূন্য, করিয়াছিলেন। কালধর্ম্মে, নানারূপ হীনতার মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে জন্মলাভ করিয়াও আপনার নিজস্ব শক্তি ও সাধনার দ্বারা প্রসাদ বাঙ্গলাদেশে বাঙ্গালীর প্রাণের মধ্যে যে প্রেমের দীপ জ্বালিয়া গিয়াছেন, পল্লীর নিভৃত নীরব তীর্থে বা অশ্বত্থ-পাকুড়-তিন্তিড়ী-নারিকেল, তাল ও আম্রবনের ছায়া শীতল কুটিরে মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া মায়ের নামের মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। এমন করিয়া মাকে কেহ

ডাকেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল, এবং ধর্ম্ম ছিল সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী, তাঁহার কাছে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম সকলকেই আবার শ্যামা-মা বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন। মানুষকে তিনি অন্তর্দৃষ্টির দিকে লক্ষ্য করিতে বলিয়াছিলেন।

যিনি মাতৃরূপিনী-বিশ্বজননী, তাঁহারই সৃষ্ট জীব, তাঁহারই সন্তান নিরীহ পশুদিগকে বলিদানের বিরুদ্ধে সে যুগে বিদ্রোহ করিয়া গিয়াছেন রামপ্রসাদ, কেন এ ধ্বংসলীলা? কেন এ জীব হত্যা? আমরা যে জাঁকজমকের পূজার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বোধহয় সেকালের রাজা, জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ধনীব্যক্তিদের বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান দেখিয়াই সাধক প্রসাদ গাহিয়াছিলেন :

জাঁকজমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে,
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা জানবে নারে জগজ্জনে!

এজন্যই তাঁহার কণ্ঠে শুনিতে পাই,—

ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা গড়ি বসাও হৃদি পদ্মাসনে।

এই যে অনন্ত শক্তিধারয়িত্রী, যিনি জড় ও জীবের আশ্রয়, তাঁহার কল্যাণময়ী মূর্ত্তির অনুভূতি ও প্রকাশ তাঁহার হৃদয়-অম্বরে মহান্ আদর্শ ও রূপ-মাধুর্য্যে প্রকাশিত হইয়া তাঁগার সাধনাকে জীবনে অমৃতের সন্ধান দিয়াছিল, সেই প্রেমলীলা ছিল বন্ধনহীন মুক্ত উদার, জীবন্ত কল্যাণ মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইয়াছিল, এবং ভক্তের কণ্ঠে মধুর বীণার সুর-ঝঙ্কারে ধ্বনিত হইয়াছিল :

রেখো রেখো সে নাম সদা সযতনে,
নিওরে নিওরে নাম শয়নে স্বপনে।
সচেতন থেকো মনরে আমার
কালী বলে ডেকো, এ দেহ ত্যজিবে যবে।

তেরো

অন্ন দে গো অন্ন দে গো অন্ন দে গো !

জানি মায়ে দেয় ক্ষুধায় অন্ন অপরাধ করিলে পদে পদে ॥ —রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদের পদাবলীর মধ্যে আমরা একটা বেদনার করুণ সুর শুনিতে পাই। অভাব ও অভিযোগের কথা তাহাতে অনেক আছে, কখনো বলিতেছেন :

দ্বারে দ্বারে যাব ভিক্ষা মেগে খাব
মা বলে আর কোলে যাব না !

কখনো দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন :

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ যে মা সংসারী ॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ এই সংসার সবারি।
ওমা তুমিও কোন্দল কোরেছ বলে শিব ভিখারী ॥

দারিদ্র্যে, অন্নক্লেশে যে তাঁহার জীবন দুঃখপূর্ণ হইয়াছিল, তাঁহার সে কথা আমরা সঙ্গীতের মধ্য দিয়াই পাইতেছি, অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্র ও সমাজের ইতিকথা প্রসাদের পদাবলীতে পরিস্ফুট। যথা :

মাগো আমার কপাল দুখী।
দুখী বটে গো আনন্দময়ী ॥
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নারলাম বারাণসী।
নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে,
মোর ভাগ্যেতে একাদশী।
অন্নত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষিকরি,
আমার কৃষি সকল নিল জলে,
কেবলমাত্র লাঙ্গল চষি ॥

আবার শত দুঃখ দৈন্যের মধ্যেও প্রসাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, অপূর্ব্ব আত্মনির্ভর ও বিশ্বাসের বাণী ! কত বড় দুর্দ্দিনের মধ্য দিয়া তাঁহার দিন যাইতেছে। তবু সেই দুঃখের অভাব ও অভিযোগের মধ্যে রহিয়াছে ভক্তি ও

অগাধ বিশ্বাস! কি সে অভিমান! ভক্তের মনে মার অবহেলায় বড় দুঃখ, কেন কিসের জন্য? তাহা নির্ব্বিকারভাবে বলিতেছেন—সরল সহজ ভাবায় নিবেদন করিতেছেন জননীর নিকট—

মরি গো এই মনের দুঃখে।
ওমা মা বিনে দুঃখ বল্‌বো কাকে॥
এ কি অসম্ভব কথা শুনে বা কি বলবে লোকে।
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী তার ছেলে মরে পেটের ভুকে॥
সে কি তোমার সাধের ছেলে মা রাখ্‌লে যারে পরম সুখে।
ওমা আমি কত অপরাধী, লুণ মেলেনা আমার শাকে॥
ডেকে ডেকে কোলে লয়ে পাহাড় মারিলে আমার বুকে।
ও মা মায়ের মত কাজ করেছ ঘুষিবে জগতের লোকে॥

অনেকে মনে করেন, রামপ্রসাদ দীন দরিদ্র ছিলেন সেই জন্যই তাঁহার মুখ দিয়া জগন্মাতার নিকট এইরূপ অভিমানসূচক পদাবলী প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নয়—স্বীকার করি অসময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, ধনসম্পত্তি হারাইলেন, কিন্তু আবার দেখিতে পাইতেছি—তাঁহার দুঃখ দৈন্য দূর করিবার জন্য সুভদ্রা দেবী, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভূমি দান করিয়াছেন, কাজেই সে সময়ে অন্নাভাব তাঁহার না থাকিবারই কথা,—কিন্তু দেশে এমন সব দুর্দ্দৈব আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহার ফলে তাঁহার একার নয় বাঙ্গালাদেশের সাধারণ প্রজা ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের দারুণ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল। সেজন্যই রামপ্রসাদের ন্যায় অনেকের অদৃষ্টেই 'লুণ মেলেনা আমার শাকে' এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। রামপ্রসাদের আর একটি সঙ্গীতেও ক্ষুধিতজনের অন্নকাতরতার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক ক্ষুধায় প্রপীড়িত আত্মার ব্যাকুল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অন্নের সহিত মোক্ষ প্রসাদ প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই, তিনি পার্থিব ক্ষুধার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক ক্ষুধায়ও কাতর হইয়া গাহিয়াছেন:

অন্নদে গো অন্নদে গো অন্ন দে।
জানি মায়ে দেয় ক্ষুধায় অন্ন অপরাধ করিলে পদে পদে।
মোক্ষ প্রসাদ দেও অম্বে, এসুখে অবিলম্বে,
জঠরের জ্বালা আর সহে না তারা কাতরা হইওনা প্রসাদে! *

কবির এই সব সঙ্গীতের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সে সময়কার বাঙ্গালায়

* রাগিণী ঝিঁঝিট—তালঠুংরি, পুণ্য জুন, ১ম বর্ষ, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা ১৬৯—১৭১ পৃষ্ঠা। রামপ্রসাদের নূতন গান—হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বাঙ্গালার তখন বড় দুর্দ্দিন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাঙ্গালার কথা বলিতেছি। সে সময়ে মারাঠা-দস্যুরা বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে লুঠতরাজ করিয়াছে, শস্যপূর্ণ গোলা পোড়াইয়া দিয়াছে, গ্রামের পর গ্রাম আগুন জ্বালাইয়া ছারখার করিয়া দিয়াছে, পুরুষ ও নারীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে, নারীজাতির প্রতি বর্ণনাতীত নির্য্যাতন করিয়াছে, গোরু বাছুর লুঠ করিয়াছে,—তখন সত্য সত্যই

লক্ষ লক্ষ প্রাণী সব করে হাহাকার।

কে তাহাদের রক্ষা করে? লোকে প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল, বাড়ীঘর ছাড়িল, স্ত্রী পুত্র ত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে, বাঙ্গালী তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নাই, অস্ত্র ধরে নাই, প্রতিরোধ করে নাই, বর্গীর সেই দুঃসহ নিপীড়নের হাত হইতে নবাব আলীবর্দ্দী দেশকে রক্ষা করিবার জন্য যে ভাবে মারাঠাদের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই জ্ঞাত আছেন। বর্গীর সেই অত্যাচারের স্মৃতি আজিও প্রাচীনা মহিলাদের কণ্ঠে কণ্ঠে শুনিতে পাই:

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে!

এই মেয়েলি ছড়া বাঙ্গালার ইতিহাসে অমর হইয়া আছে।

রামপ্রসাদ সেন তখন তরুণ যুবক। তাঁহার মনের মধ্যে সেই স্মৃতি জাগরুক ছিল।—হালিসহর কুমারহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলও বর্গীদের অত্যাচার-মুক্ত ছিল না। পঙ্গপালের মত ভিন্ন ভিন্ন দল বাঁধিয়া তাহারা নানাস্থানে লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত। এই সব বিবরণ হইতে 'রাজ্য নিল চোরের' অনেক ইঙ্গিত আমরা পাই।

বাঙ্গলাদেশ তখন মুসলমান-শাসনকর্ত্তাদের অধীন। তাঁহাদের অনেকে বিশেষতঃ আলীবর্দ্দীর রাজত্বকাল হইতে দিল্লী সম্রাটের অধীন সুবে বাঙ্গলা উড়িষ্যা আর রহিল না।—আলীবর্দ্দীর মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা, তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র বাঙ্গলার মসনদে বসিলেন। সিরাজ মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী কাশিম-বাজারের ইংরাজদের কুঠি অধিকার করিলেন, কলিকাতা আক্রমণ করিলেন, এবং অবশেষে পলাশীর রণক্ষেত্রে তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয় হইল। সুবে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবের অতি শোচনীয় ভাবে মৃত্যু হইল। পলাশীর যুদ্ধের সহিত বাঙ্গলার স্বাধীন নবাবের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী সর্ব্ব বিষয়েই স্বাধীনতা হারাইলেন। কবি নবীনচন্দ্র সেন—মোহনলালের মুখ দিয়া যে খেদোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সত্য সত্যই পাষাণ বিদীর্ণ হয়। মোহনলাল বলিতেছেন:

"কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ,
বারেক ফিরিয়া চাও অহে দিনমণি।
তুমি অস্তাচলে দেব করিলে গমন,
আসিবে ভারতে চির বিষাদ রজনী !"

বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের কূটচক্রান্তে বাঙ্গলার নবাব পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। দুর্ভাগ্য সিরাজের, মোহনলাল ও মীরমদনের ন্যায় বিশ্বস্ত, সাহসী ও নির্ভীক সেনাপতি থাকিতেও মীরজাফরের পরামর্শে পরিচালিত হইয়া সিরাজ পরাজিত হইলেন ও নিষ্ঠুর ঘাতকের হস্তে অতি নির্ম্মমভাবে নিহত হইলেন।

কবি রামপ্রসাদ তখনও জীবিত—বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসরের নীচে। তারপর মীরজাফর নামে মাত্র নবাব রহিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মীরজাফরের মৃত্যু হইল। তাহার পূর্ব্বে মীরকাশিম ও বাঙ্গলার মসনদে বসিয়াছিলেন, (১৭৬০ খৃঃ) কিন্তু মীরকাশিমের সহিত বাণিজ্য শুল্ক ঘটিত মতানৈক্যের জন্য যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজ পুনরায় মীরজাফরকে নবাব করেন—ইংরেজ কোম্পানী তখন দেশের রাষ্ট্রনায়ক হইয়া বসিয়াছেন। মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দোল্লার নিকট গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। সুজাউদ্দোল্লা মীরকাশিমকে শুধু যে আশ্রয় দিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি বাঙ্গলাদেশ আক্রমণও করিয়াছিলেন—কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে মেজর মনরোর নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন—এ হইতেছে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের কথা। ক্লাইভ বাঙ্গলাদেশের বিবিধ শাসনশৃঙ্খলা সম্পন্ন করিলেন এবং শাসন-প্রণালীর বিবিধ সংস্কার করিলেন—তাহা দ্বৈধশাসন-প্রণালী নামে ইতিহাসে পরিচিত। ক্লাইভ তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী ওয়ারেন হেষ্টিংসকে বঙ্গদেশের গভর্ণর পদে নিযুক্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৭২-১৭৮৫ সন পর্য্যন্ত কোম্পানীর অধীনে কার্য্য করেন। কবি রামপ্রসাদ আমাদের সিদ্ধান্তানুযায়ী যদি আনুমানিক ১৭৭৫ কিংবা তাহার পরে আর কয়েক বৎসর জীবিত থাকেন, তাহা হইলেও বলা যাইতে পারে মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনকালে জন্মগ্রহণ করিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন তখন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে (বাঙ্গলা ১১৭৬ সনে) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়। সেই ভীষণ দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালীর এক তৃতীয়াংশ লোক প্রাণ দিয়াছিল। সে সময়ে বাঙ্গালা-দেশে ওয়ারেন হেষ্টিংশের ন্যায় রাষ্ট্রীয় শাসনে দক্ষ বিচক্ষণ শাসক থাকিতেও দেশের সর্ব্বত্র চলিতেছিল অরাজকতা। জনসাধারণের সুখে-শান্তিতে বাস করা

অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। দস্যু-ডাকাত, ঠগী, সন্ন্যাসী প্রভৃতির লুণ্ঠন ও উৎপীড়নে দেশের বর্ণনাতীত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। কে কাহাকে রক্ষা করিবে? সে সময়ে দস্যু-ডাকাতের নির্ম্মম অত্যাচারের হাত হইতে দেশের জনসাধারণের জীবন, ধন, মান ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস ধৃত ডাকাতদের প্রাণ-দণ্ডের বিধান করিয়াছিলেন। বর্গীদের অত্যাচারের ন্যায় সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অত্যাচার, লুণ্ঠন প্রভৃতিও গ্রামে গ্রামে সংক্রামিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সন্ন্যাসীদল গ্রামবাসীর ধন-সম্পত্তি, স্ত্রী-কন্যা বালক-বালিকা গৃহপালিত পশু প্রভৃতিও বিক্রয় করিত, লুঠ করিয়া বেড়াইত। হেষ্টিংস কঠোর হস্তে এই সব পরপীড়ক অত্যাচারী দস্যু ডাকাতের হাত হইতে দেশে শান্তি স্থাপন করিবার জন্য ধৃত দস্যু ডাকাতের প্রতি প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব লিখিয়াছেন—"Some time ago, two Hindus were executed for Dacoities—at calcutta." দেশে যখন এইরূপ অরাজকতা চলিতেছিল —সেই সময়ে বাঙ্গালাদেশে দেখা দিল দারুণ দুর্ভিক্ষ। *

বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' এবং হণ্টার তৎপ্রণীত 'Annals of Rural Bengal' গ্রন্থে অতি বিশদ ভাবে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন।

"১১৭৪ সালে ফসল ভাল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ্য হইল। লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্রেরা একসন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালে বর্ষাকালে বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল, দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। অকস্মাৎ আশ্বিনমাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে কার্ত্তিকে কিছুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া একেবারে খড় হইয়া গেল। যাহার দুই এক কাহন ফলিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীর জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে একসন্ধ্যা উপবাস করিল, তারপর একসন্ধ্যা আধপেটা করিয়া খাইতে লাগিল, তারপর দুইসন্ধ্যা উপবাস আরম্ভ করিল। যেকিছু চৈত্র-ফসল হইল, কাহারও মুখে তাহা কুলাইল না। কিন্তু মহম্মদ রেজাখাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে দশটাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাঙ্গলায় বড় কান্নার রোল পড়িয়া গেল।'

'লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপরে কে ভিক্ষা দেয়!—

* To add to the miseries of Bengal, there was in 1770, a disastrous famine. Annals of Rural Bengal—p. 26—54.

উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপরে রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গরু বেচিল, লাঙ্গল জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ী বেচিল, জোতজমা বেচিল, তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী, কে কিনে? খরিদ্দার নাই, সকলেই বেচিতে চায়। খাদ্যাভাবে গাছের পাতা খাইতে লাগিল, ঘাস খাইতে আরম্ভ করিল, আগাছ খাইতে লাগিল। ইতর ও বন্যেরা কুকুর, ইন্দুর, বিড়াল খাইতে লাগিল। অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইলনা, তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল।'

'রোগ সময় পাইল, জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়, বসন্ত—বিশেষতঃ বসন্তের বড় প্রাদুর্ভাব হইল। গৃহে গৃহে বসন্তে মরিতে লাগিল। কে কাহাকে জল দেয়, কে কাহাকে স্পর্শ করে, কেহ কাহারও চিকিৎসা করে না; কেহ কাহাকে দেখেনা, মরিলে কেহ দেখে না। অতি রমণীয় বহু অট্টালিকা মধ্যে আপনা আপনি মরে। যে গৃহে একবার বসন্ত প্রবেশ করে, সে গৃহবাসীরা রোগী দেখিয়া ভয়ে পলায়।*'

দেশের যখন এইরূপ ভীষণ দুর্ভিক্ষ, নিপীড়ন চলিতেছে, বন্যার প্লাবনের মত এক একটি বিপদ আসিয়া জনসাধারণকে মৃত্যুর মুখে টানিয়া নিতেছে, যে দুর্দ্দিনের শোচনীয় পরিণতি দেখিয়া সার জন সোর লিখিয়াছিলেন :

> "Still fresh in memory's eye the scene I view,
> The shrivelled limbs, sunk eyes, and lifeless hue ;
> Still hear the mother's shrieks and infant's moans,
> Cries of despair and agonizing moans.
> In wild confusion dead and dying lie ;—
> Hark to the Jackal's yell and vulture's cry,
> The dog's fell howl, as midst the glare of day,
> They riot unmolested on their prey !
> Dire scenes of horror, which no pen can trace,
> Nor rolling years from memory's page efface."

সেই শোচনীয় দৃশ্যের কথা এখনও আমার স্মৃতির পথে উদিত হইতেছে। সেই অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ কুঞ্চিত অস্থিপঞ্জর, কোটরগত প্রাণহীন চক্ষু, এখনও

* বঙ্কিমচন্দ্র—আনন্দমঠ। Memoir of the Life and correspondence of John Lord Teignmouth, by his Son. Vol. I. p.p. 25, 26-8 Vol. London 1843.

কানে ভাসিয়া আসিতেছে মাতা ও শিশুর করুণ বিলাপ, নিরাশার সে কি মর্ম্মন্তুদ হাহাকার। একই স্থানে মরণোন্মুখ হতভাগ্যগণ এবং মৃত ব্যক্তিরা পরস্পরের অঙ্গসংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে, শুনিতে পাই শৃগালের উল্লাসময় চীৎকার, শকুনি গৃধিণীর বীভৎস চীৎকার, প্রকাশ্য দিবালোকে কুকুরের কর্কশ রব, তাহাদের শব মাংস লইয়া কাড়াকাড়ি, সে যে কি বীভৎস, করুণ ও ভয়াবহ দৃশ্য তাহা অবর্ণনীয়। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেলেও সেই শোচনীয় বীভৎস দৃশ্যের বিভীষিকা কখনও মন হইতে অপসারিত হইবে না।

কবি রামপ্রসাদ ছিয়াত্তরের এই ভীষণ মন্বন্তরের সময় জীবিত ছিলেন। দারুণ অন্নক্লেশ, ধনসম্পত্তির দস্যুকর্তৃক অপহরণ প্রভৃতি তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। দেশের এইরূপ দুর্দ্দিনেও ভক্ত সাধক মাতা জগদম্বার প্রতি নির্ভরশীল ছিলেন, তাই ভক্ত মাকে দুঃখদুর্দ্দশা ও অন্নকষ্ট জানাইয়া গাহিয়াছেন :—

অন্ন দেগো অন্ন দেগো অন্ন দেগো !

জানি মায়ে দেয় ক্ষুধায় অন্ন অপরাধ করিলে পদে পদে !

জঠর জ্বালা সহিতে পারিতেছেন না! প্রসাদের প্রতি তুমি অকরুণা হইয়ো না। এই দুর্দ্দিনেও ভক্ত কবি মাতার নিকট মোক্ষ প্রসাদ চাহিয়াছেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সেই দুর্দ্দিনে ভক্ত কবি অন্নত্রাসে প্রাণে মরিয়াও নির্ভরশীল ছিলেন বোধ হয়। তাঁহার কৃষিক্ষেত্রে ফসল ফলে নাই, যাহা ফলিয়াছিল তাহাও হয়ত বন্যার জলে হ্রাস পাইয়াছিল, কাজেই 'শাকেও তাহার নুণ' মিলিতেছিল না। এইরূপ দুঃখ-দুর্দ্দশা অন্নকষ্ট সহিয়াও কবি তাঁহার আরাধ্যা দেবী মাতা জগদম্বার প্রতি নির্ভর করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটই চাহিয়াছিলেন— অন্ন দেগো! অন্ন দে!

রামপ্রসাদের দুঃখ বেদনার সঙ্গীতের মূলে রহিয়াছে, দেশের অন্তর্বিপ্লব— বর্গীর হাঙ্গামা, পলাশীর যুদ্ধ ও তাহার পরিণাম, দস্যু-ডাকাতের অত্যাচার, উপদ্রব ও লুণ্ঠন এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রাকৃতিক বিপ্লব ও ধ্বংসলীলা—দারুণ দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আলোচনা করিয়া আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিপ্লব, অরাজকতার মধ্যেও কবির একান্ত নির্ভরশীলতা, ভক্তি ও বিশ্বাসের বলেই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন :

মন গরিবের কি দোষ আছে !

তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা যেম্নি নাচাও তেমনি নাচে।

তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্মকথা বুঝা গেছে।

চৌদ্দ

নিতান্ত যাবে দিন, এদিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে
ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো। —রামপ্রসাদ

জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যু। মানুষ মাত্রেরই এ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিতে হয়। আত্মা অবিনাশী—কিন্তু দেহ বিনাশী, তাহার ধ্বংস হইবেই। আত্মা নিত্য শাশ্বত, ক্ষয়বিহীন, অবিনাশী। আত্মা সর্ব্বগত, রূপান্তর অপ্রাপ্ত, পূর্ব্বরূপের অপরিত্যাগী, অনাদি চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত, সেই আত্মাকে চিরকালই দেহ জন্মিলে জাত ও দেহ বিনষ্ট হইলে মৃত বলিয়া আমরা জ্ঞান করি এবং দেহের বিনাশের জন্য শোক করিয়া থাকি। কেহ কেহ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা এই আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া আশ্চর্য্যের ন্যায় দর্শন করেন, কেহ আশ্চর্য্যের ন্যায় শ্রবণ করেন, কেহ বা দর্শন, শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিয়াও বিপরীত ভাবনায় অভিভূত হইয়া জানিতে পারেন না, সুতরাং বিদ্বান্ হইয়াও আত্মজ্ঞানের অভাবে অনেকে শোক করিয়া থাকেন। সকল দেহেতে সকল অবস্থাতেই এই আত্মা অবধ্য, অতএব কোন প্রাণীর নিমিত্ত শোক করা উচিত নহে। কিন্তু যাঁহারা সাধক, তাঁহারা আপনার সাধনার দ্বারা আপনাকে সর্ব্বপ্রকার শোক, দুঃখ, সাংসারিক জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে সর্ব্বদা মুক্ত করিয়া যোগানন্দে আত্মসচেতন হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেন। সেই ভাবে এই নশ্বর দেহ বিনষ্ট হইলে শান্তির রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য সাধক রামপ্রসাদ সেইরূপ যোগানন্দে আত্ম-সচেতন হইয়া মৃত্যুই কামনা করিয়াছিলেন।

নদী যেমন দিকে দিকে আপনাকে শাখা-প্রশাখায় বিস্তার করিয়া অবশেষে অনন্ত নীল জলরাশিপূর্ণ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া বিলীন হয়, সেইরূপ যিনি যোগী, তিনি সমুদয় বাসনা-কামনা বিসর্জ্জন য় নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধিপতি, জগজ্জননী বিশ্বমাতা যিনি, তাহাতে বিল হইয়া পরম শান্তি লাভ করেন।

রামপ্রসাদ সেইরূপভাবে তাঁহার আরাধ্যা জগজ্জননীর কোলে আশ্রয় পাইয়া চিরশান্তি সাগরে বিলীন হইয়াছিলেন—তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে পূর্ব্বেও আমরা সংক্ষেপে কিছু বলিয়াছি এইবার একটু বিস্তারিত ভাবে বলিতেছি।

সেদিন প্রসাদ ধ্যানে বসিয়াছেন—এমন সময় শুনিতে পাইলেন—তাঁহার স্নেহময়ী জগন্মাতার বাণী, মা যেন বলিতেছেন, প্রসাদ, এইবার তোমার পঞ্চমুণ্ডী আসনের খেলা শেষ হইল। ধন্য তুমি, ধন্য তোমার ভক্তি ও সাধনা! এস বৎস! আমার কোলে এস।'

প্রসাদ নির্ব্বাক্ নিশ্চলভাবে শুনিলেন, জগজ্জননীর আহ্বান! কোলের ছেলে মায়ের কোলে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। সেদিন শেষ বিদায়ের দিন ধীরে ধীরে আসিলেন পঞ্চবটিতে পঞ্চমুণ্ডী আসনের দিকে, সেদিনকার প্রভাত যেন নবরূপে নবসৌন্দর্য্যে হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। চারিদিকে রূপের জ্যোতিঃ বিভাসিত। আসনে বসিলেন—গ্রামবাসী সকলে আসিলেন আজ প্রভাত হইতে পূজার আয়োজন চলিয়াছে—মায়ের রাঙা চরণে দিবার জন্য রাশি রাশি জবাফুল, নানাজাতীয় কত পুষ্পরাজি, বিল্বপত্র দল সংগৃহীত হইতেছে—সেদিন রামপ্রসাদ মনের আনন্দে ভাব-বিভোর-চিত্তে গাহিতেছিলেন :

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি॥

গভীর নিশীথে রামপ্রসাদ ভক্তিবিহ্বলচিত্তে মায়ের পূজায় বসিলেন। সম্মুখে বরাভয়করা চিন্ময়ী মা বিরাজ করিতেছিলেন। মায়ের মুখে কি সুন্দর হাসি, উষার মধুর হাসির মত—কি দিব্য বিভা, কি জ্যোতিঃ, সাত কোটি সূর্য্য চন্দ্র ও সেই জ্যোতিঃর কাছে হার মানে।

ভক্ত পূজা করিতেছেন। পূজা করিতে করিতে ভক্তের ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তি অলৌকিক জ্যোতিঃতে পরিপূর্ণ হইল। তাঁহার ঘন ঘন রোমাঞ্চ ও শিহরণ আরম্ভ হইল, 'জয় মা কালী!' 'জয় মা কালী' বলিয়া ঘন ঘন আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, শোন সকলে—মা আমাকে কোলে নিবার জন্য অই দেখ, চাহিয়া দেখ তোমরা হাত বাড়াইয়া দিয়াছেন কাল মাতার বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমারও বিসর্জ্জন হইবে। ঐ দেখ মা আনন্দময়ীর মুখে কি মধুর স্নেহময় হাসি! সে হাসিতে যে জগৎ হাসে তখন ধীরে উদাত্ত স্বরে গান ধরিলেন :

তারা তরী লেগেছে ঘাটে, যদি পারে যাবি মন আয় ছুটে!
তারা-নাম পাল খাটিয়ে, ত্বরা তরী চল বেয়ে।

ভবের বেলা গেল, সন্ধ্যা হলো, কি করবে আর বসে হাটে।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মন বাঁধরে এঁটে সেঁটে,
ওরে এবার আমি ছুটেছি, ভবের মায়া বেড়ি কেটে।

জনগণ-সকলে ব্যথিত চিত্তে শুনিতে লাগিল তাঁহার পরপারে যাত্রার সিদ্ধান্তের কথা! আবার প্রসাদ গাহিলেন:

সামাল ভবে ডুবে তরী।
তরী ডুবে যায় জনমের মত॥

দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন তাঁহার শেষ পূজা। দেবীর চরণে এই পৃথিবীতে সেই তাঁহার শেষ অর্ঘ্যদান। সেদিন অতি ধীর গম্ভীর ও অসাধারণ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত গানের পর গান গাহিয়া ভক্তির তরঙ্গ তুলিয়া সকলের প্রাণে—প্রাণে উদ্বেলিত করিয়া দিলেন—ভক্তির স্রোতো-ধারা। পূজা-শেষে গ্রামের সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, গুরুজনকে প্রণাম করিলেন, সমবয়স্কদের আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন কাল বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমার এই দেহেরও বিসর্জ্জন হইবে।

বিস্মিত হইল সকলে—কি বলে প্রসাদ? মৃত্যুর কথা কি কেহ বলিতে পারে? রামপ্রসাদ কি বলিতে কি বলিতেছে! আবার তাহারা মনে ভাবিল, ভক্তের বাক্য কি কখনো মিথ্যা হইতে পারে? সকলে উৎসুকভাবে রাত্রি কাটাইল—অলৌকিক একথা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য অধীর ভাবে সকলে প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

রাত্রি প্রভাত হইল। সেদিন সন্ধ্যায় কুমারহট্টের শিশু, বালক, যুবা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সকলে আসিয়া প্রসাদের বাড়ীর সম্মুখে পঞ্চবটিতে আসনের কাছে উপস্থিত হইল। তখন বিসর্জ্জনের বিদায়ের বাজনা বাজিতেছিল। অপরাহ্ন সময়ে গ্রামের সকলে মিলিয়া বিরাট শোভাযাত্রা গঠন করিল। প্রসাদ শ্যামা-মায়ের মৃন্ময়ী প্রতিমা মাথায় করিয়া তাঁহার প্রিয় বাস্তভিটা, তাঁহার সাধনার পীঠ-পুণ্য স্থানটিতে জন্মের মত প্রণাম করিয়া শিবের গলির ভিতর দিয়া গঙ্গা তীরে চলিলেন; রামপ্রসাদ, ভক্ত রামপ্রসাদ—সদানন্দ চিত্তে মায়ের গান করিতে করিতে ধীরে ধীরে চলিলেন গঙ্গাতীরে—কণ্ঠে ধ্বনিত হইল বিদায়ের রাগিণী—

রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যা বেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো!

শোভাযাত্রা গঙ্গার তীরে—নির্দ্দিষ্ট ঘাটে আসিয়া পৌছিল। সেই গঙ্গাতীরে, সেই প্রিয় গঙ্গার ঘাট, যেখানে তিনি প্রতিদিন প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায়

আহ্নিক করিতেন, গ্রামের লোক, নৌকাযাত্রীরা যে গান শুনিতে শুনিতে—তরী ভিড়াইত, গান শুনিতে শুনিতে ভক্তের উদ্দেশ্যে শত শত প্রণতি জানাইত। সেই গঙ্গার ঘাটের দিকে পতিততারিণী পুণ্যসলিলবাহিনী গঙ্গার শোভা দেখিলেন—দূরে পল্লীর শ্যামরূপ দেখিলেন; দেবদেবীর মন্দিরে—মন্দিরে শুভ আরতির শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি শুনিলেন, তারপর সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। মায়ের মূর্ত্তি গঙ্গার তীরে স্থাপন করিয়া প্রসাদ স্বয়ং নাভি জলে নামিলেন। তারপর আরও গভীর জলে নামিলেন! গঙ্গার জল তরতর করিয়া কি মধুর সঙ্গীত-তানে সকলের প্রাণে সুধার ধারা বর্ষণ করিয়া চলিতেছিল। ঢেউগুলি ভক্তের দেহ ঘিরিয়া নাচিতেছিল—দুলিতেছিল—খেলিতেছিল।

শ্রীরামপ্রসাদ বিদায়ের সঙ্গীত গাহিলেন—সে গান কয়টি হইতেছে :

কালী গুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে
এ তনু তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে।

*　　　*　　　*

বল্ দেখি ভাই কি হয় মোলে!

*　　　*　　　*

নিতান্ত যাবে দিন, কেবল ঘোষণা রবে গো

*　　　*　　　*

তারা তোমার আর কি মনে আছে!

*　　　*　　　*

মাগো ওমা, আমার দফা, হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে।

শেষ সঙ্গীতটির 'দক্ষিণা হয়েছে শেষ' এই পদটি যেমন অতি করুণ সুরে তাহার মুখ হইতে বাহির হইল, অমনি তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় আত্মা ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া অনন্ত আকাশে বিলীন হইয়া গেল—তাঁহার আপনার ক্ষুদ্র সত্তার সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন হইল এবং মহাকালীর বিরাট সত্তার মধ্যে বিলীন হইয়া রামপ্রসাদ পরমানন্দে পরম শান্তি লাভ করিলেন।

তাঁহার দেহ পঞ্চভূতে মিলাইয়া গেলে পর গ্রামবাসীরা—রামপ্রসাদের বিরচিত সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে মৃন্ময়ী জগন্মাতাকে গভীর জলে বিসর্জ্জন দিলেন এবং শ্যামা মায়ের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নিজ নিজ বাস গৃহে যাইবার পূর্ব্বে—রামপ্রসাদের সাধন-ভজন তীর্থে আসিয়া জয়কালী জয়কালী বলিয়া আনন্দ

ধ্বনি করিতে লাগিলেন—প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সাধক রামপ্রসাদেরও বিসর্জ্জন হইল।

রামপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলেন। কেহ বলেন ভক্ত কবি রামপ্রসাদ সেন কি ভাবে মরিয়াছেন তাহা কি আপনারা জানেন? কালীপূজার পর হালিসহরের গঙ্গায় কালীমূর্ত্তি বিসর্জ্জন দেওয়া হয়, ঢাক, ঢোল, কাংস বাজিয়াছিল,—উদ্দাম ভক্তিতে সেই বিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া রামপ্রসাদ সেন প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।"*

The Good Old days oft he John Company from 1600—1858 বইখানার ৩০৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে:

"Whilst living in retirement Ramprasad became acquainted with the munificent of Raja Krishna Chandra Ray of Nadia, who was so pleased with his life and songs, that he gave him 14 bighas of Lakhraj lands, and bestowed on him title of Kaviranjan for having Completed a poem, Vidyasundaram, which is now lost.'

'He died in 1762—it is said by jumping into the river Ganges with the image of Kali, which was thrown in after the ceremony of the Puja was over." W. H. Carey. কেরী সাহেবের এই গ্রন্থ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কাজেই প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে উহার প্রকাশ কাল। ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় ৺হরিমোহন সেন লিখিত কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ১৭৭৩ শক—(১৮৫১ খৃঃ অঃ) প্রবন্ধে আছে "মৃত্যুকালে ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।" রামপ্রসাদ গঙ্গা নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন—এ কেরি সাহেবের শোনা কথা,—তিনি প্রতিমা বিসর্জ্জন কালে নাভী গঙ্গায় দাঁড়াইয়া গান করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, একথা সর্ব্বজনবিদিত। গুপ্ত কবি রামপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—মায়ের প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিসর্জ্জন হইবে, বলিয়া প্রতিমাসহ রামপ্রসাদ গঙ্গা-যাত্রা করেন, গঙ্গাযাত্রা সময়ে পথমধ্যে যে কয়েকটি গান করেন, তাহার শেষ সঙ্গীতটি' "দক্ষিণা হয়েছে" এই উক্তি করিবা মাত্রই প্রাণের দক্ষিণা হইল, অর্থাৎ প্রাণবদ্ধ শরীর পরিহার

* বঙ্গবাণী—১ সংখ্যার ৭৮ পৃষ্ঠা—রামপ্রসাদের মৃত্যু।

করিলেন। প্রাচীন লোকেদের মধ্যে অনেকেই কহেন তাঁহার মরণ সময়ে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হইয়াছিল। এবিষয়ের সত্য-মিথ্যা আমরা কিছুই বলিতে পারি না।'—কেরী সাহেব প্রতিমা-বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই রামপ্রসাদেরও ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া—রামপ্রসাদ গঙ্গানদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া—প্রাণত্যাগ করেন, এইরূপ কথা লিখিয়াছিলেন উহা একেবারেই প্রমাণসহ নহে।

'কবিচরিত' প্রণেতা হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন :— 'রামপ্রসাদ সেনের পরলোক যাত্রার বিষয় অত্যন্ত বিস্ময়কর। উল্লিখিত আছে যে, একবার শ্যামা পূজার বিসর্জ্জনের দিবস আপনার পরিবারবর্গকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, অদ্যই শ্যামা প্রতিমার সহিত আমার জীবন বিসর্জ্জিত হইবেক। এই কথা বলিয়া তিনি গান করিতে করিতে সুরতরঙ্গিনীতীরে প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হইলেন। বিসর্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া গাহিতে গাহিতে তিনটি গান সমাপ্ত করিলেন। তৎপরে নারায়ণ ক্ষেত্রে অর্দ্ধাঙ্গ জলে, অপরার্দ্ধ স্থলে স্থাপন করিয়া চতুর্থ গীত গান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই শেষস্থ গীতের'আমার দক্ষিণা হয়েছে' এই পদ প্রয়োগ মাত্রেই জীবনাবসান হইল।'

রামপ্রসাদের জীবনী সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে গুপ্ত কবিই অনুসন্ধান করিয়া তথ্য সংগ্রহ করেন এবং বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। তারপর দয়ালচন্দ্র ঘোষ তিন বৎসরের অনুসন্ধানের পর, 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ' প্রকাশ করেন। প্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধে কিংবদন্তী বা জনপ্রবাদ ব্যতীত কিছুই প্রামাণিক ভাবে জানিতে পারা যায় নাই। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধেও জনসাধারণের শ্রুত কাহিনীর উপরই নির্ভর ব্যতীত আর কিছু প্রামাণিক উপকরণ পাওয়া যায় না। কাহারও মতে '১১৯৪ সালে (১৭৮৭ খৃঃ অঃ) কালী মূর্ত্তি মাথায় করিয়া প্রসাদ জাহ্নবী সলিলে প্রবেশ করেন। সেই দেহ আর পাওয়া যায় না। জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়। হালিসহর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের আপামর জনসাধারণ জানেন প্রসাদের মৃত্যু কি ভাবে হইয়াছিল। প্রসাদের মৃত্যুর পর হইতেই এই অদ্ভুত কাহিনী জনসমাজে বংশপরম্পরায় প্রচলিত ছিল। কেরী সাহেব ঐ জনশ্রুতি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস লিখিবার সময় প্রসঙ্গ ক্রমে ইংরাজীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই ইংরাজী গ্রন্থখানার সংবাদ কেবল জন কোম্পানীর ইতিহাস লেখকেরাই রাখেন। এই ইংরাজী গ্রন্থখানার সহিত জনসাধারণের কোন কালেই পরিচয় ছিল না। তাঁহারা প্রসাদের দেহত্যাগের

বিবরণ লোক-মুখেই শুনিয়া আসিতেছেন। দয়ালচন্দ্র ঘোষ ঐ বিষয়টি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে বেশ গুছাইয়া লিখিয়াছিলেন।

প্রসাদের মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে কেরী সাহেব বলেন,—তিনি ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তবে যতদূর জানিতে পারা যায় এবং প্রমাণসহ বলিয়া মনে হয় ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে রামপ্রসাদের মৃত্যু হইয়াছিল। ইহার পরবর্ত্তী কালে হওয়াও অসম্ভব নহে।

রামপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধে 'Bengali Religious Lyrics, Sakta' গ্রন্থ প্রণেতা এড্‌ওয়ার্ড জে, টমসন্ ও প্রচলিত প্রবাদেরই উল্লেখ করিয়াছেন: Rāmprasād had friends and patrons in Calcutta, and often visited the town. He died in 1775. The older tradition was that the night of his death he worshipped Kali and composed the song, Tāra, do you remember any more.' Then he died singing, like Saxon Caedmon; with the conclusion of the lyric, his soul, went out through the top of his head' and passed to the World of Brahman, whence there is no return to this wearisome cycle of births and deaths". (page 17—18).

রামপ্রসাদের ন্যায় বীর সাধকের তন্ত্রমতানুযায়ী ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া মৃত্যুই স্বাভাবিক এবং জনশ্রুতিমূলক প্রবাদই প্রকৃত বলিয়া মনে করি। রামপ্রসাদ নিজেও এইরূপ মৃত্যুই কামনা করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি সঙ্গীতে আছে:

রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয়; মিছে মোলাম শাস্ত্র ঘেঁটে।
এখন ব্রহ্মময়ীর নাম ক'রে, ব্রহ্মরন্ধ্র যাক্ ফেটে।

সাধকের সেই কামনা পূর্ণ হইয়াছিল। ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। গঙ্গাজলে মৃত্যু হয় ইহাই ছিল তাঁহার কামনা:—

শ্রীরামপ্রসাদের এই বাণী, শোন গো মা নারায়ণী।
তনু অন্তকালে আমায় টেনে ফেল গঙ্গাজলে।

পনেরো

রসনে কালী নাম রটরে

মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জট রে !—রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক—সেকথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। হালিসহর হইতে প্রায়ই তিনি কলিকাতা যাতায়াত করিতেন। কলিকাতাতে তাঁহার যে সব বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে চূড়ামণি দত্ত ছিলেন একজন। চূড়ামণি দত্ত রামপ্রসাদের সঙ্গীতের একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। কবি ঈশ্বর গুপ্তও চূড়ামণি দত্তের কথা বলিয়াছেন। চূড়ামণি দত্তের বাড়ী ছিল বর্ত্তমান শোভাবাজারের রাজবাটীর দক্ষিণ ভাগে। অদ্যাপি রাজবাড়ীর দক্ষিণ ভাগে চূড়ামণি দত্তের গলি বর্ত্তমান রহিয়াছে। শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ পলাশী যুদ্ধের পর প্রচুর ধনশালী এবং প্রতিষ্ঠাবান্ হওয়ায়, সেকালের কলিকাতায় অনেক বুনিয়াদি ধনবানদের ঈর্ষাভাজন হইয়াছিলেন।

চূড়ামণি দত্ত নামে একজন ধনী কায়স্থ রাজার প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁহার পুত্র কালীপ্রসাদ দত্তের নামে গ্রে ষ্ট্রীট হইতে চিৎপুর রোড পর্য্যন্ত একটি বিস্তীর্ণ রাস্তা আজিও বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বে উহা রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট হইতে, নীলমণি সরকারের লেন, যেখানে কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট পড়িয়াছে, ঠিক্ তাহার সম্মুখে চূড়ামণি দত্তের দক্ষিণ-মুখা দরজা ছিল। ফটক নহে—বৃহৎ চৌকাটওয়ালা দরজা। গৃহমধ্যে সুপ্রশস্ত চাঁদনীওয়ালা উঠান এবং তাহার চারিদিকে দ্বিতল গৃহ। গৃহের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট। পশ্চিম সীমা বালাখানা ষ্ট্রীট। উত্তর সীমার অধিকাংশ রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের জমি।

এই চূড়ামণি দত্তের সহিত, সামাজিক ও বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া রাজা নবকৃষ্ণের সঙ্গে প্রায়ই বিবাদ-বিসম্বাদ চলিত। উভয় উভয়কে ঠকাইতে চেষ্টা করিতেন। চূড়ামণি দত্ত সে সময়ে একজন ধনী, মজলিসী এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণের সহিত চূড়ামণি দত্তের বিষয় ঘটিত মনোবাদ ছিল। কথিত আছে যে, চূড়ামণি দত্তের চরমকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহার পুত্রেরা তৎসমীপে গিয়া পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পাদন সম্বন্ধে অভিমত প্রার্থনা করিলেন। তদুত্তরে তিনি কহিলেন, "বাপু, তদ্বিষয়ে

তোমরা যাহা ইচ্ছা করিতে পার। সম্প্রতি আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আমার প্রণীত একটি গীত যাহা বাক্স মধ্যে আছে, একশত ঢাকের বাদ্যসহ সেই গানটি গাহিতে গাহিতে আমাকে 'তীরস্থ' কর।', এই বলিয়া বাক্সের চাবি তাঁহাদিগকে ফেলিয়া দিলেন। পুত্রেরা তাঁহার আদেশ অনুসারে একশত ঢাকের বাদ্যসহ তাঁহাকে গঙ্গাতটে লইয়া যাইলেন। গঙ্গাযাত্রা করিবার কালে নবকৃষ্ণের বাটীর সম্মুখ দিয়া তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয় ও তাঁহার রচিত গীতটি ঢক্কা নিনাদের সহ উচ্চৈস্বরে গীত হয়।

কথিত আছে যে চূড়ামণিকে যখন গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হয়, তৎকালে তিনি শয্যায় বসিয়াছিলেন, শয়ন করেন নাই। তাঁহার পীড়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করিবামাত্রই, তিনি বহুসংখ্যক ঢুলি আনাইয়া নিজে একখানি রৌপ্য-নির্ম্মিত চতুর্দ্দোলায় বসিয়া গঙ্গাযাত্রায় চলিলেন। অগ্র পশ্চাৎ অসংখ্য লোহিতবর্ণের পতাকা, দলে দলে নগর-কীর্ত্তন। চতুর্দ্দোলাটি নানারূপে সাজানো। নামাবলীর চন্দ্রাতপ, তুলসী মালার ঝালর, চারিদিকে তুলসী গাছ, আর তার মধ্যে চূড়ামণি দত্ত, আসন করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ, পরিধানে রক্তবর্ণের চেলী, পৃষ্ঠে নামাবলী ও গলায় এবং হাতে জপমালা। অগ্রে ঢুলিরা "চূড়া যায় যম জিনতে" এই বোল বাজাইতে লাগিল। কীর্ত্তনিয়ারা গাহিতে লাগিল গীতটি এই—

আয়রে আয় নগরবাসী, দেখবি যদি আয়।
সবারে (জগৎ) জিনিয়ে চূড় যম জিনিতে যায়।
যম জিনিতে যায় রে চূড়া যম জিনিতে যায়!
নবা দেখবিত আয়, নবা দেখবিত আয়!
জপ তপ কর কিন্তু মরতে জানলে হয়। ইত্যাদি

শোভাবাজার রাজবাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, এই গান গাহিবার পর, চূড়ামণি সদলবলে গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজবাটীর লোকেরা এই কঠোর বিদ্রূপে বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। কয়েকদিন গঙ্গাবাস করিয়া চূড়ামণি দত্ত, পরিশেষে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন।

এই চূড়ামণি দত্ত ছিলেন রামপ্রসাদের একজন বিশিষ্ট সুহৃদ। চূড়ামণি দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল কালীপ্রসাদ। রামপ্রসাদের সহিত বন্ধুত্বের জন্যই চূড়ামণি পুত্রের নাম কালীপ্রসাদ রাখিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কালীপ্রসাদ দত্তের গলি এখনও বিদ্যমান আছে।

সে সময়ে রাজা নবকৃষ্ণ বাঙ্গালাদেশের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন।

শোভাবাজারে তিনি বৃহৎ বাটি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন,—কিন্তু তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী কি ভাবে প্রসন্ন হইয়াছিলেন তাহা আশ্চর্য্য বলিতে হইবে।

এ বিষয়ে একটি গল্প আছে,—যে সময়ে ক্লাইবের সহিত মুর্শিদাবাদের কতিপয় সম্ভ্রান্ত এবং প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, সে সময়ে তাঁহাদের মধ্য হইতে কোন এক ব্যক্তি ক্লাইবের নিকট কোন গূঢ় সংবাদ-সূচক একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন। যাহাতে ঐ চিঠিখানি কোন মুসলমানের হাতে না পড়ে এবং কোন মুসলমান এই পত্রের পাঠোদ্ধার না করে পত্রবাহককে সেইরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। সেজন্য পত্রবাহক ঐ পত্রখানি অতি সাবধানে ও গোপনে আনিয়াছিল।

ক্লাইব এজন্য একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার নিজের বিশ্বাসী হিন্দু বেহারাকে বলিলেন, দেখ, তুমি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পারস্য ভাষায় অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে ডেকে আন। বেহারা মনিবের আদেশ পালন করিবার জন্য কলিকাতার সদর রাস্তা দিয়া চিনেবাজারের অভিমুখে আসিতে লাগিল।

এই সময়ে বা ইহার প্রাক্‌কালে যশোহর জেলার অন্তর্গত বোদখানা গ্রামে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো ব্যবহর্ত্তা উপাধি ছিল। 'দে' উপাধিযুক্ত কেহ কেহ বোদখানা হইতে জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত, পরগণা মুড়াগাছার অধীন পঞ্চগ্রামে (পাঁচ গাঁ) আসিয়া বাস করিতে থাকেন। মুড়াগাছা সে সময়ে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। ইঁহাদের মধ্যে রামচরণ দে নামক এক ব্যক্তি মুড়াগাছা হইতে কলিকাতা গোবিন্দপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। গোবিন্দপুরে যে স্থানে রামচরণের বাস ছিল, সেই স্থান বর্ত্তমানে কলিকাতা দুর্গের মধ্যে পতিত ও তদন্তর্গত হইয়া গিয়াছে। শুনা যায় যে রামচরণ দে 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। রামচরণের ছিল তিন পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামসুন্দর মধ্যম মাণিকচন্দ্র, ও কনিষ্ঠ নবকৃষ্ণ।

এই নবকৃষ্ণ একদিন বেলা তৃতীয় প্রহর বা ততোধিক সময়ে চিনাবাজারের দিকে কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে যাইতেছিলেন, এমন সময়, পথিমধ্যে ক্লাইব সাহেবের বেহারার সহিত সাক্ষাৎ হইল। বেহারা নবকৃষ্ণের সহিত কথাবার্ত্তার ভাবে বুঝিতে পারিল যে নবকৃষ্ণ পারস্যভাষায় ব্যুৎপন্ন। বেহারা কহিল, "আপনি যদি আমার সঙ্গে আমাদের সাহেবের নিকট গমন করেন, তাহা হইলে আপনার বিশিষ্ট ফল লাভ হইবে।" নবকৃষ্ণ আনুপূর্ব্বিক জিজ্ঞাসা করিয়া, বেহারার সঙ্গে সাহেবের কুটিতে গমন করিলেন।

এদিকে ক্লাইব সাহেব, ব্যাকুল-চিত্তে বেহারার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বেহারা হিন্দু মুন্‌শীর সহিত প্রত্যাগত হইতেছে দেখিয়া ক্লাইব নবকৃষ্ণকে সমাদর সহকারে চৌকি দিয়া বসাইলেন এবং কহিলেন, "আপনি অদ্য হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুন্‌শী পদে নিযুক্ত হইলেন। আপাততঃ মাসিক বেতন ৪০৲ টাকা পাইবেন, পরে কার্য্যদক্ষতা দেখাইতে পারিলে, বেতন বৃদ্ধি হইবে।' নবকৃষ্ণ ক্লাইবের সমাদরে ও সহসা মুন্‌শী পদ প্রাপ্তিতে পরম আনন্দিত হইলেন। তিনি সাহেবকে পারস্যভাষায় লিখিত পত্রের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া, তাহার যথোপদিষ্ট উত্তর লিখিয়া দিলেন। ইহাতে ক্লাইব সাহেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

এইরূপে নবকৃষ্ণের ভাগ্যলক্ষ্মী সামান্য বেহারার আকারে তাঁহাকে ক্লাইব সাহেবের সহিত পরিচিত করাইয়া দিয়া, তাঁহার ভাবী উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। সেইদিন হইতেই নবকৃষ্ণ পদস্থ হইয়া ভবিষ্যতে ইংরেজরাজ্যে যশ খ্যাতি ও যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন। নবকৃষ্ণ দিন দিন ইংরাজ রাজপুরুষগণের বিশ্বাসপাত্র হইয়া সম্মানসহকারে স্বীয় কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। হেষ্টিংস সাহেবের কর্ত্তৃত্ব সময়ে নবকৃষ্ণ "মীরমুন্সীর' পদে উন্নতি লাভ করেন। কালসহকারে ইনি "রাজানবকৃষ্ণ" নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কলিকাতার শোভাবাজার নামক স্থানে বৃহৎ ও সুন্দর বাসভবন নির্ম্মাণ করাইয়া হেষ্টিংস সাহেবের সময় হইতে ইনি সম্ভ্রমশালী এবং কলিকাতার কায়স্থসমাজে ও প্রতি-পত্তিশালী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন সম্মানিত ও বিখ্যাত ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে যে বিরাট রাষ্ট্রীয় বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে রাজা নবকৃষ্ণ ও মহারাজা নন্দকুমার পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—সে কাহিনী ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

রাজা নবকৃষ্ণ মহাসমারোহে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। তাহাতে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিশেষ ভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তিনি কালীভক্ত ছিলেন, —কালীপূজা উপলক্ষে প্রচুর অর্থব্যয় করিতেন এবং নৃত্য, গীত, বলি ইত্যাদির দ্বারা বহুলোকের তৃপ্তি বিধান করিতেন। কালীঘাটে কালীমাতার পূজা উপলক্ষে কিরূপ অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

রামপ্রসাদের সঙ্গীত তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর কলিকাতার হিন্দুসমাজে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে—নবকৃষ্ণও প্রসাদ সঙ্গীতের একজন অনুরাগী ছিলেন। কথিত আছে (অবশ্য জনশ্রুতি) তিনি রামপ্রসাদের শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন।

মহারাজা নন্দকুমার সে যুগের একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। যদিও ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের অন্যায় বিচারে জালিয়াতির অপরাধে তাঁহার ফাঁসী হইয়াছিল,—তবু একথা সকলেই স্বীকার করেন, নন্দকুমার প্রবঞ্চক ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে তাঁহার প্রভুর ও স্বদেশের স্বার্থরক্ষার জন্য আপনার জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। নন্দকুমার সেকালে একজন বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক, এবং তৎকালীন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ও একজন প্রধান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন—এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল, সে সময়ে তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ এবং ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু অতি অল্পই ছিলেন। রামপ্রসাদের সঙ্গীত তখন কলিকাতার পথে-ঘাটে গীত হয়। তখন 'চাক্‌লা জুড়ে নাম রটেছে, শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা।' আর কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ সে কথা ভাল করিয়াই জানিয়াছিলেন। মহারাজা নন্দকুমার ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, এ সময়ে বাঙ্গালাদেশে শাক্ত মত বিশেষ ভাবে প্রভাবশালী হইয়াছিল, রামপ্রসাদের শাক্ত-সঙ্গীত বা শ্যামা-সঙ্গীত শুনিয়া কলিকাতার ছোট বড় সকলেই আনন্দ লাভ করিতেন।

মহারাজ নন্দকুমার উক্ত রামপ্রসাদের সঙ্গীত একান্ত শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেন। শুধু শুনিতেন না—তিনি কালীভক্ত ছিলেন। সেকালে ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে এমন লোক অতি বিরল ছিলেন, যিনি রামপ্রসাদের শ্যামা-সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন না—কেননা তৎকালে ঐতিহাসিকের কথায় বলা যায়, "In Bengal there was a remarkable outburst of Sakta Poetry." ইতিহাস পাঠক মাত্রই জানেন—১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট তারিখে মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। অনেকের মতে সেই বৎসরই রামপ্রসাদেরও তিরোভাব হয়।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় রামপ্রসাদের প্রতি কিরূপ অনুরাগী ছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি—কৃষ্ণচন্দ্র রায় গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রামপ্রসাদকে যেরূপ শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রভাকরে রামপ্রসাদের জীবনী প্রকাশিত হইলে হালিসহর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন—"যদিও রামপ্রসাদ সেন প্রতি গানেই কালী, দুর্গা, তারা, শিবে ইত্যাদি দেবীর নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ ঐ নাম বদনে অহর্নিশি উচ্চারণ করিতেন, ফলতঃ তিনি এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন ; পরব্রহ্মের কাল্পনিক মূর্ত্তি ও রূপাদি মনে মনে ঘৃণা করিতেন, তবে দেশ-কালপাত্র বিবেচনানুসারে বাহ্যে কালী কালী শব্দ করিতেন, তেঁহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সহায় ছিলেন এবং তাঁহার অধিকারে বাস করিতেন, সুতরাং ভীত হইয়া

প্রচলিত ধর্ম্মানুযায়ী প্রকাশ্য উপাসনাদি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" পত্র-লেখকের এই উক্তি একেবারেই প্রমাণসহ ও বিশ্বাসযোগ্য নহে, রামপ্রসাদ কাহাকেও ভয় করিয়া চলিতেন না, তিনি ছিলেন নির্ভীক সাধক। এ সম্বন্ধে 'কবিচরিতে' হরিমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"কুমারহট্টে নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের এক ধর্ম্মাধিকরণ ছিল; বায়ু সেবন ও বিষয় চিন্তা হইতে বিশ্রামলাভ করিবার জন্য মহারাজ মধ্যে মধ্যে রাজধানী কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুমারহট্টে আসিয়া বাস করিতেন। একদা মহারাজ রামপ্রসাদের গুণ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে তথায় আহ্বান করত তাঁহার শক্তি-ভক্তি; নিষ্কাম চিত্ততা, উদারপ্রকৃতি ও কবিত্ব শক্তি সংদর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিলেন, এবং তাঁহাকে রাজধানী লইয়া গিয়া রায়গুণাকরের সহিত প্রতিপালন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্বাধীনচিত্ত রামপ্রসাদ স্বভাবতঃ নিষ্কাম প্রকৃতি ছিলেন, সুতরাং তিনি কিছুতেই লোভাকৃষ্ট হইলেন না। কাব্যপ্রিয় গুণগ্রাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং অতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করিলেন, অধিকন্তু কবির উৎসাহ-বর্দ্ধনের জন্য ১১৬৫ সালে চৌদ্দ বিঘা নিষ্কর ভূমিদান করিলেন।" এরূপ স্থলে স্বাধীনচেতা ও নির্ভীক প্রকৃতির সাধক রামপ্রসাদ সেন "কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অধিকারে বাস করিতেন, সুতরাং ভীত হইয়া প্রচলিত ধর্ম্মানুযায়ী প্রকাশ্য উপাসনাদি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন", একথা সম্পূর্ণ অসত্য এবং পত্র প্রেরকের অজ্ঞতার পরিচায়ক।

আমরা যে কথা বলিতেছিলাম, রামপ্রসাদ কলিকাতাতে আসিলে বিভিন্ন কালী মন্দিরে এবং কালীভক্তগণের নিকট শ্যামা সঙ্গীত করিতেন। সেকালে গোবিন্দ মিত্রের নবরত্ন মন্দির ও সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী, চিত্রেশ্বরী মন্দির, কালীঘাট, নিমতলা আনন্দময়ীর মন্দির, ঠন্‌ঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী কালী—উদয় নারায়ণ নামক শাক্ত ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত, পরে রামশঙ্কর ঘোষ, মন্দির নির্ম্মাণ করেন, এবং একটি শিবমন্দিরও নির্ম্মাণ করেন। মন্দির সোপানে খোদিত আছে—

শঙ্কর হৃদয় মাঝে
কালী বিরাজে।

রামশঙ্কর ঘোষের নামেই শঙ্কর ঘোষ লেন বিদ্যমান রহিয়াছে।

কলিকাতার সুধীসমাজে যেমন রামপ্রসাদ সর্ব্বত্র পরম সমাদরে গৃহীত হইতেন তেমনি বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্র এবং বাঙ্গালার বাহিরেও তাঁহার সঙ্গীত

ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রামপ্রসাদের জীবিতকালে কাশীনাথ, বৈষ্ণবচরণ শেঠ, নিঃস্বার্থদাতা গৌরী সেন, গোকুল মিত্র, ভূ-কৈলাশের জয়নারায়ণ ঘোষাল, দেওয়ান গোকুল ঘোষাল প্রভৃতি বহু প্রধান ব্যক্তি ছিলেন।

রামপ্রসাদের বাস 'কুমারহট্ট', নব্যন্যায়ের চর্চ্চায় নবদ্বীপের সমকক্ষতা লাভ করিয়া এক সময়ে গৌরবান্বিত ছিল। 'এই বিদ্যা সমাজের সমৃদ্ধিস্থানীয় ভূস্বামী সাবর্ণ-চৌধুরীদের ও নদীয়ার রাজবংশের বিদ্বৎসেবিতার ফলে ঘটিয়াছিল। স্থানীয় এবং ভিন্নস্থানীয় বহু ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠির সমাগমে গঙ্গাতীরবর্ত্তী এই পল্লী বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। কামালপুরের কামদেব, বলরাম ও শিশুরামের চতুষ্পাঠী কুমারহট্টের শিবের গলিতে অবস্থিত ছিল। কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমের সন্তান দমদমার ভট্টাচার্য্যবংশীয় দুলাল বিদ্যালঙ্কারের কুমারহট্টে দুইটি চতুষ্পাঠী ছিল—এই দুলালও রাজবল্লভ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন (অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা, পৃঃ ৮৬)।

রাজা নবকৃষ্ণ শোভাবাজার রাজবাটিতে একটি নবরত্ন সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ অত্যন্ত বিদ্বৎসেবী ছিলেন। তিনি বিক্রমাদিত্যের অনুকরণে 'নবরত্ন' সভা স্থাপন করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার রচিত 'মাধব-মালতী' গ্রন্থে নবকৃষ্ণের নবরত্নের সভার বর্ণনা এই :—

তাঁর ছিল নবরত্ন ইহার সেরূপ।
সভাস্থের কিবা কব নিজে বিদ্যাকূপ॥
সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ।
তর্কপঞ্চাননরূপে ভুবন বিখ্যাত॥
মহাকবি বাণেশ্বর নদের শঙ্কর।
বলরাম কামদেব আর গদাধর॥
শিশুরাম পসপুরে স্মার্ত্ত কৃপারাম।
শান্তিপুরে বাস গোসাই ভট্টাচার্য্য নাম॥
এই নবরত্ন লয়ে সর্ব্বদা আমোদ।
আপনি আছেন লক্ষ্মী কি কব সম্পদ॥ (পৃঃ ৪)

"একনিষ্ঠ শাস্ত্র ব্যবসায়-ক্ষেত্রে ইংরাজশাসনের ফল কিরূপ ভয়াবহ হইয়াছিল, তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ভট্টাচার্য কামালপুর ও তাহার প্রধান প্রধান চতুষ্পাঠিস্থান গঙ্গাতীরবর্ত্তী কুমারহট্টের ফেরুরবমুখরিত অরণ্য একবার প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক। * * কামদেব, বলরাম ও শিশুরাম

তর্কপঞ্চানন শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের নবরত্নের তিন রত্ন। বলরামের নাম অদ্যাপি পণ্ডিতসমাজে সম্যক্ প্রচারিত আছে। রাজবল্লভের বৃহৎ সভায় বলরাম নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন (অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা, পৃঃ ৮৭) রাখালদাস স্থায়রত্নের মতানুসারে ভট্টপল্লীর নৈয়ায়িকগণ বলরামের ছাত্র সম্প্রদায় (বিজয়া, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২, পৃঃ ৬৩৯) বলরাম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কামদেবের ছাত্র ছিলেন এবং সমগ্র বাঙ্গালাদেশে একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক হইয়াছিলেন।" "শ্রীকান্তঃ কমলাকান্তো বলরামশ্চ শঙ্কর," শ্লোকার্দ্ধে তাঁহার নাম কীর্ত্তিত রহিয়াছে। নবকৃষ্ণ যে সকল মহাপণ্ডিতের সপ্তাহব্যাপী বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া একদিনই লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বলরাম একজন অগ্রণী। 'বিজয়া' পত্রিকায় ৩য় বর্ষ, ৯ সংখ্যায় হরিহর শাস্ত্রী মহাশয় 'স্থায়শাস্ত্র ও স্থায়রত্ন' শীর্ষক প্রবন্ধে বলরাম সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। বলরাম তর্কভূষণ প্রথম বয়সে লেখাপড়া কিছুই শেখেন নাই, বড় গোঁয়ারগোবিন্দ ছিলেন। ১৯৷২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বলরাম কেবল মাছ ধরিয়া ও সাঁতার কাটিয়া বেড়াইতেন। গুপ্তিপাড়ায় তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বমরাম একবার শ্বশুরবাড়ীতে গিয়াছেন, তাঁহার শালাজ আসিয়া কাণ মলিয়া দিতেই বলরামও তাঁহার কাণে হাত দিবার জন্য উদ্যত হইলেন। তখন সেই শালাজ আরক্ত নয়নে পার্শ্ববর্ত্তী রমণীগণকে বলিলেন,' শুনিয়াছিলাম যে, 'বলা' লাঙ্গলা, সত্যই তাই; আমার ননদটি একটি আস্ত জানোয়ারের হাতে পড়িয়াছে।'

'এই অপমানের পর বলরাম সেই মুহূর্ত্তেই শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিলেন। প্রাণপণ পরিশ্রমে লেখাপড়া আরম্ভ করিলেন। এবং শীঘ্রই একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকরূপে বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করিলেন। পণ্ডিত রাখালদাস স্থায়রত্নের মতানুসারে ভট্টপল্লীর নৈয়ায়িকগণ বলরামের ছাত্রসম্প্রদায়। বলরাম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কামদেবের ছাত্র ছিলেন এবং সমগ্র বাঙ্গালাদেশে একজন শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক হইয়াছিলেন। (সম্বাদ ভাস্কর, ২৩শে মে, ১৮৫৪ সংখ্যা) তাঁহারই একটি বিদ্রূপোক্তি শুনিয়া রামপ্রসাদ গান বাঁধিয়াছিলেন :—

রসনে কালী নাম রট রে।
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জট রে॥
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে।
এ কেবল বাদার্থ মাত্র, খুঁজিতেছে ঘট পটরে॥ ইত্যাদি।

পণ্ডিত রাখালদাস স্থায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছেন 'এই বলরাম তর্কভূষণ, সাধক রামপ্রসাদকে বড় বিদ্রূপ করিতেন—মাতাল বলিয়াও ঘৃণা করিতেন। দুই

জনের একই গ্রামে বাড়ী ছিল। রামপ্রসাদ মৃত্যুর উদ্দেশে গঙ্গাযাত্রা করিবার পূর্ব্বে বলরামের বাড়ী হইয়া তাঁহাকে বলিয়া যান, "ঠাকুর, এই ত মরিতে চলিলাম; দেখ মায়ের কৃপায়, কেমন অনায়াসে মরিব।" বলরাম, রামপ্রসাদের সুস্থ শরীরে আগমন দেখিয়া কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু সাধক কবি সেই দিনই দেহত্যাগ করিলেন।'

রামপ্রসাদ যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—যে যুগের মধ্য দিয়া তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে, সে যুগ ছিল রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ও যুগসন্ধির যুগ। সে সময়ে অন্তর্বিদ্রোহ, অত্যাচার, অবিচার, নির্য্যাতন, সমাজের নিম্নশ্রেণী ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতি নানা দিক্ হইতে যে আঘাতের পর আঘাত আসিতেছিল, দস্যু, চোর, ডাকাতি, বর্গী, ঠগী, প্রাকৃতিক বিপ্লব, বন্যা প্রভৃতি যখন দেশের নিরীহ প্রজাসাধারণকে একান্ত অসহায় ও দুর্ব্বল পাইয়া নিপীড়ন করিতেছিল সেই সময়ে রামপ্রসাদ—নির্ভীক ভাবে মায়ের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া গাহিয়াছিলেন—

আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত চাই॥

*　　*　　*

দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে আমি করি দুঃখের বড়াই!

বাঙ্গালাদেশ চিরকাল সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা বলিয়া বিখ্যাত হইলেও নবাবী আমলের কয়েক বৎসর যেমন ১৬৮৯, ১৭৩৯, ১৭৭২, ১৭৯৫, ১৭৯৬, এবং ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার পূর্ব্বাঞ্চলে খাদ্য-শস্য অত্যন্ত সুলভ হইয়াছিল, তেমনি আবার ঐ সময়ে বাঙ্গালার অন্যান্য অঞ্চলে বন্যাও দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়িয়া দেশবাসীকে বিপন্ন ও অন্নাভাবে মৃত্যুর করাল মুখে ঠেলিয়া দিয়াছিল। ১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ বাঙ্গলার সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি লাভ করে—সে সময়ে অত্যধিক গ্রীষ্মে, রৌদ্রের প্রখর তেজে, ধূলি-ঝঞ্ঝার প্রবল বেগে বাঙ্গালা দেশকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে ভীষণ ঝড় ও বন্যা হইয়াছিল। রামপ্রসাদের সঙ্গীতে এই সব প্রাকৃতিক ও রাষ্ট্রীয় দুর্ব্বিপাকের পরিচয় আছে, সে কথা আমরা যথাস্থানে বলিব।

রামপ্রসাদের জীবিতকালে সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশে নব্য ন্যায়ের প্রভাব ছিল খুব বেশী। সে সময়ে বাঙ্গালার প্রায় সর্ব্বত্র নব্যন্যায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উহা

কথনই দেশের জনসাধারণের চিত্ত অধিকার করা দূরে থাকুক স্পর্শও করিতে পারে নাই। সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় বা মনীষার অতুল্য বিকাশের দ্যোতক এই নব্যন্যায় বাঙ্গলার জনসাধারণের পক্ষে অবোধ্য হইয়া রহিয়াছে। ন্যায়ের কচ্‌কচি বলিয়া ও দিকে সাধারণ বিষয়ী লোকে কথনই দৃষ্টিপাত করেন নাই। অথচ এই নব্যন্যায়ের অন্তরালে যে অপূর্ব্ব বাস্তবতা (Rationalism) নিহিত, সত্য অনুসন্ধিৎসার যে প্রশস্ত পন্থা উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাহা জনকয়েক মেধাবী অধ্যাপকের মধ্যে নিবদ্ধ থাকাতে, উহা দ্বারা জাতির চিত্ত বৃত্তির পুষ্টি সাধন হয় নাই। বাঙ্গালীর এই অপূর্ব্ব সৃষ্টির প্রভাবে বাঙ্গালী জাতির কোন উপকারই হয় নাই। পরন্তু এই নব্যন্যায়ের সূক্ষ্ম তর্কজাল স্মৃতিশাস্ত্রের বিতণ্ডায় অপব্যবহৃত হইয়াছে। এই সামগ্রীটা যদি জাতির বিশিষ্টতা রক্ষার ও পুষ্টির পক্ষে প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে না জানি বাঙ্গালীজাতির কি প্রভূত উপকার সাধিত হইত! এই ন্যায় বাঙ্গালীর পক্ষে দুর্বোধ থাকাতে, উহার দ্বারা বাঙ্গালীর অনিষ্ট সাধনই হইয়াছে। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই শক্তি-সাধক রামপ্রসাদ বলরাম তর্কপঞ্চাননকে লক্ষ্য করিয়া গাহিয়াছেন :—

কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে
কেবল বাদার্থ মাত্র ঘট পট রে।

সেকালে বাঙ্গালাদেশের বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ স্মৃতিশাস্ত্রের বিধি নিষেধের দারুণ বন্ধনে ও তাড়নায় বাঙ্গালীকে লৌহ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। বাঙ্গালীর আমোদ-প্রমোদ, আনন্দ-উল্লাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিত্বের সকল বৃত্তিই স্মৃতিশাস্ত্রের বিধি-নিষেধের নিগড়ে যখন আবদ্ধ ও পিণ্ডীকৃত হইয়াছিল,—জীবনের সকল ব্যাপারে সুখে-দুঃখে বাঙ্গালীর গুরু পুরোহিত আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল—সে সময়ের কর্ম্মশূন্যতা, চিত্তের ও চরিত্রের জড়তা হওয়া ত স্বাভাবিক। এইরূপে বাঙ্গালী জাতির বিশিষ্টতা এবং বাঙ্গালীর মনীষা জাত—নব্যন্যায় লইয়া, এক অপরের প্রতিঘাত করিয়া, জাতির চরিত্রের উন্মেষসাধন করিয়াছিল। সে সময়ে বাঙ্গালীর কামকলা-গন্ধ পরিব্যাপ্ত কোমল কামিনী সুলভ পদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে, বাঙ্গালী এই সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া স্বীয় পুরুষকারের অপচয় ঘটাইয়াছে, এবং দুর্ব্বল মনীষার তৃপ্তি সাধন করিয়াছে। পক্ষান্তরে, ভাবসৃষ্টির বিষয়ে স্থবির, জাড্যজড়িত, অথচ অতি তীক্ষ্ণ ধীশক্তি লইয়া বাঙ্গালী নব্যন্যায়ের উদ্ভাবন করিয়াছে, এবং উহারই সাহায্যে স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া জীবনযাত্রার পদ্ধতির বন্ধনী অতি কঠোর ও লৌহ নিগড়ের ন্যায় দুশ্ছেদ্য

করিয়া তুলিয়াছে।" এই ভাবে বাঙ্গালী সেকালে জীবন অতিবাহিত করিয়াছে। তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গক্রমে স্থানে স্থানে প্রদর্শন করিয়াছি, আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

সেই যুগে সেই সমাজে রামপ্রসাদের আবির্ভাব এক বিচিত্র বিস্ময় বলিতে হইবে। দুঃখ-দারিদ্র্য নিপীড়িত 'দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় প্লাবিত দুর্দশাগ্রস্ত সমাজে বাস করিয়াও রামপ্রসাদের সঙ্গীত সাহিত্যক্ষেত্রে গীতিকবিতায় এক নব যুগের অরুণোদয় হইয়াছিল। জীবিতকালেই তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন—। তিনি ছিলেন প্রকৃত শক্তি সাধক। জীবহত্যার বিরোধী। শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক ছিলেন ও আছেন যাঁহারা বলিদানের বিরোধী। এ বিষয়ে 'শাক্ত' নামক গ্রন্থ প্রণেতা—ই. এ. পেইন (Ernest A. Payne) বলেন :—
"Even among the Sāktas there have been those who have protested against bloodshed, and those who have tried to spiritualise the texts on which it is based. The best of the *Tantras* have always insisted that external worship is of no avail. 'If the mere rubbing of the body with mud and ashes gains liberation, then the village dogs who roll in them have attained it, says the *Kularnava* Tantra, which is at least as old as the thirteenth century'.

(Page—11)

কুলার্ণব তন্ত্র ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা। কুলার্ণব তন্ত্র মতে—রক্তপাত দ্বারা শক্তি সাধনা সঙ্গত নহে। বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ উপাসনা সিদ্ধিলাভের পরিপন্থী। যদি ভস্ম ও কর্দ্দম দ্বারা দেহ ভূষিত করিলেই ধর্ম্মলাভ হয়, তাহা হইলে গ্রাম্য কুকুর যে সর্ব্বদা পথে ঘাটে কাদা মাখিয়া বেড়ায়—সেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। 'মহানির্ব্বাণ তন্ত্র' অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্র বলেন : মুক্তি বা সিদ্ধি শুধু মন্ত্র উচ্চারণ, বলিদান' এবং শতবার উপবাস করিলেই হয় না। মানুষ সাত্বিক সাধনা, অভিনিবেশ, ধ্যান ধারণা এবং একনিষ্ঠভাবে ব্রহ্মের সাধনাই হইতেছে প্রশস্ত, জপ, তপ, উপাসনা, বাহ্যিক আড়ম্বর পূর্ণ আরাধনা এবং স্তোত্রপাঠে—সিদ্ধিলাভ হয় না—ত্যাগ, ও মহত্ব এবং চিত্তের স্থৈর্য্য ও ইন্দ্রিয় জয় দ্বারাই সাধক সিদ্ধিলাভ করেন। বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ পূজা নিম্ন—অতি নিম্ন স্তরের সাধকেরাই করেন। রামপ্রসাদ এই নিগূঢ় সাধনতত্ত্ব হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই নির্ভীক কণ্ঠে গাহিয়াছিলেন :—

ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো,
কাজ কিরে তোর সে রোসনায়ে,
তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে,
দেওনা জ্বলুক নিশি দিনে ॥*

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের জীবিতকালে, বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বত্র বহু পণ্ডিত বাস করিতেন এবং হালিসহরের পণ্ডিতগণ সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সেই পণ্ডিতদের মধ্যে রামপ্রসাদ বাস করিতেন এবং নিয়মিত ভাবে চতুষ্পাঠিতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া সংস্কৃত-সাহিত্য ও ব্যাকরণে তাঁহার জ্ঞান ছিল, তারপর কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল—সে সময়ে বাঙ্গালার পূর্ব্বাঞ্চল হইতে একদিকে যেমন তীর্থযাত্রীরা আসিতেন, তেমনি ধনী ও বণিক সম্প্রদায় ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে যাতায়াত করিতেন—কলিকাতা শোভাবাজার, বড়বাজার অঞ্চলে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের দ্বারা পূর্ণ থাকিত। পোস্তা, বেলেঘাটা অঞ্চল পূর্ব্ববঙ্গবাসী ব্যবসায়ীগণের একটি কেন্দ্রস্থান ছিল। দিনান্তে সন্ধ্যার সময় যখন শ্রান্ত ও ক্লান্ত ব্যবসায়ীরা বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেন—তখন রাতভিখারীর দল মধুর কণ্ঠে রামপ্রসাদের গান গাহিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত, ব্যবসায়ীরাও তৃপ্তি বোধ করিতেন—তাহারা গাহিত :

ওরে, মন কি ব্যাপারে এলি।
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া, লাভে মূলে হারাইলি ॥
গুরু দত্ত রত্ন ভরে, কেন ব্যাপার না করিলি।
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত, মধ্যে তরী ডুবাইলি ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, সে অর্থ কেন না আনিলি।
ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হবে কি, মহাজনকে মজাইলি।

আমরা রামপ্রসাদের এই সঙ্গীতটি বিক্রমপুরের সুদূর পল্লীতে হাটে ও বাজারে মহাজন ও ব্যবসায়ীদের মুখে বহুবার শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

*'চাঁদরাণী'—বিপিনমোহন সেন—২৬৯ পৃষ্ঠা। 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান'—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—২২৬, ২৮৯ পৃষ্ঠা। 'সাহিত্য' ২৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। বাংলার জনসাধারণের সাহিত্য—১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বেঙ্গল সোস্যাল সায়ান্স এসোসিয়েশনে' পঠিত ইংরাজী প্রবন্ধ হইতে অনুদিত—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—৯৬-৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ষোলো

হালিসহর পরগণায় বসত্ কুমারহট্টগ্রামবাসী
সে যে রামপ্রসাদ কিঙ্কর ভদ্রকালী পদঅভিলাষী॥ —রামপ্রসাদ

বামে হালিসহর নগর রসময়,
বিবাহ বাসরে যথা নৃত্য গীত হয়।
বসতি করিত রামপ্রসাদ এখানে,
বিমোহিত হয় মন যাঁর মিষ্ট গানে।—সুরধুনী কাব্য

—দীনবন্ধু মিত্র

আমরা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের জীবনী আলোচনা করিয়াছি; এইবার তাঁহার বাস্তুভিটা ও পঞ্চমুণ্ডী আসনের কথা বলিব। রামপ্রসাদ সেনের তিরোধানের পর তাঁহার বাসভবন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। কেহই সে দিকে লক্ষ্য করিতেন না। গ্রামের লোকেরা ভক্তি ও ভয়বিহ্বল চিত্তে সেই জঙ্গলাকীর্ণ সর্পসঙ্কুল স্থানটি কোনও কৌতূহলী পথিককে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইত, নিকটে যাইতে সাহসী হইত না। রামপ্রসাদের স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ক্রমশঃ গ্রামবাসী সচেতন হইলেন। সে কথাই বলিতেছি।

হালিসহর এক সময় যেমন বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী ছিল, বহু লোকজনের বসতিপূর্ণ, স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল, তেমনি ক্রমশঃ উহার অবনতি ঘটিতে থাকে এবং সমৃদ্ধ পল্লী একরূপ জনশূন্য হইয়া পড়ে। ১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দে দারুণ সংক্রামক জ্বরে হালিসহর একেবারে জনশূন্য শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। এই সব কারণে হালিসহরের ন্যায় প্রসিদ্ধ পল্লীর মন্দির ও প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা ভূলুণ্ঠিত হইয়া ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল। জনশূন্য পল্লীতে এমন কেহই বাস করিতেন না, যাঁহারা রামপ্রসাদের বাস্তুভিটা, পঞ্চমুণ্ডী আসন সংরক্ষণও ব্যবস্থা করিতে পারেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে খাসবাটী নিবাসী ৺দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় হালিসহর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শ্রীরামপ্রসাদ ও ঈশ্বরপুরী সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। হালিসহরের উত্তরে "মুখুয্যেপাড়ায়" আজিও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরীর ভদ্রাসনের শেষচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। দীননাথ বাবু সোদপুর নর্থ-বেঙ্গল-রেলওয়ের চিফ্ ক্লার্ক ছিলেন। ইনি অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত

এম-এ, কিশোরীমোহন সেনগুপ্ত, হাইকোর্টের উকীল শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি হালিসহরের মনীষীগণের উদ্যোগে ও যত্নে 'Good will Fraternity Society'র প্রতিষ্ঠা হয়। "রামপ্রসাদ স্মৃতিভাণ্ডার" এই সমিতির অন্তর্ভুক্ত। হুগলী নিবাসী ৺শিবচন্দ্র দে এম, এ, বি, এল, (যখন তিনি হালিসহর বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার ছিলেন) প্রসাদ স্মৃতি-সংরক্ষণের জন্য অনেক যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৩০২ সালে শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন সম্বন্ধে ১৩০২ সনের ৩০শে বৈশাখ সাহিত্য পরিষদ গৃহে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি ছিলেন শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত এবং সম্পাদক ছিলেন শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রাবণ ১৩০২ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ পাঠের পর নিম্নলিখিতরূপ আলোচনা হইয়াছিল।

—'শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিলেন। পঠিত প্রবন্ধে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কবিরঞ্জনের সঙ্গীত শক্তি, সংসার বিরক্তি, ঈশ্বরভক্তি ও তদ্বিরচিত বিদ্যাসুন্দর, কালীকীর্ত্তন প্রভৃতি কবিতা গ্রন্থ এবং তৎসঙ্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গুণগ্রাহিতা প্রভৃতি প্রসঙ্গ বিশদ ভাষায় বর্ণিত করেন। প্রবন্ধ পাঠান্তে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি বলিলেন যে, সাহিত্যাংশে আরও কিছু বলিলে প্রবন্ধটি আরও উৎকৃষ্ট হইত, অর্থাৎ এই প্রবন্ধে কবিরঞ্জনের সাহিত্যানুশীলনের ধারাবাহিকতা তৎপ্রণীত সঙ্গীত ও কবিতা প্রভৃতির দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের কিরূপ পুষ্টিসাধন হইয়াছে, এবং রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তৎপ্রণীত বিদ্যাসুন্দরের কিরূপ অনুকরণ করিয়াছেন ইত্যাদি সাহিত্য সংক্রান্ত কথা লিখিলে প্রবন্ধটি আরও ভাল হইত। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন এম, এ, বলিলেন, কবিরঞ্জনের সঙ্গীতসমূহে তিন প্রকার ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়, একপ্রকার দ্বিজ রামপ্রসাদ, অন্যপ্রকার রামপ্রসাদ দাস এবং তৃতীয় রামপ্রসাদ। তিনি আরও বলিলেন—রামপ্রসাদের কোন কোন সঙ্গীত গ্রন্থে পূর্ব্ববঙ্গ প্রচলিত অনেক শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি একখানি গ্রন্থের কোন কোন অংশ পাঠ করিলেন।

ইহার উত্তরে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি বলিলেন; বৈদ্যেরা আপনাদিগকে (ব্রাহ্মণ) বলিয়া পরিগণিত করেন, এই হেতু ভণিতাতে "দ্বিজ রামপ্রসাদ" থাকিবার সম্ভাবনা অনুমান করা যায়। অবশেষে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ রচয়িতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন,—'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু অল্প পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করিয়া

তদ্বারা কেবল একটি গৃহ প্রস্তুত করিলে, তাহাতে প্রকৃতপক্ষে স্মৃতিচিহ্নের কার্য্য হইবে না, একটি অতিথিশালা ও একটি চতুষ্পাঠী স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু তাহা বহু ব্যয় সাপেক্ষ। সাহিত্যপরিষদের আপাততঃ এরূপ অবস্থা নয় যে, তদ্বারা এই বিষয়ে কোন অর্থ সাহায্য হইতে পারে। আমার বিবেচনায় স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতির নিমিত্ত যে ফণ্ড স্থাপিত করিয়াছেন, তাহা হইতে এই বিষয়ের জন্য সাহায্য চেষ্টা করিলে ভাল হয়। আর এক কথা প্রবন্ধের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কোন চিহ্ন নাই, সুতরাং তাহা লইয়া আলোচনা করিবার আবশ্যকতা কি?'

আমরা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও তাঁহার কবিতাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। এখন তাঁহার জন্মস্থান এবং তাঁহার বংশধরগণের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বিবেচনা করি। বহুকাল হইল, তাঁহার গৃহ ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদই ইহার কারণ। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রামপ্রসাদ সেনের প্রপৌত্র গোপালকৃষ্ণ সেন এতন্নগরে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার পুত্র কালীপদ সেন উড়িষ্যার অন্তর্গত আঙ্গুল নামক স্থানে ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেছেন এবং তাঁহার চারিটি পৌত্র ভাবী উন্নতির পরিচয় দিয়াছেন। ইহার মধ্যে তিনজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী। যে ভূমিখণ্ডের উপর রামপ্রসাদের বাস গৃহ ছিল, তাহা দেখিলে মনে বড় দুঃখ হয়। বহুকাল তাহা জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। সম্প্রতি হালিসহর-বাসিগণ এই মহাপুরুষের মহত্ব বুঝিতে পারিয়া, সেই পবিত্র স্থানটির প্রতি যত্ন প্রকাশ করিতেছেন। এই ভূমিটির পূর্ব্বদিকে তিনটি বৃক্ষ একত্র বিরাজ করিতেছে—একটি বট, একটি অশ্বত্থ এবং আর একটি গাব বৃক্ষ। গাব গাছটি বহুকালের বলিয়া বোধ হয়।

স্থানীয় পূর্ণিমা সমিতির সভ্যগণ এই বৃক্ষ তিনটির তলে একটি বেদী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ এই পবিত্র স্থান দর্শন করিতে আসিয়া বেদীর উপর অবস্থিতি করেন। এই সমিতির সভ্যগণের যত্নে গত দশ বৎসর হইতে মহাত্মা রামপ্রসাদের স্মরণার্থে একটি মেলা হইতেছে। ইহা 'প্রসাদ মেলা' নামে অভিহিত। প্রতি বৎসর কালীপূজার সময়ে ইহার অনুষ্ঠান হয়, এবং তদুপলক্ষে কালী দেবীর পূজা হইয়া থাকে। এই মেলা হালিসহরবাসীদের মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত নহে। ইহাকে জাতীয় মেলাতে পরিণত করা বঙ্গবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। মেলার স্থলে উক্ত সমিতির সভ্যগণ একটি পর্ণকুটির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহার পরিবর্ত্তে একটি ইষ্টকালয় সংগঠিত

হওয়া উচিত। আহ্লাদের বিষয় এই যে হালিসহরবাসিগণ এতদর্থে যত্নবান হইয়াছেন। হালিসহরের 'হিতৈষিণী সভা' একটি "প্রসাদ-প্রাসাদ" নির্ম্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। এতৎসভার সভ্যগণের ইচ্ছা এই যে, প্রাসাদটি চারিটি গৃহে সম্পূর্ণ হয়—একটি দেবালয়, একটি অতিথিশালা, একটি পুস্তকাগার এবং একটি চতুষ্পাঠিরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রস্তাবিত প্রাসাদটি নির্ম্মিত হইলে উহা সকল লোকের পক্ষে প্রীতিপ্রদ হইবে। এই পুণ্যভূমি দেখিবার জন্য নানা স্থান হইতে ভক্তগণ আগমন করেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রসাদী পদ গাইয়া থাকেন। দেবালয়টি তাঁহাদিগকে পরম আনন্দ বিতরণ করিতে পারিবে। রামপ্রসাদ অতিশয় বদান্য ছিলেন। অতিথিসৎকার তাঁহার একটি দৈনিক কার্য্য ছিল। সুতরাং তাঁহার স্মরণার্থে অতিথিশালা সবিশেষ উপযোগী। একটি পুস্তকালয় সাহিত্যসেবীদের প্রীতিপ্রদ হইবে। চতুষ্পাঠীর উল্লেখ আর কি করিব। এক সময়ে হালিসহরে সংস্কৃত আলোচনার একটি প্রধান স্থান ছিল। ইহা কুমারহট্ট-সমাজ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল। এখন এ সমাজ প্রায় পণ্ডিতশূন্য হইয়াছে। যাহাতে ইহা পূর্ব্বকার খ্যাতিলাভ করিতে পারে তৎপক্ষে যত্নবান্ হওয়া সকলের কর্ত্তব্য। যে পর্ণকুটিরের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এখন চতুষ্পাঠীর কাজ করিতেছে। একজন অধ্যাপক তথায় কতিপয় ছাত্রকে উপদেশ দিয়া থাকেন। হালিসহরবাসীদের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হউক। ঈশ্বরের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে লিখিত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের এই আকাঙ্ক্ষা এখন অনেকটা পূর্ণ হইয়াছে।

১৩২০ সালে 'রামপ্রসাদ' গ্রন্থপ্রণেতা স্বর্গত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হালিসহর দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণীটিও আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম।

হালিসহর 'রামপ্রসাদের ভিটা' দর্শন করিতে অতুলবাবু ১৩২০ সালের ১১ই পৌষ শুক্রবার হালিসহরে গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন: "আমি শিয়ালদহে ১০-৪৫ মিনিটের গাড়ীতে চড়িয়া ১২-১৫ মিঃ হালিসহর ষ্টেশনে অবতরণ করি। হালিসহর যাব একথা শুনিয়া অনেকেই আমাকে নানারূপ বিভীষিকা দেখাইয়াছিলেন, কেহ কেহ যাত্রার পূর্ব্বে কুইনিন সেবন করিতেও উপদেশ দিয়াছিলেন। হালিসহর শ্মশান—মহাশ্মশান—বাংলার এই শ্মশানে সাধক শ্রীরামপ্রসাদ তান্ত্রিক সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু আজ সেই শ্মশানের ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইয়া আমাকে কতই না বিভীষিকা

দেখিতে হইয়াছিল। গাড়ীতে হালিসহরের একটি বাবুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। ইনি কাঁচরাপাড়া 'লোকো' আফিসে কাজ করেন ও ইনিই আমার পথপ্রদর্শক। গাড়ী হইতে নামিয়া ক্যামেরাটি হাতে করিয়া আমরা হালিসহরের দিকে অগ্রসর হই। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাটি গ্রামের ভিতর দিয়া গঙ্গার দিকে চলিয়াছে, চতুর্দ্দিকে কেমন একটা নীরবতা, এই নীরবতার ভিতর খেজুর গাছের ঝোপে বসিয়া দুই একটি পাখী গান গাহিতেছিল। প্রায় কুড়ি মিনিট পথ হাঁটিয়া আসিয়া রাস্তার ডানদিকে শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের গোলাবাড়ী দেখিতে পাইলাম। সম্মুখে বড় একটা পাকা ধানের গোলা, বাড়ীর সর্ব্বত্রই বঙ্গলক্ষ্মীর সুষমা-মণ্ডিত অপূর্ব্ব শ্রী উথলিয়া পড়িতেছে।"

"স্থানীয় অধিবাসী ভূষণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গীরূপে অতুলবাবু রাম-প্রসাদের বাস্তুভিটা দেখিতে চলিলেন—"বৃদ্ধের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া আমরা প্রসাদ-গৃহ দর্শনে চলিলাম। গোলাবাড়ী হইতে বাহির হইয়া সম্মুখেই চাঁদনিঘাটযুক্ত একটি পুষ্করিণী ডানদিকে দেখিতে পাইলাম। বিখ্যাত সিভিলসার্জ্জেন কর্ণেল ৺কালীপদ গুপ্ত তাঁহার মায়ের অনুমতিক্রমে ইহা খনন করাইয়াছিলেন। সোজা রাস্তায় অনেক বাগান ও পরিত্যক্ত ভিটার উপর দিয়া আমরা ১—৭ মিনিটের সময় প্রসাদ-গৃহে আসিয়া পৌছি। পুণ্যভূমির চতুর্দ্দিকে কেবল জঙ্গল, আশেপাশে দুই একখানা বাড়ী। 'রাস্তার উপর দিয়া দুই একটি প্লীহাপেটে কঙ্কালমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। অদূরে বন হইতে শিবাদলের ডাক শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। গাঙ্গুলি মহাশয় বলিলেন, 'এ কিন্তু আশ্চর্য্য নয়, এখানে এই জঙ্গলের ভিতর নিয়তই শৃগালের ডাক শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা তিনজন প্রসাদ-গৃহের চারিদিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। এক বিঘা জমির উপর প্রসাদ-গৃহ প্রতিষ্ঠিত। কথিত আছে হালিসহরের সাবর্ণ চৌধুরীরা প্রসাদের পূর্ব্বপুরুষদের এই জমি দান করিয়াছিলেন। বাস্তুভিটার দক্ষিণদিকস্থিত প্রাঙ্গণের পূর্ব্বদিকে পঞ্চবটি ও পঞ্চমুণ্ডী আসন দেখিলাম। এই আসনের উপর বসিয়া সাধক সাধনা করিতেন। এখন এই আসনখানি ইট দিয়া বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পঞ্চবটির অশ্বত্থ ও বট এই দুইটি গাছ এখনও বিদ্যমান আছে। বটটির মূল কাণ্ড খুঁজিয়া পাইলাম না। অশ্বত্থটি বহু প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল। ইহার উপর একটি গাবগাছ অর্দ্ধগিলিত অবস্থায় আছে। জনশ্রুতি এই যে, এই গাবগাছেই সাধকের যোগবলে পদ্মফুল ফুটিয়াছিল। উত্তরে প্রসাদ-

গৃহের ভগ্নাবশেষ। গৃহের সম্মুখেই চণ্ডীমণ্ডপের জমি দেখিতে পাইলাম। এই জমির উপর একটি খেজুর ও কদবেল বৃক্ষ আছে। ভদ্রাসনের চতুর্দ্দিক এখন বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভূষণবাবু প্রভৃতির উদ্যোগে প্রসাদের শয়নগহ ও রান্নাগৃহের উপর দুইখানি ক্ষুদ্র পাকা কোঠা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। শয়নগৃহে (পূর্ব্বদিকের কোঠায়) বাৎসরিক শ্যামাপূজা হয়। রান্নাঘরের (পশ্চিমদিকের কুঠরিতে) লোকজন বসিয়া পূজা দর্শন করেন। গৃহপ্রাঙ্গণের একটি নক্সা আঁকিয়া লইলাম। এদিকে বন্ধুবর ক্যামেরাটি ঠিক্ করিয়া লইলেন।"

"প্রথমে তিনি দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রসাদগৃহের ফটো তুলিলেন। তারপর তিনি পঞ্চবটি ও পঞ্চমুণ্ডী আসনের ফোটো তুলিতে অগ্রসর হইলেন। তখন আমার হৃদয় মধ্যে কেবল একটা শঙ্কার ভাব জাগিয়া উঠিল। পদাবলীর ভিতর সাধকের যে চিত্র দেখিয়াছি, সেই পুণ্য চিত্রপ্রাণের ভিতর জপ করিতে লাগিলাম। সাধকের বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া ভিন্ন এসব কাজে সাফল্যলাভ অসম্ভব। প্রসাদকে ভাবিতে ভাবিতে ক্যামেরার মুখটি খোলা হইল। দুইবার দুইখানি প্লেট 'এক্সপোজ' দিয়া আমরা প্রায় চিত্রের কাজটা সারিয়া লইলাম। বেলা ৩টার সময় গাঙ্গুলিমহাশয় আমাদিগকে শিবের গলির ঘাটের দিকে লইয়া চলিলেন। এই রাস্তা দিয়া শ্রীরামপ্রসাদ গঙ্গাস্নানে যাইতেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখি কত অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে! অনেক গলি ও রাস্তা ঘুরিয়া ফিরিয়া আমরা দুইটি মঠের নিকট আসিলাম। এখানে শিব প্রতিষ্ঠিত। চারিদিকে কোথায়ও লোকজনের বড় একটা সাড়া পাইলাম না। সম্মুখে সদররাস্তা অতিক্রম করিতেই ডান দিকে গঙ্গাতীরে মুমূর্ষু নিকেতনের ভগ্নাবশেষ। এখানে গঙ্গার তীর অত্যন্ত খাড়া ও উচ্চ। আমরা ঘাট দিয়া নিম্নে অবতরণ করিলাম। এখান হইতে গঙ্গার দৃশ্য বড়ই মনোরম দেখায়। অপর পাড়ে হুগলী জেলার বাঁশবাড়ী। এই ঘাটে প্রসাদের বিসর্জ্জন হইয়াছিল। তখন সাধকের কত স্মৃতি আসিয়া প্রাণের ভিতর সাড়া দিল। আমি গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া মনে মনে সাধককে ডাকিলাম। আমার বন্ধুবর এই সময়ে ঘাটের একখানি ফটো লইলেন। নিকটে একটি চিতা জ্বলিতেছিল। আজ প্রসাদের পুণ্যতীর্থে শিবার ডাক শুনিয়া এবং চিতা ও নরকঙ্কাল দেখিয়া প্রাণের ভিতর কেমন একটা উদাস ভাব আসিল। গাঙ্গুলি মহাশয়ের নিকট প্রসাদ-স্মৃতি সংরক্ষণের ইতিহাস শুনিলাম। তিনি

আমাকে প্রসাদের কাশী গমন সম্বন্ধে বলিলেন,—"প্রসাদ কাশী যান নাই, তিনি ত্রিবেণী হইতেই দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।' এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। তিনি যে কাশী গিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রমাণ তাঁহার পদাবলীর ভিতরই পাওয়া যায়। তবে ইহা ঠিক্ যে তিনি প্রথম যাত্রায় ত্রিবেণী হইতে স্বপ্নাদেশে গৃহে ফিরিয়া আসেন।" আমরা দেখিতে পাইতেছি স্থানীয় অধিবাসীরা রামপ্রসাদ সম্বন্ধে কোনরূপ গবেষণা বা তথ্যানুসন্ধান করেন নাই।

'* * ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রসাদের ভদ্রাসন ও পঞ্চমুণ্ডী আসন সংলগ্ন সমগ্র ভূভাগ জঙ্গলাকীর্ণ এবং শৃগাল সর্পের আবাসভূমি ছিল। একদল উত্যোগী যুবক এই পুণ্যভূমিকে জঙ্গল মুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই কার্য্যের অগ্রণী ছিলেন। জঙ্গল কাটিবার জন্য মুটে মজুর সংগ্রহ করা একরূপ অসম্ভব হইয়াছিল। সাধকের বিরাগভাজন হইতে হইবে মনে করিয়া মজুরেরা জঙ্গল কাটিতে অস্বীকার করে। তখন ভূষণবাবু, হরিদাস বাবু, জীবনকৃষ্ণ রায়চৌধুরী প্রভৃতি উত্যোগী যুবকগণকে সঙ্গে করিয়া নিজেরাই জঙ্গল পরিষ্কার করিতে অগ্রসর হইলেন। জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া এই যুবকগণ কার্ত্তিক মাসে শ্যামাপূজা ও প্রসাদী মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। পূজার প্রথম বৎসরে ইঁহারা একখানি নারিকেল পাতার ঘরে মায়ের পূজা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের ইচ্ছা ছিল রাত্রির প্রথম ভাগে এই পরিত্যক্ত ভদ্রাসনে মায়ের পূজা শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যান। কিন্তু দৈবক্রমে ঘটনা অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছিল, সেই কথা এখন বলিতেছি।'

'সন্ধ্যার সময় যুবকেরা প্রতিমা লইয়া আসিতেই ভীষণ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়। অমাবস্যার রাত্রি, চারিদিকে অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। মুষলধারে বৃষ্টিপাত, প্রবল ঝড়, এই সব কারণে নারিকেল পাতার ঘরে প্রতিমা স্থাপন করা অসম্ভব হইয়া উঠিল, তাই ইহারা পূর্ব্বদিকে বাগ্দীদের বহির্ব্বাটিতে প্রতিমাখানি কিছুক্ষণের জন্য রাখিয়া দেন। রাত্রি ১১টার সময় বৃষ্টি থামিল, আকাশের মেঘ কোথায় চলিয়া গেল। নিশাতে শ্রীহরি ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রথম কালী পূজা করেন। অনেক পুরোহিতই ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া পূজা করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। এই সময়ে হরি ভট্টাচার্য্য মহাশয় নির্ভীক পুরোহিতের উপযুক্ত মনের বল দেখাইয়াছিলেন। পরদিন গ্রামের বৃদ্ধেরা আকস্মিক ঝড়বৃষ্টির কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—'তোমরাও মানবেনা, প্রসাদ বীরাচারী তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি রাত দুপুরে মায়ের পূজা

করতেন। তোমরা সাঁঝের বেলা তাঁর ভদ্রাসনে শ্যামা মায়ের পূজা করলে চলবে কেন? তাই মা তোমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়ে দিলেন। সেই অবধি আজিও মধ্যরাত্রে বৎসরে একবার মায়ের পূজা হইয়া থাকে। এ পূজায় ছাগ বলি নাই। কেবল ইক্ষু ও কুমড়া বলি দেওয়া হয়। এই পূজা উপলক্ষ করিয়া প্রতিবৎসর 'প্রসাদ মেলা' জমিয়া থাকে। তবে সাধারণতঃ কার্ত্তিকমাসে হালিসহরে ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রকোপ হয় বলিয়া মেলাটি ভাল করিয়া জমিতে পারে না।'

আমরা এ প্রসঙ্গে গ্রামবাসীর নিকট একটি কাহিনী শুনিয়াছি যে—দারুণ ঝড়বৃষ্টির জন্য পূজার আয়োজন ইত্যাদি করিবার লোক মিলিতেছিল না—এমন সময় কোথা হইতে একজন মহিলা আসিয়া বলিয়াছিলেন: 'তোমাদের নৈবেদ্য, ইত্যাদি সমুদয় পূজোপকরণ আমি ঠিক্ করিয়া দিব,' সেই মহিলা যথা সময়ে আসিয়া নীরবে পূজার সমুদয় আয়োজন করিয়া দিলেন—পূজা আরম্ভ হইলে—আর তাঁহার সন্ধান মিলিল না! কে এই মহিলা—তাঁহার পরিচয়ও সকলের অজ্ঞাত রহিল। পূজার উদ্যোগীরা মায়ের নিকট বলিদানের জন্য একটি পাঁটা সংগ্রহ করিয়া পূজাস্থানে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল,—পূজাসময়ে দেখা গেল, দড়ি পড়িয়া আছে, পাঁটা নাই! বৃদ্ধেরা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—প্রসাদ কখনও মায়ের নিকট জীব বলিদানের পক্ষপাতী ছিলেন না।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পর স্বর্গত দয়ালচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অধ্যবসায় ও গবেষণার ফলে সাধকের জন্মস্থান, জীবনী ও পদাবলীর অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। দয়ালবাবুর 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ' ১২৮২সালের ২৫শে বৈশাখ প্রথম প্রচারিত হয়। ঈশ্বর গুপ্তের অনুসন্ধানের পর ইনিই প্রসাদ-জীবনীর মৌলিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নানাজনের কাছে নানারকম কাল্পনিক কাহিনী শুনিতে শুনিতে তিনি প্রসাদ সম্বন্ধে প্রকৃত বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন: "প্রায় দুই বৎসর কাল এইরূপ কল্পনার রাজ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘটনাক্রমে কলিকাতায় জনৈক ধর্ম্মপ্রচারকের নিকট তিনটি নিশ্চিত কথা জানিলাম। সেই তিনটি কথা এই—প্রথম, রামপ্রসাদ একজন বৈদ্যকুল-সম্ভূত, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক কবি। দ্বিতীয়, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি সাধক ছিলেন। তৃতীয়, তাঁহার বাড়ী হালিসহর পরগণার অন্তর্গত কুমারহট্টগ্রামে।'

'প্রসাদী সঙ্গীত সংগ্রহ করিবার জন্য কত বিভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের

বিবিধ অবস্থাপন্ন লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছে, কত কৌতুকাবহ গল্প এবং গানই শুনিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।'

'* * মনে বড় বাসনা ছিল প্রসাদের বাসস্থান ও সাধনার পঞ্চমুণ্ডী আসন দেখিব। এই উদ্দেশ্যে দুইজন বন্ধুসহ হালিসহর গমন করি। তথায় প্রথমে কুমারহট্ট, তৎপরে তদান্তর্বর্ত্তী শিবের গলিতে অনুসন্ধান করিয়া জনমানবশূন্য হালিসহরে প্রসাদের আবাসভূমিতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম প্রসাদের গৃহ প্রাঙ্গণে পুষ্করিণী খনিত হইয়াছে।

এমন স্থানে কেইবা আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া দিবে এবং দ্রষ্টব্য বস্তু দেখাইয়া দিবে! ঘটনাক্রমে এক বৃদ্ধ কুম্ভকারসহ সাক্ষাৎ হইল। সে বসে বসে একটি ভগ্ন প্রাসাদের ভূগর্ভস্থ ইষ্টক উদ্ধার করিতেছিল, তাহার নিকট বসিয়াই আমরা কতকগুলি উপন্যাসিক কথা শুনিলাম।'

'দেখিলাম তাঁহার পঞ্চমুণ্ডী 'সাধনাসন এক্ষণও একটি দোলমঞ্চের ন্যায় বিদ্যমান আছে; কিন্তু এরণ্ড, ভাণ্ডির প্রভৃতি দ্বারায় সমাচ্ছাদিত হইয়া বন্য পশুর আবাস-ভূমি হইয়াছে। শুনিলাম ইতিপূর্ব্বে হিন্দু গায়ক মাত্রেই এই আসন সমীপে আসিয়া সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন করতঃ আসনের ভূমি মস্তকে ও জিহ্বাগ্রে প্রদান পূর্ব্বক আহূত স্থানে গান করিতে যাইত। শুনিলাম কোন কোন স্থানে গায়ক একবার কোন স্থানে পরাজিত হইয়া আসন সমীপে হত্যা দিয়া পরে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই ত্রয়োদশ বঙ্গাব্দের ঘোর ধর্ম্মপ্লাবন সময়েও এতাদৃশ হীনাবস্থাপন্ন প্রসাদের সাধনাসন সমীপে কেহই মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে সাহসী হয় না। অনেকে এই সকলকে কুসংস্কার বলিবেন, আর যাহারা এইরূপ করে তাহাদের কুসংস্কার আছে সত্য; কিন্তু সাধকবর কবিরঞ্জনের সিদ্ধির আসনকে ইহা অপেক্ষা অধিক সম্মান করা আমাদের উচিত বোধ হয়। বদরিকাশ্রমস্থ ব্যাসাসন, হিমাচল কুঠরস্থ বশিষ্টাসন, চিত্রকূটস্থ ভরদ্বাজাসন যেরূপ পূণ্যভূমি, কুমারহট্টের প্রসাদাসনকেও তদঅপেক্ষা কোন অংশে হীন মনে করা উচিত নয়।'

পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী হালিসহর রামপ্রসাদের ভিটাতে উপস্থিত হইয়া ভক্ত রামপ্রসাদের বাস্তুভিটাতে ১৮১২ শকাব্দে (১৮৯০ খৃঃ অঃ) ২২শে অগ্রহায়ণ তারিখে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সে সময়ে সেখানকার অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বলিতেছি। কুমার পরিব্রাজক গ্রন্থের ৫০৮ (১০৪৬) পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"ভক্ত রামপ্রসাদ সেনের জন্মভূমি হালিসহরের একটি বনাকীর্ণ স্থানে 'রামপ্রসাদের ভীটে' নামক তাঁহার বাসগৃহের মৃন্ময়স্তূপ বিদ্যমান। তৎসমীপেই পঞ্চবটী ও পঞ্চমুণ্ডীর আসন অবস্থিত। হালিসহর

পূর্ণিমাব্রত সমিতির বিশেষ যত্নে ও উদ্যোগে ও শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ উৎসাহে এই মৃত ভূমিতে আবার মহাশক্তির সঞ্চার হইয়াছে। ভক্তবৎসল ভক্তের নাম উজ্জ্বল করিবার জন্য বুদ্ধিরূপিণী হইয়া হৃদয়-বৃন্দে প্রেরণা করিয়াছেন। দুই বৎসর হইতে ৺কালীপূজার সময় এই স্থানে অট্টহাসিনী নৃমুণ্ডমালিনী জগত্তারিণীর পূজা ও ধর্মোৎসবাদি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এবারও যথাবিধি মহোৎসব হইয়াছিল। উৎসবে বহু শিক্ষিত লোকের সমাগম হইয়াছিল। কুমার পরিব্রাজক মহোদয় ভক্ত প্রসাদের সাধনক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দুই দিন জ্ঞান ও ভক্তিমাখা বক্তৃতা করিয়া 'পবিত্র ক্ষেত্রের মুখ উজ্জ্বল ও শ্রোতৃগণের হৃদয় পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। মায়ের সোপচারে পূজা, চণ্ডীর গান ও সঙ্কীর্তনাদি হইয়াছিল। সাধারণের সাহায্যে এ স্থানে একটি ৺কালী মন্দির ও সম্মুখে নাটমণ্ডপ ও মায়ের নিত্য পূজার ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়, আশাকরি কোন হিন্দুই যথাসাধ্য সাহায্য দানে বিমুখ হইবেন না।'

"রামপ্রসাদ নিজে তাঁহার বাস্তুভিটা সম্বন্ধে তাঁহার গানের দুই এক স্থানে কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা কঠিন। যেমন একটি সঙ্গীতে আছে:—

মাটির দেওয়াল বাঁশের খুঁটি
তায় পারি না খড় জোটাতে!

ইহা হইতে এই টুকু অনুমান করিতে পারা যায় যে—প্রসাদ কখনও দালান কোটাতে বাস করিতেন না। এই রকম ভাল ঘর সম্বন্ধে আর একটি গানের আরম্ভে রহিয়াছে—

নিতি তোরে বুঝাবে কেটা
বুঝে বুঝ্লিনাক মনরে ঠেঁটা॥
কোথা রবে ঘর বাড়ী তোর, কোথা রবে দালান কোঠা।

ইহা হইতে মনে হয় যে এক সময়ে রামপ্রসাদের ঘরবাড়ী ও দালান কোঠা ছিল, কিন্তু কালবশে সব হারাইলেন, যেমন:

শিশুকালে পিতা মলো, মাগো রাজ্য নিল পরে।
আমি অতি অল্পমতি, ভাসালে সায়রের জলে॥
স্রোতের সেহলার মত মাগো ফিরিতেছি ভেসে।
সবে বল ধর ধর, কেও নাবে না অগাধ জলে॥

পিতার মৃত্যুর পর রামপ্রসাদের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার বয়স তখন অনুমান করা যাইতে পারে ষোল বৎসরের

বেশী ছিল না। হয়ত বাড়ী ঘর দালান কোঠা পিতার ঋণের দায়ে কিংবা অন্য কোন কারণে পর হস্তগত হইয়াছিল। কাজেই নিরুপায় সাধক স্রোতের সেহলার মত নিরাশ্রয় হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন। সকলেই (এখানে আত্মীয় স্বজন কিংবা গ্রামবাসীও বুঝাইতে পারে। 'সাহায্য করিবার কথা মুখে বলিয়াও হয়ত কেহ সাহায্য করেন নাই। আবার একস্থানে তাঁহার গানে আছে,—

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে তৃণ হয়ে ভাসি জলে,
আমি ডাকি ধর বলে, কে ধরে তুলিবে স্থলে ?

সে সময়ে কবিরঞ্জনের—"মৌখিক সহানুভূতির অভাব হয় নাই। কিন্তু তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্যও কেহ অগ্রসর হয় নাই। তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি বর্ত্তমান থাকিলে সাংসারিক অভাব এড়াইয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু ভবিতব্যকে খণ্ডাইবে কে ? সে সময়ে নদীর দুই তীরেই বর্গী, পাঠান প্রভৃতির যথেষ্ট অত্যাচার এবং অরাজকতা চলিতেছিল, তদ্ভিন্ন নদীর ভাঙ্গনেও পারিবারিক বিসম্বাদের ফলেও তাঁহার যতটুকু যাহা কিছু পৈত্রিক ভূ-সম্পত্তি ছিল, দুর্দ্দৈব বশতঃ তিনি তাহা হারাইয়াছিলেন। সেই ঘটনাই উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "রাজ্য নিল পরে" ! এই রকম বিপাকে পড়িয়া তিনি অন্নসংস্থানের চেষ্টায় স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য হন। সেই সময়ের প্রথম গানটি হইল—

কাজ কি সামান্য ধনে।
ও কে কাঁদছে তোর ধন বিহনে।
সামান্য ধন দিবে তারা পড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দাও মা অভয় চরণ রাখি হৃদি পদ্মাসনে॥

তারপর তাঁহার জীবনে আসিল বিবিধ সাংসারিক বিড়ম্বনা-অভাব ও অভিযোগ। তাঁহার একটি গানে আছে :

দিয়াছিলি একটি বৃত্তি তাও হরে নিলি।

ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে কালবশে কয়েক বৎসর পরে হয়ত তাঁহার বৃত্তি বন্ধ হইয়াছিল। —এ প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলেন :— "অনুসন্ধানের ফলে বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইলাম যে মিত্র মহাশয়দের বার্ষিক খাজনা বাকী পড়ায় ভূ-সম্পত্তি লইয়া বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে সেই সময় সম্ভবতঃ রাম-প্রসাদের মাসিক বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়। প্রসাদের হস্তলিপি "শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা" ও "আমায় দিয়েছ মা তবিলদারী" গানটির লিপিও কীট দষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ ভাবে

বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। উদ্ভট কবি পূর্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের চেষ্টাও এই কারণে বিফল হইয়াছিল।'

রামপ্রসাদের গীতাবলি হইতে বুঝিতে পারা যায়—'পিতৃত্যক্ত ভূসম্পত্তি হারাইয়া তদবধি রামপ্রসাদ স্রোতের জলে "সেহলার মত" ভাসিয়া বেড়াইয়াছেন। পরে নদী তীরে কিছু কৃষিকার্য্য করিয়াছিলেন ও উহার নিকট একখানি ঘর বাঁধেন। দুঃখের বিষয় কৃষিক্ষেত্র জল প্লাবিত হইয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং ঐ সঙ্গে ভিটাটিও নিশ্চিহ্ন হয়। তিনি বলিয়াছেন:

অন্নত্রাসে প্রাণে মরি নানাবিধ কৃষি করি।
আমার কৃষি সকল নিল জলে কেবলমাত্র লাঙ্গল চষি॥

অন্যত্র দেখা যায় কবি গাহিয়াছেন:—

আর কেন গঙ্গাবাসী হব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে বিমাতাকে মা বলিব।
পাদোদক থাকিতে কেন গঙ্গা জলে স্নান করিব।

পুনরায়— "আর হব না গঙ্গাবাসী।
গঙ্গার সতীন পো সম্বন্ধে আমি।
বিমাতার চরিত্র যেমন কত আর বলিব প্রকাশি।

অতএব ধরিয়া লইতে হইবে যে গঙ্গানদীর স্রোতে কৃষিক্ষেত্র যখন প্লাবিত হইয়াছিল সেই সময় নদীতীরের ভিটাও গিয়াছে। সেই জন্য তিনি আর বিমাতার কোলে যাইবেন না। ইহা জানা আছে গঙ্গানদী এতদঞ্চলের পূর্ব্ব তীরে চক্রদহ হইতে দক্ষিণে ভট্টপল্লী পর্য্যন্ত বহু ভাঙ্গা গড়ায় রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। কৃষ্ণচন্দ্রের সুখসাগর প্রভৃতি উহার প্রমাণ। একটি গানে আছে—

'গঙ্গা যদি গর্ভে টেনে নিল এই ভূমি' 'ইহার অন্যরূপ অর্থ করা যায় না, এক মৃত্যু ব্যতিরেকে। বাস্তুভিটা ঠিক্ কোন স্থলে ছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না। বর্ত্তমানে কেহ তাহা বলিতেও পারেন না। অনুমান অনুসারে, প্রসাদের পঞ্চমুণ্ডীর আসন অদ্যাবধি যেখানে রহিয়াছে উহার দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে একটি ডোবার ধারে শেষ ভিটা ছিল। এই ঘর মেরামতির সময়েই স্বয়ং অন্নপূর্ণা রামপ্রসাদের কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়া মেরামতি কার্য্যে ভক্ত প্রসাদকে সাহায্য করিয়াছিলেন।*

রামপ্রসাদের বাস্তুভিটা সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকগণ যেরূপ আলোচনা

*গানে রামপ্রসাদ—শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়—১৩-১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করিয়াছেন, তাহা বিবৃত করিয়াছি। আমাদেরও রামপ্রসাদের পঞ্চবটি, পঞ্চমুণ্ডীর আসন, রামপ্রসাদের ভিটা ও তাঁহার ভিটার বর্ত্তমান পূজার বেদী দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

আমরা 'রবিবাসর' নামক সাহিত্য মিলন সভার সদস্যগণ পুণ্যতীর্থ হালিসহরে তাঁহার ভিটা ইত্যাদি দর্শনে এবং তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ৭ই ডিসেম্বর ১৯৫২ (বাঙ্গালা ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৯) রবিবার ১-৩০ মিনিটের সময় কলিকাতা হইতে হালিসহর অভিমুখে যাত্রা করি। প্রায় তিনটার সময় নৈহাটী ষ্টেসনে পৌছিয়া কেহ টেক্সিতে ও কেহ বাসে প্রসাদের বাস্তুভিটার দিকে রওনা হইলাম। কুমারহট্ট পল্লীর পথে আমাদের গাড়ী চলিল—পথ অপ্রশস্ত, দুইদিকে শ্যামলতরুশ্রেণী শোভা পাইতেছে—আম, কাঁটাল, তাল, তেঁতুল, সুপারি, নারিকেল এবং বিবিধ লতাগুল্ম পথের দুইধারে শোভা পাইতেছিল—দুইদিকেই প্রাচীন ভগ্নমন্দির, জীর্ণ অট্টালিকা, বিশুষ্ক প্রায় দীঘি, ডোবা, পুষ্করিণী দেখিলাম। অনেক বড় বড় বাড়ী পড়িয়া আছে। কিন্তু লোকজন তেমন দেখিলাম না। আমরা প্রায় চারিটার সময় রামপ্রসাদের বাস্তুভিটার কাছে আসিয়া পৌছিলাম। সম্মুখে প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের বাঁ দিকে একটি ডোবার মত পুষ্করিণী, এবং দক্ষিণে দেখিতে পাইলাম রামপ্রসাদের পঞ্চবটি ও পঞ্চমুণ্ডীর আসন। নিম্নভাগ বৃত্তাকারে বেদী বাঁধান। অশ্বত্থ ও বট এই দুইটি মাত্র গাছ এখনও বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা এস্থলে আসিয়াছিলেন তাঁহারা যেরূপ অবস্থায় ইহা দেখিয়াছিলেন বর্ত্তমানে তাহা নাই। এখন চারিদিকে কোনরূপ জঙ্গল নাই। আশেপাশে বাড়ীও আছে। বট ও অশ্বত্থ গাছ দুইটি শ্যামল পত্রবহুল এবং শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করিয়াছে। বেদীর সেই পঞ্চবটী ও পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রণাম করিয়া আমরা বেদীর উপরেও আশেপাশে বসিলাম।

প্রসাদের বাস্তুভিটার উপর একটি দালান নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার তিনটি কক্ষ। একটিতে লাইব্রেরী, অপরটিতে বেদী এবং ঐ স্থানেই বর্ত্তমান সময়ে প্রতি বৎসর শ্যামা মায়ের পূজা হইয়া থাকে। অপর কক্ষটিকে ভাঁড়ার বা পূজাকালীন দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করা আছে। আমাদের সদস্যগণ সেই গৃহের সোপানোপরি, এবং বারান্দায় দাঁড়াইয়া আলোকচিত্র তুলিলেন।

সেদিনকার সে সভায় যেমন সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ আসিয়াছিলেন, তেমনি গঙ্গার উভয়তীরবর্ত্তী স্থান হইতেও বহু ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা আসিয়াছিলেন। সেদিন আমাকেই সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে

হইয়াছিল। কালী-কীর্ত্তন ও শ্যামা সঙ্গীত হইল। শ্রীমান অমিয়লাল মুখোপাধ্যায় 'রামপ্রসাদ' সম্বন্ধে বহু তথ্যমূলক একটি সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এবং সভাস্থলে তদ্‌রচিত—'গানে রামপ্রসাদ' নামক গ্রন্থখানির বিক্রয়লব্ধ অর্থ রামপ্রসাদ স্মৃতিভাণ্ডারে দান করিলেন।

আমাদের এস্থানে আসিয়া মনের ভিতর এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল—যেন সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে চলিয়া গিয়াছিলাম। মনে পড়িল, প্রসাদের সাধন জীবন, মনে পড়িল তন্ত্রের গভীর তত্ত্ব লইয়া হিন্দু শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া প্রসাদ মা-নামের পদাবলী কেমন সরল ভাষায় রচনা করিয়াছেলেন; আমি সেদিন সে বিষয়েই আলোচনা করিয়াছিলাম।

আমাদের মনে হয় প্রসাদের এই বাস্তুভিটা ও পঞ্চবটীর চারিপাশে উচ্চ দেয়াল দেওয়া আবশ্যক, এবং একটি সুরম্য উদ্যান রচনা করিয়া সেই স্থানটিকে পরম রমণীয় সাধকের তপোবন রূপে গড়িয়া তোলাই উচিত। আমরা সেদিন সন্ধ্যায় যে আনন্দ লইয়া গৃহে ফিরিয়াছিলাম, পুণ্যতীর্থের পদরেণু মাথায় লইয়া হৃদয়ের মধ্যে যে মায়ের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলাম তাহা বর্ণনা করা যায় না। অন্তরের গভীর প্রদেশেই সেই মাতৃমূর্ত্তি বিকশিত রহিয়াছে।

স্বাধীন পশ্চিমবাঙ্গালা সরকার, স্থানীয় অধিবাসী এবং প্রত্যেক বাঙ্গালীর এই পুণ্যতীর্থস্থানের স্মৃতি যাহাতে চিরদিন স্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য করা উচিত।

রামপ্রসাদ অত্যন্ত অতিথিবৎসল ছিলেন। কোন দিন কোন অতিথি তাঁহার গৃহ হইতে বিমুখ হইতনা। নিজের স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা থাক্ বা না থাক্ সেদিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিলনা—যেভাবেই হউক অতিথিসেবা গৃহস্থের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম মনে করিয়া তিনি অতিথিদের ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন।

এজন্য জগজ্জননীর নিকট তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন :

গৃহধর্ম্ম বড় ধর্ম্ম যদি দুজন অতিথি আসে।
দুজনের উপর তিনজন এলে হয় না যেন মুখ লুকাইতে॥

সেই সাধক রামপ্রসাদের বাস্তুভিটায় ও পঞ্চমুণ্ডী আসনের পার্শ্বস্থিত ভূমিতে 'রামপ্রসাদ অতিথিশালা' নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা করিলে সাধকের শুভ আশীর্ব্বাদ দেশবাসীর শিরে বর্ষিত হইবে।

আমরা এখানে রামপ্রসাদের বাস্তুভিটা, পঞ্চমুণ্ডীর আসন সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকগণ ঐ স্থান যেরূপ দেখিয়াছিলেন, এবং আমরাও যেরূপ দেখিয়াছি সেকথা বলিলাম।

সতেরো

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে
আমি ডাকি ধর ধর বলে, কে ধরে তুলিবে কূলে ? —রামপ্রসাদ

রামপ্রসাদের গানের ভণিতায়—আমরা—'রামপ্রসাদ কয়, 'প্রসাদ' বলে' 'দ্বিজরামপ্রসাদ বলে,' 'রামপ্রসাদ দাসে' 'রামপ্রসাদ দাস কয়, 'কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন' 'কলয়তি কবিরঞ্জন' 'ভিষক' 'দীন রামপ্রসাদ' ইত্যাদি দেখিতে পাই। অনেকে মনে করেন, দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতাযুক্ত গানগুলি কোন ব্রাহ্মণ রামপ্রসাদের রচনা, যেরূপেই হয় উহা বিখ্যাত শ্যামাসঙ্গীতের রচয়িতা রামপ্রসাদ সেনের পদাবলীর সহিত এক হইয়া গিয়াছে। একথা কতদূর যুক্তিসহ সে কথা যেমন আমরা বলিব - অন্য রামপ্রসাদের কথাও প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করিব। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন বৈদ্য হইলেও যে 'দ্বিজ' শব্দ ব্যবহারের অধিকারী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন যে দ্বিজ ভণিতা দিয়া কোন সঙ্গীত রচনা করেন নাই, এ বিশ্বাস অনেকেরই ছিল, কিন্তু দ্বিজ রামপ্রসাদ কে, তাহা জানিবার জন্য কেহ বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। প্রসাদ-প্রসঙ্গ রচয়িতা এসম্বন্ধে একস্থলে এইরূপ লিখিয়াছেন :

"যদিচ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ভিন্ন" দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলাম না, তথাপি পশ্চিম বাঙ্গালার সেন রামপ্রসাদ ভিন্ন পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় একজন দ্বিজ রামপ্রসাদ ছিলেন—আমার এই সংস্কার দূর হইল না। "দ্বিজ রামপ্রসাদ" ভণিতিযুক্ত সঙ্গীত মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইল বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় এসকল সঙ্গীত দ্বারা কবিরঞ্জনের কিছুই পদবৃদ্ধি হইতেছে না, বরং কতক পরিমাণে পদহানি হইতেছে। পক্ষান্তরে এক ব্যক্তির যথাসর্ব্বস্ব অপরের ভাণ্ডারে ন্যস্ত হইতেছে। আবার দেখিতেছি ইহাও একপ্রকার প্রকৃতিরই গতি। সুতরাং যেমন অনেক হীনপ্রভ কালিদাস খরপ্রভ কালিদাসে লীন হইয়াছেন ; যেমন অনেক ভাঁড়, ভাঁড় চূড়ামণি গোপাল ভাঁড়ে লীন হইয়াছেন, সেইরূপ এক অল্প-প্রাণ রামপ্রসাদ এক মহাপ্রাণ রামপ্রসাদে লীন হইলেন।"

শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন কৃত 'সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব পাঠে' প্রথমে এ বিষয়ে আভাষ পাই। পরে একটু অনুসন্ধান করিয়া "দ্বিজ" রামপ্রসাদের সন্ধান পাইয়াছি। তিনি পূর্ব্ববাংলার নহেন, কলিকাতারই অধিবাসী। এই দুইজনের রচনা পৃথক করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতার্থ হইতে পারি নাই। কারণ এই অল্পশতাব্দে কোন্ গানের ভণিতাতে দ্বিজ ছিল, কোন্ গানে ছিল না, প্রাচীন পাণ্ডুলিপির অভাবে তাহা স্থির করা যায় না।

"শ্রীরামপ্রসাদ" স্থলে "দ্বিজ রামপ্রসাদ" এবং "এদীন" "তারা" "ঐযে" "এখন্" "ওমা" "মাগো" প্রভৃতি অসংখ্য শব্দের পরিবর্ত্তে "দ্বিজ" শব্দের প্রয়োগ সহজসাধ্য হওয়ায় কোন্‌টিতে কি ভণিতা ছিল বুঝিতে পারা যায় না। গায়কের মুখে এরূপ শব্দ-পরিবর্ত্তন প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। আর কেবল রচনার প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য দর্শনে, এরূপ পার্থক্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হওয়াও যুক্তিযুক্ত বোধ করিলাম না। বস্তুতঃ এই দুইজন ভিন্ন অন্য কয়েক জনও "প্রসাদ" ভণিতা দিয়া কিছু কিছু লিখিয়া গিয়াছেন কিনা তাহাও সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

'আমরা এক্ষণে অবগত হইয়াছি যে রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী নামে আর একজন কবি কয়েকটি প্রসাদী সঙ্গীত ও সামান্য কবির গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর নীলমাধব চক্রবর্ত্তীর একটি কবির দল ছিল। নীলমাধব "কবিওয়ালা" মহলে "নীলু ঠাকুর" নামে খ্যাত। এই নীলুঠাকুরের দলেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী "বাঁধনদার" বা সঙ্গীত-প্রণেতা ছিলেন। ইনি সঙ্গীত রচনা করিতেন বটে, কিন্তু ভাল গান গাহিতে পারিতেন না বলিয়া একবার বিপক্ষ পক্ষের নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতাংশে ইঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছিল :

"যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে বাজেনাকো একটি দিন,
তেমনি নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন" ॥

এই রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী সম্ভবতঃ সন ১১৬০ কিম্বা ৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও ১২৪২ সালে পরলোকগত হন। সুতরাং মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৮০।৮২ বৎসর হইয়াছিল। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলু ঠাকুর আরও কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করেন।

এই কলিকাতা নগরেই হেদুয়া পুষ্করিণীর নিকটে নীলু, রামপ্রসাদের

বাটী ছিল। ইঁহাদিগের দৌহিত্র-বংশীয়েরা কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও কবির দল চালাইতেন। * এখনও কেহ কেহ ঐ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

কবির দলের এই রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী কোন শ্যামা-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না এবং তিনি সাধকও ছিলেন না। কাজেই তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচয়িতা দ্বিজ রামপ্রসাদ হইতে পারেন না।

কতকগুলি প্রসাদী গানে—'ডিক্রি', 'ডিসমিস' 'আপীল' প্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হয়। ঐ সমস্ত ইংরাজী কথা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় বাঙ্গালাভাষার অন্তর্নিবিষ্ট হওয়া তত সম্ভবপর নহে। সেইজন্য আমার বোধ হয় উক্ত শব্দাবলী যুক্ত গানগুলি কবিরঞ্জনের নহে,—চক্রবর্ত্তী রামপ্রসাদের রচিত।

কাব্যবিশারদ মহাশয়ের এ অনুমান সম্পূর্ণ মিথ্যা। ভুলিলে চলিবে না যে রামপ্রসাদ হেষ্টিংসের শাসনকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কাজেই ঐ সব ইংরাজী শব্দ তাঁহার জানা স্বাভাবিক।

সে যাহাই হউক, অনেক ক্ষুদ্র-প্রাণ রামপ্রসাদ যে মহাপ্রাণ রামপ্রসাদে বিলীন হইয়াছে, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনুকৃতি ও আদর্শের প্রভেদ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য বলিয়া আমি সে বিষয়ে প্রয়াস পাই নাই। কবিরঞ্জনেরই অনেক গানে যে চক্রবর্ত্তীর 'দ্বিজ' ভণিতা আসিয়া পড়িয়াছে, ইহা অনেকেই বুঝিতে পারেন। সেইজন্য এই সমস্ত গান পৃথক করা মাদৃশজনের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গীতাদির সংশোধন, সংস্করণ, পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিবার অধিকার সংগ্রহকারের নাই, সুতরাং অনধিকার-চর্চ্চা পরিহার করিয়াছি। পাছে প্রকৃত কবির কীর্ত্তি লোপ হয়, বা সংগ্রহ অসম্পূর্ণ হয়, এই ভয়ে আমি সে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি নাই। রামপ্রসাদকে সাকারোপাসক বা নিরাকারোপাসক প্রতিপন্ন করিবার জন্য সাম্প্রদায়িক সংগ্রাহকেরা নিজের মনের মত করিয়া অনেক কথা বদল করিয়াছেন, বসাইয়াছেন; আমি তাহাদিগের প্রদর্শিত পথে চলি নাই। যেরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, অবিকল তাহাই মুদ্রিত করিয়াছি। [প্রসাদ পদাবলী ১৪-১৭ পৃষ্ঠা। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।]

এখন 'দ্বিজ' শব্দের ভণিতার জন্য রামপ্রসাদের গান সংগ্রাহকেরা 'কবিরঞ্জন' রামপ্রসাদ সেন ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গের আর একজন সাধন সঙ্গীতকার রামপ্রসাদের

*ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবিগীতিকার ৺ গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কৃত "প্রাচীন কবিসংগ্রহ" নামক পুস্তকে নীলু, রামপ্রসাদ, ভোলা ময়রা, নিত্যানন্দ বৈরাগী, রামতনু, হরু ঠাকুর, রামসুন্দর সেকরা প্রভৃতির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। আমি এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থখানি ন্যাশান্যাল লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি।

সন্ধান পাইয়াছেন। গুপ্ত কবি লিখিয়াছেন [প্রভাকর ১২৬০ ১লা পৌষ—পৃষ্ঠা ৬] "পূর্ব্ব অঞ্চলে রামপ্রসাদাদি কবিতা অনেক প্রচারিত আছে; সে সকল পদ্য এখানে প্রচার নাই। ঢাকা, সেরাজগঞ্জ ও পাবনা প্রদেশের নাবিকেরা সর্ব্বদাই তাহা গান করিয়া থাকে, সে বিষয়ে তাহাদিগের এত ভক্তি যে, যখন অস্নাত থাকে তখন মুখাগ্রে উচ্চারণ করে না। কহে "বাসী কাপড়ে রামপ্রসাদের গান গাহিলে নরকে যাইতে হইবে।"

'বলা বাহুল্য, পূর্ব্ববঙ্গে যে সকল গানের প্রচার ছিল, তাহার রচয়িতা কবিরঞ্জনও নহে এবং কবিওয়ালা রামপ্রসাদও নহে। গুপ্ত কবি কবিওয়ালা রামপ্রসাদ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। কবিওয়ালা শক্তি-সাধক ছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।'—একথা সম্পূর্ণ সত্য।

কবিওয়ালা রামপ্রসাদ সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের অপর উক্তি যুক্তিসহ নহে, কেননা গুপ্ত কবি ঢাকা, সেরাজগঞ্জ ও পাবনা প্রদেশের নাবিকদের গীত একটি গানও লিপিবদ্ধ করেন নাই, যদি করিতেন তাহা হইলে প্রকৃত বিষয়ের সন্ধানের সুযোগ মিলিত, কাজেই কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের গীত, স্থানভেদে রূপান্তরিত এবং শব্দের পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধনও সম্ভবপর, তারপর প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের উচ্চারণ বৈষম্যের জন্যও বুঝা কঠিন হইয়া পড়ে, এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথিতে ও সঙ্গীতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে দীনেশবাবু আর একটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন, "দয়াল ঘোষ প্রথমেই পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ শক্তি-সাধক এই দ্বিতীয় রামপ্রসাদের পরিচয়ের সূত্র লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সময়াভাবে এবং গবেষণার অপরিপক্কতায় এবিষয়ে তথ্যলাভে সমর্থ হয়েন নাই তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ—

'কেহ বলিল, তাঁহার বাড়ী মহেশ্বরদি পরগণায়, (প্রসাদ-প্রসঙ্গ, ১ম সং ভূমিকা পৃ ৯)···এক্ষণে আর একটি গুরুতর গোলের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পূর্ব্ববাঙ্গালার অনেকেরই এরূপ অবগতি, সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে আমারও এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, রামপ্রসাদ 'দ্বিজ' ছিলেন।" (ঐ, পৃ, ১৩)

দয়ালবাবুর কথা-প্রসঙ্গে দীনেশবাবু মন্তব্য করিয়াছেন, যথা—মূল্যবান্ নির্দ্দেশ পাইয়াও দয়াল ঘোষ কিরূপ অর্ব্বাচীনের মত অকাতরে তাহা বিসর্জ্জন দিয়াছেন, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। মহেশ্বরদি ঢাকা জেলার একটি নাতিবৃহৎ পরগণা। রামপ্রসাদের বাসগ্রামের সন্ধান তিনি অনায়াসেই

পাইতে পারিতেন। উভয় রামপ্রসাদের গানের বিভাগও কেবল তিনিই পরিজ্ঞাত হইয়াও স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—

—"কবিরঞ্জনের" কাব্যসংগ্রহে" যে সকল সঙ্গীত মুদ্রিত হইয়াছে, তাহারও কোন কোনটি দ্বিজ রামপ্রসাদের বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। (ঐ, পৃ ১৫)—চিনীশপুর অতি দুর্গম স্থান ছিল এবং ভৈরব টঙ্গি রেল খোলার পরও সুগম ছিলনা" কাজেই দয়ালবাবুর যাওয়া ঐ সব কারণে সম্ভবপর হয়ত হয় নাই। তারপর ১২৬০ সালে গুপ্তকবি প্রথমে 'প্রসাদ গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করেন। ১২৮২ সালের (অর্থাৎ ২৫শে বৈশাখ গুপ্তকবির ২২ বৎসর পরে) দয়াল ঘোষ প্রসাদ জীবনী ও পদাবলী প্রকাশ করেন। প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে দয়ালবাবুর প্রসাদ-প্রসঙ্গ প্রকাশিত হয়, আর শতবর্ষ পূর্ব্বে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রসাদ পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল। এই দীর্ঘকাল মধ্যে স্বর্গতঃ দয়াল ঘোষ যাহা করিতে পারেন নাই পরবর্ত্তী লেখকদের মধ্যে সেদিকে কাহাকেও তেমনভাবে আগ্রহশীল হইতে দেখি নাই। একজন গবেষণাকারীর পক্ষে হয়ত সে সময়ে অনুসন্ধানের সুযোগ ঘটে নাই! পরবর্ত্তীকালে আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৩১৯ সালের চৈত্র সংখ্যায় দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

'৺দয়ালচন্দ্র ঘোষ তাঁহার 'প্রসাদ-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে বহু অনুসন্ধানে রামপ্রসাদের ২৬২টি পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সঙ্গীত গুলির মধ্যে ১৫টির ভণিতায় "দ্বিজ রামপ্রসাদ" পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। এখন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ও দ্বিজ রামপ্রসাদ সেন সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন হইতেছে যে 'দ্বিজ' ভণিতাযুক্ত পদ—ইঁহাদের মধ্যে কাহার রচনা? আমরা এ বিষয়ে স্বীয় মত বলিতেছি। ঢাকা জেলার অন্তর্গত মহেশ্বরদী পরগণার চিনীশপুর পল্লীতে একজন সাধক ছিলেন তাঁহার নামও ছিল রামপ্রসাদ।'

আমি ১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে রেলপথে জীনার্দ্দি হইয়া চিনীশপুর দ্বিজ রামপ্রসাদের সাধনার স্থান দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন সেখানে দেখিয়াছিলাম তিনটি বৃহৎ বটবৃক্ষের নিম্নভাগে একটি মৃত্তিকানির্ম্মিত বেদী। উহা রামপ্রসাদ ঠাকুরের সাধন স্থান ছিল বলিয়া স্থানীয় লোকেরা দেখাইয়াছিলেন। তাহার পাশে মন্দির ও একটি ছোট টিনের ঘর। অদূরে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী। স্থানটি নীরব ও নির্জ্জন। খুব বেশী লোকজন দেখিতে পাই নাই। সাধারণ ভূমি হইতে স্থানটি বেশ উচ্চ দেখিয়াছি। স্থানীয় একটি ভদ্রলোক আমাকে আশেপাশের নানাস্থান দেখাইলেন এবং দ্বিজ রামপ্রসাদ

সম্বন্ধে অনেক কিছু গল্প বলিলেন। সেখানে শনি ও মঙ্গলবারে বিশেষ জনতা হয় এবং নিয়মিতভাবে পাঁটা বলি হয়। স্থানীয় মুসলমানদের ও অনেককে মায়ের নামে পাঁটা ছাড়িতে দেখিয়াছিলাম। দ্বিজ রামপ্রসাদের জীবনী সম্বন্ধে কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তাঁহার সম্বন্ধে কিংবদন্তী ব্যতীত অন্য কিছুই স্থানীয় ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারি নাই। গল্প শুনিয়াছিলাম যে রামপ্রসাদ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। যৌবনে স্ত্রী পুত্র হারাইয়া তিনি সংসার ত্যাগ করেন। এবং কামাখ্যাধামে সিদ্ধিলাভ করেন। 'রামপ্রসাদের প্রার্থনানুসারে দেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহার গৃহে যাইতে স্বীকৃতা হন রামপ্রসাদ পথ প্রদর্শন করিয়া অগ্রে যাইবেন, পশ্চাতে দেবী নূপুর ধ্বনি করিয়া চলিবেন, কিন্তু রামপ্রসাদ ফিরিয়া তাকাইতে পারিবেন না। ব্রহ্মপুত্র তীরে আসিয়া বর্ত্তমান চিনীশপুর গ্রামে চরের বালুকা ঢুকিয়া নূপুরধ্বনি বন্ধ হইয়া যায় এবং বর্ত্তমানে যে স্থানে "ত্রিবট" রহিয়াছে, সেই স্থান হইতে রামপ্রসাদ ফিরিয়া তাকাইলেন এবং দেবীও দর্শন দিয়া অদৃশ্য হইলেন। ঠিক্ যে স্থানে দেবী দর্শন হয়, সেই স্থানেই পঞ্চমুণ্ডী স্থান ও পরে মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।" মন্দিরে কোন মূর্ত্তি দেখি নাই।

"রামপ্রসাদের পূর্ব্বজীবন এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপ অজ্ঞাত রহিয়াছে।" দীনেশবাবু একথা স্বীকার করিয়াছেন এবং পুনরায় বলিয়াছেন—দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। সেই সন্দেহ অপনোদনের জন্য দুইখানি দলিলও উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইতে আমরা দ্বিজ রামপ্রসাদের পিতার নাম, বংশ, শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে কোন পরিচয় পাই নাই, এবং কবে কোথা হইতে তিনি চীনিশপুরে আসিলেন তাহাও জানিতে পারি নাই।

দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তিনি যে বংশাবলী প্রদান করিয়াছেন তাহাও আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। "৺কৈলাস সিংহ পূর্ব্ববঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু জন্মস্থান ব্যতীত তিনিও তাঁহার বিবরণ কিছুই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কেবল, উভয়ের তুলনামূলক আলোচনায় (অবতরণিকা, পৃঃ ৪৬—৫১) স্বকীয় মজ্জাগত বৈদ্য বিদ্বেষের ফলে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের উপর স্থানে স্থানে অন্যায় ভাবে কটাক্ষ করিয়াছেন। অতঃপর "দ্বিজ রামপ্রসাদ" সম্বন্ধে যাঁহারা লেখনী ধারণ করিয়াছেন, প্রায় সকলেই গবেষণার পবিত্র ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতে ত্রুটি করেন নাই।"—একথাও দীনেশবাবুর যোগ্য হয় নাই। অতুলবাবু

দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। তাহা আমি মনোযোগ সহকারে পড়িয়া দেখিলাম, তাহাতে তিনি বিষোদ্গার করেন নাই—এবং বিজ্ঞান সম্মত গবেষণা হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছেন, তাহাও সত্য নহে। তাঁহার নিজ ধারণা এবং সিদ্ধান্তানুযায়ীই লিখিয়াছেন, দীনেশবাবুর তাহা গ্রহণীয় কি বর্জ্জণীয় তাহা তাঁহার বিবেচনাধীন।

আসাম প্রদেশের যোড়হাটের শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দের আশ্রম হইতে প্রকাশিত 'আর্য্যদর্পণ' পত্রিকায় দ্বিজ রামপ্রসাদের বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, চন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহার মধ্যে যে মারাত্মক ভ্রম রহিয়াছে, তাহাও দীনেশবাবু সংশোধন করিয়া দেখাইয়াছেন যে চন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয় 'স্বপ্ন' কিংবদন্তি এবং ছদ্মবেশী কোন মহাপুরুষের বাক্য হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন দ্বিজ রামপ্রসাদ অর্থাৎ রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী স্বনামপ্রসিদ্ধ রাণী ভবানীর পোষ্যপুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণেরই সহোদর ছিলেন, এই সিদ্ধান্ত যে অমূলক "তাহা চক্রবর্ত্তী মহাশয় রাজসাহীতে সামান্ত অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিতেন।'

পূর্ব্বে যে নূপুর সম্বন্ধীয় কিংবদন্তী এবং রামপ্রসাদের কঠোর সাধনার বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা চাঁদরায় কেদাররায়ের গুরু ব্রহ্মানন্দগিরি ও উড়িষ্যার সাক্ষীগোপাল সম্বন্ধেও প্রচলিত আছে। ইহা আমরা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করি না। বাঙ্গলাদেশে এইরূপ শত শত প্রবাদ ও কিংবদন্তী বিভিন্ন দেবদেবীর সম্বন্ধেই প্রচলিত আছে। আমরা অনেক রামপ্রসাদেরই পরিচয় পাইতেছি—তাহা নিম্নে উল্লেখ করিলাম।

রাজা রামকৃষ্ণের ভ্রাতা রামপ্রসাদ। ইনি সাধক ছিলেন না এবং কোন সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন এইরূপ কোন ইতিহাসও নাই। চীনীশপুরের দ্বিজ রামপ্রসাদ বা রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী। 'এই রামপ্রসাদের পূর্ণ জীবন এখন পর্যন্ত অজ্ঞাত রহিয়াছে, দীনেশবাবুর এ উক্তি সত্য,—কেননা তিনি রামপ্রসাদ সম্বন্ধে যে কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও চন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তীর প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত। চীনীশপুরের রামপ্রসাদ রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। চীনীশপুরে দেবী স্থাপিতা হইলে পর ব্রহ্মচারী রামপ্রসাদ পার্শ্ববর্ত্তী টেঙ্গুরীপাড়া নিবাসী জয়নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করেন। এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার জগদীশ্বরী নামে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

—*সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৫২ বর্ষ ১ম, ২য় সংখ্যা রামপ্রসাদ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিত। দ্রষ্টব্য—১০—১৫ দ্রষ্টব্য।

দ্বিজ রামপ্রসাদের বংশাবলী সম্বন্ধে দীনেশবাবু আলোচনা করিয়াছেন এবং তৎসম্পর্কিত দলিলাদি পরীক্ষা করিয়া রামপ্রসাদের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন: "চীনীশপুরের দেবোত্তর সম্পত্তির বিষয়ে বহুতর প্রাচীন দলীলপত্রাদি বিদ্যমান আছে। আমরা তাহার অনেকাংশ পরীক্ষা করিয়া দেখার সুযোগ পাইয়াছি। রামপ্রসাদ চিনীশপুরের সংলগ্ন টেঙ্গুরীপাড়া নিবাসী জয়নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে দেবীর আদেশে বিবাহ করেন। তাঁহার একমাত্র সন্তান কন্যা জগদীশ্বরীকে সংলগ্ন ব্রাহ্মণদি গ্রাম নিবাসী কেবলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। জগদীশ্বরীর দুই পুত্র—শম্ভুচন্দ্র ও মধুসূদন। মধুসূদনের তিন পুত্র,—কালিদাস, রাধানাথ (১২৬০ সনের শেষভাগে,—১৮৫৪ খ্রীঃ অঃ স্বর্গী হন) ও জগন্নাথ (১২৭২ সনের অগ্রহায়ণ মাসে স্বর্গী হন); মধুসূদনের কন্যা ভৈরবী দেবী অনতিদূরবর্ত্তী মাধবদি গ্রামের পাকড়াশীবংশীয় রামনরসিংহ চক্রবর্ত্তীর পত্নী ছিলেন। তাঁহার এক পুত্র (রাজচন্দ্র) এবং তিন কন্যা—বিশ্বেশ্বরী, রাধালক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণা। বিশ্বেশ্বরী, মহেশ্বরদি ব্রাহ্মণসমাজের শীর্ষস্থানীয় পারলীয়ার চক্রবর্ত্তী বংশীয় পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় শিরোমণির দ্বিতীয় পত্নী। বিশ্বেশ্বরীর একমাত্র পুত্র ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৩২৬ সনের ২৬শে কার্ত্তিক ৮৬ বৎসর বয়সে স্বর্গী হন। উদ্ধৃত নামমালা ঈশানচন্দ্রই মাতুল ও মাতামহের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। ঈশানচন্দ্রের দুই পুত্র—চন্দ্রকিশোর ও কাশীচন্দ্র। কাশীচন্দ্রের পুত্র শ্রীমান্ কুলভূষণ চক্রবর্ত্তী এম্-এ বিদ্যমান।"

"পক্ষান্তরে, রামপ্রসাদের শ্বশুর জয়নারায়ণের পুত্র শ্রীনারায়ণ। তৎপুত্র বলরাম, সুদাম ও শ্রীদাম। বলরামের পুত্র কালিদাস, গঙ্গাদাস (জাত্যন্তর) ও শম্ভুনাথ। শম্ভুনাথ, সংক্ষেপে শম্ভুঠাকুর, অতি বিখ্যাত সাধক ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শিবনাথের মৃত্যুর পর তিনি দানপত্র করিয়া (২৬ আষাঢ়, ১২৫৬ সনে) দেবোত্তর সম্পত্তির স্বকীয় অর্দ্ধাংশের এক অংশ ভাগিনেয়ী পুত্র রামকানাই চক্রবর্ত্তীকে এবং অপর অংশ স্বর্গত ভাগিনেয় বিশ্বনাথের তিন পুত্র ঈশান, ভৈরব ও রামচন্দ্রকে দিয়া যান। ইঁহারা সকলেই নিঃসন্তান পরলোকগত হইলে অন্য উত্তরাধিকারী সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। তাহার বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক।

রামপ্রসাদের কালনির্ণয় সম্বন্ধে দীনেশবাবু বলেন: "ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জন্ম ১৮৩৪ সন। বিশ্বেশ্বরী ও ভৈরবীকে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সন্তান ধরিয়া, প্রথম সন্তানোৎপত্তির বয়স ন্যূনপক্ষে স্ত্রীলোকদের ১৫ এবং পুরুষের ২৫ ধরিয়া জগদীশ্বরীর জন্মসন হয় ১৭৬২ খ্রীঃ। চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াও ইহার পরে আনা যায় না। পক্ষান্তরে, শম্ভু ঠাকুরের দানপত্রকালে (১৮৪৯ খ্রীঃ) তাঁহার ভাগিনেয়

পুত্র ঈশানের বয়স ন্যূনকল্পে ২০ ধরিয়া ঐরূপ চূড়ান্ত গণনায় শ্রীনারায়ণের জন্মসন হয় ১৬৪০ খ্রীঃ অঃ। তাঁহার ভগিনী অর্থাৎ রামপ্রসাদের পত্নী, সম্ভবতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন; কারণ শ্রীনারায়ণের সহিত তাঁহার ভাগিনেয়ী পুত্র (ভাগিনেয় নহে) শম্ভুচন্দ্রের সম্পত্তি-ঘটিত বিরোধ চলিয়াছিল। সকল দিক্ বিবেচনা করিলে ১৭৫০-৫৫ সন মধ্যে জগদীশ্বরীর জন্ম নির্ণয় করাই যুক্তি-যুক্ত এবং রামপ্রসাদের চীনীশপুরে আগমন ১৭৩৫-৫০ সন মধ্যে নির্ণয় করা যায়। সুতরাং তিনি কবিরঞ্জন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং উভয়েরেই অভ্যুদয়কাল প্রায় এক। রাজা রামকৃষ্ণের সহোদর রামপ্রসাদ যে ইঁহাদের অপেক্ষা অনেক বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই।"

অতঃপর দীনেশবাবু রামপ্রসাদের দেবোত্তর সম্পত্তি সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন:—"চিনীশপুর প্রভৃতি গ্রাম বস্তুতঃ মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্ভুক্ত নহে, পরন্তু ত্রিপুরা জেলার প্রসিদ্ধ পরগণা বরদাখাতের ॥০ আনা হিস্যার অন্তর্ভুক্ত "তপে পাঁচ ভাগ"-এর অধীন জোয়ার নন্দিপাড়ার অন্তর্গত। উক্ত জোয়ারের ৫টি গ্রামের মধ্যে নিজ নন্দিপাড়াই প্রকাশ্য চিনীশপুর বটে। সংলগ্ন টেঙ্গুরপাড়াও এই জোয়ার মধ্যে অবস্থিত। প্রবাদ অনুসারে, রামপ্রসাদ কৌলমার্গী চীনাচারের সাধক ছিলেন, তদনুসারে গ্রামের প্রকাশ্য নাম প্রচারিত হয়। কুমিল্লা কালেক্‌টারীর মহাফেজখানায় উক্ত পরগণার যে লাখেরাজ রেজেষ্টর রক্ষিত আছে (১৯৩৩ তৌজীর ৫নং বস্তা), তন্মধ্যে ১৮৩৯ সনের ফএছলায় পাওয়া যায়:

৩৯নং—দেবত্র ৺কালী ঠাকুরাণী: দখলকার শম্ভুনাথ, কালিদাষ, রাধানাথ ও লোকনাথ চক্রবর্ত্তী। মৌজে নন্দিপাড়া জমি বাজেআপ্তি—২৮৶১॥৴০ (প্রায় ৩ দ্রোণ)। * * ১২১২ সনের আষাঢ় মাসে রামপ্রসাদের দৌহিত্র শম্ভুচন্দ্র শ্রীনারায়ণের বিরুদ্ধে দাবী উত্থাপন করিলে ঐ সনের ৩০ মাসের হুকুমনামা দ্বারা শম্ভুচন্দ্র তান্ত্রিকসূত্রে অর্দ্ধাংশ এবং শ্রীনারায়ণের পুত্র বলরাম পূজকসত্ব অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হন।

রামপ্রসাদের সহচর হিসাবে দীনেশবাবু বলেন: 'চিনীশপুরের অনতিদূরবর্ত্তী জিনার্দী গ্রামের চক্রবর্ত্তী বংশে দুই জন সাধক রামপ্রসাদের সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তন্মধ্যে একজনের নাম রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। তিনিও রামপ্রসাদের অনুকরণে গান রচনা করিতেন এবং "দীন রামপ্রসাদ" ভণিতা যুক্ত তদীয় কোন কোন গান পদাবলীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তিনি রামপ্রসাদ অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন।"

দীনেশবাবু একথা স্বীকার করিয়াছেন যে "দ্বিজ রামপ্রসাদের জীবনের ঘটনাবলী বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে সংগ্রহ করার চেষ্টা কেহই করেন নাই। এবং বর্ত্তমানে তাহা প্রায় সমস্ত চিরকালের জন্ম বিলুপ্ত হইয়াছে।—"আর্য্যদর্পণের" প্রবন্ধ হইতে দীনেশবাবু কতিপয় ছিন্নতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কৈলাস সিংহ দ্বিজ রামপ্রসাদকে **"রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী"** বলিয়া লিখিয়াছেন। স্থানীয় লোকে তাঁহাকে "পেছু ঠাকুর" বলিয়া ডাকিত (আর্য্যদর্পণ, ১৩১৯, পৃঃ ১৮৭ ও ২৩২)। তদনুসারে "রামপ্রসাদ ঠাকুরই" তাঁহার প্রচলিত নাম ধরা যায়। তিনি নৈবেদ্য বাম হাতে লইয়া নিবেদনান্তে 'খা, খা' বলিয়া স্বয়ং উদরস্থ করিতেন। তাঁহার যোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে "বেড়া বাঁধা" ঘটনাই অতি প্রসিদ্ধ। রাজমোহন আম্বুলীর তিনটি গানেই (৩২, ৩১৫ ও ২৯২ সংখ্যক) বেড়া বাঁধার কথা আছে। আমরা একজন প্রাচীন গায়কের মুখে শুনিয়াছিলাম, জয়ন্তিয়া রাজবাড়ীতে বৃন্দাবনজীর মন্দির মধ্যে শক্তি সঙ্গীত গাহিয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন।"

আমাদের দেশের ছোটবড় প্রত্যেক সাধক সম্বন্ধেই এইরূপ অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে এবং তাহা বেশীর ভাগই একই ধরণের।

পদাবলী প্রসঙ্গে দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন—"বর্ত্তমানে রামপ্রসাদের যে সকল গান মুদ্রিত পাওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ দ্বিজ রামপ্রসাদের রচিত হইবে। * * দয়াল ঘোষ যখন গান সংগ্রহ করেন, তখন সবগুলিই দ্বিজ রামপ্রসাদের বলিয়া তাঁহার সংস্কার ছিল। তাহার প্রথম সংগৃহীত ৫০টি গানের অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারিত ছিল বলিয়া দ্বিজ রামপ্রসাদের হওয়াই সম্ভব। বর্ত্তমানে ভাষা ও সংগ্রহ স্থানের সাবধান আলোচনার দ্বারা পদাবলীর বিভাগ দুরূহ হইলেও কর্ত্তব্য। তৎপূর্ব্বে উভয়ের তুলনা অসাধ্য এবং অনুচিত। গুপ্ত কবির গবেষণার ফলে কবিরঞ্জনের কীর্ত্তি এখন সুপ্রতিষ্ঠিত, কবিরঞ্জন একাধারে সাধক, কবি এবং সঙ্গীতকার। সাধনা বিষয়ে উভয়ের তুলনা পাপ-জগতের অনধিকার চর্চ্চা। দ্বিজ রামপ্রসাদের গান ভিন্ন পৃথক কাব্য নাই। সুতরাং সঙ্গীত রচয়িতা রূপেই উভয়ের তুলনা করিতে হইবে। * * আমরা বলি কবিরঞ্জনের গান যেমন অপূর্ব্ব, তেমনই দ্বিজ রামপ্রসাদের গানও অপূর্ব্ব। উভয়ই সাধক, সমসাময়িক এবং স্ব স্ব ব্যবসায়ে প্রথম স্রষ্টিকর্ত্তা।"

'সাধক রাজমোহনের' জীবনী ও মালসী গান, সংকলন করিয়া ১৩২৪ সালে তৎপুত্র শ্রীকালীচরণ শর্ম্মা ঢাকা সিটি লাইব্রেরী হইতে বিক্রমপুরের স্বর্গতঃ রাজমোহন চক্রবর্ত্তী আম্বুলী-তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনী ও মালসী গান এবং

কতিপয় সিদ্ধ পুরুষেরও সাধক রাজমোহনের সমকালবর্ত্তী বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি মৎ-প্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাসে' সর্ব্বপ্রথম ১৩১৬ সালে রাজমোহন আখুলির বিষয় লিখিয়াছিলাম। সাধক রাজমোহনের জীবনীতে আছে—"ঢাকা জেলার অন্তর্গত মঠখোলা, চিনিসপুর, ধামরাই প্রভৃতি স্থানে রাজমোহন গান করিয়া দেবতা দর্শন এবং আত্মকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। (জীবনী—১।০ দ্রষ্টব্য)। এই প্রসঙ্গে দীনেশবাবু লিখিয়াছেন, তিনি স্বয়ং (রাজমোহন) তাঁহার তিনটি গানে (৮৪, ৯২ ও ১০৩ সংখ্যক) সাধন-পথে 'রামপ্রসাদের রা' পাওয়ার কথা লিখিয়াছেন। রাজমোহনের পক্ষে কুমারহট্টের সিদ্ধপীঠ হইতে 'রা' পাওয়ার কোনই সম্ভাবনাই ছিল না। ২৯২ সংখ্যক গানে যে সকল শক্তি সাধকের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে—ব্রহ্মানন্দ গিরি, গোঁসাই ভট্টাচার্য, রামচন্দ্র, সর্ব্ববিদ্যা, পূর্ণানন্দ, রাজা রামকৃষ্ণ ও রামপ্রসাদ তাঁহারা সকলেই পূর্ব্ববঙ্গে পরিচিত।" এখানে বলা হইতেছে "রাজমোহনের পক্ষে কুমারহট্টের সিদ্ধপীঠ হইতে 'রা পাওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই"—কেন সম্ভাবনা নাই? রাজমোহন ত বেশী দিনের লোক নন—বাঙ্গলা ১২৩১ সনের ৩০শে কার্ত্তিক শনিবার প্রাতঃকালে রাজমোহনের জন্ম হয়। ইংরাজী ১৮২৪ সাল হইবে, এরূপ স্থলে রাজমোহনের পক্ষে কুমারহট্টের সিদ্ধপীঠ হইতে 'রা' পাওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।' একথা যুক্তি ও প্রমাণসহ নহে—কেননা রাজমোহন সর্ব্বদা পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম-অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেন, এবং কলিকাতাতে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। তাঁহার জীবনীতেও ইহার উল্লেখ আছে"।

একদা তিনি মোকদ্দমা উপলক্ষে দীর্ঘ সময় কলিকাতায় ছিলেন, তদ্ভিন্ন তিনি অনেকবার কলিকাতায় গিয়াছেন। কবিরাজ কুলতিলক গঙ্গাপ্রসাদ সেন জীবিত থাকিতে তদীয় কুমারটুলীস্থিত আলয়ে অধিকাংশ সময় অবস্থান করিতেন। কবিরাজ মহাশয়ের বাসায় থাকিয়া তাঁহার কথা অনুসারে' 'ভবরোগ দূর করতে মন' এই গানটি রচনা করেন এবং আরও কতকগুলি গান রচনা করিয়া সুর-সংযোগে শ্রোতৃবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।'

'গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তির পর রাজমোহন কালীঘাট মুচীপাড়ায় কালীকুমার সেন কবিরাজ মহাশয়ের বাসায় দুই একবার অবস্থান করিয়াছিলেন। উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের ভদ্রাসন বাড়ী রাজমোহনের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী আউটসাহী গ্রামে ছিল। রাজমোহনকে সেন মহাশয় অতি আদরে রাখিতেন, তিনি তথায় দুই তিন মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই সময়ে

রাজমোহন জীবাত্মা ও পরমাত্মার কথোপকথন প্রসঙ্গে লিখেন এবং অনেক মালসী গান রচনা করেন। কালীকুমার সেন নিজেও ভক্তিমান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার বিশেষ আগ্রহেই রাজমোহন স্বীয় জীবনী কিয়ৎপরিমাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজমোহন কালীঘাটের শ্রীশ্রী৺কালীবাড়ীতে প্রায় প্রত্যহই যাইতেন এবং মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া মনের আনন্দে মহামায়ার নাম কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার মালসী গান শ্রবণের জন্য বহু লোক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইত।" এরূপ স্থলে রাজমোহনের পক্ষে কুমারহট্টের সিদ্ধপীঠ হইতে 'রা' পাওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না'—কথা কিরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে আমরা বুঝিতে অক্ষম। ১২৯৩ সনের ১৮ই আষাঢ় রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় রাজমোহন ময়মনসিংহ সহরে দেহত্যাগ করেন। তিনি ৬২ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন।

রাজমোহনের যে যে গানে রামপ্রসাদের নাম রাজমোহন উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহার দুই একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি :

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

আর কি কর্‌বেন কালী।
জীবরে বুঝিস্ না তুই কিসে কি হলি॥
*   *   *
হলি যে অসম্ভব হলি, আঙ্গুল ফুলি পর্ব্বত হলি।

আবার 'রামপ্রসাদের রা পেয়ে জীব দ্বিজ রাজমোহন নাম রটালি'

আর একটি সঙ্গীতে আছে :

প্রসাদী সুর—একতালা

কালী নামের গুণ বড় ভাই।
তারে বল্‌তে নারি কিছু জানাই॥
*   *   *
রামপ্রসাদের রা পেয়েছি রাজমোহন কয় ঐ জোড়ে ভাই।
আমি দেশ বিদেশে নাম রটালেম্ যমের সঙ্গে করে বড়াই॥

এই গানটিতে ছাপার ভুলে রামপ্রসাদের স্থানে—রাজপ্রসাদ হইয়াছে। এবং যাঁহারা তাঁহাকে সাধক কবি রামপ্রসাদের সহিত তুলনা করিতেন তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়া বলিয়াছেন :

'রামপ্রসাদের তুলনা দেয় তার রোমের যোগ্য না হইরে ভাই॥'

আবার আর একটি সঙ্গীতে আছে :

প্রসাদী সুর—তাল একতালা

আর কি চাও মন কালীর পাশে।
তোমায় কালী মায় কি না দিয়েছে॥
হলি কেশ ফুলি কদলীবৃক্ষ, নাম রটেছে দেশবিদেশে।
অ, তুই রামপ্রসাদের রা পেয়ে, রাজমোহন হলি শেষে॥

রাজমোহন যে সঙ্গীতে শক্তি-সাধকদের নাম করিয়াছেন—সেই সঙ্গীতটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম :—

কীর্ত্তনীয়া সুর—তাল কীর্ত্তনিয়া আড়া
কালীর লুট

সাধের কালী নামে লুট বিলায়।
নগরবাসী আয়রে আয় ত্বরায়॥
(ওরে) নিতাই চৈতাই অদ্বৈতাই তিন ভাই,
লুটের রাজা লুট খেয়ে খেলায়।
ঐ প্রসাদের খেয়ে ব্রহ্মাণ্ডগির পাষাণের বোঝা বহায়॥ ১
(ওরে) গোঁসাই ভট্টাজ যান পোড়াগাছায় ;
রামচন্দ্র তার নাতি সকল পায়।
তিনি উদয় হলেন নবদ্বীপে, প্রকাশ পায় বেলপুকুরায়॥ ২
(ওরে) সর্ব্ববিদ্যা আর পুণ্য দাদায়,
অমাবস্যায় পূর্ণিমা দেখায়।
ঐ লুটখেয়ে শঙ্করাচার্য্য কোলে বসে দুগ্ধ খায়।
আবার বটতলা কিড়া কারায়॥
(ওরে) পূর্ণানন্দ ব্রহ্মানন্দ ভাই,
রাজা রামকৃষ্ণ কিছু পায়।
পেয়ে রামপ্রসাদে বেড়া বান্ধায়,
রাজমোহন করে হায় হায়॥

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ছিলেন সুরস্রষ্টা সঙ্গীতজ্ঞ—লক্ষ্য করিবেন যে রাজমোহনের অধিকাংশ শ্যামা সঙ্গীতই প্রসাদী সুরে গীত হইত। এরূপ স্থলে সাধক কবি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের কথা রাজমোহন জানিতেন না—এবং কুমারহট্টের সিদ্ধ পীঠ হইতে রামপ্রসাদের 'রা' পাওয়াও কিরূপে অসম্ভব হইতে পারে? 'রা' শব্দের অর্থ দীনেশবাবু কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন জানিনা ; রাজমোহন নামের

প্রথম অক্ষর 'রা'ও হইতে পারে, সাধন পথের অর্থ হিসাবে গ্রহণ করিলে 'রা' অর্থে 'দান' বা গ্রহণ বুঝায়। 'রা' শব্দ দেশজ। রা-অর্থে সাড়া বুঝাইয়া থাকে। এরূপ স্থলে রাজমোহন কি অর্থে 'রা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বিচার-সাপেক্ষ। বিক্রমপুর অঞ্চলে 'রা' শব্দ উত্তর বা সাড়া দেওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা গ্রাম্য শব্দ। সাধন পথে "রাজমোহন যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন ততই তাঁহার সাধনাকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একটি সংস্কারের পর অপরটির জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বিল্বপুষ্করিণীর প্রসিদ্ধ সিদ্ধপুরুষ রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বংশই রাজমোহনের গুরুবংশ, রাজমোহন কুলগুরু পার্ব্বতীদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পার্ব্বতীদাস ভট্টাচার্য্যের প্রপিতামহ কল্যাণ ভট্টাচার্য্য একজন প্রধান তন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিল্বপুষ্করিণী হইতে পদ্মাতীরস্থ বটেশ্বর গ্রামে আসিয়া শিষ্যদিগের বিশেষ আগ্রহে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করেন। পার্ব্বতীদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও তন্ত্রে বিশেষ অধিকারী ছিলেন। শিষ্য রাজমোহন উপযুক্ত গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া স্বীয় সাধন কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

কাজেই রামপ্রসাদের গুরুর পরিচয় আমরা পাই নাই। রাজমোহন এখানে 'অ, তুই রামপ্রসাদের রা পেয়ে রাজমোহন হলি শেষে। এখানে সাধনপথের কোন কথা নাই—বিনয়ী রাজমোহন, ভক্ত রাজমোহন ভক্ত সাধক রামপ্রসাদের 'রা এই প্রথম অক্ষরের সহিত তাঁহার নামের ঐক্য রহিয়াছে বলিয়াই গৌরব বোধ করিয়াছেন। এবং রাজমোহন যে রামপ্রসাদের 'রা পেয়েছির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা দেশবিখ্যাত সাধক-চূড়ামণি কুমারহট্ট নিবাসী কবিরঞ্জন রামপ্রসাদকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন। একথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।

দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতাযুক্ত গীতগুলি কোন্ রামপ্রসাদের বিরচিত, এসম্বন্ধে একটা বিতর্ক অনেকদিন হইতেই উঠিয়াছে। এবিষয়ে এখন আমরা আলোচনা করিব। চিনীশপুর নিবাসী রামপ্রসাদ 'রামপ্রসাদ, ব্রহ্মচারী', 'রামপ্রসাদ ঠাকুর' 'পেদু' ঠাকুর নামে পরিচিত ছিলেন। তারপর রামপ্রসাদের সহচরের মধ্যেও রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী একজন ছিলেন এবং তিনি গান রচনা করিতেন, এরূপ স্থলে কোন সঠিক্ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। কোন্ রামপ্রসাদ দ্বিজ রামপ্রসাদ? বিক্রমপুরেও একজন দ্বিজ রামপ্রসাদ ছিলেন।

আমরা দেখিতে পাইতেছি এবং পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি যে রামপ্রসাদ, প্রসাদ, দ্বিজ রামপ্রসাদ, দীন রামপ্রসাদ, ভিষক্ প্রসাদ, রামপ্রসাদ দাস ভণিতাযুক্ত

প্রসাদী সুরে বিরচিত গীত প্রসাদেরই রচিত। কবিরঞ্জনের পরবর্ত্তী কোন মাতৃভক্ত সাধক শ্যামা-সঙ্গীত রচনা করিতে পারেন না, এরূপ কথা বলা চলে না। কিন্তু গানের শেষে দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতা আছে বলিয়াই যে তাহা বৈদ্য কবি রামপ্রসাদের রচিত নহে, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন মনে করি না।

সাহিত্যপরিষদ গৃহে দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠের পর প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়, তাহাতে স্বর্গতঃ পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি বলিয়াছেন, বৈদ্যেরা আপনাদিগকে (ব্রাহ্মণ) বলিয়া পরিগণিত করেন, এই হেতু **'দ্বিজ রামপ্রসাদ'** থাকিবার সম্ভাবনা অনুমান করা যায়।

এই প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলেন: "সাধক সাধনার প্রথমাবস্থায় ভৈরবীচক্রে বসিয়া এই 'দ্বিজ' ভণিতাযুক্ত পদাবলীগুলি রচনা করিয়াছিলেন। 'মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের' অষ্টমোল্লাসে আছে:

'সম্প্রাপ্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বেবর্ণা দ্বিজোত্তমা।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বেবর্ণা: পৃথক্ পৃথক্॥

অর্থাৎ যখন ভৈরবীচক্র অনুষ্ঠিত হয়, তখন সকল জাতীয় ব্যক্তিই **'দ্বিজ শ্রেষ্ঠ'** মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু যখন ভৈরবীচক্র নিবৃত্ত হয়, তখন সমুদয় বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রজ্ঞ রামপ্রসাদ বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারসম্পন্ন হইয়া গানের ভণিতায় নিজেকে "দ্বিজ রামপ্রসাদ" বলিয়া অভিহিত করিবেন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। রামপ্রসাদের সময় পশ্চিমবঙ্গে বৈদ্যজাতির সংস্কৃতের চর্চ্চা এবং শাস্ত্রানুযায়ী ধর্ম্মানুষ্ঠান সমাজে কিরূপ প্রতিপত্তি ছিল তাহা আলোচনা করিলে এ বিষয়ে কতকটা মীমাংসা হইতে পারে। আমি পশ্চিমবঙ্গবাসী পরম পণ্ডিত শ্রীরামপুর কলেজের ভূতপূর্ব্বক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিপদ শাস্ত্রী এম, এ মহাশয়কে এবিষয়ে সঠিক বিবরণ জানিবার জন্য পত্র দিয়াছিলাম, তিনি লিখিয়াছেন:—পরম সিদ্ধি-প্রাপ্ত পরমহংস রামপ্রসাদ ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। রামপ্রসাদী বলিয়া বিদিত অনেক সঙ্গীতে 'দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণে'—এইরূপ উক্তি দেখা যায়। এই সঙ্গীতগুলি রামপ্রসাদেব পূর্ব্বের লেখা। সিদ্ধিলাভ করিবার পর পূর্ব্বাশ্রমের পরিচয় কেহ দেন না।

বঙ্গে ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্যের সন্তান বৈদ্য। ভিন্ন ভিন্ন নামের এই দুইটি জাতির অস্তিত্ব দেখিয়া অল্পজ্ঞ ব্যক্তিরা বৈদ্যকে অব্রাহ্মণ মনে করিতে পারে, কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যেমন ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই

চারি পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষ ও ধর্ম পৃথক উল্লিখিত হয় বলিয়া মোক্ষের সাধনা অধর্ম নহে, কিন্তু সাধারণ ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই তাহার পৃথক উল্লেখ হইয়াছে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের পৃথক অস্তিত্ব দেখিয়া বৈদ্য ব্রাহ্মণ বর্ণীয় নহে, ইহা মনে করা উচিত নহে। বৈদ্য ব্রাহ্মণবর্ণীয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রাচীন কালে বিদিত ছিল। এখনও বঙ্গের বাহিরে সাধারণ ব্রাহ্মণেরা আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে বৈদ্য নামে পরিচিত ও গৌরবযুক্ত হন, আবার বৈদ্যের সন্তানেরা আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন না করিলে এবং সেই জন্য চিকিৎসায় প্রবৃত্ত না হইলে বৈদ্যনামে পরিচিত না হওয়ায় শুধু সাধারণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞাত হন। সেখানে বৈদ্য পিতার সন্তান হইলেই বৈদ্য নাম হয় না। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য উভয়েই ব্রাহ্মণ বর্ণীয়। প্রাচীন যুগে উপাধ্যায় ও আচার্য্য শব্দ অপেক্ষা বৈদ্য শব্দ অধিকতর গৌরবসূচক ছিল।

(২) চতুষ্পাঠীতে ঋক্, যজুস্ ও সাম এই তিন বেদের অধ্যয়ন করিয়া প্রাচীন যুগের ব্রাহ্মণেরা শ্রোত্রিয় উপাধি পাইতেন। শ্রোত্রিয়েরা যখন বৈদ্য আচার্য্যের নিকটে গিয়া পুনর্ব্বার উপনীত হইয়া অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিতেন এবং আয়ুর্ব্বেদের জ্ঞানের প্রভাবে ভূতশান্তি ও রোগশান্তি করিতেন তখন তাঁহাদের বৈদ্য বলা হইত। তাহার কারণ তখন তাঁহারা চারি বেদই সম্পূর্ণ করিয়া সমস্ত বিদ্যার ও বেদের আধার হন। বৈদ্য শব্দ নিখিল শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসারত ব্রাহ্মণকে বুঝায়। ভিষক্ বৈদ্যো চিকিৎসকো, শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসক সুচিকিৎসার জন্য সকলের সম্মানার্হ হইতেন, চারিবেদের জ্ঞান হেতু ব্রাহ্মণসমাজে শ্রেষ্ঠ আসন পাইতেন। ব্রাহ্মণানাং জ্ঞানতে জ্যেষ্ঠম্ এমং মহাসম্মানজনক পুরোহিত উপাধি লাভ করিতেন।

অথর্ব্ববেদে অজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা ভিষক বা বৈদ্য হইতেন না, পুরোহিত ও হইতেন না। শাস্ত্রে আছে ঃ

আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চ শাশ্বতী।
এতা বিদ্যাশ্চতস্রস্তু লোকসংস্থিতি হেতবঃ॥

সাধারণ চতুষ্পাঠীতে এই চারি বিদ্যা অধ্যাপিত হইত। ইহাদের মধ্যে তিন বেদের উল্লেখ আছে, অথর্ব্ববেদের উল্লেখ নাই। কিন্তু পুরোহিত বা বৈদ্যকে অথর্ব্ববেদ পড়িতেই হইত, কারণ অথর্ব্ববেদের জ্ঞান ব্যতীত চিকিৎসাও হইত না, পুরোহিতের শান্তিকর্মও হইত না। শাস্ত্রে আছে—

ত্রয্যাং চ দণ্ডনীত্যাং চ কুশলঃ স্যাৎ পুরোহিতঃ
অথর্ব্ববিহিতং কুর্য্যাৎ নিত্যং শান্তিকপৌষ্টিকম্॥

সে কালে তিন বেদ অধ্যয়ন করিতে জীবন ফুরাইয়া আসিত। পুনশ্চ অথর্ব্ববেদ পড়িবার মতো সামর্থ, প্রতিভা ও ধৈর্য্যশালী ছাত্র অল্পই মিলিত।

(৩) রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে বশিষ্ঠদেবকে একটি শ্লোকে 'বৈদ্য' 'গুরু' ও 'পুরোহিত' বলা হইয়াছে (অযোধ্যা ১০০ সর্গ)। বশিষ্ঠদেব 'অথর্ব্বনিধি বলিয়া খ্যাত ছিলেন (রঘু ১।৫৯)। রামায়ণের ঐ স্থানেই তিনটি শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে বৈদ্যদিগের সম্বন্ধে তিনবার কুশল প্রশ্ন করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করিতে হইবে যে 'পুরোহিত শব্দের অর্থ পুরঃ বা সর্ব্বাগ্রে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আসনে স্থাপিত। বৈদ্য যে শ্রেষ্ঠ আসনে স্থাপনের যোগ্য, তাহা পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে ৮৭ অধ্যায় এবং ভবিষ্যপুরাণে ২।১২৯—১৩০ শ্লোকে বর্ণিত আছে—দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসঃ'। ব্রাহ্মণেরা বৈদ্যদিগকে গুরুবৎ প্রণাম করিবেন, একথা শাস্ত্রে রহিয়াছে। বৈদ্য ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিবেন এ কথা তো নাই বরং বৈদ্যের নমস্কার আকাঙ্ক্ষা করিলে ব্রাহ্মণকে দীর্ঘকাল রোগী হইয়া থাকিতে হইবে, বলা হইয়াছে। স্মৃতিতে আছে প্রণামী না লইয়া রিক্তহস্তে কেহ বৈদ্যের নিকটে যাইবে না। বৈদ্যের অসম্মান্ করিবে না, তাহার সঙ্গে কলহ করিবে না। আয়ুর্ব্বেদে বৈদ্যকে ত্রিজ বা ত্রিজাতি বলিয়া দ্বিজ জাতির উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। (চরক, সূত্রস্থান)। ঋগ্বেদ ও যজুর্ব্বেদে বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণই অথর্ব্ববেদ মন্ত্রের জ্ঞানের প্রভাবে চিকিৎসা-প্রবৃত্ত হইলে ভিষক বা বৈদ্য নামে পরিচিত হন (ঋক্ ৮ম অষ্টক, ৯৭ সূক্ত ৬ ও ২৩)। এখানে সায়ণ ও মহীধর ওষধি সামর্থজ্ঞ ব্রাহ্মণই বৈদ্য, একথা বলিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ আরও বলে যে ব্রাহ্মণই চিকিৎসা করিবে, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য চিকিৎসা করিবে না। আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা দয়ার কার্য্য এবং ইহা ব্রাহ্মণেরই কার্য্য। এই দয়ার কার্য্যে নিম্ন বর্ণীয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যোগ্যতাই নাই। বশিষ্ঠদেবের ন্যায় দ্রুপদ রাজার পুরোহিতকে উদ্যোগপর্ব্বে ৬ অধ্যায়ে বৈদ্যশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ, বৈদ্য বিদ্যা শিখিয়া বৈদ্য হইয়াছিলেন ইহা চরকে আছে। পরীক্ষিৎকে বাঁচাইবার জন্য যে ঋষি রাজসভায় যাইতেছিলেন তিনি কাশ্যপ, তিনি অথর্ব্ববেদজ্ঞ বৈদ্য ছিলেন। অথর্ব্ব মন্ত্রের প্রভাবে তিনি প্রজ্জ্বলিত বৃক্ষকে বাঁচাইয়াছিলেন (মহাভারত)। এইরূপে গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিরা এবং প্রবরেরা বৈদ্য ছিলেন বুঝা যায়।

(৪) বৈদ্য শব্দের এত গৌরব। বাংলার বৈদ্য সেই কথা ভুলিতে পারে নাই। বঙ্গে যখন ব্রাহ্মণের সন্তানেরা ব্রাহ্মণ হইতেছিল, সেই সময় হইতে বৈদ্যের সন্তানেরাও বৈদ্য বলিয়া বিদিত। ব্রাহ্মণ গুরু-পুরোহিতের কথায় তাঁহারা

মুসলমানরাজত্বে ১৫ দিন বা ৩০ দিন অশৌচ পালন ও নামান্তে শর্ম্মা ব্যবহার না করিলেও তাঁহারা সংস্কৃত বিদ্যার আধার হওয়ায় 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি পাইয়া আসিতেছেন। হালিসহরে ও কাঁচরাপাড়ায় একশত বৎসর পূর্ব্বে বৈদ্যেরা ও ব্রাহ্মণেরা পরস্পরকে নিজেদের হুঁকা দিতেন অর্থাৎ এক হুকায় তামাক খাইতেন। ঐস্থানে বৈদ্যগণকে কেহ অদ্বিজ মনে করিত না। ইঁহারা সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণদের মতো বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিতেন। রামপ্রসাদ ব্রহ্মত্রা ভূমি পাইয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে দ্বিজ জানিয়াই ভূমিদান করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণকে ভূমি দানের কথা আছে।

সকল দিক হইতে দেখা যাইতেছে যে, বৈদ্য বলিলেই দ্বিজ পরিচয় আসিয়া পড়ে। সুতরাং রামপ্রসাদের দ্বিজ পরিচয় বৈদ্য রামপ্রসাদকে দেখাইয়া দেয়। বৈদ্য রামপ্রসাদ দ্বিজ রামপ্রসাদের ভিতরে লুকাইয়া আছেন, দ্বিজ রামপ্রসাদও বৈদ্য রামপ্রসাদের মধ্যে লুকাইয়া আছেন। মহাসিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষ সংসারে নিতান্ত দুর্লভ। সেরূপ ব্যক্তি কোটি কোটি লোকের মধ্যে একটিও মিলে না। সেরূপ লোক কদাচিৎ পৃথিবীতে দেখা যায়। এরূপ অবস্থায়, একই দেশে, একই বাঙ্গালীজাতির মধ্যে একই সময়ে, একই ভাষায়, একই ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে ও একই লিখন-ভঙ্গীতে (style) ভক্তি ও সাধনার একরূপ সঙ্গীত রচনাকর্ত্তা দুই জন সিদ্ধপুরুষ পাশাপাশি বিদ্যমান ছিলেন, একথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। বৈদ্যের দ্বিজত্ব যাহাদের নিতান্ত অসহনীয়, যাহারা মনে করেন, যে বৈদ্য দ্বিজ নয়, তাহাদের পূর্ব্বগঠিত এই সিদ্ধান্তই তাঁহাদিগকে অন্ধ করিয়াছে, সত্য তত্ত্ব দেখিতে দেয় নাই।

সুধীগণ বিবেচনা করুন, বৈদ্য রামপ্রসাদ বর্ণের পরিচয় দিতে হইলে নিজেকে কি শূদ্র, বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় বলিবেন? বৈদ্য-জাতি যাহা নহে, তাহা বলিয়া পরিচয় দিবেন, না দ্বিজ বলিয়া? বাংলা ভাষায় দ্বিজ শব্দ ক্ষত্রিয় দ্বিজকে বা বৈশ্য দ্বিজকে বুঝায় না। উহা ব্রাহ্মণকেই বুঝায়। তিনি কেন নিজেকে দ্বিজ বলিয়াছেন, তাহা উপরে বলা হইয়াছে। বৈদ্য ব্রাহ্মণবর্ণীয় ইহা বলিতেছে। রঘুনন্দন তাহাকে বৈদ্য বলিলে বা তাহার ১৫ দিন বা ৩০ দিন অশৌচের ব্যবস্থা করিলেই সে অন্তবর্ণীয় হইয়া যাইবে না।

অতএব 'দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণে' ইত্যাদি কথা রামপ্রসাদের নিজ মুখে বৈদ্য বংশের ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় দিতেছে। সাধনার উন্নতি করিয়াছেন বলিয়া তিনি নিজেকে 'দ্বিজ' বলিয়াছেন, ইহা ব্যক্তিগত বিশেষণ, ইহা নিতান্ত উপহাস্য, কারণ

কোনও সাধক সাধনার গর্ব্ব করেন না, সাধনা গোপনে রাখেন এবং তাহার ফলাফল প্রকাশ করিলে সাধনা নষ্ট হয়, ইহা সকলে জানেন।

রামপ্রসাদ সেন ধন্বন্তরি গোত্রীয় বৈদ্য ছিলেন। শ্রীতসূত্রে গোত্র প্রবরাধ্যায়ে গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষিদের মধ্যে ধন্বন্তরির নাম উল্লিখিত আছে।

তাঁহার বংশের অধস্তন পুরুষেরা বহু বিদ্যমান আছেন এবং সকলেই দ্বিজ আচার পালন করিতেছেন। তন্মধ্যে ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট মানসরঞ্জন সেন, হৃদয়রঞ্জন সেন, এম্-বি, যতীন্দ্রনাথ সেন, এম্-বি ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন কালে কবিরাজ বোপদেব গোস্বামী সেন, আপনাকে বৈদ্যের ছাত্র, বৈদ্যের পুত্র, বিপ্র ও দ্বিজ বলিয়া শতশ্লোকীতে, মুগ্ধবোধে ও কবিকল্পদ্রুমে লিখিয়াছেন। রামপ্রসাদও ঐভাবে নিজেকে দ্বিজ বলিয়াছেন। এদিকে সমাজের বহুস্থলে বৈদ্যগণ অদ্যাপি অধিষ্ঠান কালে পান-সুপারী ও যজ্ঞোপবীত পাইয়া থাকেন। ইহা যে বৈদ্যের দ্বিজত্বের প্রমাণ তাহা তো সকলেই দেখিতেছেন। বৈদ্যেরা যে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি ও 'বৈদ্যরত্ন' উপাধি পাইয়া আসিতেছেন, তাহাও ভগ্ন ও বিলুপ্ত প্রায়। বৈদ্যসমাজ সৌধের জীর্ণ তোরণের ন্যায় দ্বিজত্বের সাক্ষ্য দিতেছে।'

এ সম্বন্ধে আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ করিতেছি।

শোভাবাজারের স্বনামধন্য রাজা নবকৃষ্ণ ১২০৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে) স্বর্গারোহণ করেন। তাহার মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই আপন ভ্রাতুষ্পুত্র ও দত্তক পুত্র গোপীমোহন এবং ঔরসজাত পুত্র রাজকৃষ্ণ ও তাঁহার বিষয়াধিকারী হইয়াছিলেন।

রাজা রাজকৃষ্ণের বাড়ীর চিকিৎসক ছিলেন পণ্ডিতবর রামপ্রসাদ চিন্তামণি। একদিবস ঊর্দ্ধ ফোটা কাটিয়া রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। রাজকৃষ্ণ কবিরাজের ললাটদেশে ঊর্দ্ধ ফোটা দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইলেন এবং কহিলেন, "বৈদ্য জাতি ব্রাহ্মণের দ্বিজত্ব লইয়া সন্তুষ্ট হয়েন নাই। পরিশেষে ব্রাহ্মণের অতিপ্রিয় সম্পত্তি ঊর্দ্ধ ফোটা তাহাও কবিরাজ মহাশয় হরণ করিতে উদ্যত। ইহা বাস্তবিক বড় দুঃখের বিষয়।"

কবিরাজ রাজার বাক্যে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, মহারাজ আমি যদি অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিয়া থাকি প্রমাণ হয়, তবে অবিলম্বে পাঁচশত টাকা জরিমানা দিব।"

রাজকৃষ্ণ কর্কশস্বরে কহিলেন, "আপনি পাঁচশত টাকা কোথায় পাইবেন ?"

কবিরাজ। বিধাতার আশীর্ব্বাদে ও আপনাদিগের কল্যাণে আমি নিতান্ত নিঃস্ব নহি।

রাজকৃষ্ণ। ভাল কথা, একটি দিন অবধারিত হউক। তাহাতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অধ্যাপকবর্গকে আহ্বান করা যাউক। যদি আমি পরাজিত হই, তবে আপনাকে পাঁচশত টাকা ও এক জোড়া শাল পুরস্কার দিব।

কবিরাজ "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিদায় লইলেন।

পূতসলিলা গঙ্গার পশ্চিমতীরবর্ত্তী ত্রিবেণী নামক সুপ্রসিদ্ধ স্থানে মুসলমান নবাবের রাজত্বকালে অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন জনৈক শ্রুতিধর অধ্যাপক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্দেশে তাঁহার নাম জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। তৎসমকালীন পণ্ডিতগণের মধ্যে তিনিই নানা গুণালঙ্কৃত অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার জন্ম, প্রভূত ধনোপার্জ্জন ও মৃত্যু বিষয়ে অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলী শ্রুত হওয়া যায়।

সেই স্থবির অধ্যাপক ও অন্যান্য স্থানীয় পণ্ডিতমণ্ডলী রাজকৃষ্ণের সভায় আহূত হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে সমুপস্থিত হইলেন। রাজকৃষ্ণ বিনয় বচনে সমগ্র অধ্যাপকমণ্ডলীর স্বপক্ষে উর্দ্ধ ফোটা বৈদ্যের পক্ষে শাস্ত্রীয় কিনা, বিচার দ্বারা নিরপেক্ষ ভাবে সিদ্ধান্ত করিতে অনুরোধ করিলেন।

তখন শাস্ত্রজ্ঞবর্গের অগ্রণী সেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত জগন্নাথ, এতচ্ছ্রবণে ধীর ভাবে রাজাকে কহিলেন যে, যদি নিরপেক্ষ ভাবে প্রশ্নের মীমাংসা না হয়, তবে মহারাজের পক্ষেই পক্ষপাতী হওয়া সম্ভব ভিন্ন, নিঃস্ব বৈদ্যের দিকে পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিতে কোন কারণ নাই। ইহাতে রাজা রাজকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ লজ্জিত ও ম্রিয়মাণ হইলেন। জগন্নাথ সমগ্র পণ্ডিতমণ্ডলীর সভাপতি স্বরূপ প্রকাশ করিলেন যে, বৈদ্যজাতির দ্বিজত্ব ও ত্রিজত্ব বিষয়ে বিশেষতঃ উর্দ্ধফোটা ধারণ সম্বন্ধে ভূরি ভূরি শাস্ত্রীয় প্রমাণ লক্ষিত হয়। তত্তাবতের বিবৃতি করিতে গেলে অনেক সময় আবশ্যক। দুই একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেই প্রচুর হইবে। ব্যাসদেব মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে পঞ্চম অধ্যায়ে দ্রুপদের উক্তিচ্ছলে বলিয়াছেন যে :—

'ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃশ্রেষ্ঠা নরেষ্বপি দ্বিজাতয়ঃ॥
দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসো বৈদ্যেষু কৃতবুদ্ধয়ঃ॥
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥'

সকল ভূতের মধ্যে প্রাণী শ্রেষ্ঠ, প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিজীবি, বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে নর, নরের মধ্যে দ্বিজ এবং দ্বিজের মধ্যে বৈদ্যেরাই শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।

তদ্ভিন্ন চরকসংহিতায় চিকিৎসিত স্থানে প্রথম অধ্যায়ে মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন :

"বিদ্যা সমাপ্তৌ ভিষজস্তৃতীয়া জাতিরুচ্যতে।
অশ্নুতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মতঃ॥ ১
বিদ্যা সমাপ্তৌ ব্রাহ্মং হি সত্ত্বমার্ষমথাপি বা।
ধ্রুবমাবিশতি জ্ঞানাৎ তস্মাদ্বৈদ্যস্ত্রিজঃ স্মৃতঃ॥ ২
শীলবান্ মতিমান্ যুক্তস্ত্রিজাতিঃ শাস্ত্রপারগঃ।
প্রাণিভির্গুরুবৎপূজ্যঃ প্রাণাচার্য্যঃ স হি স্মৃতঃ॥

ভাবার্থ এই যে, বৈদ্য বলিয়া কোন স্বতন্ত্র জাতি ছিল না। যে ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আয়ুর্ব্বেদাদি সমস্ত বিদ্যা সমাপ্ত করিতেন, তাঁহাদিগকেই 'ভিষজ' অর্থাৎ 'বৈদ্য' এই উপাধি দ্বারা অভিহিত এবং ত্রিজ সংজ্ঞা প্রদান করা হইত। যে ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ জাত সংস্কার, দ্বিতীয়তঃ উপনয়ন সংস্কার এবং তৃতীয়তঃ আয়ুর্ব্বেদ মন্ত্রে সংস্কৃত হইতেন, তাঁহারাই ত্রিজ শব্দ বাচ্য হইতেন।

তদ্ভিন্ন আপনারা কবিকঙ্কণ কৃত ভাষা চণ্ডী মান্য করিয়া থাকেন কি না?

পণ্ডিতমণ্ডলী একস্বরে কহিলেন, "মুকুন্দরাম রচিত চণ্ডী প্রামাণ্য।'

তখন জগন্নাথ কহিলেন যে, গুজরাট পুরীর বর্ণনায় চণ্ডীতে লিখিত আছে—

"উঠিয়া প্রভাত কালে, ঊর্দ্ধফোটা করি ভালে,
বসন মণ্ডিত করি শিরে।
পরিয়া উত্তম ধুতি, কক্ষ দেশে করি পুথি,
গুজরাটে বৈদ্যগণ ফিরে।

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা রাজকৃষ্ণ স্তম্ভিত হইলেন।

জগন্নাথ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বৈদ্যের ত্রিজত্ব ও ঊর্দ্ধফোটা ধারণ যে শাস্ত্র সম্মত, তাহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

রাজা পণ্ডিতগণকে পাথেয় আদি প্রদান করিয়া পরম সমাদরে বিদায় করিলেন। *

পণ্ডিতবরেণ্য জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের

---

* চাঁদরাণী—২৭৮,—২৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। শ্রীবিপিনমোহন সেন প্রণীত। ১৩১৮ সাল।

ত্রিবেণীর জগন্নাথ পঞ্চানন (১১০১—১২১৪ সন) বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ২২৫—২৩৩, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জীবনী সম্বন্ধে অনেকে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে W. ward : Account of writings, Religion and manners of the Hindoos 4, Vols. কালীময়ঘটক প্রণীত প্রথম চরিতাষ্টক প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ ও পত্রিকায় তাঁহার জীবনী আলোচিত হইয়াছে। সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ১৩৪৯ দ্রষ্টব্য।

অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং রামপ্রসাদের মৃত্যুর পরেও বহু বৎসর জীবিত ছিলেন।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে রামপ্রসাদের পদাবলীর ভণিতায় 'দ্বিজ' শব্দের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত।

'গানে রামপ্রসাদ' প্রণেতা শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায় বলেন: "রামপ্রসাদ তাঁহার গানগুলির ভণিতায় নিজেকে ভিষক্, দীন, দাস, দ্বিজ ইত্যাদি বলিয়াছেন। তাঁহার পিতা কবিরাজ ছিলেন এবং তিনি নিজেও মূর্খ ছিলেন না। সুতরাং পিতার সঙ্গগুণে হয়ত কবিরাজীও শিখিতে পারিয়াছিলেন এবং সেজন্যই নিজেকে ভিষক বলিয়াছেন। দাস বলিয়া তিনি নিজের দীনতা হীনতা প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র, যেমন, 'আমি তুয়া দাস দাসী-পুত্র হই' (বিদ্যাসুন্দর), অন্যত্র "না হয় দাস বলে দাও অভয়পদ, রামপ্রসাদের হৃদ-কমলে"। আবার একথাও বলিয়াছেন "আমি দীনহীন অসম্ভব।" অতঃপর দ্বিজ শব্দ। দুঃখের বিষয় অনেকে দ্বিজ শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ বিপ্র ধরিয়া দ্বিজ শব্দ ব্যবহৃত গানগুলি অপরের উপর আরোপ করিয়া নানান্ কৈফিয়ৎ উপস্থিত করিয়াছেন। এমন কি একজন লেখক প্রসাদের তিরোধানের পর তাঁহার অন্তরাত্মাকে মহেশ্বরদি চিনীশপুরে পাঠাইয়া অপরের স্কন্ধে চড়াইয়াছেন। কিন্তু তন্ত্ররাজ তন্ত্রে দেখিতেছি "দ্বিজাতীনাং তু সংস্কারং বেদোক্তং সমুদাহৃতম্" (১ম পটল ৮৬ শ্লোক) মনোরমা টীকায়—দ্বিজাতীনাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যানাম্। সংস্কারং জাতকর্ম্মাদিকম্। এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন, "বেদপন্থী সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিই দ্বিজ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনের যে কোন বর্ণেরই হউক অথবা যে কোন মিশ্র বর্ণেরই হউক সেই দ্বিজ"। দ্বিজাতি সমাজের প্রত্যেক বালককে বিদ্যাদাতা আচার্য্যের সমীপে যাইতে হইত। আচার্য্যের নিকট যাওয়ার নাম উপনয়ন, এই উপনয়ন ব্যাপার দ্বিতীয় জন্ম। যে একবার বেদবিদ্যালাভে সংস্কৃত হইয়া, বিশুদ্ধ হইয়া, পূত হইয়া দ্বিতীয় জন্ম পাইয়াছে সেই ব্যক্তিই দ্বিজ।" এদিকেও দেখা যাইতেছে রামপ্রসাদ দ্বিজোচিত সন্ধ্যা উপাসনা রত এবং ভোজন দক্ষিণা পাইতেছেন। গানে আছে—"যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী।" এখানে সন্ধ্যা শব্দ হইতে ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে ইতিপূর্ব্বেই শাস্ত্রানুসারে তাঁহার উপনয়নাদি সংস্কার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল অর্থাৎ দ্বিজত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। পরে বলিলেন—"আর বাণিজ্যে কি বাসনা, ওরে আমার মন বল না (মোনরে ওরে) জনম মরণাশৌচ সন্ধ্যা পূজা বিড়ম্বনা।" অন্যত্র "সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি"। সন্ন্যাস-

গ্রহণের সময় শিখাসূত্র ত্যাগ করিতে হয়। সেই সূত্রেই তিনি বলিয়াছেন সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি। সুতরাং ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে দ্বিজত্ব লাভ করিবার পর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত নিত্য "অতি প্রাতঃকালে জয় দুর্গা বলে শরণ নিবার কাজ কি তবে"। ইহার পর সংহিতার নির্দ্দেশ অনুসারে তিনি নিত্য সন্ধ্যা উপাসনাদি করিতেন। ইহারই কোন সময়ে ভোজনে আহুত হইয়া ভোজন দক্ষিণা পাইয়াছেন "অর্থলাভ তার পরক্ষণে, দক্ষিণাটি হলে হাতে। রামপ্রসাদ বলে ফলার পেলে ভয় থাকে না সংসারেতে।" তদ্ভিন্ন শৌচাশৌচ বিচারও তিনি স্মৃতিশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী পালন করিয়াছেন, দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়।'

'বর্ত্তমান কালেও আমরা যাঁহাদের বৈদ্য বলি তাঁহারাও স্মৃতি (সংহিতি) শাস্ত্রের বিধান অনুসারে ব্রাহ্মণবর্ণের অনুরূপেই উপনয়নাদি সংস্কারে ও নিত্য সন্ধ্যা পূজা বন্দনাদি করিতে বাধ্য। অতএব রামপ্রসাদ দ্বিজ ইহা নিশ্চিত, ইহাতে কোনরূপ সন্দেহের অবসর নাই। অদ্যাবধি সমালোচকগণ এদিকটা দেখেন নাই, মন্তব্য করিয়াছেন বিষয়বস্তু না লক্ষ্য করিয়া। ফলে সার্দ্ধশত বৎসর পরে দ্বিজ ভণিতাযুক্ত গানগুলির রচয়িতার অনুসন্ধান আবশ্যক হইয়াছে চিনিশপুরের কষ্ট কল্পনা। প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলা যাইতেছে যে প্রসাদের অলৌকিক ঘটনাগুলি ঐদেশের জনৈক সাধকের নামে প্রচার করিবার অপচেষ্টা একই নিয়মে হইয়াছে ও হইতেছে। যেমন চট্টগ্রামে তন্ত্রসারের অনুলিখিত মগধেশ্বরীর অনুপ্রবেশ। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, যে গানগুলির পারম্পারিক ঘটনাবলী, ভাব ভাষা ও ভঙ্গী প্রভৃতি বিচার করিয়া অপরের রচনা বলিয়া প্রমাণ করা যাইবে সেইগুলি সেইভাবে গ্রহণীয়। প্রসাদের রচনারূপে ধৃত কতকগুলি গান স্পষ্টতঃ অপরের বলিয়া বোঝা যায়।'

শ্রীযুত অমিয়বাবু 'অবতরণিকায়' লিখিয়াছেন; 'জনসাধারণের অজানা দুইখানি দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের কোন কোন অংশ গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন, কবিরঞ্জনের সমকালে "ব্রাহ্মণ রামপ্রসাদ পূর্ব্ববঙ্গে মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্গত চিনীশপুর গ্রামে সাধনা করিতেন। দ্বিজ ভণিতাযুক্ত গান গুলি তাঁহারই রচনা" অর্থাৎ তিনি দ্বিজ অর্থে কেবল ব্রাহ্মণই বুঝিয়াছেন। পরন্তু একথা সমাচীন নহে কারণ বৈদ্যও দ্বিজ প্রচারিত হইয়াছে এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি বিষয়ে ব্রাহ্মণের সম অধিকার সম্পন্ন।" আমাদের বিক্রমপুর অঞ্চলে চাঁচুরতলা বা চাঁচরতলার সিদ্ধেশ্বর কালীবাড়ীর সম্পর্কেও বহু অলৌকিক কাহিনী শুনিয়াছি। প্রত্যেক কালীবাড়ীর সাধক সম্বন্ধেই নানারূপ কিংবদন্তি প্রচলিত।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের বহু সঙ্গীতের পদ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং গায়কেরা নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে এবং সাধারণের বুঝিবার জন্য পশ্চিম বঙ্গের শব্দ ও ভাষার পরিবর্ত্তন করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন: কবিরঞ্জনের গান যেমন অপূর্ব্ব, তেমনি দ্বিজ রামপ্রসাদের গানও অপূর্ব্ব। দুইটি অপ্রকাশিত পদও মুদ্রিত করিয়াছেন। একটি গান এই;

আমার মোন কেন পায়াছ, এতো ভয় রে।
পথে জেতে চোকীদারে জদি কিছু কয়:
তবে পরিচয় দিয় কাইলা মাএয়ের তনয় রে।
তুফান দেখে ডৈর না মোন তুফান কিছু নয়॥
শ্রীগুরু দিয়াছে তরি বাহিএ গেলে হয় রে।
প্রসাদ বোলে ঝড়ী তুফান দিবানিশি হয়॥
হাইল আটে ধৈর মাঝি শ্রী শ্রী গুরু সহায় রে।

স্পষ্টত: এই গানটি কবিরঞ্জনের গানের রূপান্তর মাত্র। যথা—তুফান দেখে ডোরো নারে, ও তুফান নয়; পথে যেতে চৌকিদারে তোরে কিছু কয়।' এ গানের ভণিতায় 'দ্বিজ' শব্দ নাই।

আমরা এখানে দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতাযুক্ত দুই একটি গান উদ্ধৃত করিতেছি। কোন্ দ্বিজ রামপ্রসাদের রচনা তাহা ভাষা, শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি দেখিয়া পাঠকগণ বিচার করিবেন।

ভাল নাই মোর কোন কালে।
ভালই যদি থাকবে আমার মন কেন কুপথে চলে॥
হেদে গো মা দশভূজা, আমার ভবে তনু হইল বোঝা।
আমি না করিলাম তোমায় পূজা, জবাবিল্বগঙ্গাজলে॥
এ ভব সংসারে আসি, না করিলাম গয়া-কাশী।
যখন শমনে ধরিবে আসি, ডাক্‌ব কালী কালী বলে।
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে তৃণ হয়ে ভাসি জলে
আমি ডাকি ধর ধর বলে, কে ধরে তুলিবে কূলে॥

দৃষ্টান্ত স্বরূপ আর একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাও পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ভাব, ভাষা, এবং শব্দ দেখিয়া উহা যে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের রচনা ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মন কেন রে ভাবিস্ এত।
যেন মাতৃহীন বালকের মত॥
ভবে এসে ভাবছো ব'সে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে কালেরও কাল যে মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত॥
ফণী হয়ে ভেকেরে ভয়, এযে বড় অদ্ভুত।
ওরে তুই করিস কি কালেরে ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ীর সুত॥
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হলিরে পাগলের মত।
অমন মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয়রে ভীত॥
মিছে কেন ভাব দুঃখে, দুর্গা বলে অবিরত।
ও মন দুর্গা নামে ভয় থাকে না ঘুচে যায় ভাবনা যত।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মনের ভুলে ভেবে ভেবে হলে হত।
এখন গুরুদত্ত তত্ত্ব ধর কি করিবে রবিসুত॥

চিনীশপুরের সাধক রামপ্রসাদের সহচরের মধ্যে একজনের নাম ছিল রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। তিনি রামপ্রসাদের অনুকরণে গান রচনা করিতেন এবং তাঁহার রচিত "দীন রামপ্রসাদ" ভণিতাযুক্ত তদীয় কোন কোন গান পদাবলী মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তিনি রামপ্রসাদ অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। তদীয় পৌত্র কালীকুমার ত্রিপুরাধিপতি বীরচন্দ্রমাণিক্যের চিত্রশিক্ষক ছিলেন। আমরা 'দীনরামপ্রসাদের' ভণিতাযুক্ত দুই একটি গান এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

[প্রসাদী সুর, তাল একতালা]
মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিসনা রে সর্ব্বনেশে॥
অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে।
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিস্না রে বসে বসে।
মনের মতন মন যদি হও, রাখ রে যোগেতে মিশে।
যখন অজপা পূর্ণিত হবে, ধরবে না আর কাল বিষে।
গুরু দত্ত রত্ন তোড়া, বাঁধিবে যতনে কসে।
দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি, অভয় চরণ পাবার আশে।

রামপ্রসাদের একখানি গ্রন্থাবলীতে দীন রামপ্রসাদ ভণিতা লিখিত আছে। কিন্তু কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সঙ্কলিত প্রসাদ-পদাবলীতে [৩৩নং ৬৫ পৃষ্ঠা] এই সঙ্গীতটিতে দীন রামপ্রসাদ ভণিতার উল্লেখ নাই, সেখানে ভণিতায় আছে 'ওরে রামপ্রসাদের এই মিনতি।' কাজেই সঙ্গীতের পদ পরিবর্ত্তন

ইত্যাদি সহজে চক্ষে ধরা পড়ে। এবং ইহা পূর্ব্ববঙ্গের রামপ্রসাদ ঠাকুরের সহচর রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর রচিত হইতে পারে না।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমাকে জানাইয়াছেন, "চিনীশপুরে আমি বহুবার গিয়াছি ও ৺কালীবাড়ীর দলিলপত্র পরীক্ষা করিয়াছি। রামপ্রসাদের পিতার নাম কিম্বা তাঁহার নিবাস গ্রামের নাম জানা যায় না।"

রামপ্রসাদের দৌহিত্রবংশের প্রামাণিক কথা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দীনেশবাবু বলেন "আসলকথা, পূর্ব্ববঙ্গে বহুল প্রচারিত "রামপ্রসাদী মালসী" গানের রচয়িতা ছিলেন চিনীশপুরের রামপ্রসাদ, একথা পশ্চিমবঙ্গের কেহ স্বীকার করিতে চান না, ইহা বোধহয় ঠিক্ নয়।

এবিষয়ের মীমাংসা ও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য:

১। চিনীশপুরের রামপ্রসাদের পিতার নাম, গ্রামের নাম, শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক তত্ত্বানুসন্ধান। 'আর্য্যদর্পণে' রামপ্রসাদের যে পিতৃপরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা গ্রহণীয় নহে। দীনেশ বাবুও তাহা বলিয়াছেন।

দ্বিজ রামপ্রসাদ লিখিত গীতাবলির ভাব, ভাষা, শব্দসম্পদ ও রচনাভঙ্গীর অনুশীলন। কেননা পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার সহিত পশ্চিমবঙ্গের ভাষার বহুস্থলেই অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। আচার, অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, সামাজিক ব্যবহারও বহুস্থলে বিভিন্ন।

আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটি গান উদ্ধৃত করিয়াছি। দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতাযুক্ত অন্যান্য পদাবলী আলোচনা করিলেও দেখিতে পাইবেন, পূর্ব্ববঙ্গের প্রচলিত শব্দ তাহাতে নাই বলিলেই চলে।

৺দয়ালচন্দ্র ঘোষের সংগৃহীত পদাবলীর মধ্যে অসম্পূর্ণ গানও আছে এবং 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতাযুক্ত ও দীন রামপ্রসাদ ভণিতাযুক্ত পদাবলীও রহিয়াছে।

দ্বিজ রামপ্রসাদ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তৎপ্রণীত "কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের" পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন:—"কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ব্যতীত একাধিক ব্যক্তির রচনা রামপ্রসাদী গানে মিশিয়া গিয়াছে। কবিরঞ্জনের গান লোকসাহিত্যের আসরে যে এক অপূর্ব্ব আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার অনুকরণে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র গান রচিত হইতে লাগিল। এজাতীয় গীতিকাব্যের সংখ্যা শতাধিক হইবে—উত্তম, মধ্যম ও অধম। অথচ এই গীতি সাহিত্যে মামুলী পুথি নিবদ্ধ

সাহিত্য নহে। অধিকাংশই মুখে মুখে প্রচারিত। অনুকরণকারীদের মধ্যেও দুই একজন "রামপ্রসাদ" ছিলেন—নীলু রামপ্রসাদের দলভুক্ত ঈশ্বর গুপ্তের প্রায় সমকালীন কলিকাতা সিমলা নিবাসী—ব্রাহ্মণবংশীয় কবিওয়ালা রামপ্রসাদ ঠাকুর অন্যতম বলিয়া ধরা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা আবশ্যক, গুপ্ত কবির সংগৃহীত রামপ্রসাদী কবিতার মধ্যে একটিও কবিওয়ালার নহে—গুপ্ত কবির সময়ে কবিওয়ালার পদ "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির পদের সহিত মিশ্রিত হইবে, এরূপ কোন সম্ভাবনাই ছিল না। আমরা নিম্নলিখিত পদটি ত্রিপুরা জেলায় আবিষ্কৃত প্রায় শত বৎসরের পুরাতন একটি পত্রে পাইয়াছিলাম—

মা গো তারা সুরেশ্বরি,
কেন অবিচারে আমার তরে করেন দুক্কের ডিগিরিজারি ॥
একা আমি ছটি পেদা বল্ মা কিসে সমাই করি।
আমার মনে লয় বিশ খরচ দিএ ছয়জনারে প্রাণে মারি ॥
সদরে ওকিল জে জনা টিসমিসে তার আশ ভারি।
সে জে বিসম সন্ধি মহাল বন্ধি কোন রুপে আমি হারি ॥
সদরে দরখাস্ত দিতে কোথা পাব ইষ্টাম্বরি।
রামপ্রসাদ বলে নিদানকালে দুর্গা ২ বলে মরি ॥

ইহা কবিরঞ্জন, কবিওয়ালা বা "দ্বিজের রচনা নহে—চতুর্থ এক অজ্ঞাত ব্যক্তির রচনা।"

দীনেশবাবুর এই অনুমান প্রমাণসহ একেবারেই নহে, তিনি যদি একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া 'প্রসাদ পদাবলী' (কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সম্পাদিত ৫৯ পৃষ্ঠার (১৬ নং গান) এবং দ্বারকানাথ বসু সম্পাদিত কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত ৯৫ পৃষ্ঠার শেষ সঙ্গীতটি দেখিতেন তাহা হইলে এই ভ্রম সম্পূর্ণরূপে দূর হইত। প্রকৃত সঙ্গীতটিতে ত্রিপুরা জেলার লেখক কিরূপ ভাবে শব্দের অদলবদল করিয়াছেন তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইবে। মাঝের কয়েকটি পদ যে কয়টি পদ ঐতিহাসিক সত্য তাগ বাদ দিয়াছেন। মূল সঙ্গীতটি এই :

[প্রসাদী সুর, তাল একতালা]

মা গো তারা ও শঙ্করী।
কেন অবিচারে আমার উপর, কল্লে দুঃখের ডিক্রিজারী ॥
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বলমা কিসে সাফাই করি।
আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছটারে, গরল খাইয়ে প্রাণে মারি ॥

প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলামজারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি, তারে দিলি জমিদারী॥
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছ রাজকুমারী॥
হুজুরে উকিল যে জনা, ডিস্‌মিসে তাঁর আসর ভারি।
করে আসল সন্ধি, সওয়াল বাদী, যেরূপেতে আমি হারি।
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ, তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারি॥

ত্রিপুরা জেলার অজ্ঞাত লেখক এই গানটির কিরূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করুন :—দুইটি মিলাইয়া পড়িলে তাহা দেখিতে পাইবেন।

মাগো তারা ও শঙ্করী,—শঙ্করী স্থলে পরিবর্ত্তন করিয়া 'সুরেশ্বরী' লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় পংক্তির 'উপর' শব্দের পরিবর্ত্তে 'তরে' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সামাইর স্থানে হইয়াছে সমাই। তারপর ইচ্ছা করে স্থানে 'মনে হয়' গরল খাইয়ে প্রাণে মারি—স্থানে ত্রিপুরার লেখক লিখিয়াছেন 'বিশ খরচ দিয়ে ছয়জনারে প্রাণে মারি'। যে দুইটি পংক্তিতে একটা ঐতিহাসিক সত্য রহিয়াছে তাহা ত্রিপুরার শত বৎসরের পুরাতন পত্রে বাদ পড়িয়াছে। যথা :—

প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলামজারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি, তারে দিলি জমিদারী।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের কাহিনী 'অন্নদামঙ্গলের' শেষ ভাগে অষ্ট মঙ্গলার পরে লিখিত আছে :

"শাকে আগে মাতৃকা যোগিনী গণ শেষে।
বরগার বিভ্রাট হইবে এই দেশে।
আলীবর্দ্দী কৃষ্ণচন্দ্রে ধরি লয়ে যাবে।
নজরানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে।

কৃষ্ণ পান্তীর কথা তো সকলেই জানেন। ১১৫৬ সালে ইংরাজী আ: ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণপান্তী রাণাঘাটের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, কৃষ্ণপান্তীর পিতার মৃত্যুর পরে কেবল একটি আধুলি সম্বল করিয়া তিনি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েন এবং আপনার অধ্যবসায়বলে, লক্ষ্মীর কৃপায় বহু বিত্ত উপার্জ্জন করেন এবং বাঙ্গলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ ধনী এবং জমিদার রূপে পরিগণিত হন। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের জীবিতকালেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কোনও সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া যায়, এবং পালচৌধুরী বংশের কৃতী পূর্ব্ব পুরুষ

কৃষ্ণপাস্তী প্রভৃত ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করিয়া ভূম্যধিকারী হইয়াছিলেন। তাই প্রসাদ গাহিয়াছেন :—

প্যায়াদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তার নামেতে নিলাম জারী।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণপাস্তী তারে দিলি জমিদারী ॥

একটি ঐতিহাসিক সত্য। রাণাঘাটের পালচৌধুরী বংশের গৌরবের কারণ। —কৃষ্ণপাস্তী, পরে কৃষ্ণচন্দ্র পালচৌধুরী নামে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। কাজেই দেখা যাইতেছে, ত্রিপুরা জেলার অজ্ঞাত ব্যক্তি রামপ্রসাদের পরিচিত সঙ্গীতটি লোক-মুখে শুনিয়াই হউক কিংবা কাহারো নিকট হইতে অনুলিপি করিয়াই হউক অনেক পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং কোন কোন শব্দ সংযোজিত করিয়াছেন—যেমন ডিগিরিজারি, টিসমিস, ইষ্টাম্বরি—গানের শেষ পংক্তিতে আছে—

'রামপ্রসাদ বলে নিদান কালে দুর্গা ২ বলে মরি।'

এই রামপ্রসাদ—চীনীশপুরের রামপ্রসাদ হইতে পারেন না—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদেরই বিরচিত সঙ্গীতটিই শব্দে ও ভাষার পরিবর্ত্তনে ঐরূপ হইয়াছে। গানটি পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ডিক্রীজারি হইয়াছে প্রাদেশিক সাধারণ লোকের কথিত ভাষা—ডিক্রীর স্থলে ডিগিরি, ডিসমিস্ হইয়াছে টিসমিস, ষ্টাম্প হইয়াছে ইষ্টাম্বরি। উচ্চারণ বৈষম্য হইতেই রচনার যথার্থতা উপলব্ধি হয়।

'মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া'— এই গীতটির শেষাংশে আছে :
ভাই বন্ধু সুতদারা, কেবল মাত্র মায়ার গোড়া।
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কল্‌সি, কড়ি দিবে অষ্টকড়া ॥
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ।
দোসর বস্ত্র গায় দিবে, চার কোণা মাঝখানে ফাঁড়া ॥
যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাবে কালিকা তারা।
বের হয়ে দেখ কন্যারূপে, রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া ॥

(প্রসাদ-প্রসঙ্গ, ১ম সং—পৃঃ, ১৫—১৬)

এই রীতি পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত—পূর্ব্ববঙ্গে নহে। তারপর এমন একটি শব্দও নাই—যাহাতে পূর্ব্ববঙ্গীয় বলিয়া গ্রহণীয়। আমরা এই সঙ্গীতটি শৈশবে কলিকাতায়ও যেমন স্বকর্ণে শুনিয়াছি, তেমনি বিক্রমপুর অঞ্চলের কালীসাধকদের মুখেও বহুবার শুনিয়াছি। এই সঙ্গীতটির ভণিতায় 'দ্বিজ' শব্দ নাই। দীনেশবাবু

নিদর্শন স্বরূপ যে পাঁচটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাও প্রসাদ-প্রসঙ্গ হইতে গৃহীত :

মন কেন রে ভাবিস্ এত যেমন মাতৃহীন বালকের মত ॥

এই গীতটির শেষভাগে ভণিতাতে আছে :

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মন কররে মনের মত।
এখন গুরুদত্ত তত্ত্ব কর, কি করিবে রবিসুত ॥

অপর সঙ্গীতটি : মা বসন পর

বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি।

এই সঙ্গীতটির ভণিতাতে—প্রসাদ-প্রসঙ্গে 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতা আছে, কিন্তু অপর সংগ্রহের ভণিতাতে আছে :

'ওমা, রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে গো ॥'

'বসুমতী' সংস্করণে দ্বিজ রামপ্রসাদের নাম ভণিতায় রহিয়াছে। 'আর্য্য-দর্পণ' হইতে উদ্ধৃত একটি সঙ্গীত এইরূপ :

আছে বলদ বয়না হালে,
আমার আবাদ জমি পতিত রইলে ॥
এক হালের হালুয়া যারা, তাদের পঞ্চ রতন ফলে।
আমার তিনখানি হাল পোড়াকপাল, অন্ন পাইনা কোনকালে ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, সঙ্গে ছিল মনা বেটা, সে পড়িল বিষম ভুলে।
সে যে বীজ খেয়েছে, সব লুটেছে, ঘুম দিয়েছে ক্ষেতের আইলে ॥

(আর্য্যদর্পণ' আশ্বিন ১৩২০, পৃঃ, ১৩৩)

এ গানটিতে ব্যবহৃত 'হালুয়া', 'পোড়াকপাল', 'মনা বেটা' প্রভৃতি শব্দ পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে লুটেছে, ক্রিয়া পদ এবং আইল শব্দ পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত হইতে শুনি নাই অন্ততঃ সেকালে হয় নাই, এখনও হয় না। পূর্ব্ববঙ্গে আইল শব্দে 'হাতাইল' বলা হয়। অর্থাৎ এক হাত বা দুই হাত চওড়া – দুই ক্ষেতের মধ্যবর্ত্তী পথ। প্রসাদ-প্রসঙ্গ হইতে দীনেশ বাবু অপর একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়াছেন :

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে বসত করি ॥
নাইকো জরিপ জমাবন্দী, তালুক হয় নীলামে বন্দী মা।
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি, শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী ॥

নাইকো কিছু অন্ত লেঠা, দিতে হয় না মাথট বাটা মা।
অন্নপূর্ণার নামে জমা আঁটা, ঐটা করি মালগুজারি ॥
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ, মা।
আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি, ব্রহ্মময়ীর জমিদারী ॥

এই গানে যে সমুদয় শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—যেমন তালুক, জরিপ, লাটে, মালগুজারি ইহা হইতে সহজেই উপলব্ধি হয় যে এই সঙ্গীতটি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের রচনা হওয়াই সম্ভব—কেননা তিনি জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিয়াছেন। চীনীশপুরের রামপ্রসাদের এ বিষয়ে স্বাভাবিক কোন অভিজ্ঞতা ছিল কিনা বলা যায় না।

'আর্য্যদর্পণ' (১৩২০ পৃঃ ১৩৩) হইতে উদ্ধৃত সঙ্গীত :

আমার ঘরে নব দ্বারে, শমন রইল থানা করে।
ঘরে গুরু নাভিস্থল, তাতে মনের বলাবল,
সে ঘরে মন বিরাজ করে ॥
প্রহরি ফিরে দশ পাঁচ ছয়, মনে বড় সন্দ হয়,
কপাট নাই মা সে সব দ্বারে ॥
ঘরচোরা যদি চুরি করে, মাটি দেয় কিবা পুড়ে তারে,
প্রসাদ বলে মাণিক গেলে, ঘরের আদর কেউ না করে ॥

আমরা ছেলেবেলা বাউলদের মুখে এই ধরনের গান শুনিয়াছি, একটি পদ এখনও আমার মনে পড়ে,—

ও পথে যাইস্‌নারে মনা—জঙ্গলের ভিতর বাঘ আছে !

স্বর্গত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন : "শৈশবে পিতামহী ঠাকুরাণীর নিকট প্রায়ই একটি রামপ্রসাদী গান শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম। দূরাগত বংশীধ্বনি যেমন সমীর তরঙ্গে রহিয়া রহিয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, সেই মধুর সঙ্গীতের দুই একটি পদ তেমন ভাবে স্মৃতির কুহেলি-অন্ধকারের মধ্যে মধ্যে উঁকি মারিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এই সঙ্গীতটির জন্য এখন দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া দেখিয়াছি—কোথাও তাহার উদ্ধার সাধনের সূত্র পাওয়া গেল না। সেকালের নারীগণ ভাবাবেশে তন্ময় হইয়া প্রসাদ পদাবলী গাইতেন ; কিন্তু প্রসাদের সেই মধুর সঙ্গীতটি বর্ত্তমান সময়ে খনির তিমির-গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। ঐ গানটির মধ্যে আছে :

"জংলার মধ্যে ভাঙ্গা ঘরে, একলা গো মা থাকি পড়ে,'

অন্যত্র—'চম্‌কে উঠি বাঘের ডাকে।"

অন্যত্র—"তুমি যা কর মা তারা।"

ঠিক্‌ একটি গানের মধ্যেই এই পদগুলি ছিল কিনা, তাহা বলিতে পারি না। কতকাংশ ঐরূপ আর একটি সঙ্গীত প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

এই পদ হইতে আমরা অন্ততঃ এইটুকু বুঝিতে পারি যে, রামপ্রসাদ কোনও অরণ্যে বা অরণ্যপ্রান্তে ভগ্ন কুটিরে একাকী বাস করিতেন। সেখানে বাঘের ভয় ছিল। তথাপি মায়ের উপর নির্ভর করিয়া প্রসাদ সেই ভাঙ্গা ঘরে পড়িয়া থাকিতেন। এস্থলে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে—যে প্রথমাবস্থায় চীনিশপুরের রামপ্রসাদ হয়ত জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে বাস করিতেন এবং সম্ভবতঃ সেখানেই সাধনভজন করিতেন কাজেই এইরূপ উক্তি স্বাভাবিক বলিয়া মনে করি। পরন্তু কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন কোন কালেই অরণ্যমধ্যে বাস করেন নাই। অতএব পূর্ব্ববঙ্গের রামপ্রসাদ বা অন্য কোন তথাকার সাধকের রচিত দুই একটি গান প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :—

'কে'বা বুকের কেবা পিঠের, বদনিয়তিয়া কানীর কানী।
কেহ সারা দিনে পায় না খাইতে হেদে গো করুণাময়ী।
কেহ দুধে খায় সাচি চিনি—
কেহ শুতে তেতালাতে, পালঙ্গেতে মশৈর টানি,
আমরা মরি 'পুড় পুড়ায়ে' (হেদেগো করুণাময়ী)
ভাঙ্গা ঘরে নাইকো ছানি।
কেহ পরে শাল দুশালা, কেহ পায়না ভাঙ্গা ছালা,
অনুভাবে বুঝি তারা (হেদেগো করুণাময়ী)
তেল মাথায় তেল ঢালানী॥"

বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীদিগের উচ্চারণের বৈষম্যে অনেক শব্দের উপর আবার অত্যাচার হয় বটে, কিন্তু উক্ত সঙ্গীতে সে আশঙ্কা নাই বলিলেও চলে। বদনিয়তির অর্থাৎ যাহার উদ্দেশ্য খারাপ, কানী অর্থে এক চোখা, যে পক্ষপাত দৃষ্টিতে দেখে; অনুভাবে (অনুমান করিয়া) শুতে (শোয়া শয়ন করে); মশৈর (মশারী), পুড়পুড়ায়ে (জ্বলে পুড়ে ছট্‌ফটিয়ে) মশারীর পর 'পুড়পুড়ায়ে' ব্যবহার হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় রামপ্রসাদ মশক দংশনের যন্ত্রণাও ভোগ

করিয়াছেন। ভাঙ্গা ছালা (ছেঁড়া ছালা, ছেঁড়া ছালাকে ভাঙ্গা ছালা বলিতে অনেক সময় শোনা যায়) এই ভাষা পূর্ব্ববঙ্গের নিজস্ব।

আর একটি সঙ্গীতে আছে—

'থাকি একখান ভাঙ্গা ঘরে,
ভয় পাইয়া মা ডাকি তোরে,
রাত্রে আইসা ছয়টা চোরে, ভাঙ্গা বেড়া ডেঁইয়া পরে।
ইয়লে হালিয়া পড়ে, আছি কালী নামের জোরে।
চম্‌কি উঠি বাঘের ডাকে, থাকি (মায়ের) নামটি ভরসা করে॥

এই সঙ্গীতের 'ইয়লে' শব্দের অর্থে শিশির। সম্ভবতঃ হিম হইতে ইম্ এবং শেষ ইয়ল হইয়াছে। ইয়ল ব্যবহার এখনও শোনা যায়। এই গানটির "ইয়লের' স্থলে ৺দয়ালচন্দ্র ঘোষের সংগ্রহে আছে 'হিল্লোল'। ডেঁইয়া অর্থাৎ ডিঙ্গাইয়া। সাধক রামপ্রসাদ জঙ্গলের বাসকে ভয় করুন আর নাই করুন তিনি ভাঙ্গা ঘরে থাকিয়া ষড় রিপুর ভয় করিতেন এবং মায়ের নামে তাহাদিগকে দমন করিতেন।

আর একটি গান—

'দেখি মা কেমন ক'রে আমারে ছাড়ায়ে যাবা।
ছেলের হাতের কলা নয় মা ফাঁকি দিয়া কেড়ে খাবা।
এমন "ছাপান ছাপাইব" (মাগো) খুঁজে খুঁজে নাহি পাবা॥
বৎস পাছে গাভী যেমন তেম্‌নি পাছে পাছে ধাবো।
প্রসাদ বলে ফাঁকিঝুকি (মাগো) দিতে পার পেলে হাবা।
আমায় যদি তরাও মা শিব হবে তোমার বাবা॥

যাবা, খাবা, পাবা, প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত হয়। "এমন ছাপাইবে" অর্থাৎ লুকাইয়া থাকা। পলাইয়া আত্মগোপন করা। সাধারণ অশিক্ষিত লোকে ছাপাইব লুকাইব অর্থে ব্যবহার করেন।

আর অধিক সংখ্যক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের ধৈর্য্য ভারাক্রান্ত করা সঙ্গত মনে করি না। কয়েকটি গানের দুই একটি পদ মাত্র উপস্থিত করিব। তাহাতেও পূর্ব্ববঙ্গের পরিচয় প্রকাশিত।

প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী, বোঝা নামাও খানিক জিরাই। জিরাই—বিশ্রাম করি।

'চুরিদারী করলে পরে উচিত মত সাজা পাব।'
'চুরিদারী,' ফাঁকিঝুকি—পূর্ব্ববঙ্গেরই কথা।

'যাই পড়াই তা পড় মন, পড়লে শুনলে দুধিভাতি।
জান না কি ডাকের কথা না পড়িলে ঠেঙ্গার গুতি॥

এই প্রবচনটি আমরা শৈশবাবধি বলিয়া আসিতেছি। ঠেঙ্গার গুতি পূর্ব্ববঙ্গের একচেটিয়া কি পশ্চিম বঙ্গের ব্যবহার আছে জানি না। পশ্চিমবঙ্গেও ইহার যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

'কেহ গায় দেয় শাল দুশালা কেহ পায় না ছিঁড়া তেনা।'

তেনা অর্থ ন্যাকড়া। পশ্চিমবঙ্গে 'তেনা' বলে কিনা বলিতে পারি না। এ দেশের বহু লোক তেনা পরিয়া দিন গুজরান করে। পশ্চিম বাঙ্গালায় ন্যাকড়া বলে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেও তেনা শব্দের ব্যবহার আছে।

সে যে সময়সির নাড়িতে নারে।

'সময়সির' (সময় মত) ইহাও সম্ভবতঃ আমাদের সম্পত্তি। এই সকল সঙ্গীতের রচয়িতাকে পূর্ব্ববঙ্গবাসী বলিতে দ্বিধা করিবার কোনও কারণ নাই।"*

'আর্য্যদর্পণে' ১৩২০ সনের আশ্বিন সংখ্যায় সুরেন্দ্রনাথ বল নামে একজন লেখক কয়েকটি আখ্যায়িকা ও গান প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

জাগ মা আমার দেহ মধ্যে।
আমি জ্ঞান সচন্দনে ভক্তিজবা দিব মা তোর পাদপদ্মে॥
অপূর্ব্ব ছয় পদ্ম আছে মা মেরুদণ্ডের মধ্যে মধ্যে।
ডাকিন্যাদি শক্তি তোমার রয়েছে তার প্রতি পদ্মে॥

* উদ্ধৃত গান কয়টিতে ব্যবহৃত শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত—'বিক্রমপুরের ইতিহাস' ৩৪৬, পৃঃ ও অন্নদামঙ্গল দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষতঃ বিক্রমপুর অঞ্চলে 'ইয়ল' শব্দের ব্যবহার খুব বেশী। ছড়া, পাঁচালীতে, ব্রতকথায় ইহার উল্লেখ আছে। মাঘমণ্ডলের ছড়ায় আছে:

ওঠ ওঠ সূর্য্যদেব ঝিকিমিকি দিয়া,
না উঠিতে পারি আমি 'ইয়লের' লাইগা,
ইয়:লর পঞ্চ কোটি শিয়রে থুইয়া,
সূর্য্য উঠবেন কোন্ খান দিয়া।

ইয়ল অর্থে, শিশির, কুয়াশা এবং সাধারণতঃ 'ওশ' কথাটাও ব্যবহৃত হয়।

তেনা বা টেনা শব্দ ন্যাকড়া অর্থে পশ্চিমবঙ্গেও ব্যবহার আছে। 'অন্নদামঙ্গলে' ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন:

শত গাছি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান।
ব্যাসের নিকটে গিয়া হইলা অধিষ্ঠান॥

সুষুম্নার সূক্ষ্মপথে মা শক্তি গো যোগাচ্ছে।
চল সহস্রদল পদ্ম করে মা আমি তাই ভাবি গো ভবারাধ্যে ॥
পরমহংসরূপে পিতা আছেন তলায় কোন্ বিশুদ্ধে।
পরমহংসিনিরূপিনী মা তুই (একবার) যুগল মিলনে দেখা দে ॥
প্রসাদ বড় ভাবছে গো, মা কি হবে শমনের যুদ্ধে।
অভয় দে অভয়ে শমন ভয়ে আর ছলনা করিস্‌নে আচ্ছে ॥

আর একটি সঙ্গীত এই :

১। মহাকালী বলনা, দিন রবে না।
কালী ভাবনা, ভয় কি ?
কালী নামমাহাত্ম্য, যে জানে সত্য,
তার বিপত্তি রয় কি ?
দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণে, সমুদ্র মন্থনে
দেব পঞ্চাননে, হলাহল পানে, হলো কি ?
সে যে কালী বলেছিল তাইত বাঁচিল
নতুবা শিব বাঁচে কি ?

২। আমার দুঃখের কথা কই।
দুঃখে কিম্বা সুখে আছি জানতোগো ব্রহ্মময়ী।
সারাদিন মা মরি খেটে, ভূত সকল নেয় গো লুটে
দারুণ পেটের জ্বালা সইতে নারি পরের বোঝা মাথায় লই।
জন্মজরা মৃত্যু মা আর কত সহেলো তারা।
প্রসাদ বলে দুঃখের ভরা আমার প্রাণে কেমন করে সই।

৩। সদা আনন্দময়ী মনে থাকলে পরে, নিরানন্দ হবে কেন ?
যে জন যে বস্তু খায়, উদ্গারে লক্ষণ প্রকাশ পায়,
সাসীর মুখেতে যেন দৃষ্টমান বস্তু জ্ঞান ॥
যে জনার যে মতি হয় চোখ মুখ তার সাক্ষী হয়।
ভাস্থর উদয় হলে যেন, অন্ধকার নয় কখন।
দ্বিজ রামপ্রসাদের বাণী পাগল রাজার ক্ষেপা রাণী।
ও সরকারে চাকরী হলে পাগল বই আর বলবে কেন ?

এই গানটির 'সাসী' দর্পণ অর্থে পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

৪। কে তোরে দোষে মাগো কে তোরে দোষে।
সকলি ঘটে আমার করম দোষে ॥

না জানি তত্ত্ব পরম কথা, আপনি খেয়েছি আপন মাথা,
চরণ ভজিতে চাই, মনেতে না পাই, আমাকে দেখিয়ে সাগর শোষে।
আপনা বলিয়ে যারে গো ভাবি, সে মোরে দেখিয়ে ফিরায় গো আঁখি,
দুঃখ বলিব কাহাকে, জগতে আছে কে? অঙ্গ জর জর কাল বিষে।
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, শ্যামা মার চরণে কমলে দোলে
যে জপে তাঁর নাম পুরে তার মনস্কাম,
এই নাম শম্ভুনাথ সদাই পোষে॥

৫। আনন্দময়ী হয়ে গো মা তারা নিরানন্দে রেখো না।
ঐ দুটি চরণ বিনা আমার মন যেন অন্য কিছু জানে না।
ভবানী বলিয়ে ভবে যাব চলে, মনে ছিল এই বাসনা।
তাতে অকূল পাথারে ডুবালি আমারে স্বপনেত ইহা জানি না।
এবার যদি মরি, ও হরসুন্দরী ভবে দুর্গা নাম আর কেউ লবে না।
শ্রীরামপ্রসাদের বাণী, শুন মা ভবানী পূর্ণ কর মনের বাসনা।
আমি এই ভিক্ষা চাই, অন্তে যেন পাই, না হয় যেন জঠর যন্ত্রণা।

৬। ভুলি ভুলি হে গুরু ব্রহ্ম আর কি তোমার কথায় ভুলি।
ত্রিপাদ ভূমি চেয়েছিলে, তিন পদে তিন রাজ্য নিলে
ঐ বাহ্বালাপী পলপীর সাক্ষী আছেন রাজা বলী।
শ্রীমতিরে ভাসাইয়ে মথুরাতে রাজা হলি,
যার কারণে বৃন্দাবনে হয়েছিলি কৃষ্ণকালী
রাবণকে বধিবার ছলে সীতা লয়ে বনে গেলে,
সেই সীতা উদ্ধারিয়ে পুনর্ব্বার বনে দিলি
শ্রীরামপ্রসাদ বলে সাধে কি দেই গালাগালি,
এখন পতিতেরে না তরিলে কেন গুরুব্রহ্ম হলি।*

৭। আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত তাই॥
আগে পাছে দুঃখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই।
তখন দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুঃখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥
বিষের কৃমি বিষে আমি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মাঝে, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই॥

* আর্য্যদর্পণ ১৩২০ আশ্বিন সংখ্যা লেখক সুরেন্দ্রনাথ বল শান্তি-আশ্রম, যোড়হাট; দর্শন প্রেস শ্রীটুনিরাম শর্ম্মা দ্বারা মুদ্রিত শ্রীকুমার স্বরূপানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত।
১৩২৯ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী ১৩৩০ বরদা ব্রহ্মচারী।

রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে কয়েকটি আখ্যায়িকাও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে। কথিত আছে, দেবীর আদেশে চীনে ক্রমে অর্থাৎ তন্ত্রের বীরাচারী প্রণালীতে মায়ের সাধনায় তিনি নিযুক্ত ছিলেন। পঞ্চতত্বের সাধনায় শক্তির প্রয়োজন। তিনি কলিধর্ম্ম সম্মত স্বকীয় ধর্ম্মপত্নীর সহিত সাধন করিবেন স্থির করিয়া সন্নিহিত টেঙ্গুরাপাড়া নিবাসী জয়নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া চীনীশপুরেই জীবন অতিবাহিত করেন। এবং ঐ গ্রামের এক বটবৃক্ষতলে আসন করিয়া বসেন, পরে পঞ্চমুণ্ডী আসন স্থাপন করিয়া সেখানে বসিয়া সিদ্ধিলাভ করেন।

পরবর্ত্তীকালে ঢাকার প্রসিদ্ধ নীলকর ও জমিদার মিঃ জে, পি, ওয়াইজ সাহেবের দেওয়ান ফরিদপুর নিবাসী রামকৃষ্ণ রায় ঐ পঞ্চমুণ্ডীর সিদ্ধপীঠের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। পূর্ব্বে খড়ো ঘর ছিল। রাজচন্দ্র পাকড়াশী এই কালীবাড়ী ও তৎসংক্রান্ত জায়গীরদার মালিক ছিলেন। রাম-প্রসাদ ঐ মন্দিরে কোন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যান নাই। তিনি কালীমূর্ত্তি প্রস্তুতের জন্য এক খণ্ড কাঠ জোগাড় করিয়াছিলেন, তাহা জিনার্দ্দী নিবাসী অক্ষয়রাম চক্রবর্ত্তী চুরি করেন। তজ্জন্য কোন মূর্ত্তি গড়েন নাই।

বৈশাখী আমাবস্যার দিন তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। অদ্যাবধি প্রতি বৎসর তাই ঐদিনে সমারোহের সহিত উৎসব হইয়া থাকে। তাঁহার শেষ জীবন সঙ্গীতেই অতিবাহিত হয়। সঙ্গীতেই তাঁহার সমধিক প্রীতি ছিল। সঙ্গীতই উপাসনা, সঙ্গীতেই সিদ্ধি। (আর্য্যদর্পণ বৈশাখ ১৩২০—লেখক চন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী)

ব্রহ্মচারী রামপ্রসাদ সম্বন্ধে ঐ অঞ্চলে বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে: তাহার দুই একটি উদ্ধৃত করিলাম, বলা বাহুল্য যে এই শ্রেণীর অলৌকিক গল্প প্রত্যেক সাধক সম্বন্ধেই আমাদের দেশে শুনিতে পাই।

১। একদিন রামপ্রসাদের আম ডাইল খাইতে বাসনা হইলে পিসীমাকে জানান। অসময়ে আম কোথা পাইবেন, তাই আমসী দিয়া ডাইল রন্ধনের জন্য পিসীমা স্থির করিয়াছেন, এমন সময় একটি মেয়ের বেশে ভগবতী আসিয়া পিসীমার হাতে পাঁচ ছয়টি কাঁচা আম দিয়া, প্রসাদ পাঠাইয়াছেন বলিয়া অন্তর্হিত হন।

২। কোন তস্কর অপহৃত দ্রব্যাদি লইয়া পলায়নের সময় একদিন প্রসাদের গান শুনিয়া ভাবে আকৃষ্ট হইয়া ঐ অলঙ্কারাদি কালীবাড়ীর সংলগ্ন ভূমিতে

ফেলিয়া যায়। ইহাতে ঐ ব্যক্তি প্রসাদকে চৌর্য্য অপরাধে ধৃত করে এবং প্রসাদ বিচারালয়ে নীত হন। ইহাতে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি তাঁহার ভাববিগলিত কণ্ঠে গান সুরু করেন, তাহাতেই বিচারপতি মুগ্ধ হইয়া নিরপরাধী বলিয়া তাঁহাকে মুক্তি দেন।

৩। একদিন বাজার খাইবার কালে পথিমধ্যে কয়েকজনের অনুরোধে প্রসাদ গান গাহিতে বসেন। তাহাতে সন্ধ্যা হইয়া যায়। প্রসাদের আর সেই দিন হাটে যাওয়া হইল না। লজ্জায় হেঁটমুখে বাড়ী ফিরিলেন। খাইবার সময় স্ত্রীর মুখে শুনিলেন, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয় দেখিয়া আমি যখন তোমার কথা ভাবিতেছিলাম, সেই সময় একটি মেয়ে আসিয়া বাজার সমুদয় দিয়া গেল এবং তোমার ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইবে তাহাও জানাইয়া গেল।—

ব্রহ্মচারী রামপ্রসাদের শাঁখা পরার গল্পটিও ঠিক যোগাদ্যার শাঁখা পরার অনুরূপ। কাজেই উল্লেখ করা বাহুল্যজনক মনে করি। বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্রই দেবদেবী সম্পর্কে এইরূপ একই কাহিনী বহুলাংশে প্রচলিত রহিয়াছে।

আমরা পূর্ব্ববঙ্গীয় দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে আর দুই একটি কথা বলিব চীনীশপুরে যে একজন সাধক রামপ্রসাদ ছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তবে তাঁহার সাধন সঙ্গীতের ভাষা, ভাব ও শব্দাদি প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় যে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের বহু সঙ্গীত লোক মুখে মুখে—গায়কের মুখে মুখে রূপান্তরিত হইয়া এমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে উভয়ের সঙ্গীত করাও দুরূহ হইয়াছে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদও যে সঙ্গীতের ভণিতায় দ্বিজ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা আমরা বিবিধ প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছি। আবার দেখিতে পাইবে কি 'আর্য্যদর্পণে' কি 'প্রসাদ-প্রসঙ্গে', উদ্ধৃত সঙ্গীতের মধ্যে কোথাও আছে—দ্বিজ রামপ্রসাদ' কোথাও প্রসাদ—এরূপস্থলে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের পদাবলী হইতে পৃথক করিয়া চীনীশপুরের দ্বিজ রামপ্রসাদের সঙ্গীত সংগ্রহ ও আলোচনা আবশ্যক। কাজটি অত্যন্ত দুরূহ, কেননা—এ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গবাসী কোন লেখকই নিরপেক্ষভাবে একার্য্যে মনোযোগী হন নাই।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন কাব্যাদি রচনায়, এবং সাধন-সঙ্গীত রচনায় চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ভবিষ্যতে কোনও গবেষণাকারী যদি চীনীশপুর নিবাসী রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর সাধন সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করেন—তাহা হইলে খুব ভাল হয়। প্রকৃত সত্য নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

ভূমিকা

রামপ্রসাদ ছিলেন সাধক, কবি ও গীতকার। তাঁহার রচনার মধ্যে—(১) শ্রীশ্রীকালীকীর্ত্তন, (২) শ্রীশ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, (৩) কালিকা-মঙ্গল বা কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর, (৪) সাধন সঙ্গীত বা পদাবলী—সর্ব্বজন পরিচিত।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কালীকীর্ত্তনের একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার বিশদ পরিচয় আমরা এখানে দিলাম। সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকায় [৪৯শ বর্ষ—২য় সংখ্যা] শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কালীকীর্ত্তন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : —"১৩৪৪ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকা'য় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলী সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন, তাহাতে সর্ব্বপ্রথম আমরা কবিবরের সম্পাদিত বিস্তৃত ভূমিকার সহিত সাধক রামপ্রসাদ সেনের "কালীকীর্ত্তন" গ্রন্থের কথা জানিতে পারি।*

'কালীকীর্ত্তন'ই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক রচিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ আছে, তাহাতেও আমরা উক্ত উল্লেখ দেখি না। ঈশ্বরচন্দ্রের কৃপায় প্রাচীন কবিদিগের লুপ্তপ্রায় কবিতাবলী ও জীবনী আমরা পাইয়াছি। তিনিই সর্ব্বপ্রথম উদ্যোগী হইয়া যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া সে সমুদয় প্রকাশ করেন। কালীকীর্ত্তন ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।'

'এই কালীকীর্ত্তন গ্রন্থ অতি দুষ্প্রাপ্য। ইহার একখণ্ড রাজা রাধাকান্তদেবের লাইব্রেরীতে আছে। বর্ত্তমানে বাজারে প্রচলিত সাধক রামপ্রসাদের যে 'কালীকীর্ত্তন' আমরা পাই, তাহার সহিত ইহার অনেক পার্থক্য আছে। সেই জন্য এই গ্রন্থ বর্ত্তমান সংখ্যা পরিষদ্ পত্রিকায় মুদ্রিত হইল।'

আমরা এই গ্রন্থ মধ্যে যে কালীকীর্ত্তন মুদ্রিত করিলাম, তাহা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রকাশিত কালীকীর্ত্তন গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ করিয়াছি।

রামপ্রসাদের "কালীকীর্ত্তন" তাঁহার জীবিতকালেও যেমন জনপ্রিয় হইয়াছিল, তেমনি কীর্ত্তনওয়ালাগণ রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন সর্ব্বত্র গান করিয়া ইহার

* শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্তের একথা: প্রকৃত নহে। কেননা পূর্ব্বে যে সকল রামপ্রসাদের পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই কালীকীর্ত্তন মুদ্রিত হইয়াছিল। তবে একথা সত্য যে কবিবরের সম্পাদিত বিস্তৃত ভূমিকা পূর্ব্বে কেহ প্রকাশ করেন নাই। সেজন্য ব্রজেন্দ্রনাথ একান্ত ধন্যবাদার্হ।

বহুল প্রচারের সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিয়াছিল। 'বলা কেন চাটার' গল্প আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। গুপ্ত কবির মতে কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন বিদ্যাসুন্দরের অপেক্ষায় অনেক উত্তম।" পাদ্রী ওয়ার্ড (Ward) সাহেবের গ্রন্থে কালীকীর্ত্তনের উল্লেখ আছে,—"Kalee Keerttun by Ramu prusadu a shoodru. "The Hindoos, London 1822, Vol. II. p. 478; also III. p. 300-1. ওয়ার্ড সাহেব নিজের অজ্ঞতাবশতঃ বৈদ্য ও দ্বিজ রামপ্রসাদকে শূদ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেকালের ইংরাজ-লেখকগণ অনেকেই এইরূপ অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

কালীকীর্ত্তন, শিব-সঙ্কীর্ত্তন, বিদ্যাসুন্দর, রামপ্রসাদের সাহিত্য সাধনাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। বই কখানি ক্ষুদ্র হইলেও সাহিত্য-সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ। কালীকীর্ত্তনের সুমধুর পদাবলী এক সময়ে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে মধুবর্ষণ করিত।

এই বইখানির আরম্ভে রহিয়াছে গুরুবন্দনা। গুরুবন্দনার আরম্ভ এইরূপ:

বন্দে শ্রীগুরুদেব কি চরণ্।
অন্ধপুট খোলে ধ্বন্ধ সব হরণং॥
জ্ঞানাঞ্জন দেহি অন্ধ কি নয়নং।
বল্লভ নাম শুনায়ত করণং॥

ইত্যাদি। তৎপরে কালীকীর্ত্তনারম্ভ হইল—প্রথমেই মায়ের বাল্যলীলা।

গৌরচন্দ্রী। গিরিবর! আর আমি পারিনে হে
প্রবোধ দিতে উমারে।

গুপ্ত কবির প্রথম মুদ্রিত সংস্করণে এই গৌরচন্দ্রী ছিলনা। ১২৬১ সনের ১লা চৈত্র সংখ্যার প্রভাকরে ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল। কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রণেতা' বিখ্যাত লেখক স্বর্গতঃ ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন:—"শিক্ষার ধূম্র পথের পুঞ্জীভূত আঁধার ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে রামপ্রসাদের কতকগুলি সুন্দর কবিত্ব-পূর্ণ রচনা দৃষ্ট হয়। মেঘ-বিমুক্ত কিরণরাশির ন্যায় সেইসব স্থল তৃপ্তিপ্রদ।"*

আমাদের মনে হয় কালীকীর্ত্তনে হিমালয়ের নিভৃত নিকেতনে উমার বাল্যলীলা যেরূপ সুন্দর ও সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে বঙ্গ-জননীর স্নেহবিহ্বল কণ্ঠের চির পরিচিত বাণী, বাঙ্গালা ঘরেরই কথা। আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে—অষ্টম সংস্করণ—৩৩২ পৃষ্ঠা।

'গিরিবর আর আমি পারিনে হে
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্যপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে।
আমি পারি নেহে প্রবোধ দিতে উমারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে॥
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে॥
উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটি শশধরে॥

শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্য পুঞ্জচয়,
জগৎ-জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা,
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে॥

এই সুমধুর 'উমার বাল্যলীলা' কবিতাটির ইংরাজী অনুবাদ এখানে প্রকাশ করিলাম :

An incident of Uma's Childhood 'Giribara', I can no longer try to quiet Uma. In angry pride she sobs and sobs and will not have the breast. She does not want the clotted milk ; butter or cream she will not eat.

The night has almost gone, and in the sky the moon has risen. Uma cries : Bring it for me.'

No longer (I say) can I try to quiet Uma. Her eyes are swollen with her sobbing, all tear stained in her face. Can I, her Mother, bear to see her so ?

'Come, Mother, come !' she says, and takes my hand ; yet whither she would go I do not know.

Said I to her : 'you cannot grasp the moon' ; and at the words she flung her ornament at me.

Giribara left his bed and sat him down, and tenderly took Gauri in his arms. Happy at heart and laughing as he spoke, 'See, little mother, here's a moon for you, 'he said, and handed her a mirror. Great was her joy, as in the mirror she beheld her face, than Countless moons more beautiful.

Ramprasad says : Blessed indeed is he within whose house Earth's Mother dwells.

'Umas' mother speaks.''*

আমরা রামপ্রসাদের জনপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই অনুবাদটি উদ্ধৃত করিলাম।

কালীকীর্ত্তনে ভগবতীর নৃত্য-শেষের ও অপর দুইটি ভণিতাতে কবিরঞ্জন উপাধি দেখিতে পাই।

শ্রীরাজকিশোরে মাতা তুষ্টা সুতজ্ঞানে।
প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পুরাণ প্রমাণে॥
অরসিক অভক্ত অধম লোকে হাসে।
করুণাময়ীর দাস প্রেমানন্দে ভাষে॥
শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মহা অন্ধের ঔষধ অঞ্জন॥

বাল্যলীলার আর একটি স্থানও কবিত্ব মাধুর্য্যে উল্লেখযোগ্য।

বাল্যলীলা

জয়া বলে, আমি সাধে সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম,
জগদম্বা চল পুষ্পকাননে।
চল চল পুষ্পবনে, জয়াদাসী যাবে সনে॥

* Bengali Religious Lyrics, Sakta by E. J. Thomson and A. M Spencer. Page. 88-89.

জলদমে বিলম্বেও চলিত চিন্তপদ চল না।
লোহিতচরণতলারুণপরাভব, নখরুচি হিমকরসম্পদ দলনা॥
নীলাঞ্চল নিচোল বিলোল পবনে ঘন,
সুমধুর নূপুর কিঙ্কিণী কলনা।
সকল সময়ে মম হৃদয়সরোরুহে।
বিহরসি হরশিরসি শশি-ললনা॥
কল্পতরুতলে, শ্রীরাজকিশোর ভাবে,
বাঞ্ছা ফল ফলনা।
ভাগ্যহীন শ্রীকবিরঞ্জন কাতর,
দীন দয়াময়ী সন্তত ছল ছলনা।

'গোষ্ঠলীলা'র একটি অংশও অতি সুন্দর। বর্ণনামাধুর্য্যে-শব্দসম্পদে অতুলনীয়। এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

গোষ্ঠলীলা

গিরিশগৃহিণী গৌরী গোপবধূবেশ।
কষিত কাঞ্চনকান্তি প্রথম বয়েস॥
বিচিত্র বসন মণিকাঞ্চন ভূষণ।
ত্রিভুবন দীপ্তি করে অঙ্গের কিরণ॥
স্বয়ম্ভু যুগল হর সুরনদী কূলে।
স্বয়ম্ভু পুজেন নিত্য করপদ্ম ফুলে॥
নাভিপদ্মভেদি ভ্রমে বেণী ক্রমে ক্রমে।
লোমাবলী ছলে চলে করিকুম্ভ ভ্রমে॥
ঈশ্বর মোহন ইষু নয়ন তরল।
বিধি কি কজ্জল ছলে মাখিল গরল॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীর কি কাণ্ড।
ফেরে করে লয়ে ছাঁদ ডোর দুগ্ধভাণ্ড॥
ভালেতে তিলক শোভে সুচারু বয়ান।
ভণে রামপ্রসাদ দাস মার এই এক ধ্যান॥

কালীকীর্ত্তন প্রসঙ্গে 'কবিচরিত' প্রণেতা বলেন—"রামপ্রসাদ সেন কালীকীর্ত্তন নামা আর একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, যদিও তাহার কলেবর নিতান্ত ক্ষুদ্র; তথাপি উহা অল্প প্রশংসার আস্পদ নহে। কবিরঞ্জনের

যাবতীয় রচনার মধ্যে অনেকে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া অনুমান করেন। ইহাতে কবিরঞ্জন অদ্ভুত কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বিদ্যা-সুন্দরের ন্যায় ইহার কোন স্থানই কর্কশ বলিয়া বোধ হয় না। গ্রন্থখানি এতাদৃশ প্রশংসার যোগ্য হইলেও তাহার রচনা-প্রণালীর দোষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। ইহার কবিতা সকল অত্যন্ত অনিয়মিত। কোন স্থানেই ছন্দঃ ও মিত্রাক্ষরের সমতা নাই বলিলেই হয়। রাজকিশোর নামা ব্যক্তির অনুরোধ ক্রমে কবিবর কালীকীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন। রাজকিশোর কে, তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। যথা—

শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মহা অন্ধের ঔষধি অঞ্জন॥

কবিচরিত (১৮৬৯ খৃঃ) রচয়িতার ঐরূপ মন্তব্যের পর ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় রাজকিশোরের পরিচয় প্রসঙ্গে সর্ব্ব প্রথম প্রচার করেন যে, রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের আদেশে প্রসাদ কালীকীর্ত্তন রচনা করিয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় রাজকিশোর নামের সঙ্গে 'মুখোপাধ্যায়' সংযোগ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন,—তিনি রাজকিশোরের সবিশেষ পরিচয় দেন নাই। "প্রসাদ-প্রসঙ্গকার" (১২৮২ সাল) ৺দয়ালচন্দ্র ঘোষ ও উপরোক্ত রাজকিশোরের কোন পরিচয় দেন নাই। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, "রামপ্রসাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য কালীকীর্ত্তন। কালীকীর্ত্তন যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে পাঠক অনুমানেই বুঝিতে পারেন।' ইত্যাদি (প্রসাদ-প্রসঙ্গ ৯৮ পৃঃ) 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রণেতা স্বর্গতঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন: "রাম-প্রসাদ যে ধনী ব্যক্তির সেরেস্তায় মুহুরিগিরি করিতেন, সেই প্রাগুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন আর একজন ধনী ব্যক্তি তাঁহাকে কাব্য লিখিতে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন, ইঁহার নাম রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়। ইনি কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজার পিসা শ্যামসুন্দর চট্টোপাধ্যায়ের জামাতা ছিলেন; কবি এই রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের আদেশে 'কালী-কীর্ত্তন' রচনা আরম্ভ করেন; সেকথা তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন। রচে গান মোহান্ধের ঔষধ অঞ্জন।" ভারতচন্দ্রও এই রাজকিশোর মহাশয়ের গুণজ্ঞাপক একপংক্তি কবিতা লিখিয়াছেন—'মুখ রাজকিশোর কবিত্ব কলাধার।' (অন্নদামঙ্গল)—ভারতচন্দ্রের সভাবর্ণনা হইতে ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন। 'অন্নদামঙ্গলে' আছে—

'ভূপতির পিসা শ্যামসুন্দর চাটুতি।
তার কৃষ্ণদেব রাজকিশোর সন্ততি॥
ভূপতির পিসার জামাই তিনজন।
কৃষ্ণানন্দ মুখয্যা পরম যশোধন॥
মুখয্যা আনন্দিরাম কুলের আগর।
মুখ রাজকিশোর কবিত্ব কলাধর॥

'কালীকীর্ত্তনের' রামপ্রসাদ বর্ণিত রাজকিশোর এবং ভারতচন্দ্রের উল্লিখিত রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় একই ব্যক্তি কিনা তাহা ঠিক্ করিয়া বলিবার কোন উপায় নাই। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, অন্নপূর্ণা পূজা উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল। 'অন্নদামঙ্গলে' আছে:

সেই রাজা এই অন্নপূর্ণার প্রতিমা।
প্রকাশিয়া পূজা কৈলা অনন্ত মহিমা॥
কবিরস গুণাকর খ্যাতি নাম দিয়া।
ভারতেরে আজ্ঞা দিলা গীতের লাগিয়া॥

ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতচন্দ্র অন্নপূর্ণা পূজার সময় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে "অন্নদামঙ্গল" রচনা করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ কালীকীর্ত্তনে ভারতচন্দ্রের মত গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য খোলাখুলি ভাবে কিছুই বলেন নাই। তবে দুইটি স্থান পড়িয়া গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ও কোন ব্যক্তির আদেশে উহা রচিত হয় তাহাব সামান্য একটা আভাস পাওয়া যায়। 'কালীকীর্ত্তনে' আছে—

(ক) 'শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মোহান্ধের ঔষধ অঞ্জন॥
(খ) 'শ্রীরাজকিশোরে তুষ্টা রাজরাজেশ্বরী॥'

এই 'রাজকিশোর' ও 'রাজরাজেশ্বরী' বাক্য হইতে ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, রাজকিশোর নামা কোন ব্যক্তি রাজরাজেশ্বরী (দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত দেবী বিশেষ) পূজার সময় প্রসাদকে কালীকীর্ত্তনের স্থায়ী রচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাজকিশোর যে প্রসাদের সময়ে স্বনামখ্যাত পুরুষ ছিলেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়, কারণ রাজরাজেশ্বরী পূজার অনুষ্ঠান ধনী ভিন্ন সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সহজসাধ্য নয়।

বিগত ১৩২২ সালে স্বর্গত রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত ৺বিজয়রাম

সেন বিশারদ 'লিখিত' তীর্থমঙ্গল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাহার একস্থানে আছে :

'হুগলীর দেওয়ান রাজকিশোর রায়।
বজরাতে আসিয়া তাঁহে প্রণমিলা পায় ॥*

এই রাজকিশোর রায় অতি সম্ভ্রান্ত বৈদ্য কুলীন ছিলেন। সম্ভবতঃ ইঁহার আদেশেই প্রসাদ 'কালীকীর্ত্তন' রচনা করেন। দেওয়ানজীর মত ধনী ব্যক্তির পক্ষে রাজরাজেশ্বরী পূজার অনুষ্ঠান সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় এবং তাঁহারই আদেশে এই পূজোপলক্ষে প্রসাদ কালীকীর্ত্তনের পালা রচনা করিয়াছিলেন ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ন্যায়রত্ন মহাশয় ও বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতা দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিসীর জামাতা 'কবিন্দ্র কলাধর' রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় কে 'কালীকর্ত্তন' রচনার উৎসাহদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু 'তীর্থমঙ্গলের' বৈদ্যকুলতিলক দেওয়ান রাজকিশোর রায়ের নাম অধিকতর সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা বোধ হয় বর্ত্তমানে অনেকেই স্বীকার করিবেন। তবে দলিলাদির প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া কেহই এ বিষয়টি আলোচনা করিবার সুযোগ পান নাই, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া সকলেই নিজ নিজ অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই সময়ে 'তীর্থমঙ্গল' গ্রন্থ প্রকাশিত থাকিলে বৈদ্য দেওয়ান রাজকিশোর রায়ের প্রসঙ্গ কোন না কোন সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। হুগলী হালিসহর কুমারহট্টের পরপারে অবস্থিত, হুগলির দেওয়ান রাজকিশোর রায় প্রসাদের সমসাময়িক,—এই প্রতিপত্তিশালী বৈদ্য প্রতি-পালক দেওয়ান যে বহু ব্যয় সাধ্য রাজরাজেশ্বরী পূজার আয়োজন করিয়াছিলেন ইহাও সম্ভবপর এবং ইনি বৈদ্য কবি প্রসাদকে উপরোক্ত পূজার সময় 'কালীকীর্ত্তন' রচনার জন্য বিশিষ্ট ভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। যাহা হউক বর্ত্তমানে আমরা দুইজন বিভিন্ন রাজকিশোরের পরিচয় পাইলাম, ইহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির আদেশে যে প্রসাদ 'কালীকীর্ত্তন' রচনা করিয়াছিলেন তাহা সবিশেষ জানিবার উপায় নাই। গুপ্ত কবি বহু

*সম্ভবতঃ 'ইনি হুগলীর ইংরাজ ফ্যাক্টরীর দেওয়ান ছিলেন। 'বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস' প্রণেতা ডক্টর সুকুমার সেন বলেন :

"এই রাজকিশোর ছিলেন হুগলীর দেওয়ান। কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল যখন তীর্থ যাত্রা করেন তখন হুগলীতে ইঁহার বাড়ীতে মধ্যাহ্নে আহারাদি করিয়াছিলেন, এই কথা তীর্থমঙ্গলে বিজয়রাম বলিয়াছেন।

বৎসরের অনুসন্ধানের ফলে প্রসাদ জীবনীর উপাদান সর্ব্বপ্রথমে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি ও রাজকিশোর প্রসঙ্গ আলোচনা করেন নাই।"*

আমরা রাজকিশোর বিষয়ক প্রসঙ্গের আলোচনা হইতে এখানেই নিবৃত্ত হইলাম।

(২) **শ্রীশ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন**—রামপ্রসাদ বিরচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ। কৃষ্ণ কীর্ত্তন এক্ষণে সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। মহাত্মা ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক 'প্রভাকরে' যে অংশটুকু প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা যথাস্থানে প্রকাশ করিলাম। কেহ কেহ বলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইহা সম্পূর্ণ পাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "রামপ্রসাদের কৃষ্ণ কীর্ত্তনের একস্থান হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহকার এবং প্রকাশক যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, "জনসাধারণের অনাস্থা বশতঃ একজন প্রকৃত সহৃদয় কবির এইরূপ একটি কীর্ত্তিলোপে আমরা বস্তুতঃ ব্যথিত।' এখানে মাত্র কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম :

'প্রথম বয়স রাই রসরঙ্গিণী,
ঝলমল তনু রুচি স্থির সৌদামিনী।
রাইবদন চেয়ে ললিতা বলে,
রাই আমার মোহনমোহিনী।

(৩) **কালিকামঙ্গল** বা **কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর :** কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রামপ্রসাদের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে একস্থানে লিখিয়াছেন :—'কবিরঞ্জন' কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন এই তিনখানি গ্রন্থ কেবল লিখিত হইয়াছিল, আর কিছুই লিপিবদ্ধ ছিল না।' (সংবাদ-প্রভাকর, ১লা পৌষ ১২৬০, পৃঃ ৮)। এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় সহজেই চক্ষে পড়ে—কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরের গণেশ বন্দনা, সরস্বতীবন্দনা, লক্ষ্মীবন্দনা, কালীবন্দনার পরই বিদ্যাসুন্দরের প্রারম্ভ। তাহাতে লিখিত আছে জাগরণারম্ভ। অনেকে বলেন,—"এই সম্পূর্ণাঙ্গ। জাগরণ গ্রন্থের নামান্তর 'কালিকামঙ্গল' ছিল বলিয়াই মনে হয়। নিম্নলিখিত পয়ার তাহাই সূচনা করে "—

যে গাওয়ায় যে বা গায় (? (তাহার) মঙ্গল।
নায়ক সহিত শিবা করহ কুশল। (পৃঃ ১৭৬)

ইহার বহু ভণিতায় 'শ্রীকবিরঞ্জন' লিখিত আছে। (পৃঃ ৫, ১৩, ২৪,

*'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন। অষ্টম সংস্করণ ১৩১-৩৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। রামপ্রসাদ—অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৩৫৩-৩৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩৯, ৪২, ৪৭, ৬২ প্রভৃতি—অধিকাংশ ত্রিপদী ছন্দে) সুতরাং নূতন প্রমাণ বলে ইহা ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই—ঐ সনের সনন্দে তাঁহার সর্ব্বজন পরিচিত উপাধির উল্লেখ নাই। গুপ্তকবি লিখিয়াছেন, "মহারাজ রামপ্রসাদাদি বিদ্যাসুন্দর দৃষ্টি করিয়া ভারতচন্দ্রের প্রতি বিদ্যাসুন্দর রচনার আদেশ করিয়াছিলেন।" (সংবাদপ্রভাকর, ১লা পৌষ ১২৬০, পৃঃ ৬) রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার ও ভারতচন্দ্রকে রামপ্রসাদের পরে ধরিয়াছিলেন। (সা-প-প-৫০, পৃঃ ৬২-৩) এবং রামগতি ন্যায়রত্নের মতেও কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনার ২।১ বৎসর পুর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল।" (বাঙ্গালাসাহিত্য, ১ম সং পৃঃ ১৫৪)।"* 'কবিচরিত' প্রণেতা বলেন :—"কবিরঞ্জন, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের সমকালবর্ত্তী সুকবি ছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অঙ্কে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ভারতচন্দ্র ভারত-প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, দুরদৃষ্ট রামপ্রসাদ কেবল কতিপয় পদাবলী রচনা দ্বারাই সাধারণ সমীপে পরিচিত রহিয়াছেন। তিনি উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিতে পারিতেন, এবং তৎপ্রণীত বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্র বিরচিত বিদ্যাসুন্দরের অগ্রজ, ইহা অনেকেই অবগত নহেন। বিদ্যাসুন্দর কোন বঙ্গীয় কবির স্বকপোল কল্পিত কাব্য নহে, উজ্জয়িনীর অধীশ্বর মহারাজা বিক্রমাদিত্যের অন্যতম সভাসদ্ রত্নবর বররুচি প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থই ইহার মূল। সেই গ্রন্থের আভাস গ্রহণ করিয়া প্রথমে প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী, তৎপরে কবিরঞ্জন, এবং সর্ব্বশেষে গুণাকর স্ব স্ব কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। যে কোন বিষয়ই হউক না কেন প্রথমোদ্যোগেই কখন তাহা একেবারে নির্দ্দোষ হইতে পারে না। এক বিষয়ে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের যে যে স্থানে দোষ থাকে, পরবর্ত্তী গ্রন্থকার তত্তাবৎ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ গ্রন্থ উত্তমোত্তম ভাবালঙ্কারে বিভূষিত করিতে পারেন। প্রাণরাম ও রামপ্রসাদ স্ব স্ব প্রণীত গ্রন্থে মূলের সহিত অনেক ঐক্য রাখিয়া গিয়াছেন, ভারতচন্দ্র তাহার দুই এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া নূতন কল্পনার সমাবেশ পুরঃসর নিজ গ্রন্থের উপাদেয়ত্ব সম্পাদন করিয়াছেন। গুণাকর যে চণ্ডীকাব্য, প্রাণরামের কালিকামঙ্গল ও কবিরঞ্জনকে আদর্শ করিয়া অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছেন তাহার পরিচয় তত্তৎ গ্রন্থ পাঠেই বিশেষরূপে উপলব্ধি হয়। অনুকৃতি অপেক্ষা অনুকরণীয় উৎকর্ষ সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি কেহ ভারতচন্দ্র প্রণীত বিদ্যাসুন্দর প্রথম বলিয়া আপত্তি করেন, তাঁহার সুবোধ জন্য ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ যে স্বর্ণালঙ্কার বর্ত্তমানে রৌপ্যালঙ্কার আদৃত

* কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ৩১-৩২ পৃষ্ঠা।

হইবার আশা কে করিতে পারে? রায়গুণাকরের তাদৃশ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছে দেখিলে কোন্ কবি তদপেক্ষা নীরস করিয়া সেই বিষয়ে অভিনব গ্রন্থ প্রচলন করিতে সাহস করিতেন! ফলতঃ দুইখানি বিদ্যাসুন্দর পর্য্যালোচনা করিলে নানা লক্ষণদ্বারা কবিরঞ্জন কৃত বিদ্যাসুন্দরের প্রাথম্য বিলক্ষণ সপ্রমাণ হয়। গুণাকরের উপাখ্যান ভাগ অপেক্ষা ইহার উপাখ্যান ভাগ অতি সরল ও অলঙ্কার নাতিভূষিত। বর্ণনা বিষয়েও যে যে স্থানে গুণাকরের পারিপাট্য ও চাকচিক্য সেই সেই স্থানে ইহার হীনতা দেখা যায়। তাঁহার পূর্ব্বক না হইলে কবিরঞ্জনের রচনায় কেন এত বৈলক্ষণ্য জন্মিবে? কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখান, যদি ঐ বিষয়ের উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ মহারাজের সভাসদ্ ভারতচন্দ্র কর্ত্তৃক পূর্ব্বে প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে রামপ্রসাদ কখনই উহা রাজাকে দেখাইতে সাহসী হইতেন না, এবং রাজাও কখন উহা পাঠ করিয়া তাদৃশী প্রীতিলাভ করিতে পারিতেন না।'

'কবিরঞ্জন সকল রসবর্ণণাতেই বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ অপেক্ষা কি ছন্দোবন্ধ কি বাগাড়ম্বর, কি কল্পনাশক্তি, কিছুতেই হীনকল্প ছিলেন না, বরং শ্রেষ্ঠই ছিলেন। ইঁহার রচনা ওজস্বী, প্রগাঢ় এবং অনুপ্রাস-বাহুল্য। রায়গুণাকরের বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় কবিরঞ্জনের কবিতা সরল ও প্রসাদ-গুণসম্পন্ন নহে বটে, কিন্তু কবিত্বে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে, বরং দুই এক স্থানে উৎকৃষ্ট প্রতীত হইয়া থাকে। যেখানে রামপ্রসাদ পরমার্থ প্রসঙ্গ ও কালী নামের গন্ধ পাইয়াছেন, সেই স্থানেই রচনার শেষ করিয়া তুলিয়াছেন। কবিরঞ্জনের রচনা সরল নহে, তাঁহার এক বিদ্যাসুন্দরেই কোমল ও সরল এবং কুটিল ও কর্কশ রচনা প্রায় সমপরিমাণে মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। কবিরঞ্জনের একস্থানে লিখিত আছে :—

"কালীকিঙ্করের কাব্যকথা বোঝা ভার।
বোঝে কিন্তু সে কালী অক্ষর হৃদে যার॥"

ইহা যদিও গর্ব্বব্যঞ্জক, কিন্তু কবিরঞ্জনের কবিতাবলী এই গর্ব্ব সংরক্ষণে নিতান্ত অসমর্থ নহে। গ্রন্থের কোন কোন স্থল এমন কঠিন, যে সহজে বোধগম্য হইতে পারে না। ফলতঃ নিরপেক্ষ চিত্তে আলোচনা করিয়া দেখিলে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে, যে কবিরঞ্জন প্রণীত বিদ্যাসুন্দর একখানি সুন্দর ও মনোহর কাব্য। ইহার স্থানে স্থানে এমন সুন্দর কবিতা সকল

বিরচিত হইয়াছে যে, পাঠমাত্র পাঠকের অন্তঃকরণে রচয়িতার কবিত্বশক্তি প্রতিভাত হয়। কবিরঞ্জন হিন্দী এবং বাঙ্গালা ভাষা মিশ্রণ করিয়া যে সকল কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভারতচন্দ্রের মিশ্র ভাষার কবিতা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।*

এ বিষয়ে 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন' প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বলেন :—"এই সকল ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত একদিকে ভারতচন্দ্রের রচনার শ্রেষ্ঠতা হেতু এবং অন্যদিকে রামপ্রসাদের প্রতি পক্ষপাতহেতু কল্পিত হইয়াছিল।" তাঁহার এই মন্তব্যটুকু আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না—রামপ্রসাদের প্রতি পক্ষপাতহেতু কল্পনা করা কি সঙ্গত? ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সমসাময়িক, কাজেই পরবর্ত্তী লেখকগণ কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন এরূপ মনে করা বোধ হয় ঠিক্ নয়। রামপ্রসাদকেও গ্রন্থরচনা সম্বন্ধে ও সন তারিখ ইত্যাদি বিষয়ে "ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর এবং এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের জন্মের পূর্ব্বে ১৭৬০—৭০ খ্রীঃ মধ্যে রামপ্রসাদ গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়।" এ বিষয়ে অধিক আলোচনা এক্ষেত্রে অনাবশ্যক। কে কাহার আগে রচনা করিয়াছেন সে বিষয়ে বিভিন্ন মত বিদ্যমান থাকিলেও রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল বা কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরের সহিত ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের তুলনামূলক আলোচনা করিলে উভয়ের রচনার, বর্ণনার ও বিষয়-বস্তুর বৈশিষ্ট্য কল্পনা ও চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে বিভিন্নতা ও বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের মধ্যে কে আগে এবং কে পরে বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন তাহাও সুমীমাংসিত নহে। হয়ত সময়ে নবীন গবেষণাকারীরা সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন। যদি রামপ্রসাদের হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে সঠিক্ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইত। আমরা এ প্রসঙ্গ লইয়া আর অধিক আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না।

বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল অপৌরাণিক আখ্যায়িকা কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের অপর নাম কবিরঞ্জন। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান এইরূপ :

কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর

কবিরঞ্জন প্রথমে গণেশ, সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালী বন্দনার পর আখ্যায়িকা আরম্ভ করিয়াছেন। বীরসিংহ মহামতি ছিলেন বর্দ্ধমানের রাজা। তাঁহার

* কবিচরিত—শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

বিদ্যা নামে এক পরমা রূপবতী কন্যা ছিল। বিদ্যার উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধানের জন্য মাধব ভাট রাজা কর্তৃক প্রেরিত হইলেন।

ভ্রমিল অনেক ঠাঁই, উপযুক্ত মিলে নাই
শেষে কাঞ্চীদেশে উপনীত।

অবশেষে সেখানে :

পাঠশালে পড়ুয়া সঙ্গে, সুকবি সুন্দর রঙ্গে,
রূপ দেখি ভট্ট হরষিত।

সুন্দরকে দেখিয়া মাধব ভাট তাঁহাকে রূপবতী ও বিদ্যাবতী বিদ্যার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনে করিয়া সুন্দরকে দেখিয়া—

শিরে উঠাইয়া হাত, কহিতেছে হিন্দি বাত,
শুনি সুখী সুন্দর নীরব॥
বাবুজি কুর্ণিশ মেরা, বর্দ্ধমান বিচ ডেরা,
নাম তো হামারা মাধো ভাট।
আরজ করেঁগে পিছে, ঘড়ী এক বৈঠে নীচে,
আর তো লাগায় তোম হাট॥
আয়া হোঁ যো চড়ে ঘোড়ে, তস্‌দিয়া পায়া হোঁ বড়ে,
ও লেকেন ভুল গেয়া সব।

* * * *

বীরসিংহ নাম রাজা, জাত্‌মে হ্যায় বড়া তাজা,
শোন হোঁগে ওন্‌কা জেকের।
ওন্‌কা ঘর্‌মে লেড়্‌কী এক, তারিফ করেঁগে কেত্তেক
রাত দিন সাদিকা ফেকের।

তারপর মাধব ভাট বিরলে সুন্দরকে ডাকিয়া লইয়া পরম রূপসী বিদ্যার রূপ ও গুণ বর্ণনা করিলেন। সুন্দর মুগ্ধ হইলেন—সেই বিদ্যা সুন্দরীর জন্য ব্যাকুল হইলেন।

পিয়া বিদ্যানাম সুধা, সুন্দরের গেল ক্ষুধা,
রত্নাগারে করিলা শয়ন।
ঘোরতর নিশি শেষ, ধরি কালী নিজ বেশ
সবিশেষ কহেন স্বপন॥

ভাব কেন ওরে ভক্ত, আমি তব অনুরক্ত,
সেওতো আমার দাসী বটে।
পরম রূপসী সেই, একান্ত জানিবে এই,
তরুণী তোমার তরে বটে।

এইখানে দেবী সুন্দরকে কিভাবে কি করিতে হইবে, সে বিষয়েও উপদেশ দিলেন।

সুন্দর দেবীর স্বপ্নে আদেশ অনুসারে বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন। ভক্তকে ভয় দেখাইবার জন্ম দেবী ভগবতী এক মায়া নদীর সৃষ্টি করিলেন। সুন্দর নদীর বিশালতা এবং গভীরতা ও তাহার বেগবতী স্রোতোধারা দেখিয়া বিমূঢ় হইয়া নদীতীরে দাঁড়াইয়া কি করিবেন ভাবিতেছিলেন। সে নদী কেমন?

ছিল না কাণ্ডারী তরী অত্যন্ত গম্ভীর।
তালবৃক্ষ তুল্য ভাসে প্রলয় কুম্ভীর॥
সুতুঙ্গতরঙ্গরঙ্গ অঙ্গ কাঁপে ডরে।
ফাঁপর হইল ফিরে যেতে চাহে ঘরে॥
হেনকালে শুনহ অপূর্ব্ব এক কথা।
অকস্মাৎ মহাযোগী উপস্থিত তথা॥

অকস্মাৎ আবির্ভূত মহাযোগী সুন্দরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কি নাম কোথায় ধাম কাহার তনয়, কি উদ্দেশ্যে কোথায় সে যাইবে?

সুন্দর কহেন নিবেদন মহাশয়।
কাঞ্চি দেশে ধাম গুণসিন্ধুর তনয়॥
সুন্দর আমার নাম বিদ্যা-ব্যবসাই।
বিদ্যা অন্বেষণে বীরসিংহ দেশে যাই॥

যোগী বলিলেন—

পথঘাট নাহি জান যাইবা কেমনে?

সুন্দর বলিলেন—দনুজ-দলনী শ্যামা যাহার জননী, জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে কোথাও কি তাহার কোন ভয় থাকিতে পারে? যোগী সুন্দরকে কহিলেন—জগত পালক শিবপদ ভজনা কর, কেননা দেবদেব আশুতোষ সৌখ্য-মোক্ষদাতা এবং সঙ্কটে শঙ্কর ভিন্ন কেহ ত ভয়ত্রাতা নাই। তুমি 'কালী-মন্ত্র পরিহর হরমন্ত্র লহ।' সুন্দর যোগীর কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—শৈলপুত্রী মুক্তিকর্ত্রী জগদ্ধাত্রী কালী ব্যতীত আমি অন্য কোন দেবতার নাম

গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। তখন নিজের মধ্যে 'খুঁজিল সায়ার নদী যোগী নাহি কাছে।'

গোহাইল বিভাবরী উদয় তপন।
শ্রীদুর্গা স্মরণ করি করিলা গমন॥
কাঞ্চীপুর হইতে সহর বর্দ্ধমান।
ছয় মাসে আসে লোক কণ্ঠাগত প্রাণ॥
কেমনে কালীর কৃপা কি কব বিশেষ।
দশম দিবসে কবি করিলা প্রবেশ॥

এখানে ভক্ত কবিরঞ্জন বলিয়াছেন:

প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপাময়ী।
আমি তুয়া দাস দাস দাসী পুত্র হই॥

এইবার সুন্দর বর্দ্ধমানে প্রবেশ করিলেন। রাজধানী ও গড়ের বর্ণনায় কবিরঞ্জনের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা দেশের সামাজিক অবস্থাও জানিতে পারি। লোকে স্বচ্ছন্দে বাস করে, দিব্য পরিচ্ছদ পরে, গান বাজনা করে, রোগ দুঃখ শোক নাই, অধর্ম্মের লেশ মাত্র নাই। বালবৃদ্ধ যুবা, রাগরঙ্গ ও উত্তম প্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করে।

পরস্পর সুকৌতুক, কাব্যছাড়া একটুক,
কদাচিত মুখে নাহি ভাষা।
গোধনরক্ষক যারা, সঙ্কীর্ত্তন ভাষে তারা,
কে বুঝে পণ্ডিত কেবা চাষা।

রাজধানী ও গড়ের বর্ণনায় ইরাণী, তুর্কী, পাঠান, মোগল সেপাইর কথা আছে। মোগলদের চাঁপদাড়ী মেতীকটা। মাথার উপরে হেঁড়ে পাগ। পারসি আরবি ভাষায় কথা বলে। আর মোল্লা মোকাদিমা কাজি আখিল এলাক রাজি, ইয়ে হফীজকে কিয়ো আওয়াজ।

কোনরূপে নহে কাঁচা, দিন এমানত সাঁচা,
পাঁচ ওক্তে করয়ে নমাজ।
কোহি দেলমে নাহি সুজে, ক্যা হোগা আখের বুঝে,
কিয়া হোঁ বহুত বুরা কাম।

এই ভাবে গড় ও সহরের বর্ণনা, সহরের অধিবাসীর প্রকৃতি ও রুচি বর্ণনা, যেমন আছে তেমনি মল্লবীর, তীরন্দাজ, রায়বেঁশে প্রভৃতির উল্লেখও রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে বিদেশী সেফাই সান্ত্রী—যাহাদের হিজি বিজি কথা

বুঝিতে পারা যায় না। তাহারাও 'বাঙ্গালিরে দেখে যেন ভেড়া।' সেকালেও বাঙ্গালীর এই দুর্নাম ঘোচে নাই!

বাজার বর্ণনায় বিবিধ দ্রব্যের পরিচয় রহিয়াছে। মণি, মুক্তা প্রবাল যেমন আছে, তেমনি বস্ত্রাদির মধ্যে বনাত, মখমল, পট্টু ভুসনাই খাসা, বুটাদার, 'ঢাকাইয়া দেখিতে তামাসা।' আশ্চর্য্যের বিষয়:

বিলাতি বহুত চিজ বেস কিস্মতের।
খরিদার নাহি পড়্যা, পড়্যা আছে ঢের॥

সেকালেও বাজারে বিলাতী জিনিষের প্রচুর আমদানী হইত, তবে ক্রেতার সংখ্যা বড় বেশী ছিল না। তারপর সরোবর বর্ণন:

তাহার দুই একটি পংক্তি কবিত্ব পূর্ণ। যথা:—

অলিকুল বিকল বকুলে পিয়ে মধু।
গুঞ্জরে মঞ্জিম রব পরভৃত বধূ।
*　　*　　*
চক্রবাক চক্রবাকী খেলে চঞ্চুপুটে।
খঞ্জন-খঞ্জনী প্রেম তিলেক না টুটে॥
*　　*　　*
ক্ষণেক গগনে ঘন ঘোরতর রব।
সখি দেখি শিখী শিখি সঘনে তাণ্ডব॥

অতঃপর বকুলতলায় সুন্দর-দর্শনে নাগর-নাগরীদিগের উক্তি, মালিনীর সহিত সুন্দরের পরিচয়, বিদ্যার রূপ বর্ণন অতি চমৎকার। মালিনী সুন্দরকে বলিলেন:

সেরূপের সীমা কবে এত শক্তি কার।
সে পারে কহিতে কিছু শত মুখ যার॥

সুন্দর কহিলেন—সে রূপের কথা কহ শুনি আগে, তখন মালিনী বলিল:

চাঁচর চিকুরজাল জলধর জিনি।
শ্রুতিযুগে পরাভব পাইল গিধিনী॥ (গৃধিনী)
ডুবিল কুরঙ্গশিশু মুখেন্দুসুধায়।
লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়॥
নয়নের চঞ্চলতা শিখিবার তরে।
অদ্যাপি খঞ্জন নিত্য কর্ম্ম ভোগ করে॥
অমিয়াজড়িত ভাষা নাসা তিলফুল।
বিম্বাধর দশনে মুকুতা নহে তুল॥

পুষ্পধনু-ধনু অণু কি ভুরুভঙ্গিমা।
বাহুতুল নহে বিসে কিসের গরিমা॥
যৌবনজলধি মধ্যে মগ্ন মত্ত গজ।
উরে দৃষ্ট কুম্ভস্থল সে নহে উরজ॥
নাভিপদ্ম পরিহরি মত্ত মধুপান।
ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণকুম্ভস্থান॥
কিম্বা লোমরাজিছলে বিধি বিচক্ষণ।
যৌবন কৈশোরে দ্বন্দ্ব করিল ভঞ্জন॥
কেহ বলে মধ্যস্থল নাহি কি রহস্য।
কেহ বলে দেবসৃষ্টি থাকিবে অবশ্য॥
সূক্ষ্ম বিবেচনা তাহে বুঝিবে প্রবীণ।
বিজ্ঞ বট ভাব দেখি কি প্রকার ক্ষীণ॥
নিবিড় বিপুল চারু যুগল নিতম্ব।
কাম-পারাবার-পার সার-অবলম্ব॥
যদ্যপি অচিরপ্রভা চির স্থির হয়।
তবে বুঝি তনুশোভা হয় কি বা নয়॥
মন্দ মন্দ গমনে যদ্যপি বাঁকা চায়।
মনোভব পরাভব লইয়া পলায়॥
কোন্ বা বড়াই তার পঞ্চশর তূণে।
কতকোটি খরশর সে নয়ন কোণে॥
পোড়াইয়া কাম নাম বটে স্মরহর।
তাঁহার অসহ্য বালা হানে দৃষ্টিশর॥

বর্ণনায় অনুপম এবং স্বাভাবিক একথা বলিতেই হইবে।

সেকালের মালঞ্চে কি কি ফুল ফুটিত সেকথা জানিবার কৌতূহল স্বাভাবিক। আমরা দেখিতে পাই—তখনকার মালঞ্চে—কাঞ্চন, কস্তুরী, বক, অপরাজিতা, চম্পক, মালতী, মল্লিকা, কুন্দ, সেফালিকা, কেতকী, জুতি, গন্ধরাজ, নাগকেশর, বকুল, কিংশুক, রঞ্জন, কদম্ব, কামিনী, শতদল, সূর্যমণি, জবা, কৃষ্ণকেলি, টগর, কাঞ্চন, মাধবীলতা, শোণ, সর্বজয়া, অশোক, নিশিগন্ধা, সেঁউতি, গোলাব, ধাতকি, ঝিন্টি, মুচকন্দ প্রভৃতি ফুল মালঞ্চের শোভা বর্দ্ধন করিত। সে সময়ে বিকশিত পুষ্প-মাধুর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে মালঞ্চ যেন হাসিতে থাকিত।

কোকিল কুঞ্জিত, ভ্রমর গুঞ্জিত,

ফুলে পিয়ে মকরন্দ।

মালিনী পুষ্প চয়ন করিয়া সুন্দরকে দিলে, তিনি কি করিলেন ?

শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালীপদ সার।

বিরলে বিনোদবর গাঁথে পুষ্পহার॥

সুন্দরের মালা গ্রন্থন মধ্যে সুকৌশলে তাঁহার পরিচয় লিখন দিলেন।

মালিনীকে হাটের হিসাব দিতে বলিলে, সে কহিল—সমুদয় দ্রব্যই অগ্নি মূল্য 'দু টাকায় কিনিলাম দুই সের ঘি।' মালিনীর নিকট হইতে বাজারের হিসাব পাইয়া,

সুন্দর হাসেন মনে আমি এক চোর।

চাতুরী করিয়া মাগী কড়ি খায় মোর॥

কিন্তু মালিনী ত বড় সহজ মানুষ নয়, সে আপনার বড়াই করিতে গিয়া বলিল,—

এই যে তোমার মাসী বোধে নহে টুটা।

কে পারে ভুলাতে কার ঘাড়ে মাথা দুটা॥

পুরুষের কান কাটে ধরে শক্তি হীরা।

ফাঁকী দিয়া চাকি ভুক্তে গায় করে ফিরা॥

এ হেন হীরা মাসী। সুন্দর গ্রন্থিত পুষ্প ও মাল্য লইয়া বিদ্যার নিকট গমন করিলে—বিদ্যা সেই মালা দেখিয়া প্রশ্ন করিল মালিনীকে যে মালা গাঁথিয়াছে তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য। মালিনীর প্রতি বিদ্যার অনুনয়ে অবশেষে মালিনী, একে একে সুন্দরের সহিত তাহার কেমন করিয়া পরিচয় হইল তাহা বিস্তারিত ভাবে বলিয়া কহিল,—

কাঞ্চী নামে দেশ ধাম, সুধাময় হাস্য।

সুন্দর সুন্দর নাম পদ্মসুন্দরাস্য॥

বদনে বিরাজে বাণী বিদ্বান্ বিপুল।

পঞ্চবক্ত্র পদ্মযোনি প্রায় সমতুল॥

দৃষ্টিমাত্র মম দেহ দহে দিবানিশি।

বৃদ্ধার বাসনা হয় বাঁচে কি রূপসী॥

তখন বিদ্যা সুন্দরকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুলা হইলেন, এবং বলিলেন :

এ দুঃখ সাগরে হীরা তুমি এক তরী।

স্নান ছলে হীরা বিদ্যাকে সরোবর তীরে সুন্দরকে দর্শন করাইলেন, সুন্দরকে

দর্শন করিয়া বিদ্যা মুগ্ধা হইলেন। এদিকে সুন্দরেরও বিদ্যাকে দর্শন করিয়া মোহ হইল। বিদ্যা ভগবতীর স্তব করিলেন, দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন :—

কৃপাকর কৃপাময়ি, কেহ নাহি তোমা বই,
শঙ্করী কিঙ্করী তব ডাকে।
সুন্দর সুন্দর তনু, অভিন্ন কুসুমধনু
সেই পতি দেহি মা আমাকে।

সুন্দরের চিত্তেও বিদ্যারই মত মিলনাকাঙ্ক্ষার ব্যাকুলতা, সুন্দরও ভগবতীর স্তব করিলেন। সকলসিদ্ধিদাতা গিরীশ প্রমদা, সুন্দরের স্তবে পরিতুষ্টা হইয়া বর দিলেন :—

ভয় নাহি বচ্ছ, ইহা কোন্ তুচ্ছ
সুখে কর পরিণয়॥
অপরূপ কথা, অকস্মাৎ তথা
হইল সুড়ঙ্গ পথ।

সুড়ঙ্গ পথে আরম্ভ হইল উভয়ের গমনাগমন। বিদ্যা ও সুন্দরের বিচারের ফলে :

হেসে বলে হরিণাক্ষী হারিলাম আমি।
সুপুরুষ সুন্দর সুধীর সত্য স্বামী॥

বিদ্যা ও সুন্দরের বিবাহ

বিদ্যা সুন্দরের বিবাহ ও মিলন হইল। দাম্পত্য মিলন ও সম্ভোগের ফলে বিদ্যার গর্ভ দৃষ্টে সখীগণের নানা যুক্তি চিন্তা, অবশেষে রাণীর নিকট বিদ্যার গর্ভবার্ত্তা প্রদান, রাণীর বিদ্যার প্রতি ভৎর্সনা, রাণীর সহিত বিদ্যার বাক্‌চাতুরী, বিবিধ ঘটনান্তরের পর—নৃপতি বিদ্যার গর্ভ সংবাদ শ্রবণে কোটালকে ডাকিয়া আনিলেন—বলাই কোটালকে নৃপতি বিশেষ ভাবে তর্জ্জন করিলেন এবং চোর ধরিবার জন্ত আদেশ দিলেন। কোটালের বিপদ ও বিপন্ন অবস্থা দেখিতে পাইয়া কোটালিনী কর্তৃক ভদ্রকালীর স্তুতি :

দেবী অনুকূল ফুল পাইল প্রসাদ।
হাস্যযুতা বিধুমুখী হৃদয়ে আহ্লাদ॥
যত্নে সেই ফুল দিল প্রাণনাথ হাতে।
ভক্তি করি কোতোয়াল রাখে নিজ মাথে॥

কোটালের পত্নী রাণীর নিকট হইতে চোরের দুষ্কার্য্য জানিতে পারিয়া দেবীর বরে প্রসাদী ফুল লাভ করিয়া, স্বামীকে চোর ধরিবার জন্ত উৎসাহিত করিলেন।

'কোটালের চোর অন্বেষণে সজ্জার' বর্ণনা বাঙ্গালা, হিন্দী, পারসী ও আরবী ভাষায় বিরচিত। কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম :

সাজে কোতোয়াল, লে খঞ্জর ঢাল, দো আঁখিয়া লাল,
সোবাণ পতঙ্গ, চড়ে গজতুঙ্গ, ঘুমাওত অঙ্গ,
সেতাব করি।
যোয়ায়ত সাত, তুঝে দেওমে হাত, কহে মিঠি বাত,
পিছে হোকে আও, কোহি মত যাও, মেরে সের খাও,
হো পাঁও পরি।

ইত্যাদি। সহরে চোর ধরণার্থে নগরবাসীর প্রতি কোতোয়ালবাহিনীর দৌরাত্ম্য হইতে সেকালের 'পুলিশি জুলুমে'র প্রকৃত পরিচয় পাই।

চোর ধরিবার জন্য ঘরে ঘরে বিষম বেদাতি করে ; বিদেশীকে বেন্ধে মারে কোড়া, উৎপাতের দরুন লোক পলাইতে আরম্ভ করিল, শিষ্ট লোকের পক্ষে নগরে বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়িল।

ফাটকেতে রাখে বন্দী, কে বুঝে তাহার ফন্দী
সাবল তাওয়াইয়্যা দেয় হাতে॥

কাহাকেও সারারাত্রি হাড়্যা ঠুক্যা রাখে। এইভাবে অত্যাচারের— নির্য্যাতনের মাত্রা সীমা ছাড়াইয়া গেল, তবু কিন্তু চোর ধরা পড়িলনা।

এথা চোরচূড়ামণি, দণ্ড-কমণ্ডলু পাণি
কখন বা ব্রহ্মচারি-বেশ।
অবধৌত কোন দিন, আসন শার্দ্দূলাজিন,
দীপ্যমান দ্বিতীয় দিনেশ॥

চোর ধরিবার জন্য কোতোয়াল পাঁচশত 'হরকরা' বা চর নিযুক্ত করিল

কত পাটনির ঠাটে খেয়া দেয় ঘাটে।
কত বা দানির ছলে দান সাধে মাটে॥
দশ বিশ জন ধরে ব্রজবাসীর বেশ।
কত সবচুল কত মুড়াইল কেশ॥
কেহ কটিতে কৌপীন মাত্র তাহাতে গিরস
সদা করে কেবল ভক্ষণ নামরস॥
গৌড়রাজ্যে গোঁড়াগুলা চলে যে যে ঠাটে।
সেরূপে ভ্রময়ে কত হাটে ঘাটে মাঠে॥

খাসা চীরা বহির্ব্বাস রাঙ্গা চীর মাথে।
চিকন গুধড়ী গায় বাঁকা কোঁৎকা হাতে॥
মুঞ্জ-গুঞ্জ ছড়া গলে ঠাঁই ঠাঁই ছাব।
দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টি ছাড়া ভাব॥
পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে থান সাত আট।
ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট॥
এক এক জনার ধুমড়ী দুটি দুটি।
দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটি॥
ভুগলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে।
বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম উঠে ডেকে॥

সে রসে রসিক নবশাক লোক যত।
উঠে ছুটে পায় পড়ে করে দণ্ডবত॥
সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজবাড়ী।
ভালমতে সেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি॥
গোষ্ঠীশুদ্ধ খাড়া থাকে বাবাজির কাছে।
মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে॥

নানা রস ভুঞ্জায় শোয়ায় দিব্য খাটে।
শেষে মেয়ে পুরুষেতে পত্র শেষ চাটে॥
বৈষ্ণববন্দনা গ্রন্থ সকলে পড়ায়।
ছত্রিশ আশ্রম নিয়া একত্র জড়ায়॥
কেমন কলির কর্ম্ম কব আর কি।
মজাইল গৃহস্থের কত বহু ঝী।

কেহ কেহ এই অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া রামপ্রসাদের বৈষ্ণব বিদ্বেষের কথা প্রচার করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় এই বর্ণনা বৈষ্ণব বিদ্বেষ-মূলক নহে, সেকালের অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবসমাজের মধ্যে যে ব্যভিচার ও ধর্ম্মের নামে যে সকল পাপানুষ্ঠান ও ভণ্ড আচরণ প্রবেশ করিয়াছিল তাহারই প্রকৃত বর্ণনা। সে কালের সামাজিক রীতিনীতি ও প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি বুঝিবার পক্ষে ইহার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী।

তারপর চোর ধরার জন্য কেহ সাজিল রামানন্দী। কেহ সাজিল ফকীর, অবধূত, ভিক্ষুক। এই সকল ছদ্মবেশীদের বিষয় বলিতে গিয়া কবি তাহাদের

অর্থাৎ ঐ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন, বেশ সুনিপুণ-ভাবে। সেই অংশটুকুও এখানে উদ্ধৃত করিলাম :

শতাবধি জনে হয় খাসা রামানন্দী।
অঙ্গ সঙ্গোপনে তারা ভাল জানে সন্ধি॥
পাঁচ হাতিয়ার বান্ধা বিষম দুরন্ত।
অনেক তাহার মধ্যে প্রাচীন মহান্ত॥
দেবল দেখিলে যেন পায় ভক্ষ নাড়ু।
ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়া কেড়ে লয় গাড়ু
মার পিটে ধুমধাম করয়ে লহর।
ভয় নাই লুট্যা খায় রাজার সহর॥
কেহ বা বিষম বাঁকা জালালি ফকির
কাঁকালে কুঠার গাঁথা পায়েতে জিঞ্জির
বাঁ হাতে লোহার খাড়ু শিরে পাগ কালা।
কান্ধে ঝুলী গলে কত তরবেতর (তর তর) মালা
যার বাটী যায় তার নাকে আনে দম।
কয়েফেতে চুর চুর নদারদ গম॥
কত অবধৌত কত যতি ব্রহ্মচারী
হাজারে হাজারে ফিরে নানা ভেকধারী॥
হেকমতে কতগুলা হইল কাঙ্গালি।
মরা পাড়া পড়্যা পড়্যা থাকে গলি গলি॥
লোকে জিজ্ঞাসিলে কেহ নাহি কাড়ে রা।
দুই চক্ষু বুজে থেকে থেকে করে হা।
মেয়ে হরকরা গৃহস্থের ঘরে ঘরে।
চোর অন্বেষণ করে কত মায়া ধরে॥
নিদ্রা নাহি যায় লোক কোটালের ডরে।
খেতে শুতে শান্তি নাই কখন কি করে॥
সন্ধ্যার সময় বড় পড়ে তাড়াতাড়ি।
রজনীতে কেহ নাহি যায় কারু বাড়ী॥
পূর্ব্বমত গানবাদ্য নাহি রাগরঙ্গ।
মহাভয়যুক্ত লোক সদা রঙ্গ ভঙ্গ॥

কবিরঞ্জনের এই বর্ণনা হইতে আমরা বাঙ্গালাদেশে কোন্ কোন্ ধর্ম্মাবলম্বীরা

কিভাবে ধর্ম্মের নামে মিথ্যাচার ও পাপাচার অনুষ্ঠান করিত, কি ভাবে গৃহস্থের বৌ-ঝীর সর্ব্বনাশ করিত, সে পরিচয় যথাযথভাবে পাই।

আরও রহিয়াছে কিভাবে রামানন্দী, জালালি ফকির, যতি, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে পর্য্যটন করিয়া ধর্ম্মের অজুহাতে অজ্ঞ নরনারীকে পাপানুষ্ঠানে ব্রতী করিত তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন ইহা হইতে পাইতেছি।

যাঁহারা মনে করেন রামপ্রসাদ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ছিলেন বলিয়াই ঐরূপ কথা লিখিয়াছেন, আমরা তাহা মনে করি না, তৎকালীন সমাজের প্রকৃত চিত্রই তিনি উপস্থাপিত করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর লৌকিক ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে এই সব বর্ণনা আমাদের একান্ত সহায়ক।

আর একটি বিষয়ও আমাদের চক্ষে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। বর্ত্তমান কালের ন্যায় অষ্টাদশ শতাব্দীতেও পুরুষ ও নারী গোয়েন্দার প্রচলন ছিল। এবং কৌটীল্যের শাসন ও শাস্তি বোধ হয় সে কালেও শাসকগণ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। সে সমুদয়ও অনুধাবনযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম ও সমাজ আচার ও অনুষ্ঠানের বিষয় আলোচনা করিতে গেলেও আমরা প্রাচীন কবিদের রচনার মধ্য হইতে ধর্ম্ম ও সমাজের গ্লানি, নিন্দা ও বিরূপ সমালোচনা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। সে সমুদয় যে দ্বেষমূলক তাহা আমরা মনে করি না। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার রচনার মধ্যে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপের দ্বারা উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ, ধর্ম্ম, স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেগুলিকে যদি আমরা পরিহার করি, উনবিংশ শতাব্দীর সমাজের প্রকৃতরূপের পরিচয় হইতে তবে বঞ্চিত হইব। এ সব দিক লক্ষ্য করিয়া আমরা বলিতে পারি, রামপ্রসাদ অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করিয়া এবং শাক্ত ছিলেন বলিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছেন আমাদের এই অনুমান যুক্তিসহ নহে। তাহা হইলে উনবিংশ শতাব্দীর বা বিংশ শতাব্দীর লেখকগণকেও সেই অপরাধে নিঃসন্দেহে অপরাধী করা যায়।

এদিকে পাঁচদিন কাটিয়া গেল, চোরের সন্ধান মিলিল না। তখন হীরারায় নামে কোটালের এক খুড়া ছিলেন, তিনি কোটোয়ালকে বলিলেন :

কহে বাপু কেন হাপু গণ যুক্তি আছে।
সঙ্গোপনে যাও বিদ্যু ব্রাহ্মণীর কাছে॥
তাহার অসাধ্য কর্ম্ম ভূমণ্ডলে নাই।
অবশ্য চোরের তত্ত্ব পাবে তাঁর ঠাঁই॥

খুড়ার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কোটোয়াল বিদ্যু ব্রাহ্মণীর কাছে গমন করিয়া

তাহাকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, মাসী আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। বিদু ব্রাহ্মণী বলিলেন তোমার কি বিপদ বল, তখন কোটোয়াল বলিল, বিদ্যার সমাচার হয়ত শুনিয়া থাকবে, এ ঘোর সঙ্কটে তুমি আমাকে নিস্তার কর। তোমা ভিন্ন আর আমার গতি নাই।

তোমা বই গতি নাই পৃথিবীতে মোর।
'পূজিব চরণ দুটি যদি পাই চোর।'
বিদু বলে হাসি হাসি এত বড় দায়।
আজি যাও কালি চোর মিলিবে তোমায়।
বাহু তুলি কুতূহলী নাচে নিশিনাথে।
আকাশের চাঁদ যেন পায় নিজ হাতে॥
কোটাল চলিয়া গেল আপনার ঘর।
বিদু যায় বিদ্যা বিনোদিনীর গোচর।

কিন্তু সেখানে বিদু ব্রাহ্মণীর কোন ছলা কলাই খাটিল না। বিদ্যার সখিগণ বিদুর কুৎসিত কথনে ক্রুদ্ধ হইয়া বিদুকে লাঞ্ছনার একশেষ করিল। তাহার এক গালে চূণ দিল আর গালে দিল কালি।

ঠেসে ধর‍্যা ঠোনা মারে ঠগিনী বলিয়া।
ঘন ঘন মুখ ঘসে মাটিতে ফেলিয়া॥
কেবল ব্রাহ্মণী হেতু জীবন রহিল।
ঢেকা মেরে বাড়ীর বাহির করে দিল।
হাঁইফাঁই করে দুই চক্ষে পড়ে জল।
মনে ভাবে অসৎ কর্ম্মে বিপরীত ফল।

বিদু ব্রাহ্মণীর নিগ্রহের পর চোর ধরিবার জন্য রাজার অনুমতি লইয়া কোটাল বিদ্যার শয়নমন্দিরে পঞ্চাশ মণ সিন্দুর আনিয়া খট্টাদি যতেক ছিল বিচিত্র ভূষণ তাহাতে সিন্দুর বিলেপন করিল। ইহার ফলে সুন্দরের বসন সিন্দুরে রঞ্জিত হইয়া গেল। মালিনীর গৃহে পৌঁছিয়া সুন্দর ইহা বুঝিতে পারিয়া, হীরার মারফতে সংগোপনে বস্ত্রখানি কাচিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং ধোপাকে দুনা কড়ী দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু তবু নিস্তার হইল না। সিন্দুর চিহ্নিত বস্ত্র দৃষ্টে কোটোয়ালের অনুচরেরা ধোপাকে ধরিয়া ফেলিল। রজককে নিপীড়ন করিলে সে হীরার নাম বলিল—কোটোয়াল হীরাকে বাড়ী নিয়া গ্রেপ্তার করিল এবং বিবিধরূপ কুৎসিত গালাগালি করিতে লাগিল এবং অতি নির্ম্মমভাবে :

পয়জার চট চট কিল গুম গুম।
আঁকপাঁক ঘুরাইল আর কোথা ঘুম॥
মারণের চোটে বটে ভয়ে ভূত ছাড়ে।
বুকে হাঁটু দিয়া ঠেঙ্গ তুল্যে বান্ধে ঘাড়ে।
তখনি কান্দিয়া কহে ভাইরে বাঘাই।
নারীহত্যা করিও না জল দেও খাই॥
কাতর দেখিয়া তার বন্ধন খুলিল।
হাসিয়া কোটাল তারে ধরিয়া তুলিল।

হীরাবতী নির্য্যাতনের ফলে সুন্দরের কথা বলিয়া দিল। সুন্দর সুড়ঙ্গ মধ্যে পলায়ন করিল। কোটোয়াল সুড়ঙ্গ খনন করিয়াও সুন্দরকে ধরিতে পারিল না। এদিকে সুন্দর সুড়ঙ্গপথে বিদ্যার কাছে আসিল—বিদ্যার পরামর্শে নারীবেশ ধারণ করিল।

বাঘাই কোটোয়াল বড় সহজ মানুষ ছিল না, তিনি সসৈন্যে পুরী ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং বিদ্যার সহচরীগণকে খন্দক লঙ্ঘন পরীক্ষা করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। নারীবেশধারী সুন্দর--খন্দক লঙ্ঘন করিতে গিয়া ধরা পড়িল।

দক্ষিণ চরণে তারি দাঁড়াইল পাড়ে।
ব্যাঘ্রপ্রায় কোটাল পড়িল গিয়া ঘাড়ে।

এবং সুন্দরকে বন্ধন করিল। সুন্দরের বন্ধনদৃষ্টে বিদ্যা অনেক খেদ করিল, সেই খেদোক্তির দুইটি পংক্তি অতিসুন্দর—

রোপিলাম প্রেমতরু, না ফলিল ফল যার
উপাড়িলা অঙ্কুরে আপনি॥

কোটালের প্রতি বিদ্যার বিনয়োক্তি, চোর দৃষ্টে রাণীর বিদ্যার প্রতি বিলাপ, বিদ্যার স্তবে কালীর অভয় প্রদান, চোর দর্শনে নাগরিকজনের খেদ, রাজার সহিত চোরের ব্যাজোক্তি উপভোগ্য। বাঘাই কোটাল চোর নিয়া বীরসিংহ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল:

গরীব নেওয়াজ বলি আদাব সেলাম।
নজর দৌলত এই চোর লেয়া হাম॥

রাজা সুন্দরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাই কৌতূহলি হইয়া পাত্রের প্রতি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। পাত্র বলিল :

দেহ পরিচয় সত্য দেহ পরিচয়।
যদি মিথ্যা কহ তবে জীবন সংশয়॥

তখন সুন্দর উত্তর দিলেন :

দাড়ি ভুঁড়ি সার কোন জ্ঞান নাহি মাত্র।
হবচন্দ্র রাজা যেন গবচন্দ্র পাত্র॥
বনপশু বুঝেছি বলিয়া দেন তুড়ি।
রাজা বট যেন সার কাঁঠালের গুঁড়ি॥
ছয় মাস গতে কর্ম্ম সুধাও কি জাতি।
কেননা হইবে তুমি নিজে হও কাতি॥
তব চর্য্যা চর্চ্চিলাম আলাগে ক্ষণেক।
দ্বিপাদ পশুর মধ্যে তুমি হে জনেক॥
কদাচিৎ মিলে যদি তোমার দোসর।
চাষায় পরশ পায় তুনা বাড়ে দর॥

সভাস্থ সকলে এইরূপ উত্তর শুনিয়া অপমানিত মনে করিলেন। এইবার

দ্বিজগণ কহে কহ রূপগুণযুত।
কোন্ কুলে জন্ম ধাম নাম কার সুত॥

সুন্দর উত্তর করিলেন :

জনম মানবকুলে শম্ভুধাম ধাম।
পিতামাতা শিবশিবা কালিদাস নাম॥

কোনরূপে পরিচয় না পাইয়া রাজা বিরলে কোটোয়ালের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন এবং বলিলেন :

হেদে নিশানাথ সুতানাথ বটে।
এমন সুপাত্র বহুভাগ্য হেতু ঘটে॥
বধ করা মত নহে দিব কন্যা দান।
কিন্তু তুমি নিয়া যাও দক্ষিণ মশান॥

এই ব্যবস্থা বা রাজার কৌশল শুধু সুন্দরকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিবার জন্য। প্রকাশ্যে সুন্দরকে কাটিয়া ফেলিবার আদেশ দিলেন। সুন্দর দক্ষিণ মশানে নীত হইলেন। বধ্যস্থলে সুন্দর চৌত্রিশ অক্ষরে কালী স্তুতি করিলেন। দেবী সুন্দরের চতুস্ত্রিংশাক্ষরে স্তব শুনিয়া পরিতুষ্টা হইয়া সুন্দরকে অভয় দিয়া কহিলেন :

ভয় নাহি ভয় নাহি বাছারে সুন্দর।
কার শক্তি কাটে তুমি কালীর কিঙ্কর॥
পর্ব্বত চালিতে পুত্র পারে কি পতঙ্গ।
ছায়ারূপে সদা আমি থাকি তব সঙ্গ॥
ভাবরে ভকত নর কালী কল্পতরু।
তারা নাম তরী তাহে কাণ্ডারী শ্রীগুরু॥

এমন সময় কালীর কৃপায়ঃ

*　　　　*　　　　*

মাধব নামেতে ভট্ট মিলিল তথায়।
জরির পোষাক পরা বেশ চিরা মাথে।
কনকে জড়িত হীরা নবরত্ন হাতে॥
চিক্কণ পাথর শিরে চকমক করে।
বহুমূল্য তরুণতপনতেজো ধরে॥
ডোরে লট্‌কা তলোয়ার কোমরে খঞ্জর।
চাঁদমুখে চাঁপদাড়ি পরম সুন্দর॥
বুকেতে চাপ্পানি ঢাল তুরকীর পৃষ্ঠে।
বাঘাই কোটাল পানে চাহে কোপদৃষ্টে॥

সুন্দরকে মশানে বন্দী অবস্থায় দেখিয়া এবং কোতোয়াল তাহাকে বধ করিতে উদ্যত দর্শনে—কোটালের প্রতি মাধব ভট্ট হিন্দীমিশ্রিত ব্রজবুলিতে কটূক্তি করিলে * পরে মাধবের প্রতি কোটালও কটুবাক্য বলিলে মাধবভট্ট রাজ

---

* মাধব বলিল :

ছুঁন্দর ছো গুণসিন্ধু কি নন্দন
ক্যা কহুঁ যাকো ভবানী ছহায়।
জাকর লাগি জাগি বহু যামিনী
চিরদিন পূজন পড়নি ধেয়ায়।
পরমনরবর তুহ বি মূরথ বুঝা
হাম বাতমে ছাত মেরা আও।
রাজাকি পাছ খালাছ করোঁ যাকর
সুন্দরকো গজরাজ ঠাহরাও॥

কোটাল উত্তর দিল : উত্তরে যে কটুবাক্য বলিল, তাহাতে মাধব মনোদুখে ম্রিয়মাণ হইল।

মান ভঙ্গ মলিন মাধব মনোদুখে।
কাষ্ঠবৎ কায় কথা নাহি সরে মুখে॥
পত্ত দেখি গত্ত কথা যত্তপিহ করে।
বৈত্তগ্রন্থে সত্ত ফল বৈত্তক হা করে॥
নব্যলোক ভব্য হয় সভ্যসঙ্গে বটে।
গুণ যেন দ্রব্যযোগ দিব্যগুণ ঘটে।

দরবারে উপস্থিত হইয়া সুন্দরের সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে পর ভূপতি পাত্র-মিত্র সভাসদগণসহ মশানে আসিয়া সুন্দরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। সুন্দরের বন্ধন মোচন হইল। তাহার বন্ধন মোচন সংবাদে বিদ্যা উল্লসিতা হইলেন। রাণীও বিদ্যার প্রতি সদয় হইলেন এবং সমাদর করিলেন। পরে সভাস্থলে বিচারে পরাস্ত হইয়া বিদ্যা, সুন্দরকে মালা দিলেন।

রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা—সুন্দরকে নিজের পাশে আর একটি সিংহাসনে বসাইলেন।

ঘুচিল সকল দুখ, হৃদে জন্মে পুনঃ সুখ
দম্পতি মিলিল পুনর্ব্বার।
দ্বিগুণ বাড়িল প্রেম, মাণিক্যজড়িত হেম
সেইরূপ ভাব দোঁহাকার।

সুন্দর শ্বশুরাবাসে দিন অতিবাহিত করিতেছেন, দেশে যাইবার নামও করেন না, তখন সুন্দরকে মাতৃবেশে কালী স্বপ্নে দেশে যাইতে আদেশ করিলেন। তখন সুন্দর স্বদেশে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন এবং বিদ্যার নিকটে বিদায় প্রার্থনা করিলে, বিদ্যাও তাঁহার সহিত যাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন এবং পিতামাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদ্যা সহ সুন্দর স্বদেশে গমন করিলেন। সুন্দরকে আনিবার জন্য পিতামাতা প্রত্যুদ্গমন করিলেন।

সন্তোষ সাগর মধ্যে ভাসে রাজরাণী।
পুত্র কোলে করে দোঁহে প্রসারিয়া পাণি॥

সে সময় যত সুখ কথায় কে কবে।
সহস্র বদন হয় কৈতে পারে তবে॥

বিদ্যাকে দর্শন করিবার জন্য পুরবাসিনী নারীগণ আসিলেন এবং

নিরখিয়া নববধূ দ্বিজবধূচয়।
সকলে সদনে গেলা সদয় হৃদয়॥

রাজা গুণসিন্ধু পুত্রকে রত্নসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। তৎপর:

ভূপ জরাগ্রস্ত, দারা সহ ত্রস্ত
কৈলা বারাণসী বাস॥

বিদ্যা যথাসময়ে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। সেকালের রীতি অনুযায়ী নৃপতি সুন্দর,

করে বিতরণ, রতন বসন
কুঞ্জর ঘোটক ধেনু।
মহা কুতূহলি, শিরে দিল তুলি
লক্ষ দ্বিজ পদরেণু॥

তারপর ষষ্ঠ মাসে পুত্রের মুখে অন্ন দিলেন এবং শিশুর নাম রাখিলেন পদ্মনাভ। পঞ্চম বৎসরে, কর্ণবেধ হইল এবং শুভদিনে বিদ্যারম্ভ হইল। বালক কিরূপ মেধাবী ছিলেন এবং কি কি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয়ও এখানে দিতেছি :—

সপ্তদিন মাত্র, লেখে তালপত্র
পঞ্চাশত বর্ণ চিনে॥
বালক ত্বরায় ব্যাকরণ সায়
ভট্টি অভিধান গণ।
রঘুকুমারাদি, সাঙ্গ হল যদি
অলঙ্কারে দিল মন॥
কৃপান্বিতা চণ্ডী, পাঠ করে দণ্ডী,
তদনু কাব্যপ্রকাশে।
ন্যায়শাস্ত্রে ঘূণ, কত কব গুণ,
কবিচিত্তে মহোল্লাসে॥
জ্যোতিষ পিঙ্গল, সাঙ্খ্য পাতঞ্জল
মীমাংসা বেদান্ত তন্ত্র॥
কোন ক্ষোভ নাই, জননীর ঠাঁই
নিল একাক্ষরী মন্ত্র॥

ক্রমে ক্রমে যখন কুমারের বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ হইল, তখন

বিবাহ দিলেন কুলে তুল্য রাজকন্যা।
রূপবতী গুণবতী ধরাতলে ধন্যা॥

কিছুকাল পরে সুন্দর ;

গাঁথিল দেউল উচ্চ স্পর্শে বিষ্ণুপদ।
চতুর্দিকে পুষ্পোদ্যান সন্নিকটে হ্রদ॥
পাষাণে নির্ম্মাণ কৈলা কালিকা দক্ষিণা।
শবারূঢ়া মুক্তকেশী বসনবিহীনা॥

মুণ্ডমালাবিভীষণা খড়্গমুণ্ডধরা।
বামে বরাভয় ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা॥

মন্দির প্রতিষ্ঠার পর, সুন্দর শবসাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিলেন। মহামায়া মহা তুষ্টা হইয়া কহিলেন 'বরং বৃণু, বরং বৃণু।

সুন্দর সুস্বরে কহে সুধাধিক উক্তি।
দর্শনে তোমার মাগো চতুর্ব্বিধ মুক্তি॥
নাহি চাহি কুঞ্জরালী বাজিরাজি রাজ্য।
জায়াপত্য দাসদাসী বাসি কিবা কার্য্য॥
মনোমম হংস পাদপদ্মে বিহরতু।
অঙ্গীকার কৈলা মাতা তথাস্তু তথাস্তু॥

তারপর কলিকালের ভবিষ্যৎ পরিণতিতে যে কি পরিমাণে জাতি ও সমাজের দুর্গতি হইবে, সে বিষয়ে উপদেশ দিলেন:

ব্রাহ্মণ করিবে বেদ বহিষ্কৃত কর্ম্ম।
অকর্ম্মণ্য রাজা হবে রাজ্য শূন্যধর্ম্ম॥
অষ্টবর্ষে রমণীর জন্মিবে অপত্য।
মিথ্যা কথা বিনে লোক নাহি কবে সত্য॥
অবলা চঞ্চলা চলা মন্দ ফলা হবে।
ভ্রমে কেহ ঈশ্বরের নাম নাহি লবে॥

অবশেষে পুত্র পদ্মনাভকে রাজ্য দিয়া বিদ্যাসুন্দর স্বর্গারোহণ করিলেন। পদ্মনাভকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সময় সুন্দর পুত্রকে রাজনীতি সম্পর্কে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা সামান্য কিছু উদ্ধৃত করিলাম:—

পরস্ত্রী জননীতুল্যা থাকে যেন মনে।
কদাচ না লোভ যেন হয় পরধনে॥
একান্ত বিহিত নহে মানি-মান-ভঙ্গ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট তবে যাবে নীচসঙ্গ॥
নিরন্তর থাকা ভাল রিপু সঙ্গে শৌর্য্য।
সম্পদে বিনয়ী হবে বিপদেতে ধৈর্য্য॥

*　　　*　　　*

ভবানী শঙ্কর বিষ্ণু এক ব্রহ্ম তিন।
ভেদ করে সেই মূঢ় জন প্রজ্ঞাহীন॥

এই ভাবে সমুদয় বৈষয়িক এবং রাষ্ট্রীয় কার্য্য ইত্যাদি কর্ত্তব্য অবসানে,—দেবীর আদেশে বিদ্যা ও সুন্দর—

দেবীপুরমধ্যে চারু বিল্ব-বৃক্ষতলে।
যোগাসনে দোঁহে তথা বৈসে কুতূহলে॥
হৃদাহ্লাদে দক্ষিণকালিকা করে ধ্যান।
যোগবলে এককালে দোঁহে ত্যজে প্রাণ॥

এবং পূর্ব্বে যেরূপ ছিলেন তাহাই হইলেন;

ধরে অপরূপ পূর্ব্ব রূপকলেবর।
আছিল যেমন হারাবতী মালাধর॥

এই ভাবে জাগরণ সমাপ্ত হইল। অষ্টমঙ্গলাতে দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা, সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর ভাবে বলিয়া কবি আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর সম্পর্কে বঙ্গভাষার ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতাগণের মত এখানে উল্লেখযোগ্য মনে করি। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের লেখক স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন:—যাঁহারা তৎকালীন রাজসভার দূষিত রুচির সান্নিধ্যে ছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রবণতা সত্ত্বেও কথঞ্চিৎ সংক্রামিত না হইয়া যান নাই,—ইহার সাক্ষী রামপ্রসাদ। আমরা রামপ্রসাদের নির্ম্মল ভক্তি বিবেকতায় মুগ্ধ, তাঁহার উন্নত চরিত্রের সর্ব্বদা পক্ষপাতী; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তৎপ্রণীত বিদ্যাসুন্দরের বীভৎস রুচির সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহি; ভারতচন্দ্রের রচনা যে গর্হিত রুচি-দোষে দুষ্ট, রামপ্রসাদ তাহার পথ প্রবর্ত্তক। ভারতচন্দ্রের মত রামপ্রসাদ বীভৎস আদিরসপূর্ণ কবিতা আপাতসুন্দর করিয়া দেখাইতে পারেন নাই, কিন্তু তাহা শক্তির অভাব জন্য, ইচ্ছায় ত্রুটি হেতু নহে।'

'রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের অপর নাম 'কবিরঞ্জন'। কবিরঞ্জনে 'রামপ্রসাদের সংস্কৃত বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় আছে, কিন্তু তাঁহার সংস্কৃত বিদ্যার উত্তম পরিপাক হয় নাই; বাঙ্গলা পদগুলির মধ্যে সংস্কৃত কথাগুলির উত্তম সমন্বয় হয় নাই,—উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি স্থল তুলিতেছি; * *—"সহজে কলঙ্কী সে তবাসম্য সম নহে।' জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে।" ক্ষেপ করে দশ দিক্ষু লোষ্ট্র বিবর্দ্ধনে। 'পূর্ণচন্দ্র শোভা যেন পিবতি চকোর।" কালীকীর্ত্তনে,—* * বারে বারে ডাকে রাণী জননী জাগৃহী জাগৃহী। আগত ভানু রজনী চলিয়া যায়। উঠ উঠ প্রাণগৌরী, এই নিকটে গিরি উঠ গো, উঠগো এবমুচিত মধুনা তব নহি নহি। সুত মাগধ বন্দী, কৃতাঞ্জলি কথয়তি, নিদ্রাং জাহিহি।'

এইরূপ সংস্কৃত পদের প্রভাবে বাঙ্গলা কবিতা একান্ত শ্রুতিকটু হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং রামপ্রসাদ সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গলা মিলাইতে যাইয়া উৎকট পদাবলীর সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু রামপ্রসাদ যে স্থলে শিক্ষার অভিমান ত্যাগ করিয়াছেন—সে স্থলে তিনি বাগ্দেবীর আদরের কবি; তাঁহার গানে প্রাণের কথা সহজ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে; এই যুগের শিক্ষিত সমাজের রুচি মুন্সীয়ানা বিদ্যা বুদ্ধি দেখাইতে ব্যগ্র ছিল, এই দুষ্ট রুচির সংক্রমণে যখন রামপ্রসাদের ন্যায় ভাবপ্রধান কবিকেও আমরা লোকমনোরঞ্জনার্থ শব্দ লইয়া বিফল ক্রীড়া করিতে দেখি, তখন আমাদের ইডেন উদ্যানে এডেম এবং ইভের মনোরঞ্জনার্থ হস্তীর চেষ্টা মনে পড়ে—

"The unwieldy elephant,
To make them mirth used all his might and wreathed
His lithe proboscis"—Paradise Lost—Book IV.

রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দরের ভাষাকে অলঙ্কার পরাইয়া সুন্দরী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; "গোযুগে গলিত ধারা তৃষ্ণা নিষ্ঠাগত। প্রভৃতি ভাবের অনুপ্রাস বন্ধন দেখিয়া মনে হয় যেন উন্মত্তা রাধিকার ন্যায় তিনি পদের অলঙ্কার কণ্ঠে ও কর্ণের দুল চুলে সংলগ্ন করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র সেই সব অলঙ্কার লইয়া ভাষাকে সাজাইয়াছেন,—একটু সাধারণ সৌন্দর্য্যবোধের অভাবে রামপ্রসাদের বিরাট চেষ্টা পণ্ড হইয়া গিয়াছে, সেই পণ্ডশ্রমের শ্মশানে অদ্য ভারতচন্দ্রের যশোমন্দির উত্থিত হইয়াছে।"*

বাঙ্গলা সাহিত্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর সুকুমার সেন বলেন† : "উপাখ্যান অংশে রামপ্রসাদ কিছু কিছু মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। শবসাধনার বিস্তৃত বিবরণ শুধু রামপ্রসাদের কাব্যেই পাওয়া যাইতেছে। কবি যে শক্তি-সাধক ছিলেন ইহা তাহার অন্যতম নিদর্শন।'

'ভারতচন্দ্রের কাব্যের সহিত রামপ্রসাদের কাব্য তুলনা করিলে দেখা যায় যে, শিল্প চাতুর্য্যে এবং ভাষার মনোহারিত্বে ভারতচন্দ্রের কাব্য রামপ্রসাদের কাব্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, কিন্তু চরিত্র-চিত্রণে অপকৃষ্ট। রামপ্রসাদের কাব্যে সকল চরিত্রগুলিই স্বাভাবিক হইয়াছে, চরিত্রগুলি typical, প্রায় যেন Satarical, এবং এইজন্য ভারতচন্দ্রের কাব্যের কাছে রামপ্রসাদের কাব্য অনেকটা নিষ্প্রভ। রামপ্রসাদের কাব্যের আর একটি মহৎ গুণ আছে,

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন অষ্টম সংস্করণ—পৃষ্ঠা ৩৩৭ দ্রষ্টব্য।
† বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডক্টর সুকুমার সেন। ৮৮৬—৮৮৭ পৃষ্ঠা।

কাব্যটির ঘরুয়া ভাব (human touch) ওতপ্রোত। তবে রামপ্রসাদের ভাষা বিষয়ে শ্লীলতা জ্ঞান বিশেষ ছিল না। শব্দশিল্পী হিসাবে ভারতচন্দ্রের সহিত তিনি তুলনায় দাঁড়াইবার যোগ্য নহেন।"

'ভারতচন্দ্রের মত চটকদার না হইলেও রামপ্রসাদের উক্তি মধ্যে মধ্যে অতি চমৎকার। যেমন,

স্বপ্ন কন্থা গুলা ভেজে গেল ধুলা খেলা। পৃঃ ১৬১

অপরাহ্নে তরুছায় অতি দূরতর যায়,
সে যেমত ছাড়া নহে মূল।
অন্ততম ভাব পাছে, মানস তোমার কাছে,
থাকিল, নহ সেই তুল। পৃঃ ১৬২

ভণ্ডবৈষ্ণব ও অন্যান্য সাধুদিগের বর্ণনা ইত্যাদিতে রামপ্রসাদের রস-রচনার দক্ষতার পরিচয় রহিয়াছে। সাধারণ লোকের গুজবপ্রিয়তার বর্ণনা অতি-মাত্রায় বাস্তব। এই অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

সহরে গুজব উঠে একে একশত।
গল্প বাড়ে বড়ই আঠারমেসে যত॥
দরজায় বস্তে কেহ মণ্ডলের ঠাট।
পথের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট॥
এক শরা ভরা টিকা হুঁকা চলে দুটা।
পোয়া দেড় গুড়াকু তামাকু ঢেঁকিকুটা॥
হেসে কহে তোমরা শুনেছ ভাই আর।
শুনিলাম এখনি আশ্চর্য্য সমাচার॥
হাতকাটা একটা মানুষ গেল কয়ে।
চোরের সহিত নাকি ছিল দুটা মেয়ে॥
পরমরূপসী তারা স্বর্গবিদ্যাধরী।
বিপুলনিতম্ব হরিণাক্ষী কৃশোদরী॥
চোর কাটা গেল যদি কোটালের হাতে।
সেইক্ষণে তারা পুড়ে মৈল তার সাথে॥

ভারতচন্দ্রের মত না হইলেও রামপ্রসাদ ছন্দোবৈচিত্র্য কিছু কিছু দেখাইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে অনুপ্রাসের চেষ্টা আছে, কিন্তু তাহা প্রায়ই শোভন নহে। একটি অংশে আদ্য ও অন্ত্য যমকের প্রয়োগ আছে। যেমন,

বারণ বারণ মন কদাচ না মানে।
কৃপা কৃপাদিবা ছোটে কি করিবে মানে॥
সর্ব্ব সর্ব্বকাল পুজি পীড়া এই ধারা।
নিত্য নিত্যাবধি দিলা দুনয়নে ধারা॥
তারা তারাপতি যদি মিলাইলা করে।
ফের ফের দিয়া বিধি বঞ্চনা বা করে॥
হর হরবধূ দুঃখ তনয় প্রসাদে।
বিদ্যা বিদ্যা কবিবরে করহ প্রসাদে॥ পৃঃ ৪৭॥

রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' সম্পর্কে কেহ কেহ সমালোচনা-প্রসঙ্গে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে,—'রামপ্রসাদ সাধক এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াও যে আদিরসাত্মক বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, ইহা বোধ হয় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সংসর্গের ফল। কাহারও কাহারও মতে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর তদচরিত' কালিকামঙ্গল গ্রন্থের অন্তর্গত। একথা অস্বীকার করিবার কোনও কারণ নাই। কৃষ্ণরামের রচিত বিদ্যাসুন্দর 'কালিকামঙ্গল' ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থের অন্তর্গত। এই নিয়মে রামপ্রসাদও তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কালিকামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার রচিত 'কালিকামঙ্গল' গ্রন্থের এখনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ইতিপূর্ব্বে যে কালী-কীর্ত্তনের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা গীতিকাব্য। সুতরাং বিদ্যাসুন্দর এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত থাকা সম্ভবপর হইতে পারে না। কালিকামঙ্গল নামে কবির রচিত অন্য কোনও গ্রন্থ আছে কিনা, এ বিষয়ের অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

উপরে যে কৃষ্ণরামের নামোল্লেখ হইল, তিনিই বঙ্গভাষায় প্রথম 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পরে রামপ্রসাদ এবং তৎপর ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছেন। প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী ভারতচন্দ্রের পরে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন। তাহাতে তিনি তাঁহার পূর্ব্বে যে সকল কবি 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন :

'বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ।
বিরচিল কৃষ্ণরাম নিমতা তাঁর বাস॥
তাঁহার রচিত পুঁথি আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥

ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় তাঁহার বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসের ১৩৪৭ সাল ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের সংস্করণে—ক্রমক্রমে যে স্থানে 'রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই' আছে, সেখানে যে কারণেই হউক মুদ্রিত হইয়াছে—

'রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা নাই !'

এই তিনখানা 'বিদ্যাসুন্দরের' মধ্যে কৃষ্ণরাম অপেক্ষা রামপ্রসাদের ভাষা এবং রামপ্রসাদ অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের ভাষা অধিকতর মার্জ্জিত হইয়াছে।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রণেতা দীনেশবাবু এ বিষয়ে লিখিয়াছেন :—"কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর অবলম্বন করিয়া ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন,—এই অবলম্বন অর্থে একরূপ চৌর্য্যবৃত্তি। কিন্তু প্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষে ইহা দোষ নহে, প্রতিভাশালী ব্যক্তির কৃতিত্বের মূলে সংগ্রহ,—প্রতিভাবান্ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট সংগ্রাহক নামে বাচ্য। প্রকৃতিতেও নূতন সৃষ্টি আছে, দেখা যায় না ; শুষ্ক পল্লবটির স্থলে নূতন পল্লবটির উৎপত্তি হইতেছে—উহা অতীতের পুনরার্বিভাব মাত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাসুন্দর গুলির ভাব ও ভাষা ঘসিয়া মাজিয়া ভারতচন্দ্র সুন্দর করিয়াছেন, দোমেটে মূর্ত্তিতে রং ফিরাইলে যেরূপ দেখায়, পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাসুন্দর গুলির পরে ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরও সেইরূপ দেখাইবে। * * কৃষ্ণরামের হাতে বিদ্যাসুন্দর একমেটে, রামপ্রসাদের হাতে দুমেটে এবং ভারতচন্দ্রের হাতে বিদ্যাসুন্দরের রং দিবার সময় হইয়াছে।*

রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থে অশ্লীলতা দোষ দুষ্ট বলিয়া অনেকে তাঁহাকে অপরাধী করেন, এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি :—"সেকালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথায় আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরল বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাজই অশ্লীল। চোর কবি চোর পঞ্চাশৎ দুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিখিলেন—বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে ; দুই পক্ষে সমান অশ্লীল। তখন পূজা পার্ব্বন অশ্লীল—দুর্গোৎসবের

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (অষ্টম সংস্করণ) দীনেশচন্দ্র সেন ৩২৮-২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই অধিকাংশ বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়—নিধিরাম কবিরত্ন, গোবিন্দদাস, কবিকঙ্ক, বলরাম, প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এই সকল লেখকদের লিখিত বিদ্যাসুন্দরে অনেক কিছু নাম, ধাম ও পরিচয়ের বিভিন্নতা আছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মতে—"ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের জন্মের পূর্ব্বে ১৭৬০—৭০ খৃঃ মধ্যে রামপ্রসাদ গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন—সাহিত্যসাধক চরিতমালা। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ ৩২ পৃষ্ঠা। বলা বাহুল্য যে এ বিষয়টি এখনও অমীমাংসিত।

নবমী বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেও লোকরঞ্জন হইত। পাঁচালী, হাফ আখ্‌ড়াই অশ্লীলতার জন্য রচিত।"

এ হেন অশ্লীলতার যুগে বিদ্যাসুন্দর রচনার জন্য রামপ্রসাদকে অপরাধী করা বোধ হয় সঙ্গত নহে, কেননা তিনি দেশ ও কালের, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রভাব অনুযায়ী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহা বর্ত্তমান কালে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইলেও সেকালে পরম সমাদরেই সুধীসমাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। কোন কবির কাব্য বিশ্লেষণ করিতে গেলে তাঁহার অভ্যুদয়ের কালের বিষয় সম্বন্ধেও বিবেচনা করা আবশ্যক হয়। যে সময়ে বাঙ্গলাদেশ তথা ভারতবর্ষ এক যুগ সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়াছে। একদিকে মোগল শাসকগণের শাসন দণ্ড শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, মুর্শিদাবাদের মসনদে যাঁহারা বসিয়াছেন, তাঁহাদের দিবারাত্রি নৃত্য গীত, বিলাস ব্যসন। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতায় দেশ বীর্য্য ও শক্তি হারাইতে বসিয়াছে। বাঙ্গলার সমাজ বর্গীর হাঙ্গামায় বিধ্বস্ত ও বিপন্ন, সমাজে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের ধর্ম্মের নামে একশ্রেণীর লোকের মধ্যে চলিয়াছে ব্যাভিচার, সেই সময়ে রামপ্রসাদের আবির্ভাব কাল ও কাব্য রচনা, কাজেই তাঁহার পক্ষে বিদ্যাসুন্দর কাব্যে লোকরঞ্জনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াও হয়ত অশ্লীলতার প্রচার স্বাভাবিক হইয়াছিল। সেজন্যই রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। রামপ্রসাদ তাঁহার শৃঙ্গার রসের বিচিত্র বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বীরাচারী তান্ত্রিক ইষ্টদেবীর লীলা অনুভব করিয়াছেন। অর্থাৎ রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর একাধারে কাব্য ও কৌলতন্ত্রের নিবন্ধ এবং জনসাধারণের নিকটএজাতীয় রহস্যময়তন্ত্রের গ্রন্থ চিরকালই গুপ্ত থাকে।"

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাসেও অশ্লীলতার অভিযোগ কি আমরা বহুল পরিমাণে শুনিতে পাই নাই? রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' তাঁহাকে অমর করিয়া রাখে নাই—তাহা লোকে বিস্মৃত হইবে, কিন্তু রামপ্রসাদের যশঃ তাঁহার কাব্য-রচনার জন্য নহে তাঁহার সুমধুর সঙ্গীতই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিবে।

প্রসাদী সঙ্গীত বা পদাবলী—বাঙ্গলাদেশে রামপ্রসাদের সঙ্গীত প্রচারিত, এবং লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে প্রতিদিন গীত হইতেছে। রামপ্রসাদ তাঁহার

ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয় তাঁহার বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসের ১৩৪৭ সাল ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের সংস্করণে—ভ্রমক্রমে যে স্থানে 'রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই' আছে, সেখানে যে কারণেই হউক মুদ্রিত হইয়াছে—

'রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা নাই !'

এই তিনখানা 'বিদ্যাসুন্দরের' মধ্যে কৃষ্ণরাম অপেক্ষা রামপ্রসাদের ভাষা এবং রামপ্রসাদ অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের ভাষা অধিকতর মার্জ্জিত হইয়াছে।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রণেতা দীনেশবাবু এ বিষয়ে লিখিয়াছেন :—"কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর অবলম্বন করিয়া ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন,—এই অবলম্বন অর্থে একরূপ চৌর্য্যবৃত্তি। কিন্তু প্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষে ইহা দোষ নহে, প্রতিভাশালী ব্যক্তির কৃতিত্বের মূলে সংগ্রহ,—প্রতিভাবান্ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট সংগ্রাহক নামে বাচ্য। প্রকৃতিতেও নূতন সৃষ্টি আছে, দেখা যায় না ; শুষ্ক পল্লবটির স্থলে নূতন পল্লবটির উৎপত্তি হইতেছে—উহা অতীতের পুনরাবির্ভাব মাত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাসুন্দর গুলির ভাব ও ভাষা ঘসিয়া মাজিয়া ভারতচন্দ্র সুন্দর করিয়াছেন, দোমেটে মূর্ত্তিতে রং ফিরাইলে যেরূপ দেখায়, পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাসুন্দর গুলির পরে ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরও সেইরূপ দেখাইবে। * * কৃষ্ণরামের হাতে বিদ্যাসুন্দর একমেটে, রামপ্রসাদের হাতে দুমেটে এবং ভারতচন্দ্রের হাতে বিদ্যাসুন্দরের রং দিবার সময় হইয়াছে।*

রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থে অশ্লীলতা দোষ দুষ্ট বলিয়া অনেকে তাঁহাকে অপরাধী করেন, এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি :—"সেকালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথায় আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরল বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাজই অশ্লীল। চোর কবি চোর পঞ্চাশৎ দুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিখিলেন—বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে ; দুই পক্ষে সমান অশ্লীল। তখন পূজা পার্ব্বন অশ্লীল—দুর্গোৎসবের

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (অষ্টম সংস্করণ) দীনেশচন্দ্র সেন ৩২৮-২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই অধিকাংশ বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়—নিধিরাম কবিরত্ন, গোবিন্দদাস, কবিকঙ্ক, বলরাম, প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এই সকল লেখকদের লিখিত বিদ্যাসুন্দরে অনেক কিছু নাম, ধাম ও পরিচয়ের বিভিন্নতা আছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মতে—"ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের জন্মের পূর্ব্বে ১৭৬০—৭০ খৃঃ মধ্যে রামপ্রসাদ গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন—সাহিত্যসাধক চরিতমালা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ৩২ পৃষ্ঠা। বলা বাহুল্য যে এ বিষয়টি এখনও অমীমাংসিত।

নবমী বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেও লোকরঞ্জন হইত। পাঁচালী, হাফ আখ্‌ড়াই অশ্লীলতার জন্ত রচিত।"

এ হেন অশ্লীলতার যুগে বিদ্যাসুন্দর রচনার জন্য রামপ্রসাদকে অপরাধী করা বোধ হয় সঙ্গত নহে, কেননা তিনি দেশ ও কালের, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রভাব অনুযায়ী গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহা বর্ত্তমান কালে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইলেও সেকালে পরম সমাদরেই সুধীসমাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। কোন কবির কাব্য বিশ্লেষণ করিতে গেলে তাঁহার অভ্যুদয়ের কালের বিষয় সম্বন্ধেও বিবেচনা করা আবশ্যক হয়। যে সময়ে বাঙ্গলাদেশ তথা ভারতবর্ষ এক যুগ সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়াছে। একদিকে মোগল শাসকগণের শাসন দণ্ড শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, মুর্শিদাবাদের মসনদে যাঁহারা বসিয়াছেন, তাঁহাদের দিবারাত্রি নৃত্য গীত, বিলাস ব্যসন। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতায় দেশ বীর্য্য ও শক্তি হারাইতে বসিয়াছে। বাঙ্গলার সমাজ বর্গীর হাঙ্গামায় বিধ্বস্ত ও বিপন্ন, সমাজে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের ধর্ম্মের নামে একশ্রেণীর লোকের মধ্যে চলিয়াছে ব্যাভিচার, সেই সময়ে রামপ্রসাদের আবির্ভাব কাল ও কাব্য রচনা, কাজেই তাঁহার পক্ষে বিদ্যাসুন্দর কাব্যে লোকরঞ্জনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াও হয়ত অশ্লীলতার প্রচার স্বাভাবিক হইয়াছিল। সেজন্যই রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। রামপ্রসাদ তাঁহার শৃঙ্গার রসের বিচিত্র বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বীরাচারী তান্ত্রিক ইষ্টদেবীর লীলা অনুভব করিয়াছেন। অর্থাৎ রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর একাধারে কাব্য ও কৌলতন্ত্রের নিবন্ধ এবং জনসাধারণের নিকটএজাতীয় রহস্যময়তন্ত্রের গ্রন্থ চিরকালই গুপ্ত থাকে।"

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাসেও অশ্লীলতার অভিযোগ কি আমরা বহুল পরিমাণে শুনিতে পাই নাই? রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' তাঁহাকে অমর করিয়া রাখে নাই—তাহা লোকে বিস্মৃত হইবে, কিন্তু রামপ্রসাদের যশঃ তাঁহার কাব্য-রচনার জন্য নহে তাঁহার সুমধুর সঙ্গীতই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিবে।

প্রসাদী সঙ্গীত বা পদাবলী—বাঙ্গলাদেশে রামপ্রসাদের সঙ্গীত প্রচারিত, এবং লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে প্রতিদিন গীত হইতেছে। রামপ্রসাদ তাঁহার

বিদ্যাসুন্দরে লিখিয়াছেন :—"গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত।" দীনেশ বাবু বলেন : 'তাঁহার রচিত কাব্য প্রকৃত পক্ষেই ভারতচন্দ্রীয় বিদ্যাসুন্দরের দ্বারা পরাভূত হইয়া আজ ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে, তিনি তাহা ফেলিয়া গানে ব্যস্ত হইয়াছিলেন, বঙ্গীয় লেখকগণও কাব্য ফেলিয়া তাঁহার গানগুলি লইয়া ব্যস্ত হইয়াছিল।" ই. জে. টমসন্ (E. J. Thomson) সাহেব বলেন : Ramprasad's well-known contemporary Bharatchandra Ray *Raj Kavi* or *Kings poet* of Krishnagar, wrote a better poem with the same theme and title, his treatment being erotic and grossly indecent. Ramprasad allegorises the story; even so, the poem is not one of which his admirers are proud."* এ কথা কয়টি প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন, কেননা রামপ্রসাদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি, 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের জন্য নহে, তাহা তাঁহার সঙ্গীতের জন্য —ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত।

রামপ্রসাদের সঙ্গীতের মধ্য দিয়া আমরা 'এই দুঃখময় জীবনের আঁধার দিক্‌টার উপর জোর দিয়া বৈরাগ্যের যে সুরটা উঠিয়াছিল—এ যুগে তাহার প্রেরণা দিয়াছিলেন রামপ্রসাদ।' রামপ্রসাদের দুঃখবাদের মধ্যে আমরা যে অসীম নির্ভর দেখিতে পাই, তাহা শুধু তাঁহার মায়ের প্রতিই ছিল। জীবনের দুঃখ দৈন্যের অসীম যন্ত্রণা বেদনা ও অন্নাভাব, শোকের দারুণ ব্যথার মধ্যেও রামপ্রসাদ মায়ের কাছেই আবেদন করিয়াছেন, মায়ের কাছেই আবদার করিয়াছেন, মাকে ভৎ'সনা করিয়াছেন, আবার মায়ের তাঁহার প্রতি স্নেহ, প্রেম ও বাৎসল্যের অভাবজনিত মর্ম্মবেদনার জন্য আশ্রয় ও নির্ভর করিয়াছেন। দুঃখবাদের মধ্যে প্রসাদের গানে যে ধৈর্য্য ও নির্ভর আছে তাহা সাধক ও ভক্ত ব্যতীত অপরের পক্ষে সম্ভব নহে। ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন :—"রামপ্রসাদের কান্নায় দুঃখ সৃষ্টির জন্য মায়ের প্রতি ভৎ'সনা আছে, কিন্তু তাহা বিরাগ নয়, অনুরাগের ছদ্মবেশ। শত গালাগালি দিয়াও তিনি মায়ের আঁচলটিতে বাঁধা আছেন।" "নিতান্ত যাবে এ দিন ঘোষণা রবে গো—তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক রবে গো।" এই সুরে মায়ের স্নেহে পাছে ঔদাসীন্যের কলঙ্ক ছাপ পড়ে, আবদারে ছেলে তাহারই জন্য কাঁদিতেছেন। এই দুঃখবাদ বিষকুম্ভ নহে।

* Bengali Religious Lyrics, Sakta. Page 19. by E. J. Thomson an H. M. Spencer. মৈমনসিংহের কবি—চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরই প্রাচীন -ন। এই কাব্যে কোনরূপ অশ্লীলতার গন্ধ নাই—ইহার ভাষা ও কবিত্ব উভয়ের প্রধান গুণ সারল্য। সহজ সুন্দর ভাষায় এই উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। সেই কাহিনীর সঙ্গে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের অনেক স্থলে গরমিল আছে।" বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন—৩২৭ পৃষ্ঠা।

এই দুঃখবাদের মধ্যে প্রেম ও নির্ভর যথেষ্ট পরিমাণ আছে,—এইজন্য ইহা বৈষ্ণব-কবির বিষ-মিশ্রিত অমৃত। ইহা মায়ের অসীম নিষ্ঠুরতা জানিয়াও মায়ের অসীম দয়ার প্রতি আস্থাবান্। এক একবার ইহা নৃমুণ্ডমালিনী মায়ের অসি স্বীকার করিয়াছে সত্য—কিন্তু তাঁহার বরাভয়দায়ী করদ্বয় ও দেখিয়াছে; জগৎকে ভয়ানক জানিয়াও ইহার মূল শক্তির অভয় প্রদত্ব ও মঙ্গলত্ব স্বীকার করিয়াছে। শাক্ত ধর্ম্মের এইখানেই জোর। ইহা লোক চিত্তকে এই কারণে এতদূর আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা ভগবান্কে শুধু দয়াময়, প্রেমময় বলিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, ইহা তাঁহার নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অপরাপর ধর্ম্ম ভগবানের শ্রীমুখ দেখিয়া ভুলিযাছে। তাঁহার স্নেহ ও প্রেমের বাঁশীর সুর শুনাইতে জগৎকে আহ্বান করিয়াছে। একমাত্র শাক্ত ধর্ম্ম বিশ্বের উলঙ্গ সত্যকে যথাযথ ভাবে দেখাইবার সাহস করিয়াছে—ইহা লোল-শোণিত-লোলুপ জিহ্বা ও কঙ্কালাকৃতিকে প্রণাম করিয়া বরাভয়দায়ী করদ্বয়ের পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছে। কালীমূর্ত্তি-ঝঞ্ঝা, উল্কাপাত, মহামেঘ ও চিতাভস্মের দেবতা ইনি বৈদিক রুদ্রদেবের পরবর্ত্তী বিভূতি। এদিকে তাঁহার কৃষ্ণকান্তি মাঝে উন্মাদনায়—'ধনি না বাঁধে কবরী না পরে বাস—ও বিধুবদনে মধুর হাস।' —এই ভীষণ ও সুন্দর উলঙ্গ সত্যকে সাহসিক সাধক ভিন্ন কে হৃদয়ের শোণিত দিয়া পূজা করিবে?"

"বাউলের সুরের দুঃখবাদ ও রামপ্রসাদের দুঃখবাদে এই প্রভেদ। বাউল মানুষকে জীবনের প্রতি পদে শত দুঃখ দেখাইয়া শ্মশানের নির্ব্বাণটাকে শেষাশ্রয় স্বরূপ মনে করিয়াছে, রামপ্রসাদের দুঃখবাদে সংসারে শত দুঃখের প্রতি ইঙ্গিত থাকিলেও তাহা যে মাতৃ পাদপদ্মের স্মরণ লইলে দূর হয় তাহা জোরের সহিত বলা হইয়াছে। এই নিছক সত্য, এই নির্ভর আত্মোৎসর্গময় সঙ্গীত এককালে সমস্ত বাংলা দেশকে জয় করিয়াছিল। সংসার কাঁটার বন, ইহা সাফ করিয়া যদি ভক্তির চর্চ্চা করা যায় তবে মানবজীবন দুঃখময় হইয়া স্বর্ণপ্রসূ হইতে পারে। রামপ্রসাদ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, "এমন মানব জন্ম রৈল পড়ে, আবাদ কৈলে ফলত সোনা।" হাটে মাঠে বাটে এই সকল গানের সুধা হরির লুটের মত তিনি বিলাইয়া গিয়াছেন।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—৩৫০ পৃষ্ঠা।)

রামপ্রসাদের পদাবলীকে আমরা কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া পাঠকগণকে পড়িতে অনুরোধ করি, এ শ্রেণী বিভাগ সহজ ও সরল। (১) আত্মজ্ঞান ভগবদ্ভক্তি মূলক গীতমালা; (২) সঙ্গীতে প্রসাদের সাংসারিক অবস্থা পরিচয়, মায়ের নিকট অভাব ও অভিযোগ জ্ঞাপন, ভর্ৎসনা ও আবদার অসহায়

অবস্থায় জন্ম মায়ের নিকট করুণা ভিক্ষা, ও আত্মনিবেদন, (৩) ষট্‌চক্রভেদ—সম্পর্কে তিনি সঙ্গীত দ্বারা অতি সহজ ও সরল ভাবে তন্ত্রের গভীর তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। (৪) শব-সাধনার বিষয় যেমন সঙ্গীতে বর্ণনা করিয়াছেন, তেমনি বিদ্যাসুন্দর কাব্যে সুন্দরের দক্ষিণ কালিকামূর্ত্তি সংস্থাপন এবং শব সাধনোদ্যোগ অধ্যায়ে অতি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। (৫) রণ-সঙ্গীত (৬) ভক্তি নিবেদন-সাধনা ও সিদ্ধি (৭) সংসার বিতৃষ্ণা (৮) আত্মনির্ভর (৯) বৈরাগ্য ও মৃত্যু বিজয়ী সঙ্গীত (১০) শেষার্ঘ্য দান।

এই বিভিন্ন বিষয়ক সঙ্গীতগুলির আমরা বিভিন্ন অধ্যায়ে সাধ্যানুরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছি। যাহা ভক্তির, এবং যাহা অনুভূতির এবং সাধনার বিষয় তাহার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ অপ্রাসঙ্গিক। প্রত্যেক পাঠক তাহা অন্তর মধ্যে চিন্তা দ্বারা এবং সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিবেন।

রামপ্রসাদের সঙ্গীতে বাঙ্গলা গীতি-কবিতার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, সহজ সরল ভাষার এবং দৃষ্টান্তের নিদর্শন রহিয়াছে, যথা—'মা আমায় ঘুরাবে কত! কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত!' 'মনরে কৃষি কাজ জান না', 'ভবের আশা খেলব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল।' এই সঙ্গীতে সেকালের পাশা খেলার যে কিরূপ প্রচলন ছিল তাহাই দেখিতে পাই, 'ওরে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয়কালী বলে' অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুরাপানের প্রচলন অত্যন্ত বেশী ছিল, 'মন খেলরে ডাণ্ডাগুলি',—আমি তোমা বিনা নাহি খেলি॥ এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল, চম্পা কলি ধূলাধূলি', 'ওরে মন চড়কি চড়ক কর, শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি', বাসনা দাও আগুন জ্বেলে, ক্ষার হবে তার পরিপাটি।' 'দিস্ মা কালী কলার খেতে',—এই ভাবে অনেক সঙ্গীতের মাধ্যমে আমরা সেকালের খেলাধূলা, সমাজ, জীবন-যাত্রা, সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবস্থারও পরিচয় পাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্ম বিষয়ক উপাদান রামপ্রসাদের গীতাবলিতে ও কাব্যে অনেক রহিয়াছে, তাহা গবেষণার বিষয়।

বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে প্রধানতঃ আমরা তাহা তিনটি যুগে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম যুগ—দোহাকোষ ও চর্য্যাপদের যুগ। যদিও নেপালে আবিষ্কৃত এই পুঁথি দু'খানা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত। দ্বিতীয় যুগ হইতেছে পাল, সেন প্রভৃতির যুগ ও পরবর্ত্তী মুসলমানী আমল বা নবাবী আমল—মুসলমান প্রভাবকাল সে বড় কম সময় নয়, তৎকালে বাঙ্গলা সাহিত্যের উপর যেমন ছিল মুসলমান সাহিত্যের প্রভাব তেমনি ছিল মঙ্গল-কাব্যের প্রভাব—সে সময়ে সাহিত্যের মধ্যে নানা বিদেশীভাষারও সংমিশ্রণ

হইয়াছিল। পার্শী, আরবী, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজী, ইংরাজী, প্রভৃতি নানা ভাষা আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতি অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের কাব্যে তাহার শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

নবাবী আমলের সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছিল,—পদাবলী ও গান, পাচালী, সংস্কৃত মহাকাব্যের অনুবাদ, রামায়ণ, মহাভারত, সে সময়ের লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা বর্ত্তমানকালেও স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, কাশীরাম কৃত্তিবাস প্রভৃতি স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া আছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তীকালে নবাবী আমলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাঁহারা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে হালিসহর নিবাসী রামপ্রসাদ এবং বর্দ্ধমান জেলার পেঁড়োগ্রাম নিবাসী ভারতচন্দ্র চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। ইংরাজী আমলে বাঙ্গলা ভাষা নানা দিক্ দিয়া পরিপুষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা বাঙ্গলা সাহিত্যের তৃতীয় যুগ—তৃতীয় যুগের প্রভাব স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিদ্যমান—এখন চতুর্থ যুগ আরম্ভ হইয়াছে—স্বাধীনতা লাভের পর হইতে তাহার পরিচয় ভবিষ্যৎ যুগের সমালোচকদের কাছে পরবর্ত্তীকালের জনগণ পাইবেন।

রামপ্রসাদ ছিলেন নবাবী আমলের গীতকারক—শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি। তাঁহার প্রত্যেকটি সঙ্গীত বাঙ্গলার ঘরে ঘরে নদীর স্রোতের মত প্রবহমান।

রামপ্রসাদের শাক্ত-সঙ্গীত সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে—বাঙ্গলার সর্ব্বত্র জনসাধারণের প্রাণে রামপ্রসাদের সঙ্গীত সঞ্জীবিত। অল্প কবির ভাগ্যেই এইরূপ সৌভাগ্য হয়। আমি পথচারী কুলী-মজুরের মুখে; ধানের ক্ষেতে কার্য্যেরত কৃষাণের মুখে রামপ্রসাদের সঙ্গীত—'দিনান্তে যাবে এদিন, এদিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো। এ গীতটি গাইতে শুনিয়াছি। আসন্ন সন্ধ্যায় সূর্য্য যখন অস্ত গমনোন্মুখ, যখন পাখীরা দলে দলে কলরবে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া নীড় পানে ছুটিয়া চলিয়াছে, তখনও প্রশস্ত নদীর বুকে নৌকারোহীযাত্রী ও নৌকার মাঝিদের মুখে রামপ্রসাদের গান শুনিয়াছি। হাট হইতে ফিরিবার সময় খেয়া নৌকায় বসিয়া ও গ্রামবাসীর মুখে গাহিতে শুনিয়াছি রামপ্রসাদের গান। একবার আমি মফঃস্বলের একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে রবীন্দ্রনাথের একটি গান লিখিতে বলিয়াছিলাম, চল্লিশ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র দুইজন লিখিতে পারিয়াছিল। ইহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম, কিন্তু আমি যখন তাহাদিগকে রামপ্রসাদের একটি গান লিখিতে বলিলাম, তখন দু'জন ছাড়া প্রত্যেক বালকই রামপ্রসাদের

সঙ্গীত লিখিতে পারিয়াছিল। চৌদ্দ বৎসর হইতে অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক বালক ও কিশোরদের মধ্যে যে কবি ও তাঁহার রচনার সহিত পরিচয় আছে, তিনি নিশ্চয়ই একজন জাতীয় কবি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত কলিকাতার পথে-ঘাটেও শুনিতে পাই, ছাত্র সম্প্রদায় এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে কলিকাতাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের প্রচার সর্ব্বত্র। কিন্তু বাঙ্গলার পল্লীসমাজে তাহা অপরিজ্ঞাত, সেখানে রামপ্রসাদের সঙ্গীত সর্ব্বজন পরিচিত। গ্রামের কৃষাণ-মজুর, গ্রাম্য-পণ্ডিত বা গুরুমহাশয় সকলেই একসঙ্গে রামপ্রসাদের গান গাহিয়া আনন্দবোধ করেন। তাহাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, মৃত্যু, জীবনের প্রত্যেকটি পরিবেশের সহিতই রহিয়াছে রামপ্রসাদের পদাবলীর অপূর্ব্ব সংযোগ। মুমূর্ষু ব্যক্তিকে গঙ্গাযাত্রার সময় গঙ্গার তীরে আনিয়াও রামপ্রসাদের গান গাহিয়া শেষ বিদায় দেয়।*

ভগিনী নিবেদিতা রামপ্রসাদকে কবি উইলিয়াম ব্লেকের (Wiliam Blake) সহিত তুলনা করিয়াছেন। অনেকে মনে করেন ব্লেক্ অপেক্ষা হেরিকের (Herrick) সঙ্গেই তাঁহার তুলনা সুসঙ্গত। আমাদের মনে হয়, সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জর্জ হার্বার্টের (George Herbert) সহিতই প্রসাদের সঙ্গীত তুলনীয়। অবশ্য ব্লেকের কবিতার মধ্য দিয়া আমরা দেখিতে পাই—পৃথিবীর সমুদয় প্রাণীর মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ এবং পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। রামপ্রসাদের গীতাবলী (Lyrics)-এর সহজ ও সরল ভাষা অশিক্ষিত জনসাধারণের হৃদয়েও অনুভূতির সৃষ্টি করে, তাহাদের সরল হৃদয় স্পর্শ করে। যেমন মধুর সুর—তেমনি শব্দ ও ভাষা প্রাণস্পর্শী। তাহারা রাম-প্রসাদি গানের মধ্যে পায় তাহাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট অভিজ্ঞানের পরিচয়, প্রতি-দিনকার দেখা জীবন-যাত্রার আনুষঙ্গিক জিনিষের সহিত তুলনা। রামপ্রসাদ গাহিলেন 'মা আমায় ঘুরাবে কত, কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত! এই গান বুঝিতে কোন গ্রামবাসীরই ভাবিতে হয় না। সে প্রত্যহ দেখে তাহার বাড়ীর পাশেই কলু বলদের চোখ ঢাকিয়া ঘানি ঘুরাইতেছে এই সহজ দৃষ্টান্তটি পল্লীর জনসাধারণের হৃদয় অধিকার করে। লোকসাহিত্য, লোক-সঙ্গীত অশিক্ষিত জনসাধারণের মনের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

রামপ্রসাদের কবিতা ও সঙ্গীত আলোচনা করিলে আমরা সেকালের সমাজ, ধর্ম্ম, রীতি-নীতি ও আচার অনুষ্ঠানের সহিত সহজেই পরিচয় লাভ করি। পথের দুই পাশে অজ্ঞাত বনফুলের রূপ ও মাধুর্য্য যেন সহজেই আমাদের মন

* Bengali Religious Lyrics, Sakta Page 19—20.

মুগ্ধ করে, রামপ্রসাদের গান ও তেমনি অপনার রসমাধুর্য্যে আপনি ফুটিয়া সৌন্দর্য্য ও সৌরভ বিলাইতেছে। জীবনের সুখ-দুঃখের চিত্র তাঁহার প্রত্যেকটি গানের মধ্যেই দেখিতে পাই।

রামপ্রসাদের গীতাবলী বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর অন্তরের জিনিষ। মাতৃমন্ত্রের উপাসক শক্তিসাধক রামপ্রসাদ তাঁহার সঙ্গীতের দ্বারা একদিকে যেমন মধুর মাতৃভাব সাধনা প্রচার করিয়াছেন, ধর্ম্ম সমন্বয়ের এক মহান্ আভাষ দিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গীতে পরবর্ত্তী শক্তি-সাধকগণ তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়াছেন, এবং বাঙ্গলার সর্ব্বত্র বহু শক্তি-সাধকও সাধন-সঙ্গীত রচয়িতারও আবির্ভাব হইয়াছে। পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তাঁহাদেরই প্রেরণায় বিবেক, বৈরাগ্য, ত্যাগ ও তৃপ্তি, নরনারায়ণ সেবা, সমাধি ও সার্ব্বজনীন মাতৃমূর্ত্তির পূর্ণ বিকাশ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, রামপ্রসাদ ও সাধক কমলাকান্তের তত্ত্ব সঙ্গীতের দ্বারা ভক্তগণের নিকট মর্ম্মকথা প্রকাশ করিতেন। তাঁহাদের সঙ্গীত গান করিতেন এবং ভক্তগণকে তাঁহার স্নেহমধুর ভক্তিধারায় প্লাবিত করিয়া দিতেন।

সাধক কবি রামপ্রসাদ তাঁহার সঙ্গীতের দ্বারা বাঙ্গলা দেশকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গীতের—তাঁহার সাধনার ভাব ছিল অসাম্প্রদায়িক। কালী কৃষ্ণ শব্দে একই ব্রহ্মের বিচিত্র প্রকাশ—রামপ্রসাদ তাঁহার সঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন।

সাধকের সাধনা বলে, অচিন্ত্য অব্যক্ত চিৎস্বরূপব্রহ্ম বিভিন্নরূপে আমাদের কাছে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। কখনও তিনি অমলকমলদলবাসিনী, কখনও তিনি ঘনবরণী-নবীনা-নগ্না-লাজবিরহিতা, দনুজদলনী ভয়ঙ্করী, কালদণ্ডধারিণী কালী, কখনও তিনি প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ, আবার কখনও তিনি ব্রহ্মের বিচিত্র প্রকাশক। একে তিন। তিনে এক। তাই ভক্ত সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন:

কালী হলি মা রাসবিহারী নটবর-বেশে বৃন্দাবনে।
তখন "ছিল ঘন ঘন হাস ত্রিভুবন-ত্রাস
এবে মৃদু হাসে ভুলে ব্রজকুমারী।
তখন তুমি—'শোণিত সায়রে নেবেছিলে শ্যামা
এবে প্রিয় তব যমুনাবারি।
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননি মনে বিচারি,
মহাকাল কানু শ্যাম শ্যামা তনু একই সকলি বুঝিতে নারি॥

এই গানটির সবটা আমরা এখানে উদ্ধৃত করি নাই।

রামপ্রসাদ ছিলেন সর্ব্ববিধ সংকীর্ণতার ও সম্প্রদায়ের অহঙ্কার মতের উর্দ্ধে, তাই তিনি গাহিয়াছেন—

শিবরূপে ধর শিঙ্গা কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।

ওমা রাম রূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি ॥

এই অপূর্ব্ব সঙ্গীতটি সর্ব্বপ্রকার সংকীর্ণতা এবং হিংসাদ্বেষ পরিহার করিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিতে সকলকে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু রামপ্রসাদ ছিলেন মাতৃমন্ত্রের উপাসক, মা ছাড়া তিনি আর কিছুই জানেন না, তাই ভক্ত দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত গাহিয়াছেন :—

কালীকৃষ্ণ শিবরাম সকল আমার এলোকেশী।

রামপ্রসাদকে বুঝিতে হইলে তাঁহার সঙ্গীতের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে হইলে মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে হইবে—তাঁহার ভাব ও ভক্তি। সকলকেই আপনার করিতে হইবে—তখন দিব্যভাবে হৃদয় পূর্ণ হইবে এবং অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্ম দৃষ্টির বিকাশ লাভ হইবে—তখন অনুভূত হইবে—

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।

জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে।

তখন সার্ব্বজনীন বিশ্বপ্রেমে হৃদয় পূর্ণ হইবে—জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃমূর্ত্তির বিকাশ হইবে অন্তরের মণিপুরে, ধন্য হইব আমরা। লাভ করিব অন্তর্দৃষ্টি, পবিত্র হইবে মন ও প্রাণ,—তখন প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারিব—

কালী কালী বল রসনা।

কর পদ ধ্যান, নামামৃত পান, যদি হতে ত্রাণ থাকে বাসনা ॥

রামপ্রসাদের গ্রন্থাবলী

প্রসাদ পদাবলী, কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন,

সীতা-বিলাপ ও বিদ্যাসুন্দর

পদাবলী

[রাগিণী—বিভাস, তাল—ধিমা তেতালা]

অকলঙ্ক শশিমুখী, সুধাপানে সদা সুখী,
তনু তনু* নিরখি, অতনু† চমকে।
না ভাব বিরূপ ভূপ, যাঁরে ভাব ব্রহ্মরূপ,
পদতলে শিব(শব)রূপ, বামা রণে কে॥
শিশু শশধর ধরা, গুণধরা, সুহাস মধুরাধরা,
প্রাণ ধরা ভার, ধরা আলো করেছে।
চিত্তে বিবেচনা কর, নিশাকর দিবাকর,
বৈশ্বানর নেত্রবর কর ঝলকে॥
রামা অগ্রগণ্যা, বটে ধন্যা, কার কন্যা,
কিবা অন্বেষণে রণে এসেছে।
সঙ্গে কি বিকৃতি গুলা, নখে কুলা দন্ত মূলা,
এলো চুলা গায় ধূলা ভয় করে হে॥
কবি রামপ্রসাদ ভাষে, রক্ষা কর নিজ দাসে,
যে জন একান্ত ত্রাসে, মা বলেছে।
তার অপরাধ ক্ষমা, যদি না করিবে শ্যামা,
তবে গো তোমায় উমা, মা বলিবে কে॥১॥

[প্রসাদী সুর, তাল একতালা]

অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী।
শিব ধন্য কাশী ধন্য, ধন্য ধন্য গো আনন্দময়ী॥
ভাগীরথী বিরাজিত, প্রবাহে অর্দ্ধ শশী।
উত্তর বাহিনী গঙ্গা, জল চলেছে দিবানিশি॥
শিবের ত্রিশূলে কাশী, বেষ্টিত বরুণা অসি‡।
তন্মধ্যে মরিলে জীব শিবের শরীরে মিশি॥
কি মহিমা অন্নপূর্ণার কেউ থাকে না উপবাসী।
ওমা রামপ্রসাদ অভুক্ত তোমার, চরণ ধূলার অভিলাষী॥২॥

[রাগিণী—জংলা, তাল—একতালা]

অপরা জন্মহরা জননী।
অপারে ভব সংসারে এক তরণী॥

---

* তনু তনু—কৃশ শরীর। † অতনু—অনঙ্গ, কামদেব। ‡ পাঠান্তর হয়ে অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি বরুণা, অসি কাশীর উভয় পার্শ্বস্থ নদীদ্বয়।

অজ্ঞানেতে অন্ধজীব, ভেদ ভাবে শিবাশিব।
উভয়ে অভেদ পরমাত্মা, স্বরূপিণী॥
মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া।
দীনদয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী॥
আনন্দ-কাননে ধাম, ফলকি তারিণী নাম।
যদি জপে দেহ-অন্তে, শিব ব'লে মানি॥
কহিছে প্রসাদ দীন, বিষয় সুক্রিয়া হীন।
নিজগুণে তিনলোক, তারয় তারিণী॥৩॥

[রাগিণী—গাঢ়া ভৈরবী, তাল—ঠুংরী]

অপার সংসার নাহি পারাপার।
ভরসা শ্রীপদ, সঙ্গের সম্পদ, বিপদে তারিণী, কর গো নিস্তার॥
যে দেখি তরঙ্গ অগাধ বারি, ভয়ে কাঁপে অঙ্গ, ডুবে বা মরি।
তার * কৃপা করি, কিঙ্কর তোমারি, দিয়ে চরণ তরি, রাখ এইবার॥
বহিছে তুফান নাহিক বিরাম, থর থর অঙ্গ কাঁপে অবিরাম।
পুরাও মনস্কাম, জপি তারা নাম, তারা তব নাম সংসারের সার॥
কাল গেল কালী হল না সাধন, প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন।
এ ভব বন্ধন, কর বিমোচন, মা বিনে তারিণী কারে দিব ভার॥৪॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

অভয় চরণ সব লুটালে। †
কিছু রাখ্‌লে না মা তনয় বলে॥
দাতার কন্যা দাতা ছিলে, শিখেছিলে মা বাপের কুলে। (মায়ের স্থলে)
তোমার পিতা মাতা যেম্নি দাতা, তেম্নি দাতা কি আমায় হ'লে॥
ভাঁড়ার জিম্মা যাঁর কাছে মা, সে জন তোমার পদতলে।
সদা ভাং খেয়ে সে (শিব সদাই মত্ত) মত্ত ভোলা, তুষ্ট কেবল বিল্বদলে॥
মা হয়ে মা জন্মে জন্মে কত দুঃখ আমায় দিলে।
(জন্ম জন্মান্তরে মা, কতই দুঃখ দিয়েছিলে।)
রামপ্রসাদ বলে এবার মোলে, ডাক্‌বো সর্ব্বনাশী বলে॥৫॥

[রামপ্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি শমন ভয় রেখেছি॥
কালী নাম কল্পতরু, † হৃদয়ে রোপণ করেছি।
আমি দেহ বেচেছি ভবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি॥
দেহের মধ্যে সুজন যে জন, তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে, দেখাব ভেবে রেখেছি॥

* তার—ত্রাণ কর। † কল্পতরু,—অভীষ্ট-ফলপ্রদ স্বর্গীয় বৃক্ষ।

সারাৎসার তারা নাম, আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে, দুর্গা বলে, যাত্রা করে বসে আছি ॥৬॥

[রামপ্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

অসকালে যাব কোথা।
আমি ঘুরে এলেম যথা তথা ॥
দিবা হলো অবসান, তাই দেখে কাঁপিছে প্রাণ।
নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হয়ে, স্থান দাও গো জগন্মাতা ॥
শুনেছি শ্রীনাথের† কথা বট চতুর্ব্বর্গ‡দাতা।
রামপ্রসাদ বলে চরণ তলে রাখ্‌বে রাখ এই কথা ॥৭॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

আছি তেঁই তরুতলে বসে।
মনের আনন্দে আর হরষে ॥
আগে ভাঙ্গাব গাছের পাতা, ডাঁটি ফল ধরিব শেষে ॥
রাগ দ্বেষ লোভ আদি, পাঠাব সব বনবাসে।
রব রসাভাষে, ছা প্রত্যাশে, ফলিতার্থ সেই রসে ॥
ফলে ফলে সুফল লয়ে, যাইব আপন নিবাসে।
আমার বিফলকে ফল দিয়ে, ফলাফল ভাসাও নৈরাশে ॥
মন কর কি, লওরে সুধা, দুজনাতে মিলে মিশে।
খাবে একই নিশ্বাসে যেন সূর্য্য তেজে সকল শোষে ॥
রামপ্রসাদ বলে আমার কোষ্ঠি, শুদ্ধ সেই তারাবেশে।
মাগী জানে না যে মন কপাটে, খিল দিয়েছি কত কসে ॥৮॥

[রাগিণী সিন্ধুকাফী, তাল—একতালা]

আপন মন মগ্ন হলে মা, পরের কথায় কি হয় তারে ॥
পরের কথায় গাছে চড়ে, আপন দোষে পড়ে মরে।
পরের জামিন হলে পরে, সে না দিলে আপনি ভরে ॥
যখন দিনে নিড়াই করে, শিকারী সব রয়না ঘরে।
জাঠা বর্শা লয়ে করে, নাও না পেলে চলে তরে ॥
চাষা লোকে কৃষি করে, পঙ্ক জলে পচে মরে।
যদি সে নিড়াতে পারে, অঝরে কাঞ্চন ঝরে ॥৯॥

[রাগিণী—টুরি জায়েনপুরী, তাল—একতালা]

আমায় ছুঁয়ো না রে শমন আমার জাত গিয়েছে।
যে দিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা করেছে ॥
শোন্ রে শমন বলি আমার জাত কিসে গিয়েছে।
আমি ছিলেম গৃহবাসী, কেলে সর্ব্বনাশী আমায় সন্ন্যাসী করেছে ॥

† শ্রীনাথ, ইনি বোধ হয় রামপ্রসাদের গুরু ছিলেন। ‡ চতুর্ব্বর্গ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

মন রসনা এই দুজনা, কালীর নামে দল বেঁধেছে।
ইহা করে শ্রবণ, রিপু ছয়জন ডিঙ্গা ছেড়ে চলে গেছে ॥ •
যে জোরে একঘোরে আমি, সে জোর আমার বজায় আছে।
প্রসাদ বলে বেজাত মোলে যম যেন আসে না কাছে ॥১০॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম্ নই শঙ্করী ॥
পদ-রত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারী। *
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির্ তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনের চাকর, কেবল চরণ ধূলার অধিকারী ॥
যদি তোমার বাপের† ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের‡ ধারা ধর, তবে বটে তো মা পেতে পারি ॥
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি ॥১১॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

আমায় কি ধন দিবি তোর কি ধন আছে।
তোমার কৃপাদৃষ্টি পাদ পদ্ম, বাঁধা আছে শিবের কাছে ॥
ও চরণ উদ্ধারের মা, আর কি কোন উপায় আছে।
এখন প্রাণপণে খালাস কর, টাটে বা ডুবায় পাছে ॥
যদি বল অমূল্য পদ, মূল্য আবার কি তার আছে।
ঐ যে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব ওপদ বাঁধা রাখিয়াছে ॥
বাপের ধনে বেটার সত্ব, কাহার বা কোথা ঘুচেছে।
রামপ্রসাদ বলে, কুপুত্র বলে, আমায় নিরংশী করেছে ॥১২॥

[রাগিণী—তাল জংলা, একতালা]

আমার অন্তরে আনন্দময়ী।
সদা করিতেছেন কেলী ॥
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি, নামটি কভু নাহি ভুলি।
আবার দু আঁখি মুদিলে দেখি, অন্তরেতে মুণ্ডমালী ॥
বিষয় বুদ্ধি হইল হত, আমায় পাগল বোল বলে সকলি।
আমায় যা বলে তাই বলুক তারা, অন্তে যেন পাই পাগলী ॥

* ত্রিপুরারী, শিব। যিনি ত্রিপুরবাসী দৈত্যগণ বিনাশ করিয়াছেন। † তোমার বাপ, হিমালয় (যিনি পাষাণময়)। ‡ আমার বাপ, শিব (যিনি আশুতোষ)।

শ্রীরামপ্রসাদে বলে, মা বিরাজে শতদলে।
আমি শরণ নিলাম চরণ তলে, অন্তে না ফেলিও ঠেলি ॥১৩॥

[রাগিনী—বেহাগ, তাল আড়খেমটা]

আমার কপাল গো তারা।
ভাল নয় মা ভাল নয় মা, ভাল নয় মা কোন কালে ॥
শিশুকালে পিতা মলো, মাগো রাজ্য নিল পরে।
আমি অতি অল্প মতি, ভাসালে সায়েরের* জলে ॥
স্রোতের সেহলার মত মাগো ফিরিতেছি ভেসে।
সবে বলে ধর ধর, কেও নাবে না অগাধ জলে ॥
বনের পুষ্প বেলের পাতা, মাগো আর দিব আমার মাথা।
রক্তচন্দন রক্তজবা, দিব মায়ের চরণ তলে ॥
শ্রীরামপ্রসাদের এই বাণী, শোন গো মা নারায়ণী।
তনু অন্তকালে আমায়, টেনে ফেল গঙ্গাজলে ॥১৪॥

[প্রসাদী সুর ; তাল—একতালা]

আমার মনে বাসনা জননি।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে, হ, ল, ক্ষ, ব্রহ্মরূপিণী ॥
মূলে পৃথ্বী ব, স, অন্তে, চারি পত্রে মায়া ডাকিনী।
সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে, শিবে ঘেরে কুণ্ডলিনী ॥
স্বাধিষ্ঠানে ব, ল, অন্তরে, ষড়দলোপর বাসিনী।
ত্রিবেণী বরুণ বিষ্ণু, শিব ভৈরবী ডাকিনী ॥
ত্রিকোণ মণিপুরে, বহ্নি বীজ ধারিণী।
ড, ফ, অন্তে দিগ দলে, শিব ভৈরবী লাকিনী ॥
অনাহতে ষট্‌কোণে, দ্বিষড়দল বাসিনী।
ক, ঠ, অন্তে বায়ু বীজ, শিব ভৈরবী কাকিনী ॥
বিশুদ্ধাখ্য স্বরবর্ণ, ষোড়শ দল পদ্মিনী।
নাগোপরি বিষ্ণু আসন, শিব শঙ্করী সাকিনী ॥
ভ্রূমধ্যে দ্বিদলে মন, শিব লিঙ্গ চক্র যোনি।
চন্দ্র বীজে সুধা ক্ষরে, হ, ক্ষ, বর্ণে হাকিনী ॥১৫॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

আমার সনদ দেখে যারে।
আমি কালীর সুত, যমের দূত, বলগে যা তোর যম রাজারে ॥
সনদ দিলেন গণপতি, পার্ব্বতীর অনুমতি।
আমার হাজির জামিন ষড়ানন, সাক্ষী আছে নন্দীবরে ॥

* সায়ের, সায়র জলাশয়।

সনদ আমার উমস পাটে, যেমি সনদ তেমি টাটে।
তাতে স্ব অক্ষরে দস্তখৎ, করেছেন যে দিগম্বরে ॥
সনদ পেলাম মায়ের কাছে, এতে কি আর গলদ আছে।
প্রসাদ বলে ভয় দেখালে, যাবরে মায়ের দরবারে ॥১৬॥

[রাগিণী—ঝংলা, তাল—একতালা]

আমি অই খেদে খেদ করি।
ঐ যে তুমি মা থাকিতে আমার, জাগা ঘরে হয় গো চুরি ॥
মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাসরি।
আমি বুঝেছি পেয়েছি আশায়, জেনেছি তোমার চাতুরি ॥
কিছু দিলে না পেলে না, নিলে না খেলে না, সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি ॥
যশঃ অপযশঃ সুরস সকল রস তোমারি।
ওগো রসে থেকে রসভঙ্গ কেন কর রসেশ্বরী ॥
প্রসাদ বলে মন দিয়াছ মনেরে আঁখিঠারি।
ওমা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টি পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরে মরি ॥১৭॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

আমি এত দোষী কিসে।
ঐ যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার, সারাদিন মা কাঁদি বসে ॥
মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাকবো না আর এমন দেশে।
তাতে কুলালচক্র ভ্রমাইল, চিন্তারাম চাপরাশী এসে ॥ *
মনে করি গৃহ ছাড়ি, নাম সাধনা করি বসে।
কিন্তু এমন কল করেছে কালী, বেঁধে রাখে মায়াপাশে ॥
কালীর পদে মনের খেদে, দীন রামপ্রসাদে ভাসে। আমার
সেই যে কালী, মনের কালী হলেম কালী তার বিষয় বশে ॥১৮॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

আমি কবে কাশীবাসী হব।
সেই আনন্দ কাননে গিয়ে, নিরানন্দ নিবারিব ॥
গঙ্গাজলে বিল্বদলে, বিশ্বেশ্বর নাথে পূজিব।
ঐ বারাণসী জলে স্থলে, মোলে পরে মোক্ষ পাব ॥
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণময়ীর শরণ লব।
আর বব বম্ বম্ ভোলা বলে, নৃত্য করে গাল বাজাব ॥১৯॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

আমি কি আটাসে ছেলে।
ভয়ে ভুলব নাকো চোখ রাঙালে ॥

* কুলালচক্র—কুমারের চাক। ভ্রমাইল—ঘুরাইল। চিন্তারাম—চিন্তারূপ।

সম্পদ আমার ও রাঙাপদ, শিব ধরে যা হৃৎকমলে।
ওমা আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে॥
শিবের দলিল সই মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে।
এবার করব নালিশ নাথের আগে, ডিক্রী লব এক সওয়ালে॥
জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ, গুজরাইব মিছিল কালে॥
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায়, শান্ত করে লবে কোলে॥২০॥

[রাগিণী—জংলা, তাল—খয়রা]

আমি কি এমতি রব (মা তারা)।
আমার কি হবে গো দীন দয়াময়ী॥
আমি ক্রিয়া হীন, ভজন বিহীন, দীন হীন অলম্ভব।
আমার অসম্ভব আশা পূরাবে কি তুমি,
আমি কি ও পদ পাব (মা তারা)॥
সুপুত্র কুপুত্র যে হই সে হই, চরণে বিদিত সব।
কুপুত্র হইলে, জননী কি ফেলে,
এ কথা কাহারে কব (মা তারা)॥
প্রসাদ কহিছে তারা ছাড়া নাম কি আছে যে আর তা লব।
তুমি তরাইতে পার তেঁই সে তারিণী,
নামটী রেখেছেন ভব * (মা তারা)॥২১॥

[প্রসাদীসুর, তাল—একতালা]

আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত চাই॥
আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোন খানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে, দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই॥২২॥

[প্রসাদীসুর, তাল—একতালা]

আমি ক্ষেমার খাসতালুকের প্রজা।
ঐ যে ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা॥
চেন না আমারে শমন, চিনলে পরে হবে সোজা।
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি, অভয় পদের বইরে বোঝা॥

* ভব—শিব।

কেদার খাসে আছি বসে, নাই মহালে শুকা* হাজা†।
দেখ বালী চাপা সিকস্ত নদী, তাতেও মহাল আছে তাজা ॥
প্রসাদ বলে শমন তুমি, বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা ॥
ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছ, জাননা সেই পদের মজা ॥২৩॥

[প্রসাদীসুর, তাল—একতালা]

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ গো মা সংসারী ॥

অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই, সংসার সবারি।
ওমা তুমিও কোন্দল করেছ, বলিয়ে শিব ভিখারী ॥
জ্ঞান-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান-ধর্ম্ম তদুপরি।
ওমা বিনা দানে মথুরা পারে, যান্‌নি সেই ব্রজেশ্বরী।
নাতোয়ানি‡ কাচ কাচো মা, অঙ্গে ভস্ম ভূষণ পরি।
ওমা কোথায় লুকাবে বল, তোমার কুবের ভাণ্ডারী ॥
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা, এত কেন হলে ভারি।
যদি রাখ পদে, থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি ॥২৪॥

[প্রসাদীসুর, তাল—একতালা]

আমি নই পলাতক আসামি।
ওমা কি ভয় আমায় দেখাও তুমি ॥

বাজে জমা পাওনি যে মা, ছাটে জমি আছে কমি।
আমি মহামন্ত্র মোহর করা, কবচ রাখি সালতামামি ॥
আমি মায়ের খাসে আছি বসে, আসল কসে সারে জমি।
এবার, তোমার নামের জোরে, থাকৃব ধরে নিস্কর করে লব ভূমি ॥
প্রসাদ বলে খাজনা বাকী, নাইকো রাখি কড়া কমি।
যদি ডুবাও দুঃখ সিন্ধুমাঝে, ডুবেও পদে হব হামি ॥২৫॥

[রাগিণী—মোহিনী, তাল—একতালা]

আয় দেখি মন চুরি করি, তোমায় আমায় একত্তরে।
শিবের সর্ব্বস্ব ধন মায়ের চরণ, যদি আস্তে পারি হরে ॥
জাগা ঘরে চুরি করা, ইথে যদি পড়ি ধরা।
তবে মানব দেহের দফা সারা, বেঁধে নিবে কৈলাসপুরে ॥
গুরু বাক্য দৃঢ় করে, যদি যাইতে পারি ঘরে।
ভক্তিবাণ হরকে মেরে, শিবত্ব পদ লব কেড়ে ॥২৬॥

[রাগিণী—মোহিনী বাহার, তাল—একতালা]

আয় দেখি মন তুমি আমি, বিরলেতে বসি রে।
যুক্তি করি মনে প্রাণে, পিঞ্জর গড়ব গুরুচরণে।
পদে লুকায়ে সুধা খাব, যমের বাপের কি ধার ধারিরে ॥

* শুকা—অনাবৃষ্টি হেতু অজন্মা। † হাজা—অতিবৃষ্টি হেতু অজন্মা। ‡ নাতোয়ানি—নিঃস্বঅপারক।

মন বলে করিবে চুরি, ইহার সন্ধান বুঝিনে রে।
গুরু দিয়েছেন যে ধন, অভয় চরণ, কেমনে খরচ করি রে।
শ্রীরামপ্রসাদের আশা কাঁটা কেটে খোলসা করিরে।
মধুপুরী যাব, মধু খাব, শ্রীগুরুর নাম হৃদয়ে ধরি রে ॥ ২৭ ॥

[প্রসাদীসুর, তাল—একতালা]

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী কল্পতরুতলে গিয়া, চারি ফল কুড়ায়ে খাবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি ॥
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন তুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি ॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহ গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হেড়ে* বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে, জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি ॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে, দূরে রইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধুমাঝে ডুবাইবি ॥
প্রসাদ বলে এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি।
ওরে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর, মনের মতন মনটী হবি ॥ ২৮ ॥

[রাগিণী—জংলা, তাল—একতালা]

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী ॥
হৃৎকমলে ধ্যান কালে, আনন্দ সাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি ॥
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।
ওরে অনলে দাহন যথা, হয়রে তুলা রাশি ॥
গয়ায় করে পিণ্ড দান, বলে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ।
ওরে যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি ॥
কাশীতে মোলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি।
ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী ॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল।
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি ॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে।
ওরে চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী ॥ ২৯ ॥

* হেড়ে,—হাড়িকাঠ।

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

আর তোমায় না ডাকব কালী।

তুমি মেয়ে হয়ে অসি ধরে, লেংটা হয়ে রণ করিলি

দিয়াছিলে একটা বৃত্তি তাওতো দিয়ে হরে নিলি।

ঐ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে, মা হয়ে তার মাথা খালি

দীন রামপ্রসাদ বলে মা, এবার কালী কি করিলি।

ঐ যে ভাঙ্গা নায়ে দিয়ে ভরা, লাভে মূলে ডুবাইলি॥ ৩০ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

আর বাণিজ্যে কি বাসনা,

ওরে আমার মন বল না।

ওরে ঋণী*আছেন ব্রহ্মময়ী, সুখে সাধ†সেই লহনা॥‡

ব্যজনে§পবন বাস চালনেতে সুপ্রকাশ।

মনরে ওরে, শরীরস্থা ব্রহ্মময়ী, নিদ্রিতা জন্মাও চেতনা॥

কাণে যদি ঢোকে জল, বার করে যে জানে কল।

মনরে ওরে সে জলে মিশায়ে জল, ঐহিকের এরূপ ভাবনা॥

ঘরে আছে মহারত্ন, ভ্রান্তিক্রমে কাচে যত্ন।

মনরে ওরে শ্রীনাথ দত্ত, ধর তত্ত্ব কালের কপাট খোল না॥

অপূর্ব্ব জন্মিল নাতি, বুড়া দাদা দিদিঘাতী।*

মনরে ওরে জনম মরণাশৌচ, সন্ধ্যা পূজা বিড়ম্বনা॥

প্রসাদ বলে বারে বারে, না চিনিলে আপনারে।

মনরে ওরে সিন্দুর বিধবার ভালে, মরি কিবা বিবেচনা॥ ৩১ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

আর ভুলালে ভুলব না গো।

আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেল্‌ব দুল্‌ব না গো॥

বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উলব † না গো।

সুখ দুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন তুলবো না গো॥

ধন লোভে মত্ত হয়ে, দ্বারে দ্বারে বুলব না গো।

আশা বায়ু গ্রস্থ হয়ে মনের কথা খুলব না গো॥

মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুলব না গো।

রামপ্রসাদ বলে, দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুলব না গো॥ ৩২ ॥

---

* ঋণী—দায়ী (সাধনা করিলে মানবকে মুক্ত করিতে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রতিশ্রুত। †সাধ—আদায় কর (সাধনা কর) ‡লহনা—বাকী। §ব্যজন-বাতাস করণ। *দিদিঘাতী—মনের দুই স্ত্রী, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তির সন্তান অবিদ্যা (অজানা) নিবৃত্তির সন্তান বিদ্যা (জ্ঞান)। জ্ঞানের সন্তান বিবেক। বিবেক জন্মিলেই প্রবৃত্তির নাশ হয়।

† উলব—নামিব।

[রাগিণী—ঝিঁঝিট, তাল—জলদ তেতালা]

আরে ঐ আইল কেরে ঘনবরণী ॥

কেরে নবীনা নগনা লাজ বিরহিতা, ভুবনমোহিতা,

একি অনুচিতা, কুলের কামিনী।

কুঞ্জরবর গতি আসবে আবেশ, লোলিত বসনা গলিত কেশ।

সুর নরে শঙ্কা করে হেরি বেশ, হুঙ্কার রবে রে দনুজদলনী ॥

কেরে নব নীল কমল কলিকা বলি, অঙ্গুলী দংশন করিছে অলি,

মুখচন্দ্রে চকোরগণ, অধর অর্পণ করত, পূর্ণ শশধর বলি ॥

ভ্রমর চকোরেতে লাগিল বিবাদ, এ কহে নীলকমল ও কহে চাঁদ,

দোঁহে দোঁহে করতঁহি নাদ, চিচিকি গুণ গুণ করিয়ে ধ্বনি ॥

কেরে জঘন সুচারু, কদলী তরু, নিন্দিত রুধির অধীর বহিছে।

তদূর্দ্ধে কটীবেড়া নর কর ছড়া, কিঙ্কিণী সহ শোভা করিছে ॥

করতল স্থল নিরমল অতিশয়, বামে অসি মুণ্ড দক্ষিণে বরাভয়।

খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়, জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী ॥

কেরে ঊর্দ্ধতর ভূধর, হেরি হেরি পয়োধর, করিকুম্ভ ভয়ে বিদরে।

অপরূপ কি এ আর, চণ্ডমুণ্ডহার সুন্দরী সুন্দর পরে ॥

প্রফুল্ল বদনে রদন ঝলকে, মৃদুহাস্য প্রকাশ্য দামিনী নলকে।

রবি অনল শশী ত্রিনয়ন পলকে, দম্ভে কম্পে সঘনে ধরণী ॥ ৩৩ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

ইথে কি আর আপদ আছে।

(এই যে তারার জমী আমার দেহ)

যাতে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে, মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে ॥

ধৈর্য্য খোঁটা, ধর্ম্ম বেড়া, এ দেহের চৌদিক ঘেরেছে।

এখন কাল চোরে কি কর্ত্তে পারে, মহাকাল রক্ষক রয়েছে ॥

দেখে শুনে ছয়টা বলদ * ঘর হোতে বাহির হয়েছে।

কালী নাম অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধারে, পাপ তৃণ সব কেটেছে ॥

প্রেম ভক্তি সুবৃষ্টি তায়, অহর্নিশি বর্ষিতেছে।

প্রসাদ বলে কালীবৃক্ষে, চতুর্ব্বর্গ ফল ধরেছে ॥ ৩৪ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

এই দেখ সব মাগীর খেলা।

মাগীর আপ্ত ভাবে গুপ্ত লীলা ॥

স্বগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ, ডেলা দিয়া ভাঙ্গে ডেলা।

মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজি, নারাজ হয় সে কাজের বেলা ॥

* ছয়টা বলদ—ষড় রিপু।

প্রসাদ বলে থাক বসে, ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা।
যখন জোয়ার আসবে উজিয়ে যাবে, ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা॥ ৩৫ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি॥
ওরে ক্ষিতি জল বহ্নি বায়ু, শূন্যেতে পাঁচ পরিপাটি।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষকোটী॥
যেমন শরার জলে সূর্য্য ছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটি।
গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলাম মাটী॥
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ি কিসে কাটি।
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী॥
আগে ইচ্ছাসুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছটফটি॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটি।
ওমা যা ইচ্ছা তাই কর গো মা, তুমিতো পাষাণের বেটী॥৩৬॥

[রাগিণী—জংলা, তাল—একতালা]

একবার ডাকরে কালীতারা বলে, জোর করে রসনে।
ও তোর ভয় কিরে শমনে॥
কাজ কি তীর্থ গঙ্গা কাশী, যার হৃদে জাগে এলোকেশী।
তার কাজ কি ধর্ম্মকর্ম্ম, ও তাঁর মর্ম্ম যেবা জানে॥
ভজনের ছিল ভরসা, সূক্ষ্ম মোক্ষ পূর্ণ আশা।
রামপ্রসাদের এই দশা, দ্বিভাব ভেবে মনে॥৩৭॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

এবার আমি করব কৃষি।
ওগো এ ভব সংসারে আসি॥
তুমি কৃপাবিন্দু পাত করিয়ে, বসে দেখ রাজমহিষী।
দেহ জমীর জঙ্গল বেশী, সাধ্য কি মা সকল চষি।
মাগো যৎকিঞ্চিৎ আবাদ হলে, আনন্দ সাগরে ভাসি॥
হৃদয় মধ্যেতে আছে, পাপরূপী তৃণরাশি।
তুমি তীক্ষ্ণ কাটারীতে মুক্ত, কর গো মা মুক্তকেশী॥
কাম আদি ছয়টা বলদ, বহিতে পারে অহর্নিশি।
আমি গুরুদত্ত বীজ বুনিয়ে, শস্য পাব রাশি রাশি॥
প্রসাদ বলে চাষে বাসে, মিছে মন অভিলাষী।
আমার মনের বাসনা তারার, ও রাঙ্গা চরণে মিশি॥৩৮॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

এবার আমি বুঝব হরে।
মায়ের ধরব চরণ লব জোরে ॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি, বলব এবার যারে তারে।
সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ, হৃদে ধরে কোন বিচারে ?
পিতা পুত্রে এককক্ষেত্রে, দেখা মাত্রে বলব তারে।
ভোলা মায়ের চরণ করে হরণ, মিছে মরণ দেখায় কারে ॥
মায়ের ধন সন্তানে পায়, সে ধন নিলে কোন বিচারে ?
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে, চরণ ছেড়ে দিক আমারে ॥
শিবের দোষ বলি যদি, বাজে আপন গায় উপরে।
রামপ্রসাদ বলে ভয় করিনে, মায়ের অভয় চরণের জোরে ॥৩৯॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

এবার আমি সার ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি !
যে দেশেতে রজনী নাই, সে দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যারে বন্ধ্যা জেনেছি ॥
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি ॥
সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোনাতে রং ধরায়েছি।
মণি মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি ॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি, উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি ॥৪০॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

এবার কালী কুলাইব
কালি কসে কালি বুঝে লব ॥
সে নৃত্যকালী কি অস্থিরা, কেমন করে তায় রাখিব।
আমার মনোযন্ত্রে বাদ্য করে, হৃদিপদ্মে নাচাইব ॥
কালী পদের পদ্ধতি যা, মন তোরে তা জানাইব।
আছে আর যে ছটা * বড় ঠ্যাটা, সে কটাকে কেটে দিব ॥
কালী ভেবে কালী হয়ে, কালী বলে, কাল কাটাব।
আমি কালাকালে কালের মুখে, কালি দিয়ে চলে যাব ॥
প্রসাদ বলে আর কেন মা, আর কত গো প্রকাশিব।
আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু, কালী বুলি না ছাড়িব ॥৪১॥

* ছটা, ছয় রিপু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য)

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

এবার কালী তোমায় খাব। *
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
তারা গণ্ড যোগে জন্ম আমার
গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় যে মা-খেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটোর একটা করে যাব ॥
খাব খাব বলি মাগো উদরস্থ না করিব।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোমানসে পূজিব ॥
যদি বল কালী খেলে, কালের হাতে ঠেকা যাব।
আমার ভয় কি তাতে, কালী বলে কালেরে কলা দেখাব॥
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, ভাল মতে তাই জানাব।
তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পতন, যা হবার তাই ঘটাইব ॥
ডাকিনী যোগিনী দুটা, তরকারী বানায়ে খাব।
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে, অম্বলে সম্বরা দিব ॥
হাতে কালী মুখে কালী সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে, সেই কালী তার মুখে দিব ॥৪২॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

এবার বাজি ভোর হ'ল।
মন কি খেলা খেলাবি বল ॥
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চে আমার দাগা দিল।
এবার বড়ের ঘর করে ভর, মন্ত্রীটি বিপাকে ম'ল ॥
দুটা অশ্ব দুটা গজ, ঘরে বসে কাল কাটাল।
তারা চলতে পারে সকল ঘরে, তবে কেন অচল হ'ল ॥
দুখান তরি নিমক ভরি, বাদাম তুলি না চলিল।
ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে, ঘাটের তরি ঘাটে র'ল ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, মোর কপালে এই কি ছিল।
ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে, পীলের কিস্তে মাত হ'ল ॥৪৩॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

এবার ভাল ভাব পেয়েছি।
কালীর অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি ॥
ভবের কাছে পেয়ে ভাব, ভাবিকে ভুল ভুলায়েছি।
তাই রাগ দ্বেষ লোভ ত্যজে, সত্ত্বগুণে মন দিয়েছি ॥

* তোমার খাব অর্থাৎ তোমার 'তুমিত্ব' কিংবা আমার 'আমিত্ব' খাইয়া উভয়ে এক হইব।

তারা নাম সারাৎসার, আত্মশিক্ষায় বাঁধিয়াছি।
সাদা দুর্গা দুর্গা বলে, দুর্গানামের কাচ পেয়েছি॥
প্রসাদ ভাবে যেতে হবে, একথা নিশ্চিত জেনেছি।
লয়ে কালীর নাম পথের সম্বল, যাত্রা করে বসে আছি॥৪৪॥

[রাগিণী—মল্লার, তাল—খয়রা]

এলোকেশে কে শবে এলোরে বামা।
নখর নিকর হিমকরবর, রঞ্জিত ঘন তনু, মুখ হিমধামা।
কুলবালা বাহু বলে, প্রবল দনুজ দলে, ধরাতলে হতরিপু সমা॥
ভৈরব ভূত * প্রমথগণ, ঘন রবে রণজয়ী শ্যামা।
করে করে ধরে তাল, ববম বম বাজে গাল,
ধাঁ ধাঁ ধাঁ গুড়্ গুড়্, বাজিছে দামামা॥
ভবভয় ভঞ্জন হেতু কবিরঞ্জন, মুঞ্চতি করম সুনামা†।
তবগুণ শ্রবণে, সতত মম মনে, ঘোর ভবে পুনরপি গমন বিরামা॥৪৫॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

এলোকেশী বিগ্বসনা।
কালী পুরাও মোর মনবাসনা॥
যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশ মা নাহি দেখি।
আমায় হবে কি না হবে দয়া, বলে দে মা ঠিক ঠিকানা॥
যে বাসনা মনে আছে, বলেছি মা তোমার কাছে।
এ মা তুমি বিনে ত্রিভুবনে, এ বাসনা কেউ জানে না॥৪৬॥

[রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—রূপক]

এলো চিকুর নিকর, নরকর কটীতটে, হরে বিহরে রূপসী।
সুধাংশু তপন, দহন নয়ন, বয়ানবরে বসি শশী॥
শব শিশু ইষু, শ্রুতিতলে শোভে, বাম করে মুণ্ড অসি।
বামেতর‡ কর, যাচে অভয় বর, বরাঙ্গনা রূপ মসি॥
সদা মদালসে, কলেবর খসে, হাসে প্রকাশে সুধারাশি।
সমস্তা স্ববাসা, মাভৈঃ মাভৈঃ ভাষা, সুরেশানুকূলা ষোড়শী॥
প্রসাদে প্রসন্না, ভব ভবপ্রিয়া, ভবার্ণব ভয় বাসি।
জহুর যন্ত্রণা হরণে মন্ত্রণা, চরণে গয়া গঙ্গা কাশী॥৪৭॥

[রাগিণী—বিভাস, তাল—তিওট]

এলো চিকুর ভার, এ বামা! মার মার মার রবে ধায়।
রূপে আলো করি ক্ষিতি, গজপতিরূপ গতি,
রতিপতি মতি মোহ পায়॥

* প্রমথগণ—শিবের অনুচর বর্গ। †মুঞ্চতি করম সুনামা—কর্ম্ম ও সুনাম ত্যাগ করিয়াছি।
‡বামেতর—দক্ষিণ।

অপযশ কুলে কালী, কুলনাশ করে কালী,
নিশুম্ভ নিপাতি কালী, সব সেরে যায়।
সকল সেরে যায়, একি ঠেকিলাম দায়, এ জন্মের মত বিদায় ॥
কালী বলে এতকাল, এড়ালাম যে জঞ্জাল, সেই কাল চরণে লুটায় ॥
টেনে ফেল রম্ভাফল, গঙ্গাজল বিল্বদল,
শিব পূজার এই ফল, অশিব ঘটায় ॥
অশিব ঘটায়, এই দনুজ ভটায়, কি কুরব রটায়।
ভব দৈবরূপ শব, মুখে মাত্র নাহি রব, কার ভরসায় রব, হায়।
চিনিলাম ব্রহ্মময়ী, হই বা না হই জয়ী,
নিতান্ত করুণাময়ী, স্থান দিবে পায় ॥
স্থান দিবে পায়, নিতান্ত মন তায়, এজন্ম কর্ম্ম সায় ॥
প্রসাদ বলে ভাল বটে, এ বুদ্ধি হয়েছে ঘটে,
এ শঙ্কটে প্রাণে বাঁচা দায়।
মরণে কি আছে ভয়, জন্মের দক্ষিণা হয়,
দক্ষিণান্তে মন লয় কর দৈত্য রায় ॥
ওহে দৈত্য রায়, ভজ এই দক্ষিণায়, আর কি কাজ আশায় ॥৪৮॥

[রাগিণী—সিন্ধু, তাল—ঠুংরি]

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে, তারা বেয়ে পড়্‌বে ধারা ॥
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়্‌ব লুটে, তারা বলে হব সারা ॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা ॥
শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে।
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির হরা (ভরা) ॥৪৯॥

[রাগিণী—পিলুবাহার, তাল—জৎ]

এ শরীরে কাজ কিরে ভাই, দক্ষিণে প্রেমে না গলে।
ওরে এ রসনায় ধিক্ ধিক্, কালী নাম নাহি বলে ॥
কালীরূপ যে না হেরে, পাপ চক্ষু বলি তারে।
ওরে সেই সে দুরন্ত মন, না ডুবে চরণ তলে ॥
সে কর্ণে পড়ুক বাজ, থেকে তার কিবা কাজ।
ওরে সুধাময় নাম শুনে, চক্ষু না ভাসালে জলে ॥
যে করে উদর ভরে, সে করে কি সাধ করে।
ওরে না পুরে অঞ্জলি যদি, চন্দন জবা আর বিল্বদলে ॥
সে চরণে কাজ কিবা, মিছা শ্রম রাত্রি দিবা।

ওরে কালী মূর্ত্তি যথা তথা ইচ্ছা সুখে নাহি চলে ॥
ইন্দ্রিয় অবশ যার, দেবতা কি বশ তার।
রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে, আম্র কি কখন ফলে ॥৫০॥

[রাগিণী—জয়জয়ন্তি, তাল—জৎ]

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর, খাস তালুকে বসত করি ॥
নাইকো জরীপ জমাবন্দী, তালুক হয় না লাট-বন্দি (মা)।
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি, শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী ॥
নাইকো কিছু অন্য লেঠা, দিতে হয় না মাথট বাটা (মা)।
জয় দুর্গার নামে জমা আটা, ঐটা করি মালগুজারি।
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ (মা)
আমি ভক্তির জোরে কিন্‌তে পারি, ব্রহ্মময়ীর জমিদারি ॥৫১॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

এ সব ক্ষেপা মেয়ের খেলা।
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিহ্বলা ॥
সে যে আপ্‌নি ক্ষেপা, কর্ত্তা ক্ষেপা, ক্ষেপা দুটো চেলা ॥
কি রূপ কি গুণভঙ্গি, কি ভাব কিছুই না যায় বলা।
যার নাম করিয়ে কপাল পোড়ে, কণ্ঠে বিষের জ্বালা ॥৫২॥

[রাগিণী—ললিত, তাল—তিওট]

ও কার রমণী সমরে নাচিছে।
দিগম্বরী দিগম্বরোপরি শোভিছে ॥
তনু নব ধরাধর, রুধিরধারা নিকর,
কালিন্দী জলে কিংশুক ভাসিছে।
বদন বিমল শশী কত সুধা ক্ষরে হাসি,
কালরূপে তমোরাশি রাশি নাশিছে।
কহে কবি রামপ্রসাদে, কালিকা কমল পদে,
মুক্তিপদ হেতু যোগী হৃদে ভাবিছে ॥৫৩॥

[রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—ধিমা তেতালা]

ওকে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি বিগলিত বেশ।
বসনবিহীনা কে রে সমরে ॥
মদন মথন উরসি রূপসী, হাসি হাসি বামা বিহরে।
প্রলয় কালীন জলদ গর্জ্জে, তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জ্জে,
জনমনোহরা শমন সোদরা গর্ব্ব খর্ব্ব করে ॥
শস্ত্রে শাস্ত্রে প্রথম দীক্ষা, প্রথম বয়স বিপুল শিক্ষা,
ক্রুদ্ধ নয়নে, নিরখে যে জনে, গমন শমন নগরে ॥

কলয়তি প্রসাদ হে জগদম্বে, সমরে নিপাত রিপু কদম্বে,*
সম্বর বেশ, কুরু কৃপালেশ, রক্ষ বিবুধ নিকরে॥ ৫৪ ॥

[রাগিণী—বেহাগ, তাল—একতালা]

ও কেরে মনমোহিনী।
ঐ মনোমোহিনী॥
ঢল ঢল ঢল তড়িৎঘটা, মণি মরকত কান্তি ছটা।
একি চিত্ত ছলনা, দৈত্য দলনা, ললনা নলিনী বিড়ম্বিনী॥
সপ্ত পেতি সপ্ত হোতি, সপ্তবিংশ-প্রিয় নয়নী।
শশী খণ্ড শিরসী, মহেশ উরসী, হরের রূপসী একাকিনী॥
ললাট ফলকে, অলকা ঝলকে, নাসানলকে, বেসরে মণি।
মরি! হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ, সুধারস কূপ, বদনখানি।
শ্মশানে বাস, অট্টহাস, কেশপাশ, কাদম্বিনী।
বামা সমরে বরদা, অসুর দরদা, নিকটে প্রমদা প্রমাদ গণি॥
কহিছে প্রসাদ, না কর বিষাদ, পড়িল প্রমাদ স্বরূপে, মানি।
না হব জয়ী রে, ব্রহ্মময়ী রে, করুণাময়ী রে, বল জননী॥ ৫৫ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

ও মন, তোর নামে কি নালিশ দিব।
ও তুই শকার বকার বলতে পারিস, বলতে নারিস দুর্গা শিব॥
খেয়েছ জিলিপি খাজা, লুচি মণ্ডা সরভাজা।
ওরে শেষে পাবি সে সব মজা, যখন রে পঞ্চত্ব পাব॥
পাঁচ ইন্দ্রিয়ের পাঁচ বাসনা, কেমন করে ঘর করিব।
রে চুরি দারি করিলে পরে উচিত মত সাজাই পাব॥ ৫৬ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

ও মা শ্যামা নেবে দাঁড়া, নাচিস্‌নে আর ক্ষেপা মাগী।
মরে নাই ও বেঁচে আছে মা, মহাযোগে পরম যোগী॥
যে দেখি তোর চরণের জোর, মা নাব নইলে ওর ভাঙ্গলো পাঁজর,
(বুড়োর) বিষ খেকো হাড় নয় মা সজোর,
তাহে আবার তোর বিয়োগী।
বিষ খেয়ে যার হয় নাই মরণ, সে মরবে আজ কিসের কারণ,
প্রসাদ বলে ওর কপট মরণ,
মা তোর অভয় চরণ পাবার লাগি॥ ৫৭ ॥

* কদম্বে—সমূহে। হোতি—সাধন বিশেষ।

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

ওমা তোর মায়া কে বুঝতে পারে।
তুমি ক্ষেপা মেয়ে মায়া দিয়ে, রেখেছ সব পাগল করে॥
মায়া ভরে এ সংসারে, কেহ কারে চিন্তে নারে।
ঐ সে এম্নি কালীর কাপ আছে যে, যেম্নি দেখে তেম্নি করে॥
পাগল মেয়ের কি মন্ত্রণা, কে তার ঠিক্‌ঠিকানা করে।
রামপ্রসাদ বলে যায় গো জ্বালা, তারা যদি চায় গো ফিরে (অনুগ্রহ করে)॥ ৫৮।

[রাগিণী—সোহিনী বাহার, তাল—আড়খেম্‌টা]

ওমা ! হর গো তারা, মনের দুখ।
(আর তো দুঃখ সহে না॥)
যে দুঃখ গর্ভ যাতনে, মাগো, জন্মিলে থাকে না মনে।
মায়ামোহে পড়ে ভ্রমে, জন্মি বলে ওনা ওনা॥
জন্মমৃত্যু যে যন্ত্রণা, যে জন্মে নাই সে জানে না।
তুমি কি জান যন্ত্রণা, জন্মিলে না মরিলে না॥
রামপ্রসাদ এই ভণে, দ্বন্দ্ব হবে মায়ের সনে।
তবু রব মায়ের চরণে, আর ত ভবে জন্মিব না॥ ৫৯॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

ওরে তারা বলে কেন না ডাকিলাম।
(আমার) এ তনু তরণী ভবসাগরে ডুবালাম॥
এ ভবতরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম।
(তাতে) ত্যজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পূরাইলাম॥
বিষম তরঙ্গ মাঝে চেয়ে না দেখিলাম।
মনডোরে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম॥
প্রসাদ বলে মা মাগো আমি কি কার্য্য করিলাম।
(আমার) তুফানে ডুবিল তরী আপনি মজিলাম॥ ৬০॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

ওরে মন কি ব্যাপারে এলি।
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া, লাভে মূলে হারাইলি।
গুরুদত্ত রত্নভরে, কেন ব্যাপার না করিলি।
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত, মধ্যে তরী ডুবাইলি॥
রামপ্রসাদ বলে সে অর্থ কেন না আনিলি।
ও তোর ব্যাপারেতে ভাল হবে কি মহাজনকে মজাইলি॥ ৬১॥

[রাগিণী—ঝংলা, তাল—একতালা]

ওরে মন চড়কি চরক কর, এ ঘোর সংসারে।
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাঁহারে॥

যুগল স্বয়ম্ভু শম্ভু যুবতীর উরে।
মন রে ওরে, কর পঞ্চ বিল্বদলে পূজিছ তাহারে॥
ঘরেতে যুবতীর বাক, গাজনে* বাজিছে ঢাক।
মনরে ওরে, বৃন্দাবলী খ্যামটা ঢালি, বাজায় বারে বারে॥
কাম উচ্চ ভারায় চড়ে, ভাংলে পাঁজর পাটে পড়ে।
মনরে ওরে, এমন যাতনা করেছ তুচ্ছ, ধন্যরে তোমারে॥
দীর্ঘ আশা চড়ক গাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ।
মনরে ওরে, মায়া ডোরে বঁড়শী গাঁথা, স্নেহ বল যারে॥
প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার।
মনরে ওরে, শিঙ্গে ফুঁকে† শিঙ্গে পাবি, ডাক কেলে মারে॥ ৬২॥

[রাগিণী—পিলু বাহার, তাল—জৎ]

ওরে মন বলি ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র কর, দিবানিশি জপ করে॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
ওরে নগর ফিরে মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে॥
যত শোন কর্ণপটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে।
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে।
ওরে, আহার কর মনে কর আহুতি দেই শ্যামা মারে॥ ৬৩॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে।
তুমি যে পদে ওপদ পেয়েছ, সে মোরে অভয় দিয়েছে॥
ইজারার পাট্টা পেয়ে, এত কি গৌরব বেড়েছে।
ওরে, স্বয়ং থাকতে কুশের পুতুল, কে কোথা দাহন করেছে॥
হিসাব বাকী থাকে যদি, দিব না রে তোদের কাছে।
ওরে, রাজা থাকতে কোটালের দোহাই,
কোন্ দেশেতে কে দেখেছে॥
শিব রাজ্যে বসতি করি, শিব আমার পাট্টা দিয়েছে।
রামপ্রসাদ বলে সেই পাট্টাতে, ব্রহ্মময়ী সাক্ষী আছে॥ ৬৪॥

[রাগিণী—পিলু বাহার, তাল—জৎ]

ওরে সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী বলে।
মন মাতালে মাতাল করে, মদ মাতালে মাতাল বলে॥
গুরুদত্ত গুড় লয়ে প্রবৃত্তি মশলা দিয়ে (মা)

---

* গাজনে—শিবের উৎসব। † শিঙে ফুঁকে—মৃত্যু হইলে।

আমার জ্ঞান শুরীতে চুয়ায় ভাঁটী, পান করে মোর মন মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি বলে তারা (মা)।
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে ॥ ৬৫ ॥

[রাগিণী—মুলতান ধানেশ্রী, তাল—একতালা]

করুণাময়ি ! কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা, (গো তারা)
আমার এম্নি দশা, শাকে অন্ন মেলে কৈ ॥
কারে দিলে ধন জন মা, হস্তী অশ্ব রথ চয়।
ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর, আমি কি তোর কেহ নই ॥
কেহ রহে অট্টালিকায়, মনে করি তেম্নি হই।
মা গো, আমি কি তোর পাকা খেতে দিয়াছিলাম মই ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, আমার কপাল বুঝি অম্নি অই।
ওমা আমার দশা দেখে বুঝি, শ্যামা হলে পাষাণময়ী ॥ ৬৬ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

কই তারা তোর বিবেচনা।
তাই বলি গো শ্যামা ত্রিনয়না ॥
যাব ভবপারে কেমন করে, কি আছে মোর সম্ভাবনা ॥
অকৃতী সন্তান জননীর হয় ভাবনা।
ওমা তোমার কেন উল্টা বিচার, অধিকন্তু দাও যাতনা ॥
জাননা সন্তানের স্নেহ, জননী তব ছিল না।
ওমা পাষাণ কন্যে পাষাণ হলে, মনেও ত চেয়ে দেখ না ॥
নির্গুণ রামপ্রসাদ তোর, ব'লে মা সন্তান ছেড় না।
কর মা হয়ে মা বিড়ম্বনা, কলঙ্কেরি ভয় রাখ না ॥ ৬৭ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

কাজ কি মা সামান্য ধনে।
ও কে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে ॥
সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে।
যদি দেও মা আমায় অভয় চরণ, রাখি হৃদি পদ্মাসনে ॥
গুরু আমায় কৃপা করে মা, যে ধন দিলে কানে কানে।
এমন গুরু আরাধিত মন্ত্র, তাও হারালেম সাধন বিনে ॥
প্রসাদ বলে কৃপা যদি মা, হবে তোমার নিজ গুণে।
আমি অন্তিমকালে জয়দুর্গা বলে, স্থান পাই যেন ঐ চরণে ॥ ৬৮ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

কাজ কিরে মন, যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্য* রাশি॥

সার্দ্ধ ত্রিশ কোটী তীর্থ, মায়ের ও চরণ বাসী।
যদি সন্ধ্যা জান শাস্ত্র মান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী
হৃৎকমলে ভাব বসে, চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি॥ ৬৯॥

[রাগিণী—ইমন, তাল—একতালা]

কাজ কি আমার কাশী।
যাঁর কৃতকাশী, তত্ত্বমসি বিগলিতকেশী॥
যেই জগদম্বার কুণ্ডল পড়েছিল খসি।
সেই হতে মণিকর্ণি বলে তারে ঘোষি॥
অসি বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণসী।
মায়ের করুণা বরুণাধারা, অসিধারা অসি॥
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি।
ওরে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশমহিষী॥
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল ত না বাসী।
ঐ যে গলাতে বেঁধেছে আমার কালীনামের ফাঁসি॥৭০॥

[প্রসাদী সুর,—তাল—একতালা]

কাজ হারালাম কালের বশে।
গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে॥
যখন তারা ধন উপার্জ্জন, করেছিলাম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আমার বশে॥
এখন আমার ধন উপার্জ্জন, না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত, নির্ধন বলে সবাই রোষে॥
যমদূত আসি শিয়রেতে বসি, ধর্ব্বে যখন অগ্রকেশে।
তখন সাজায়ে মাচা কলসী কাচা, বিদায় দিবে দণ্ডিবেশে॥
হরি হরি বলি শ্মশানেতে ফেলি, যে যার যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ মলো কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে॥৭১॥

[রাগিণী—সুরট, তাল—কাওয়ালি]

কামিনী যামিনী-বরণে রণে এলো কে।
উলঙ্গ এলোকেশী, বাম করে ধরে অসি, উল্লাসিতা দানব নিধনে॥
পদভরে বসুমতী, সুভীতা কম্পিতা অতি।
তাই দেখে পশুপতি, পতিত চরণে রণে॥

* কৈবল্য,—মোক্ষ, সংসার মুক্তি।

দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, তবে আর কিবা ভয়।
অনায়াসে যম জয় জীবনে মরণে রণে ॥৭২॥

[রাগিণী—মূলতান, তাল—একতালা]

কার বা চাকরী কর, (রে মন)।
ওরে তুই বা কে, তোর মনিব কে রে, হলিরে তুই কার নফর ॥
মোহাছিবা দিতে হবে, নিকাশ তৈয়ার কর।
ও তোর আমদানিতে শূন্য দেখি, কর্জ্জ জমা ধর (ওরে মন) ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে তারার নামটী সার।
ওরে মিছে কেন দারা সুতের বেগার খেটে মর (ওরে মন) ॥৭৩॥

[রাগিণী—মূলতান, তাল—একতালা]

কাল মেঘ উদয় হলো অন্তর অম্বরে।
নৃত্যতি মানস শিখী কৌতুকে বিহরে ॥
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধরাধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ হাসি, তড়িৎ শোভা করে ॥
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ চাতকের তৃষা ভয় ঘুচিল সত্বরে ॥
ইহ জন্ম, পর জন্ম, বহু জন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম, হবে না জঠরে ॥৭৪॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

কাল হারালাম কালের বশে।
কি হবে মা মোর অবশেষে ॥
তখন কারে ডাকবো তারা, শমন এসে ধরলে কেশে ॥
পুরাণে শুনেছি আমি 'পতিত পাবনী তুমি'।
এবার তোমার ভার তারা, যেন বিপক্ষেতে নাহি হাসে ॥
প্রসাদ গতি মতি হীন কুমতি কুরতি ক্ষীণ।
কেবল মাত্র আছি কালী, অভয় চরণ পাবার আশে ॥৭৫॥

[রাগিণী—বসন্ত বাহার, তাল—একতালা]

কালী কালী বল রসনা।
কর পদ ধ্যান, নামামৃত পান, যদি পেতে ত্রাণ থাকে বাসনা ॥
ভাই বন্ধু সুত দারা পরিজন, সঙ্গের দোসর নহে কোন জন।
দুরন্ত শমন বাঁধিবে যখন, বিনে ঐ চরণ কেহ কার না ॥
দুর্গা নাম মুখে বল একবার, সঙ্গের সম্বল দুর্গানাম আমার।
অনিত্য সংসার নাহি পারাপার, সকলি অসার ভেবে দেখ না ॥
গেল গেল কাল বিফলে গেল, দেখ না কালান্ত নিকটে এল।
প্রসাদ বলে ভাল, কালী কালী বল, দূর হবে সব যম-যন্ত্রণা ॥৭৬॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

কালী কালী বল রসনা রে।
ও মন ষট্‌চক্র রথ মধ্যে, শ্যামা মা মোর বিরাজ করে॥
তিনটে কাছি * কাছাকাছি, যুক্ত বাঁধা মূলাধারে।
পাঁচ ক্ষমতার, সারথি তার, রথ চালায় দেশদেশান্তরে॥
ঘুড়ি ঘোড়া দৌড় কুচে, দিনেতে দশকুশী মারে।
সে যে সময় শির নাড়িতে নারে, কলে বিকল হলে পরে॥
তীর্থে গমন মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করনা রে।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে॥
পাঁচ জনে পাঁচ স্থানে গেলে, ফেলে রাখবে প্রসাদেরে। ওমন,
এইত সময়, মিছে কাল যায়, যত ডাক্‌তে পার দুঅক্ষরে॥৭৭॥

[রাগিণী—মূলতানী, তাল—একতালা]

কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে,
এতনু তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা, মনকে কর নেয়ে॥
দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠ দেশে অনুকূল, কাল রবে চেয়ে।
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অণিমাদি।
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী পলাইব ধেয়ে॥৭৮॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

কালী গো কেন লেংটা ফের
ছি ছি কিছু লজ্জা নাই তোমার
বসন ভূষণ নাই তোমার মা, রাজার মেয়ে গৌরব কর
মাগো এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম, পতির উপর চরণ ধর
আপনি লেংটা পতি লেংটা, শ্মশানে মশানে চর।
মাগো আমরা সবে মরি লাজে, এবার মেয়ে বসন পর॥
তেজে রত্নহার মা তোমার, ওকণ্ঠে শোভে নরশির।
প্রসাদ বলে ঐরূপে মা, ভয় পেয়েছেন দিগম্বর॥৭৯॥

[রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—আদ্ধা]

কালী তারার নাম জপ মুখেরে।
যে নামে শমন ভয়ে যাবে দূরে রে॥
যে নামেতে শিব সন্ন্যাসী, হইল শ্মশানবাসী।
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে না পায় ভাবিয়া রে॥
ডুবু ডুবু হইল ভরা, লোকে বলে ডুবে রে।
তবু ভুলাইতে পার যদি, ভোলানাথের মন রে॥

* তিনটে কাছি—ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না।

আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি স্তুতি।
দ্বিজ প্রসাদের নতি, চরণতলে রেখ রে ॥৮০॥

[রাগিণী—পিলু বাহার, তাল—জৎ]

কালী নাম জপ কর, সবে কালীর কাছে।
কালী ভক্ত জীবন্মুক্ত, যে ভাবে যে আছে ॥
শ্রীনাথ করুণাসিন্ধু, অকিঞ্চন দীনবন্ধু।
দেখালেন কালী পাদপদ্ম কল্প-গাছে ॥
গৃহে মুক্তি মূর্ত্তিমতী, রসনাগ্রে সরস্বতী।
শিব শিবা, রাত্রি দিবা, রক্ষা হেতু আছে ॥
যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহীর বাসনা ভোগ।
মার ইচ্ছা যোগ ভোগ, ভক্ত জনে আছে ॥
আনন্দে প্রসাদ কয়, কালী কিঙ্করের জয়।
অণিমাদি আজ্ঞাকারী, পড়ে থাক্ পাছে ॥৮১॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

কালীর নাম বড় মিঠা।
সদা গান কর পান কর এটা ॥
ওরে ধিক্‌রে রসনা, তবু ইচ্ছা করে পায়স পিঠা।
নিরাকার সাকার ককার সবাকার ভিটা ॥
ওরে ভোগ মোক্ষ ধাম নাম, ইহার পর আর আছে কিটা ॥
কালী যার হৃদে জাগে, হৃদয়ে তার জাহ্নবীটা।
সে যে কাল হলে মহাকাল হয়, কালে দিয়ে হাততালীটা ॥
জ্ঞানাগ্নি অন্তরে জেলে, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর ঘিটা।
তুমি মন কর বিল্বদল, শ্রুব* কর যত্ন যেটা ॥
প্রসাদ বলে হৃদি ভূমির, বিরোধ মেনে গেল মিটা।
আমার এ তনু দক্ষিণা কালীর, দেবোত্তরের দাগা চিঠা ॥৮২॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

কালীপদ মরকত আলানে‡ মন কুঞ্জরেরে বাঁধ এটে।
ওরে কালী নাম তীক্ষ্ণ খড়্গে, কর্ম্মপাশ ফেল কেটে ॥
নিতান্ত বিষয়াসক্ত, মাথায় কর বেসার বেটে।
ওরে একে পঞ্চভূতের ভার, আবার ভূতের বেগার মর খেটে ॥
সতত ত্রিতাপের তাপে, হৃদিভূমি গেল ফেটে।
নব কাদম্বিনীর বিড়ম্বনা, পরমায়ু যায় ঘেটে ॥

* শ্রুব—যজ্ঞে ঘৃত ক্ষেপনার্থ পাত্র। ‡ আলানে—গজ বন্ধন স্তম্ভ।

নানা তীর্থ পর্য্যটনে, শ্রম মাত্র পথ হেঁটে।
পাবে ঘরে বসে চারি ফল, বুঝনারে দুঃখ চেটে॥
রামপ্রসাদ কয় কিসে কি হয়, মিছে মোলেম শাস্ত্র ঘেটে।
এখন ব্রহ্মময়ীর নাম করে, ব্রহ্মরন্ধ্র যাক ফেটে॥৮৩॥

[রাগিণী—ললিত বিভাস, তাল—আড়খেমটা]

কালীর নামে গণ্ডী দিয়ে আছি দাঁড়াইয়ে॥
শোন্‌রে শমন তোরে কই, আমিতো আটাশে নই,
তোর কথা কেন রব সয়ে।
ছেলের হাতের মোওয়া নয় যে, খাবে ভোগা দিয়ে॥
কটু বলবি সাজা পাবি, মাকে দিব ক'য়ে।
সে যে কৃতান্তদলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে॥
শ্রীরামপ্রসাদ কয় যেন শ্যামা গুণ গেয়ে।
আমি ফাঁকি দিয়ে চলে যাই, চক্ষে ধূলা দিয়ে॥৮৪॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

কালী সব ঘুচালে লেটা।
আগম* নিগম† শিবের বচন, মানবি কি না মানবি সেটা॥
শ্মশান পেলে ভালবাস মা, তুচ্ছ কর মণিকোটা।
মাগো আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ভুলেনা আর সিদ্ধি ঘোটা॥
যে জন তোমার ভক্ত হয় মা, ভিন্ন হয় তার রূপের ছটা।
তার কটীতে কৌপীন মেলে না, গায় ছাই আর মাথায় জটা॥
ভূতলে আনিয়ে মাগো, করলে আমায় লোহাপিটা।
আমি তবু কালী বলে ডাকি, সাবাস আমার বুকের পাটা॥
চাকলা‡ জুড়ে নাম রটেছে, শ্রীরামপ্রসাদ কালীর বেটা।
এযে মায় পোয়ে এমন ব্যবহার, ইহার মর্ম্ম বুঝবে কেটা॥৮৫॥

[রাগিণী—জংলা, তাল—একতালা]

কালী হলি মা রাসবিহারী।
নটবর বেশে বৃন্দাবনে॥
পৃথক প্রণব‡ নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি॥
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটি, এলো চুল চূড়া বংশীধারী॥
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে, মোহিত করেছে ত্রিপুরারি।
এবে নিজ কাল, তনুরেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি॥

* আগম—তন্ত্রশাস্ত্র। † নিগম,—বেদ। ‡ চাকলা—কয়েকটি পরগণার সমষ্টি। আ—গতং শিববক্ত্রেভ্যোঃ, গ—তঞ্চ গিরিজা শ্রুতৌঃ, ম—তঞ্চ বাসুদেবস্য, তস্মাদাগম উচ্যতে।
‡ প্রণব—ঈশ্বরের গূঢ় নাম (ওঁ)

ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস, এবে মৃদু হাস ভুলে ব্রজকুমারী ।
পূর্ব্বে শোণিতসাগরে নেচেছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুনা বারি ॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি ।
মহাকাল কানু শ্যাম শ্যামা তনু, একই সকল বুঝিতে নারি ॥৮৬॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

কি আর বৈদিক পূজা আছে (মা)
আমার সুযশ নাই অযশ ঘটেছে ॥
আমার নাই অবকাশ হ'ল সব কাজ, জন্ম মৃত্যু দুট অশৌচ ঘটেছে ॥
চিন্তা ভার্য্যা বন্ধ্যা ছিল, সে ভার্য্যা প্রসব করেছে ॥
কাল অনুক্রমে সুসঙ্গমে, জ্ঞান আনন্দ নামে, এক পুত্র জন্মেছে ॥
কুবুদ্ধি এক জনক ছিল, সেও আমারে ত্যাগ করেছে ।
সেই পিতার লাগি হয়ে বিবাগী, মায়া নামে আমার মা মরেছে ॥
রোগ শোক দুটি ভ্রাতা, কেহ কৃপণ কেহ দাতা ।
ভগ্নী দুটী ক্ষুধা তৃষ্ণা, যশ প্রসংশা নাই কারো কাছে ॥
প্রসাদ বলে কাজ কি বাসে, যত বিপদ গৃহবাসে ।
এমন সম্বল লয়ে কৃত্তিবাসে, জয় কালী বলে বেড়াই নেচে ॥৮৭॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

কি ধন দিবি আর তোর কি ধন আছে ।
তোর যত ছিল ধন সম্পত্তি, শিব আগে বুকে রেখেছে ॥
যে ধন তোর ছিল তারা, সে ধন ত সব ফুরায়েছে ।
শিব সেই ধনকে ব্রহ্ম জেনে, পদতলে পড়ে আছে ॥
তোমার ধনের মধ্যে অন্তে পদ, সে ত শিবের সম্পদ পদ ।
ভেবে শিব সে সম্পদ, নয়ন মুদে পড়ে আছে ॥
খেয়ে ভোলা সিদ্ধি গোলা, নেশাতে ভোর হয়ে আছে ।
ডাক্‌লে সাড়া দেয়না তারা, ও সে ধনের ঘড়া ধরে আছে ॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ বলে, সে ধনের অংশ দিতে হবে বলে ।
চায়না ভোলা চক্ষু মেলে, জেগে ঘুমায়েছে ॥৮৮॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

কি গুণে মা ব'লব তোরে ।
দুঃখি তাপিত তোমার নিন্দে করে ।
ওমা তোমার জন্যে বাবা পাগল, বিমাতাকে মাথায় করে ॥
বোঝে না সে বুড়ো বেটা, তোমার দুর্গা নামে কেঁদে মরে ।
তার কি বাপের সাধ্য আছে তারা, দশ হাতে খাওয়াতে পারে ॥
সদাই বাক্য জ্বালা তারা, দিস্ কেন তুই মোর বাপেরে ।
মরে ছিলে শতবার মা, হাড় গেঁথে হর গলায় পরে ॥

দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, লোকে নিন্দে করে গো মোরে।
মা যদি হয় অন্নপূর্ণা, অন্ন নাই তোর বাপের ঘরে ॥৮৯॥

৯০

[রাগিণী—সোহিনী বাহার, তাল—আড়খেম্‌টা]

কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী, তারা আছ গো অন্তরে,
মা আছ গো অন্তরে ॥
এক স্থান মূলাধারে, আর স্থান সহস্রারে,
আর স্থান চিন্তামণি পুরে।
শিবশক্তি সব্যে বামে, জাহ্নবী যমুনা নামে,
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে ॥
ভুজগ রূপা (ভুজঙ্গপা) লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা,
এই ধ্যান করে ধন্য নরে।
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর নাভিস্থান,
অনাহতে বিশুদ্ধাখ্য বরে ॥
বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স, ব, ল, ড, ফ, ক,-ঠ,
ষোল স্বর কণ্ঠায় বিহরে।
হ, ক্ষ, আশ্রয়-ভুরু, নিতান্ত কহিলা গুরু,
চিন্তা এই শরীর ভিতরে ॥
ব্রহ্মা আদি পাঁচ ব্যক্তি, ডাকিন্যাদি ছয় শক্তি,
ক্রমে বাস পদ্মের উপরে।
গজেন্দ্র মকর আর, মেষবর কৃষ্ণসার,
আরোহণ দ্বিতীয় কুঞ্জরে ॥
অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ,
গুঞ্জে মত্ত মধুব্রত স্বরে।
ধরা জল বহ্নি বাৎ, লয় হয় অচিরাৎ,
বং রং লং হং হৌং স্বরে ॥
ফিরে কর কৃপাদৃষ্টি, পুনর্ব্বার হয় সৃষ্টি,
চরণযুগলে সুধা ক্ষরে।
তুমি নাদ, তুমি বিন্দু, সুধাধার যেন ইন্দু,
এক আত্মা ভেদ কেবা করে ॥
উপাসনা ভেদাভেদ, ইথে কোন নাহি খেদ,
মহাকালী কাল পদ ভরে।
নিদ্রা ভাঙ্গে যার ঠাঁই, তার আর নিদ্রা নাই,
থাকে জীব শিব কর তারে ॥

মুক্তি কন্যা তারে ভজে, সে কি (আর) বিষয়ে মজে,
পুনরপি আসিয়া সংসারে।
আজ্ঞাচক্র করি ভেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ,
হংসীরূপে মিল হংসবরে
চারি ছয় দশ বার, ষোড়শ দ্বিদল আর,
দশ শতদল শিরোপরে।
শ্রীনাথ বসতি তথা, শুনে প্রসাদের কথা,
যোগী ভাসে আনন্দ সাগরে ॥ ৯০ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

কেন মিছে মা মা কর, মায়ের দেখা পাবে নাই।
থাক্‌লে আসি দেখা দিত, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই ॥
শ্মশানে মশানে কত, পীঠ স্থান ছিল যত।
খুঁজে হলেম ওষ্ঠাগত, মিছে কেন যন্ত্রণা পাই ॥
বিমাতার * তীরে গিয়ে, কুশপুত্তল দাহাইয়ে †
অশৌচান্ত পিণ্ড দিয়ে, কালাশৌচে কাশী যাই ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণে, মায়ের জন্যে ভাবনা কেনে।
মা গেছে নাম ব্রহ্ম আছে, তরিবার আর ভাবনা নাই ॥৯১॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

কুলবালা উলঙ্গ, ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ, তরুণ বয়েস।
দনুজদলনা ললনা, সমরে শবে, বিগলিত কেশ ॥
ঘন ঘোর নিনাদিনী, সময় বিবাদিনী, মদনোন্মাদিনী বেশ।
ভূত পিশাচ প্রমথ সঙ্গে, ভৈরবগণ নাচত রঙ্গে,
রঙ্গিণীবর সঙ্গিনী, নগনা সমান বেশ ॥
গজ রথ রথী করত গ্রাস, সুরাসুর নর হৃদয় ত্রাস,
দ্রুত চলত ঢলত রসে গর গর, নরকর কটীদেশ।
কহিছে প্রসাদ ভুবনপালিকে, করুণাং কুরু জননী কালিকে,
ভব পারাবার তরাবার ভার, হরবধূ হর ক্লেশ ॥ ৯২ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

কে জানে গো কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন ॥
কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ। ‡
তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে, সদা যোগী করে মনন ॥

* বিমাতা—গঙ্গা। † দাহাইয়ে—দাহ করিয়া।
‡ ষট্‌চক্র বিবেক ১৫, ৭৩, ৮৪ সংখ্যক সঙ্গীত দেখ।

আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্য কেবা জানে তেমন ॥
প্রসাদ ভাসে লোক হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না, ধর্ব্বে শশী হয়ে বামন ॥১৩॥

[প্রসাদীসুর, তাল—একতালা]

কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে বসে মায়ের নাম গাইব ॥
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন, পরের রাজ্যে বাস করিব।
কালীর চরণতলে কত শত, গয়া গঙ্গা দেখতে পাব ॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে নিদানকালে, কালীর পদে শরণ লব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে, বিমাতাকে মা বলিব ॥১৪॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হল।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে রল ॥
মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছল।
ওমা! মিঠার লোভে, তিত মুখে সারা দিনটা গেল ॥
মা খেলবে বলে খেলালে মাগো, আশা না পূরিল ॥
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায়, যা হবার তাই হল।
এখন সন্ধ্যা বেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চল ॥১৫॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

কেবা বুকের কেবা পিঠের, বল দেখি মা তাই শুনি।
কেহ সারা দিনে পায় না খেতে, কেহ দুধে খায় সাঁচা চিনি ॥
কেহ শুয়ে তেতালাতে, পালঙ্গে মশারি টানি।
আমরা মরি শুড় শুড়য়ে, ভাঙ্গা ঘরে নাইক ছা'নি ॥
কেহ পরে শাল দোশালা, কেহ পায় না ছেঁড়া ছালা।
অনুভবে বুঝি তারা, তেলা মাথায় তেল ঢালনি ॥১৬॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

কেমন করে ছাড়ায়ে যাবা;
(দেখবো এবার, অধম বলে)।
ছেলের হাতে কলা নয় মা, ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা ॥
এমন ছাপান ছাপাইব, মাগো খুঁজে খুঁজে নাহি পাবা।
বৎস পাছে গাভী যেমন, তেমনি পাছে পাছে ধাবা ॥

প্রসাদ বলে কাঁকিঝুঁকি, (মাগো) দিতে পার পেলে হাবা।
আমায় যদি না তরাও মা, শিব হবে তোমার বাবা ॥৯৭॥

[রাগিণী—ঝিঁঝিট, তাল—একতালা]]

কে মোহিনী ভালে ভাল শশী পরম রূপসী,
বিহরে সমরে বামা বিগলিত কেশী।
তনু তনু অমানিশা, দিগম্বরী বালা কৃশা,
সব্যে বরাভয় বাম করে মুণ্ড অসি ॥
মরি কিবা অপরূপ, নিরথ দনুজ ভূপ,
সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী।
জয়ী হব যার বলে, সেই প্রভু শব ছলে,
পদে মহাকাল, কালরূপ হেন বাসি ॥
নানারূপ মায়া ধরে, কটাক্ষে মানস হরে,
ক্ষণে বপু বিরাট বিকট মুখে হাসি।
ক্ষণে ধরাতলে ছুটে, ক্ষণেক আকাশে উঠে,
গিলে রথরথী গজবাজী রাশি রাশি ॥
ভণে রামপ্রসাদ সার, না জান মহিমা মার,
চৈতন্যরূপিনী নিত্য ব্রহ্ম মহিষী।
যেই শ্যাম সেই শ্যামা, অকার আকারে বামা,
আকার করিয়া লোপ, অসি ভাব বাঁশী ॥৯৮॥

[প্রসাদী—সুর, তাল—একতালা]

কে রে বামা কার কামিনী।
বসে কমলে ঐ একাকিনী ॥
বামা হাসিছে বদনে, নয়ন কোণে, নির্গত হয় সৌদামিনী ॥
এ জনমে এমন কন্যে, না দেখি না কর্ণে শুনি।
গজ খাচ্ছে ধরে, ফিরে উগরে, ষোড়শী নবযৌবনী ॥৯৯॥

[রাগিণী—ইমনকল্যাণ, তাল—একতালা]

কে রে কাল কামিনী, বাস পরিহারিণী।
চরণ তরুণ অরুণ নিকর, নখর নিভাতী নিন্দি নিশাকর।
উরু তরু রম্ভা নাভি সরোবর, নৃকর কটিতে কিঙ্কিনী ॥
পীযূষ পূর্ণিত পীন পয়োধর, পানে পুলকিত সুরাসুর নর।
করে শোভে অসি মুণ্ড বরাভয়, বামা নরমুণ্ডমালিনী ॥
তড়িত জিনি হাস্য কমলবদন, খঞ্জন গঞ্জিনী যুগল নয়ন।
ইষু শিশু সব সুশোভিত কর্ণে, বামা আধ শশী ভালিনী ॥
আহা কিবা কান্তি এলোকুন্তলে, কাদম্বিনী কাঁদে বরিষণ ছলে।
বামা গঙ্গাধর হৃদি জাল, শোভে যেন নীল নলিনী ॥১০০॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

কে রে রজনী-রূপিণী রণ করে।
ঘোর চিকুর অন্ধকার আলু থালু দেখে মরি মা ডরে॥
যত দেবগণ ধরেছে তাল, নাচিছে বামা সমরে বিশাল।
বব্‌ম বব্‌ম বাজিছে গাল, নর-শির হার কণ্ঠে দোলে॥
রামপ্রসাদ বলে কেন হে ভূপ, ঐ দেখ মায়ের অপরূপ রূপ।
তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র রূপিণী, ষোড়শীকে স্তুতি করে অমরে॥১০১॥

[রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—ভিয়ট]

কে হরহৃদি বিহরে।
তনুরুচি রুচি সজল ঘন নিন্দিত, চরণে উদিত বিধু নখরে॥
নীল কমলদল শ্রীমুখ মণ্ডল, শ্রমজল গলে শরীরে।
মরকত মুকুরে মঞ্জু মুকুতা ফল, রচিত কিবা শোভা মরি রে॥
গলিত চিকুর ঘটা নব জলধরছটা, ঝাঁপাল দশদিশি তিমিরে।
গুরুতর পদভর কমঠ ভুজবর, কাতর মূর্চ্ছিত মহী রে॥
ঘোর বিষয়ে মজি কালীপদ না ভজি সুধা ত্যজি বিষপান করি রে।
ভণে শ্রীকবিরঞ্জন দৈববিড়ম্বন, বিফলে মানব দেহ ধরি রে॥১০২॥

[রাগিণী—সুরাট, তাল—কাওয়ালি]

গেল না গেল না দুঃখের কপাল।
গেল না গেল না, ছাড়িয়ে ছাড়ে না ;
ছাড়িয়ে ছাড়ে না মাসী* হলো কাল॥
আমি মনে সদা বাঞ্ছা করি সুখ,
মাসী এসে তায় দেয় নানা দুঃখ,
মাসীর মায়া জ্বালা, করে নানা খেলা,
দেয় দ্বিগুণ জ্বালা, বাড়ায় জঞ্জাল॥
দ্বিজ রামপ্রসাদের মনে এই ত্রাস।
জন্মে মাতৃকোলে না করিলাম বাস॥
পেয়ে দুধের জ্বালা, শরীর হল কালা।
তোলা দুধে ছেলে, বাঁচে কত কাল॥১০৩॥

[রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—তিওট]

চিক্কণ কালরূপা সুন্দরী ত্রিপুরারি হৃদে বিহরে।
অরুণ কমল দল, বিমল চরণ তল, হিমাকর নিকর রাজিত নখরে॥

* মাসী—অবিদ্যা।

বামা অট্ট অট্ট হাসে, তিমির কলাপ নাশে,
ভাষে সুধা অমিত ক্ষরে।
ভ্রমে কোকনদ দল, মধুকর চঞ্চল,
লঘুগতি পতিত যুবতী অধরে॥
সহজে নবীনা ক্ষীণা, মোহিনী বসনহীনা, কি কঠিনা দয়া না করে।
চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণহর, বরষিত শর খর, কত কত শত শত শত রে॥
কহে রামপ্রসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি, ভাবি ভাবি নয়ন ঝরে।
ও-পদ পঙ্কজ পল্লবে বিহরতু, মামক* মানস আশ ধরে॥১০৪॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

চিন্তাময়ী তারা তুমি, আমার চিন্তা করেছ কি।
নামে জগচ্চিন্তা-হরা মা, ব্যাভারে কি তেমন দেখি॥
প্রভাতে দাও অর্থ চিন্তা, মধ্যাহ্নে জঠর চিন্তা।
সায়াহ্নে দাও অলস চিন্তা, বল মা তোরে কখন ডাকি॥
দিয়াছ এক মায়া চিন্তে, ওমা সদাই করি তাই চিন্তে।
না পারিলাম তোমার চিন্তে, মা চিন্তাকূপে ডুবে থাকি॥
ওমা তুই গো পাষাণের মেয়ে, পরম চিন্তামণি পেয়ে।
রইলি গো পাষাণী হয়ে, রামপ্রসাদকে দিয়ে ফাঁকি॥১০৫॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

ছি ছি মন তুই বিষয় লোভা।
কিছু জাননা, মাননা, শুননা কথা॥
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কর শোভা।
যদি তুই সতীনে পীরিত হয়, তবে শ্যামা মা'রে পাবা॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থোবা।
ওরে জ্ঞান খড়্গে বলিদান, করিলে কৈবল্য পাবা॥
কল্যাণকারিণী বিদ্যা, তার ব্যাটার মত লবা।
ওরে মায়াসূত্র, ভেদসূত্র, তারে দূরে হাঁকায়ে দেবা॥
আত্মারামের অন্নভোগ, দুটো সেই মাকে দিবা।
রামপ্রসাদ দাসে কয় শেষে ব্রহ্ম রসে মিশাইবা॥১০৬॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

ছি ছি মন ভ্রমরা দিলি বাজী।
কালী পাদপদ্ম সুধা ত্যজে, বিষয় বিষে হলি রাজি॥
দশের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ, লোকে তোমায় কয় রাজাজি।
সদা নীচ সঙ্গে থাক তুমি, রাজা বট রীতি পাজি॥

* মামক—মদীয়, আমার।

অহঙ্কার মদে মত্ত, বেড়াও যেন কাজির তাজী।
তুমি ঠেকবে যখন শিখবে তখন, কর্ব্বে কালে পাপোস বাজি॥
বাল্য জরা বৃদ্ধ দশা, ক্রমে ক্রমে হয় গতাজি।
পড়ে চেরের কোঠায় মন টুটায়, যে ভজে সে মস্ত গাঁজি॥
কুতূহলে প্রসাদ বলে, জরা এলে আস্‌বে হাজী।
যখন দণ্ডপাণি লবে টানি, কি করিবে ও বাবাজি॥১০৭॥

[রাগিণী—গৌরী, তাল—একতালা]

জগতজননী তরাও ওগো তারা।
জগৎকে তরালে, আমাকে ডুবালে,
আমি কি জগৎ ছাড়া গো তারা॥
দিবা অবসানে রজনী কালে, দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা বলে।
মম জীর্ণ তরী, মা আছে কাণ্ডারী,
তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভরা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে ভাবিয়ে সারা, মা হয়ে পাঠাইলে মাসীর পাড়া।
কোথা গিয়েছিলে, একর্ম্ম শিখিলে,
মা হয়ে সন্তান ছাড়া গো তারা॥১০৮॥

শব সাধনা

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো,
জগদম্বার কোটাল।
জয় জয় ডাকে কালী, ঘন ঘন করতালি,
বব বম্ বাজাইয়া গাল॥
ভক্তে ভয় দর্শাবারে, চতুষ্পার্শ্ব শূন্যাগারে,
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল।
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদ লম্বিত জটা জাল॥
শমন সমান দর্প, প্রথমেতে চলে সর্প,
পরে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিশাল।
ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে,
সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল॥
যে জন সাধক বটে, তারে কি আপদ ঘটে,
তুষ্ট হয়ে বলে ভাল ভাল।
মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর, করাল বদনী জোর,
তুই জয়ী ইহ পরকাল॥

কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দসাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
বিভীষিকা সে কি মানে, বসে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ করে ঢাল ॥১০৯॥

[রাগিণী—মূলতানী, তাল—একতালা]

জননী পদ পঙ্কজং দেহি শরণাগত জনে, কৃপাবলোকনে তারিণী।
তপনতনয় ভয় চয় বারিণী ॥
প্রণব রূপিণী সারা, কৃপানাথ দারা তারা, ভব পারাবার তরণী।
সগুণা নির্গুণা, স্থূলা, সূক্ষ্মা মূলা, হীন মূলা,
মূলাধার অমল কমল বাসিনী ॥
আগম নিগমাতীতা অখিলমাতা অখিলপিতা, পুরুষপ্রকৃতিরূপিণী।
হংসরূপে সর্ব্বভূতে, বিহরসি শৈলসুতে,
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি, ত্রিধা কারিণী ॥
সুধাময় দুর্গানাম, কেবল কৈবল্যধাম, অজ্ঞানে জড়িত যেই প্রাণী।
তাপত্রয়ে সদা ভজে, হলাহল কূপে মজে,
ভণে রামপ্রসাদ তার, বিষফল জানি ॥১১০॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

জয় কালী জয় কালী বল।
লোকে বলে বল্‌বে পাগল হল ॥
লোকে বলে বল্‌বে, তায় কিরে তোর বয়ে গেল।
আছে ভাল মন্দ দুটো কথা, যা ভাল তাই করা ভাল ॥
কালীনামের খড়্গ তুলে, মায়া মোহ কেটে ফেল।
করে মিছে মায়ায় টানাটানি, রামপ্রসাদের প্রমাদ হল ॥১১১॥

[রাগিণী—বংলা, তাল—একতালা]

জয় কালী জয় কালী বলে জেগে থাকরে মন।
তুমি ঘুম যেওনারে ভোলা মন, ঘুমেতে হারাবে ধন ॥
নব দ্বার ঘরে, সুখে শয্যা করে, হইবে যখন অচেতন।
তখন আসিবে নিদ, চোরে দিবে সিঁধ, হরে লবে সব রতন ॥১১২॥

[রাগিণী—খটভৈরবী, তাল—পোস্তা]

জানিগো জানিগো তারা, তোমার যেমন করুণা।
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে, কারু পেটে ভাত কারু গেঁটে সোনা ॥
কেহ যায় মা পাল্‌কি চড়ে, কেহ তারে কাঁধে করে।
কেহ গায়ে দেয় শাল দোশালা, কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা ॥১১৩॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

জানি না মা কি বলে ডাকি তোরে (শ্যামা মা)
কখন শঙ্কর বামে, কভু হর হৃদিপরে,
কখন বিশ্বরূপিণী, কভু বামা উলঙ্গিনী।
কভু শ্যাম মোহিনী,
কভু রাধার পায়ে ধরে।
কখন বিশ্ব জননী, পঞ্চভূত নিবাসিনী,
কভু কুলকুণ্ডলিনী
চতুর্দ্দল বিম্বোপরে।
যে যা বলে শুনিব না, মা নামের নাই তুলনা,
তাই ডাকি মা বলে মা মা,
ঐ অভয় চরণ পাবার তরে* ॥১১৪॥

[রাগিণী—ঝংলা, তাল—একতালা]

জানিলাম বিষম বড়, শ্যামা মায়েরি দরবার রে।
সদা ফুকারে ফরিয়াদী বাদী, না হয় সঞ্চার রে॥
আরজবেগী † আর শিবে, সে দরবারে ভাস্ত কিবে।
দেওয়ান যে দেওয়ানা নিজে, আস্থা কি কথায় রে॥
লাখ উকিল করেছি খাড়া, সাধ্য কি মা ইহার বাড়া।
তোমার তারা ডাকে আমি ডাকি, কাণ নাই বুঝি মার রে॥
গালাগালি দিয়ে বলি, কাণ খেয়ে হয়েছ কালী।
রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী করিল আমার রে ॥১১৫॥

[রাগিণী—ঝংলা, তাল—একতালা]

জাল ফেলে জেলে রয়েছে বসে।
(ভবে আমার কি হইবে গো মা)॥
অগম্য জলেতে মীনের শ্রয়, জেলে জাল ফেলেছে ভুবনময়।
ও সে যখন যারে মনে করে, তখন তারে ধরে কেশে॥
পালাবার পথ নাইকো জালে, পালাবি কি মন ঘেরেছে কালে॥
রামপ্রসাদ বলে মাকে ডাক, শমন দমন করবে এসে ॥১১৬॥

---

*এই সঙ্গীতটি "সাধন-প্রদীপ" গ্রন্থকার শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক সংগৃহীত উক্ত গ্রন্থের ২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য। স্বামিজী লিখিয়াছেন, ইহা প্রসাদের রচনা, ইহাতে ভণিতা নাই আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না ইহার রচয়িতা প্রসাদ কি না। রামপ্রসাদ—অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যা পদাবলী ১৫৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† আরজবেগী,—বিচারকের নিকট যে আবেদন পত্র দেয়।

[রাগিণী—ভৈরবী, তাল—একতালা]
[মতান্তরে ঝিঁঝিট খাম্বাজ আড়াঠেকা]

জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজী।
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে, তাতেই তুমি হও মা রাজী ॥
মগে বলে, 'ফরাতারা' 'গড্' বলে ফিরিঙ্গী যারা মা।
'খোদা' বলে ডাকে তোমায়, মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা, ‡
গৌরী বলে সূর্য্য তুমি বৈরাগী কয় রাধিকা জী ॥
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা।
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কালী জেনো এ সব জনে।
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে, মন আমার হয়েছে পাজী ॥১১৭॥ *

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

ডাকরে মন কালী বলে।
আমি এই স্তুতি মিনতি করি, ভুল না মন সময় কালে ॥
এসব ঐশ্বর্য্য ত্যজ, ব্রহ্মময়ী কালী ভজ।
ওরে ওপদ পঙ্কজে মজ, চতুর্ব্বর্গ পাবে হেলে† ॥
বসতি কর যে ঘরেতে, পাহারা দিচ্ছে যমদূতে।
ওরে পারবে না এড়াইয়ে যেতে, কাল ফাঁসি লাগবে গলে ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কালের বশে কাজ হারালে।
ওরে এখন যদি না ভজিলে, আম্‌সী খাবে আম ফুরালে ॥১১৮॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

ডুব দে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে ॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দুচার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে ॥
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি করে কুড়িয়ে পাবে, শিবের যুক্তি মতন নিলে ॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক হল্‌দি গায় মেখে যাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝাঁপ দিলে মন, মিল্‌বে রতন ফলে ফলে ॥১১৯॥

---

* এই গানটি রামপ্রসাদের বিরচিত নহে। সচিত্র 'বিশ্বসঙ্গীত' নামক গ্রন্থের ২২৮ পৃষ্ঠাতে এই গানটি 'শ্রীরামদুলাল বলে, বাজী নয় এ জেনো ফলে ইত্যাদি ভণিতা আছে। বিশ্বসঙ্গীতের প্রকাশ কাল ১৩০৭ সাল। প্রকাশক—শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক।

† হেলে—অবহেলে।

[রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—ধিমা তেতালা]

চল চল জলদ বরণী এ কার রমণীরে।
নিরখ হে ভূপ, ঈশ* শবরূপ, উরসী রাজে চরণ॥
নখরাজী উজ্জ্বল, চন্দ্র নিরমল, সতত ঝলকে কিরণ।
একি! চতুরানন হরি কলয়তি† শঙ্করী, সম্বরণ কর রণ॥
মগনা রণ মদে, সচলা ধরা পদে, চরণে অচল চালন।
ফণীরাজ কম্পিত, সতত ত্রাসিত, প্রলয়ের এই কি কারণ॥
প্রসাদ দাসে ভাষে, ত্রাহি নিজ দাসে, চিত্তমে মত্ত বারণ।
সদা বিষয়াসব পানে, ভ্রমিছে বিজ্ঞানে, কদাচ না মানে বারণ॥১২০॥

[রাগিণী—রামকেলী, তাল—আড়া]

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে।
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানব-দলে,
ধরি করতলে গজ গরাসে॥
কেরে কালীর শরীরে রুধির শোভিছে, কালিন্দীর জলে
কিংশুক ভাসে।
কেরে নীল কমল শ্রীমুখমণ্ডল, অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে॥
কেরে নীলকান্তমণি নিতান্ত, নখরনিকর তিমির নাশে।
কেরে রূপের ছটায় তড়িত ঘটায়, ঘন ঘোর রবে উঠে আকাশে॥
দীতিসুতচয় সবার হৃদয়, থর থর থর কাঁপে হুতাশে।
মাগো, কোপ কর দূর চল নিজ পুর, নিবেদে শ্রীরামপ্রসাদ দাসে॥১২১

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

তাই কাল রূপ ভালবাসি।
জগন্মোহিনী মা এলোকেশী॥
কালর গুণ ভাল জানে, শুক শম্ভু দেব ঋষি।
যিনি দেবের দেব মহাদেব, কালরূপ তার হৃদয়বাসী॥
কাল বরণ ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী, বাঁশী ত্যজে করে অসি॥
যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তারা সকল এক বয়সী।
ঐ যে তার মধ্যে কেলে মা মোর, বিরাজে পূর্ণিমা শশী॥
প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে, কালরূপে মেশামিশি।
ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক, মন করো না দ্বেষাদ্বেষী॥১২২॥

---

* ঈশ—মহাদেব। †কলয়তি—বলিতেছেন।

[রাগিণী—বিভাষ, তাল—ঝাঁপ]

তাই বলি মন জেগে থাক, পাছে আছে রে কাল চোর।
কালী নামের অসি ধর, তারা নামের ঢাল,
ওরে সাধ্য কি শমনে তোরে করিতে পারে জোর॥
কালী নামে নহবৎ বাজে করি মহা শোর।
ওরে, শ্রীদুর্গা বলিয়া রজনী কর ভোর॥
কালী যদি না তরাবে কালে মহাঘোর।
কত মহাপাপী তরে গেল, রামপ্রসাদ কি চোর॥১২৩॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

তারা আর কি ক্ষতি হবে।
হ্যাদে গো জননি শিবে॥
তুমি লবে লবে বড়ই লবে, প্রাণকে আমার লবে॥
থাকে থাক যায় যাক্, এ প্রাণ যায় যাবে।
যদি অভয় পদে মন থাকে তো, কাজ কি আমার ভবে॥
বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর, কি দেখাও শিবে।
একি পেয়েছ আনাড়ি দাঁড়ি, তুফানে ডরাবে॥
আপনি যদি আপন তরী, ডুবাই ভবার্ণবে।
আমি ডুব দিয়ে জল খাব, তবু অভয় পদে ডুবে॥
গিয়েছি না যেতে আছি, আর কি পাবে ভবে।
আছি কাঠের মুরাদ খাড়ামাত্র গণনাতে সবে।
প্রসাদ বলে আমি গেলে, তুমি তো মা রবে।
তখন আমি ভাল কি তুমি ভাল, তুমিই বিচারিবে॥১২৪॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

তারা-তরী লেগেছে ঘাটে।
যদি পারে যাবি মন আয়রে ছুটে॥
তারা নামে পাল খাটায়ে, ত্বরায় রে চল বেয়ে।
যদি পারে যাবি, দুখ মিটাবি, মনের গিরা দেরে কেটে॥
বাজারে বাজার কর মন, মিছে কেন বেড়াও ছুটে।
ভবের বেলা গেল সন্ধ্যা হল, কি করবে আর ভবের হাটে॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, বাঁধ রে বুক এঁটে সেঁটে।
ওরে এবার আমি ছুটিয়াছি, ভবের মায়া বেড়ী কেটে॥১২৫॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

তারা! তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা, এখন যেমন রাখলে সুখে, তেমি সুখ কি পাছে॥

শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি মা তোমায় সাধি।
মাগো ওমা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে ॥*
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই।
মাগো ওমা, দিয়ে আশা, কাটলে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে।
প্রসাদ বলে মন দৃঢ়, দক্ষিণার জোর বড়।
মাগো ওমা আমার দফা হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে ॥১২৬॥

[রাগিণী—ঝংলা, তাল—একতালা]

তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা, সেটাও নিত্য নয় ॥
যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে, স্বর্ণ খাদে উড়ায়।
ওমা, তোর নামেতে তেমনি ধারা, তেমনি তো দেখায় ॥
যে জন গৃহ স্থলে দুর্গা বলে, পেয়ে নাশ ভয়।
ওমা, তুমিতো অন্তরে জাগ, সময় বুঝতে হয় ॥
যার পিতা মাতা ভস্ম মাখে, তরু তলে রয়।
ওমা, তার তনয়ের ভিটেয় টেঁকা, এ বড় সংশয় ॥
প্রমাদে ঘেরেছে তারা, প্রসাদ পাওয়া দায়।
ওরে, ভাই বন্ধু থেকো না রামপ্রসাদের আশায় ॥১২৭॥

[রাগিণী—ললিত খাম্বাজ, তাল—একতালা]

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন, বদন ভরে মাকে ডাকিরে।
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী, এসেন কিনা এসেন দেখিরে ॥
লয়ে যাবি সঙ্গে করে, তার একটা ভাবনা কিরে।
তবে তারা নামের কবচমালা, বৃথা আমি গলায় রাখিরে ॥
মহেশ্বরী আমার রাজা, আমি খাস তালুকের প্রজা।
আমি কখন নাতান, কখন সাতান, বাকীর দায়ে না ঠেকিরে
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, অন্যে কি জানিতে পারে।
যাঁর ত্রিলোচন† না পেল তত্ত্ব, আমি অন্ত পাব কিরে ॥১২৮॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

তুই যারে কি করবি শমন, শ্যামা মাকে কয়েদ করেছি।
মনবেড়ী তাঁর পায়ে দিয়ে, হৃদ-গারদে বসায়েছি ॥
হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে, সহস্রারে মন রেখেছি।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে, আমি আমার প্রাণ সঁপেছি ॥
এমনি করেছি কায়দা, পালাইলে নাইকো ফায়দা।
হামেশ রুজু ভক্তি প্যায়াদা, দুনয়ন দ্বারয়ান দিয়েছি ॥

*পুরুষের দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন, শুভ লক্ষণ সূচক
†ত্রিলোচন,—মহাদেব (তাঁহার তিনটি নয়ন)

মহাজ্বর হবে জেনে, আগে আমি ঠিক্ করেছি।
তাই সর্ব্বজ্বর হর-লৌহ, গুরুতত্ব পান করেছি॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, তোর জারি ভেঙে দিয়েছি।
মুখে কালী কালী কালী বলে, যাত্রা করে বসে আছি॥১২৯॥

[রাগিণী—সোহিনীবাহার. তাল—একতালা]

তুমি এ ভাল করেছ মা, আমারে বিষয় দিলে না।
এমন ঐহিক সম্পদ কিছু আমারে দিলে না॥
কিছু দিলে না পেলে না, দিবে না পাবে না,
তায় বা ক্ষতি কি মোর
হোক দিলে দিলে বাজী.
তাতেও আছি রাজি, এবার এবাজী ভোর গো॥
এমা দিতিস দিতাম, নিতাম খেতাম মজুরি করিয়ে তোর।
এবার মজুরি হলো না, মজুরা চাব কি,
কি জোরে করিব জোর গো॥
আছ তুমি কোথা, আমি কোথা, মিছামিছি করি শোর।
শুধু শোর করা সারা, তোর যে কুধারা,
মোর যে বিপদ ঘোর গো॥
এমা ঘোর মহানিশি, মন যোগে জাগে, কি কাজ তোর কঠোর।
আমার একুল ওকুল, দুকুল, গেল, সুধা না পেলে চকোর গো॥
এমা, আমি টানি কুলে মন প্রতিকূলে, দারুণ করম ডোর।
রামপ্রসাদ কহিছে, পড়ে দুটানায়, মরে মন ভুঁড়া চোর গো॥১৩০॥

[রাগিণী—জয়জয়ন্তি, তাল—একতালা]

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন, ওরে আমার শুয়া পাখি।
আমারি অন্তরে থেকে, আমারে দিতেছ ফাঁকি॥
কালী নাম জপিবার তরে, তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পুরে।
মন, ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে, ঐরি সুখে হইলে সুখী॥
শিব দুর্গা কালী নাম, জপ কর অবিশ্রাম মন।
ও তোর, জুড়াবে তাপিত অঙ্গ, একবার শ্যামা বলরে দেখি॥১৩১॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

তোমার কে মা বুঝবে লীলে।
তুমি কি নিলে কি ফিরিয়ে দিলে॥
তুমি দিয়ে নিচ্চো তুমি, বাছা রাখনা সাঁঝ সকালে।
তোমার অসীম কার্য্য অনিবার্য্য, মাপাও যেমন যার কপালে॥
তোমার অভিসন্ধি পদে বন্দী, ভোলানাথই যাচ্ছে ভুলে।
তুমি যেমন দেখাও তেমনি দেখি, জলেই তুমি ভাসাও শিলে॥

তোমার জারি জুরি আমার কাছে, খাটবে না মা কোন কালে।
ওসব ইন্দ্রজালের মন্ত্র জানে, রামপ্রসাদ যে তোমার ছেলে ॥১৩২॥

[রাগিণী—খটভৈরবী, তাল—একতালা]

তোমার সাথী কেরে, ও মন।
তুমি কার আশায় বসেছ, রে মন ॥
তন্থর তরী ভবের চড়ায়, ঠেকে রয়েছে রে।
যার যার গুরুর নামে বাদাম দিয়ে, বেয়ে চলে যারে ॥
প্রসাদ বলে ছয় রিপু নিয়ে, সোজা হয়ে চল রে।
নৈলে আঁধারের কুটীরের গোঁৎ, যোগে লেগেছে রে ॥১৩৩॥

[রাগিণী—বসন্তবাহার, তাল—একতালা]

ত্যজ মন কুজন ভুজঙ্গ সঙ্গ।
কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্ক ॥
অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময় ভজ
মকরন্দ রসে মজ, ওরে মনোভৃঙ্গ ॥
স্বপ্নে রাজ্য লভ্য যেমন, নিদ্রাভঙ্গে ভাব কেমন।
বিষয় জানিবে তেমন হলে নিদ্রাভঙ্গ ॥
অন্ধ স্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কূপে পড়ে।
কর্ম্মীকে কি কর্ম্মে ছাড়ে, তার কি প্রসঙ্গ ॥
এই যে তোমার ঘরে, ছয় চোরে চুরি করে।
তুমি যাও পরের ঘরে, এত বড় রঙ্গ ॥
প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল সেটা।
অঙ্গহীন হয়ে সেটা, দগ্ধ করে অঙ্গ ॥১৩৪॥

[প্রসাদী সুর, তাল একতালা]

থাকি একখান ভাঙ্গা ঘরে।
তাই ভয় পেয়ে মা ডাকি তোরে ॥
হিল্লোলেতে হেলে পড়ে, আছে কালীর নামের জোরে।
ঐ যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে,
মেটে দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে পড়ে ॥১৩৫॥

[রাগিণী—ঝিঁঝিট, তাল—একতালা]

দিবানিশি ভাবরে মন, অন্তরে করালবদনা।
নীলকাদম্বিনী রূপ মায়ের, এলোকেশী দিগ্বসনা ॥
মূলাধারে সহস্রারে, বিহরে সে মন জাননা।
সদা পদ্মবনে হংসীরূপে, আনন্দ রসে মগনা ॥
আনন্দে আনন্দময়ী, হৃদয়ে কর স্থাপনা।
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন, ব্রহ্মময়ী রূপ দেখনা ॥

প্রসাদ বলে ভক্তের আশা, পূরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্ব্বাণে কি গুণ বল না ॥১৩৬॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

দীন দয়াময়ী কি হবে শিবে।
বড় নিশ্চিন্ত রয়েছ, তোমার পতিত তনয় ডুবলো ভবে ॥
এ ঘাটে তরণী নাইক, কিসে পার হব মা ভবে।
মা তোর দুর্গানামে কলঙ্ক রবে, মা নইলে খালাস কর তবে ॥
ডাকি পুনঃ পুনঃ শুনিয়া না শুন, পিতৃধর্ম্ম রাখলে ভবে।
অতি প্রাতঃকালে জয় দুর্গা বলে, শরণ নিবার কাজ কি তবে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা, মোর ক্ষতি কিছু না হবে। মা তোর
কাশী মোক্ষধাম অন্নপূর্ণা নাম, জগজ্জনে আর নাহি লবে ॥ ১৩৭ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

দুঃখের কথা শুন মা তারা।
আমার ঘর ভাল নয় পরাৎপরা ॥*
যাদের নিয়ে ঘর করি মা, তাদের এম্নি কাজের ধারা।
ওমা পাঁচের† আছে পাঁচ বাসনা, সুখের ভাগী কেবল তারা ॥
অশীতি লক্ষ ঘরে বাস করিয়ে, মানব ঘরে ফেরা ঘোরা।
এই সংসারেতে সং সাজিতে, সার হলো গো দুঃখের ভরা ॥
রামপ্রসাদের কথা লও মা, এ ঘরে বসতি করা।
ঘরের কর্ত্তা যেজন, স্থির নহে মন, দুজনেতে কল্লে সারা ॥ ১৩৮ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

দুটো দুঃখের কথা কই।
দুঃখের কথা কই গো তারা মনের কথা কই।
কে বলে তোমারে তারা দীন দয়াময়ী ॥
কারেও দিলে ধন জন মা হয় ‡ হস্তীরথী জয়ী।
আর কারো ভাগ্যে মজুরখাটা শাকে অন্ন মিলে কই ॥
কেহ থাকে অট্টালিকায়, আমার ইচ্ছা তেম্নি রই।
ওমা, তারা কি তোর বাপের ঠাকুর, আমি কি কেউ নই ॥
কারো অঙ্গে শাল দোশালা, ভাতে চিনি দই।
আবার কারো ভাগ্যে শাকে বালী ধানে ভরা খই ॥
কেউবা বেড়ায় পালকী চড়ে আমি বোঝা বই।
মাগো আমি কি তোর পাকা ধানে দিয়াছি গো মই ॥
প্রসাদ বলে তোমায় ভুলে আমি জ্বালা সই।
ওমা, আমার ইচ্ছা অভয়পদে চরণ ধূলা হই ॥ ১৩৯ ॥

---

* পরাৎপরা,—পরমেশ্বরী (যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ)। † পাঁচের,—পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের।
‡ হয়,—অশ্ব।

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

দূর হয়ে যা যমের ভটা। *
ওরে, আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা॥
বল্‌গে যা তোর যম রাজারে, আমার মতন নেছে কটা।
আমি যমের যম হতে পারি, ভাবলে ব্রহ্মময়ীর ছটা॥
প্রসাদ বলে কালের ভটা, মুখ সাম্‌লায়ে বলিস বেটা।
কালী নামের জোরে বেঁধে তোরে, সাজা দিলে রাখবে কেটা॥ ১৪০॥

[রাগিণী—বিভাস, তাল—তিওট]

নব নীল নীরদ তনু রুচি কে, ঐ মনোমোহিনী রে॥
তিমির শশধর, বাল দিনকর, সমান চরণে প্রকাশ।
কোটী চন্দ্র ঝলকত, শ্রীমুখ মণ্ডল, নিন্দি সুধামৃত ভাষ॥
অবতংস সে শ্রবণে, কিশোর বিধি অরি, গলিত কুন্তল পাশ।
গলে সুন্দর বরণ, সুহার লম্বিত, সতত জঘনে নিবাস॥
বামার বাম করপর, খড়্গ নরশির, সব্যে পূর্ণাভিলাষ।
শশী সকল ভালে, বিরাজে মহাকালে, ঘোর ঘন ঘন হাস॥
ভণে শ্রীকবিরঞ্জনে, বাঞ্ছা করেছি মনে,
করুণাবলোকনে, কলুষচয়ে কর নাশ।
তব নাম বদনে, যে প্রকাশে সে জনে,
প্রভবে এ কথা আভাষ॥ ১৪১॥

[রাগিণী—ললিত, তাল—রূপক]

নলিনী নবীনা মনোমোহিনী।
বিগলিত চিকুর ঘটা, গমনে বরটা, † বিবসনা শবাসনা মদালসা।
ষোড়শী ষোড়শকলা, কুশলা সরলা, ললাটে বালার্ক বিধু,
শ্রুতিতলে ব্রহ্মা বিধু, মনোজ্ঞা মধুরমুখা, মধুর লালসা॥
‡ সোমমৌলি প্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম,
ভজে বুধ বৃহস্পতি, হান কর্ম্মনাশা।
হরিণাক্ষী হরিমধ্যা* হরিহর ব্রহ্মারাধ্যা,
হরি পরিবার সেই, যে ভজে দিগ্বসা॥ ১৪২॥

[রাগিণী মুলতানী, তাল—একতালা]

নিতান্ত যাবে দিন এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে।
ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো॥

* ভটা,—চর, দূত।
† বরটা—রাজহংসী। ‡ সোমমৌলি—শিব (যাঁহার কপালে চন্দ্র)। *হরিমধ্যা—সিংহের ন্যায় ক্ষীণ কটিযুক্তা।

দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়।
ওমা, তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো॥
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে।
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো॥ ১৪৩॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

নীতি তোরে বুঝাবে কেটা।
বুঝে বুঝলি নারে মনের ঠেঁটা॥
কোথা রবে ঘর বাড়ী তোর, কোথা রবে দালান কোটা।
যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে, মন কোথা রবে খুড়া জেঠা॥
মরণ সময় দিবে তোমায়, ভাঙ্গা কলসি ছেঁড়া চেঠা।
ওরে সেখানেতে তোর নামেতে, আছে রে যে জাবদা আটা॥
যত ধন জন সব অকারণ, সঙ্গেতে না যাবে কেটা।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, ছাড়বে সংসারের লেঠা॥ ১৪৪॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

পতিতপাবনী তারা।
ওমা কেবল তোমার নাম সারা॥
ঐ যে তরাসে আকাশে বাস, বুঝেছি মা কাজের ধারা।
বশিষ্ঠ চিনিয়াছিল, হাড় ভেঙ্গে শাপ দিল।
তদবধি হইয়াছ ফণী যেন মণিহারা।
ঠেকেছিলে মুনির ঠাঁই, কার্য্য কারণ তোমার নাই।
ওয়ায় সর তর রয়, সেইরূপ বর্ণপারা॥
দশের পথ বটে সোজা, দশের লাঠি একের বোঝা।
লেগেছে দশের ভার, মনে শুধু চক্ষু ঠারা॥
পাগল বেটার কথায় মজে, এতকাল মলেম ভজে।
দিয়াছি গোলামি খৎ, এখন কি আর আছে চারা॥
আমি দিলাম নাকে খৎ, তুমি দেও মা ফারখৎ।
কালায় কালায় দাওয়া ঝুটা, সাক্ষী তোমার ব্যাটা যারা॥
বসতি ষোড়শদলে, ব্যক্ত হবে ভূমণ্ডলে।
প্রসাদ বলে কুতূহলে, তারায় লুকায় তারা॥১৪৫॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

পতিত পাবনী পরা
পরামৃত ফলদায়িনী॥
স্বদীনে চরণ ছায়া, বিতর শঙ্কর জায়া।
কৃপাং কুরু স্বগুণে মা, নিস্তারকারিণী॥
কৃত পাপ হীন পুণ্য, বিষয় ভজনা শূন্ত।
তারারূপে তারয় মাং নিখিল জননী॥

ত্রাণ হেতু ভবার্ণব, চরণ তরণী তব।

প্রসাদে প্রসন্না ভব, ভবের গৃহিণী ॥১৪৬॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

পুরলনাকো মনের আশা।

আমার মনের দুঃখ রৈল মনে ॥

দুঃখে দুঃখে কাল কাটালাম, সুখের আর কিবা ভরসা।

আমি বলব কি করুণাময়ী, সঙ্গে ছয়টা কর্ম্মনাশা ॥

শ্রীরামপ্রসাদ বলে মা, ভেবে ভেবে পাইনা দিশা।

অভয় পদে শরণ নিয়ে, ঘট্‌ল আমার উল্‌টে দশা ॥১৪৭॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

বড়াই কর কিসে গো মা।

জানি তোমার আদি মূল, বড়াই কর কিসে ॥

আপনি ক্ষেপা, পতি ক্ষেপা, থাক ক্ষেপা সহবাসে।

তোমার আদি মূল সকলই জানি, দাতা তুমি কোন্ পুরুষে ॥

মাগী মিন্সে ঝগড়া করে, রৈতে নার আপন বাসে।

মাগো তোমার ভাতার ভিক্ষা করে ফিরে দেশে দেশে ॥

প্রসাদ বলে মন্দ বলি, কেবল তোমার বাপের দোষে।

মাগো, আমার বাপের নাম লইলে, বিরাজ করে কৈলাসে ॥১৪৮॥

[রাগিণী—পিলু বাহার, তাল—জৎ]

বল ইহার ভাব কি, নয়নে ঝরে জল (গ্রহণে কালীর নাম)।

তুমি বহুদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ, স্থির করে বল ॥

একটা করি অভিপ্রায়, ডুবা কাষ্ঠ বটে কায়।

কালী নামাগ্নি রসনায় জ্বলে, সেই জল ঢল ঢল ॥

কাল ভাবি চক্ষু মুদি, নিদ্রা আবির্ভাব যদি।

শিব শিরে গঙ্গা তারি, প্রবাহ নির্ম্মল ॥

আজ্ঞা করেছেন গুরু, বেণী তীর্থ বটে ভুরু।

গঙ্গা যমুনার ধারার নিতান্ত এই ফল ॥

প্রসাদ বলে মন ভাই, এই আমি ভিক্ষা চাই।

বেণী তটে আপন নিকটে দিও স্থল ॥১৪৯॥

প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে।

এই বাদানুবাদ করে সকলে ॥

কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি।

কেহ বলে সালোক্য * পাবি, কেহ বলে সাযুজ্য † মেলে ॥

---

* সালোক্য—কর্ম্মফল হেতু তুল্যলোকে বাসরূপ মুক্তি। † সাযুজ্য—(ঈশ্বর) একত্ব প্রাপ্ত রূপ মুক্তি।

বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খোয়ালে॥
এক ঘরেতে বাস করিছে, পঞ্চ জনে মিলে জুলে।
সে যে সময় হইলে আপনা আপনি, যে যার স্থানে যাবে চলে॥
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই, তাই হবি রে নিদান কালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে॥১৫০॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা॥
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বলে, চলে যাব যথা তথা।
আমি সাধু সঙ্গে নানা রঙ্গে, দূর করিব মনের ব্যথা॥
তুমি গো পাষাণের সুতা, আমার যেম্নি পিতা তেম্নি মাতা।
রামপ্রসাদ বলে হৃদিস্থলে, গুরু তত্ত্ব রাখ গাঁথা॥১৫১॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা॥
মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।
যে বাপ বিমাতাকে শিরে ধরে, এমন বাপের ভরসা বৃথা॥
তুমি না করিলে কৃপা, যাব কি বিমাতা যথা।
যদি বিমাতা আমায় করেন কোলে, দেখা নাই আর হেথা সেথা॥
প্রসাদ বলে এই কথা, বেদাগমে আছে গাঁথা। ওমা যেজন
তোমার নাম করে, তার হাড় মালা আর ঝুলি কাঁথা॥১৫২॥

[রাগিণী—ললিত, তাল—আড়খেমটা]

বসন পর মা বসন পর তুমি।
রাঙ্গা চন্দনে মাখিয়া জবা, পদে দিব মা আমি॥
খড়্গ হস্তে, রুধির ধারা, এ মা মুণ্ডমালা গলে।
একবার হেঁট নয়নে চেয়ে দেখ, মা পতি পদতলে, গো মা॥
সবে বলে পাগল পাগল, ওমা আরো পাগল আছে।
রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে॥১৫৩॥

[রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—ধিমা তেতালা]

বামা ওকে এলোকেশে।
সঙ্গিনী রঙ্গিণী ভৈরবী যোগিনী, রণে প্রবেশে অতি দ্বেষে॥
কি সুখে হাসিছে লাজ না বাসিছে, নাচিছে মহেশ উরসে।
ঘোর সমরে মগনা হয়েছে নগনা, পিবতি সুধা আবেশে॥
ঢলিয়া ঢলিয়া যাইছে চলিয়া, ধর রে বলিয়া ঘন হাসে।
কাহার নারী রে চিনিতে নারি রে, মোহিত করেছে ছিন্নবেশে॥

কারে আর ভজরে, ও পদে মজরে,
রূপে আলো করেছে দিগ দেশে।
কি করি রণে রে, হয়েছে মনে রে,
প্রসাদ ভণে রে চল কৈলাসে ॥১৫৪॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

বাজ্‌বে গো মহেশের হৃদে, আর নাচিস্‌নে ক্ষেপা মাগি।
মরে নাই শিব বেঁচে আছে, যোগে আছেন মহাযোগী ॥
যে দেখি তোর চরণের জোর, নাচতে শিবের ভাঙ্গবে পাঁজর।
বিষ খেকো শিব নয়গো সজোর, তোর লেগে ওর মন বিবাগী।
খেয়ে গরল হয় নাই মরণ, শিব ছল করে মুঁদেছেন নয়ন।
ফাঁকির মরণ কল্লছেন সাধন, ও চরণ তোর পাবার লাগি ॥
ভাঙ্গ খেয়ে ভাঙ্গরের মতি, শিব হয়ে আছেন শবাকৃতি,
দীন রামপ্রসাদ কয় এই মিনতি,
নেবে নাচ মা শিব সোহাগী ॥১৫৫॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

বাস্‌নাতে দাও আগুণ জ্বেলে স্বভাব হবে পরিপাটী।
কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই মনের ময়লা ফেল কাটি ॥
কালীদহের কূলে চল, সে জলে ধোপ ধর্ব্বে ভাল।
পাপ কাষ্ঠের আগুণ জ্বাল, চাপায়ে চৈতন্যের ভাঁটি ॥ ১৫৬ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

ভবে আর জন্ম হবে না।
হবে না জননীর জঠরে ॥
ভবানী ভৈরবী শ্যামা, বেদ শাস্ত্রে নাইক সীমা।
তারার মহিমা আপনি মাত্র, জেনেছেন শিব শঙ্করে ॥
আমার মায়ের নামে গান করে, কত পাপী গেল তরে।
কৈলাস গিরি দিব্য পুরী, দেখাও এবার মা আমারে ॥১৫৭॥

[রাগিণী—পিলু বাহার, তাল—জৎ]

ভবে এসে খেলব পাশা, বড়ই আসা মনে ছিল।
মিছে আশা ভাঙ্গা দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ি পলো ॥
পো-বার আঠার ষোল, যুগে যুগে এলেম ভাল।
শেষে কচে-বার পেয়ে মাগো, পাঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলো ॥
ছ দুই আট ছ চার দশ, কেহ নয় মা আমার বশ।
আমার খেলাতে না হলো যশ, এবার বাজী ভোর হইল ॥
হদ্দ হলো চোদ্দ পোয়া, বদ্ধ পথে যায় না যাওয়া।
রামপ্রসাদের বুদ্ধি দোষে, পেকেও ফিরে কেঁচে এলো ॥ ১৫৮ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

ভাব কি ভেবে পরাণ গেল।

যার নামে হরে কাল, পদে মহাকাল, তার কেন কালরূপ হল।
কাল রূপ অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য্য কাল।
যাকে হৃদয় মাঝে রাখিলে পরে, হৃদয়পদ্ম করে আলো॥
রূপে কালী নামে কালী, কাল হইতে অধিক কাল।
ওরূপ যে দেখেছে সে মজেছে, অন্যরূপ লাগে না ভাল॥
প্রসাদ বলে কুতূহলে, এমন মেয়ে কোথায় ছিল।
না দেখিলাম শুনে কাণে, মন গিয়া তায় লিপ্ত হল॥ ১৫৯॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

ভাব না কালী ভাবনা কিবা।

ওরে মোহময়ী রাত্রি গতা, সংপ্রতি প্রকাশে দিবা॥
অরুণ উদয় কাল, ঘুচিল তিমির জাল।
ওরে কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করেছে শিবা॥
বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, ষড়দর্শনের সেই অন্ধগুলা।
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠা মূলা, খেলা ধূলা কে ভাঙ্গিবা॥
যেখানে আনন্দ হাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাঠ।
ওরে যার নেটো তারি নাট, তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইবা॥
যে রসিক ভক্ত শূর, সে প্রবেশে সেই পুর।
রামপ্রসাদ বলে ভাঙ্গলো ভুর, আগুন বেঁধে কে রাখিবা॥ ১৬০॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

ভাল নাই মোর কোন কালে।

ভালই যদি থাকৃবে আমার, মন কেন কুপথে চলে॥
হেদে গো মা দশভূজা, আমার ভবে তনু হইল বোঝা।
আমি না করিলাম তোমার পূজা, জবা বিল্ব গঙ্গাজলে॥
এ ভব সংসারে আসি, না করিলাম গয়া কাশী।
যখন শমন ধরিবে আসি, ডাকৃব কালী কালী বলে॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে।
আমি ডাকি ধর ধর বলে, কে ধরে তুলিবে কূলে॥ ১৬১॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

ভাল ব্যাপার মন কর্ত্তে এলে।
ভাসিয়ে মানবতরী কারণ জলে॥

বাণিজ্য করিতে এলে, মন ভবনদীর জলে।
ওরে কেউ করিল দুন ব্যাপার, কেউ হারাল লাভে মূলে॥
ক্ষিত্যপতেজঃমরুৎব্যোম, বোঝাই আছে নায়ের খোলে।
ওরে ছয় দাঁড়ি ছয় দিকে টেনে, গুরোয় পা দে ডুবিয়ে দিলে॥

পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা করা, পাঁচে ডেকে পাঁচে মিলে।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে, কি হবে তাই প্রসাদ বলে ॥১৬২॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

ভাল মা ভাল এ মন্ত্রণা।
যারে খেদাইলে তার উঠল চষি, করেছ কি এই বাসনা।
সাধের ঘরে বাদ সেধেছে দিয়ে ছয়টা বাদী সেনা।
তারা আপন আপন পক্ষ টানে, নিমকের সর্ত্ত মানে না।
এক হাটে দুই দর করেছ, এই কি মা তোর বিবেচনা।
কারু শাকে দেও বালি, কারু দুগ্ধেতে দেও চিনির পানা।
প্রসাদ বলে বলবো কি মা, বল্‌তে কিছু চায় রসনা।
ঐ যে জোরকা লাঠি শির কা উপর, আমার মন বুঝেছে প্রাণ
বুঝেনা ॥১৬৩

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

ভূতের বেগার খাটিব কত।
তারা বল্ আমায় খাটাবি কত ॥
আমি ভাবি এক হয় আর, সুখ নাই মা কদাচিত ॥
পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়, এ দেহের পঞ্চভূত।
ওমা, ষড়রিপু সাহায্য তায়, হল ভূতের অনুগত ॥
আসিয়া ভব সংসারে দুঃখ পেলেম যথোচিত।
ওমা, যার সুখেতে হব সুখী, সে মন নয় গো মনের মত ॥
চিনি বলে নিম খাওয়ালে, ঘুচল না সে মুখের তিত।
কেন ভিষক প্রসাদ মনে বিষাদ, হয়ে কালীর শরণাগত ॥১৬৪॥

[রাগিণী—গাড়া ভৈরবী, তাল—জৎ]

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়, মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্ত্তা বলে সবাই বলে।
আবার সে কর্ত্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে ॥
যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে।
সেই প্রেয়সী গোবর ছড়া দিবে, অমঙ্গল হবে বলে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে শমন যখন ধরবে চুলে।
তখন ডাক্‌বি কালী কালী বলে, কি করিতে পারবে কালে ॥১৬৫॥

[রাগিণী—মূলতানী, তাল—একতালা]

মন আমার যেতে চায় গো আনন্দ কাননে।
বট মনোময়ী সান্ত্বনা কেন কর না এই মনে ॥
শিবযুক্ত বারাণসী, সেই শিব পদবাসী,
তবু মন ধায় কাশী রব কেমনে।

অন্নপূর্ণা রূপ ধর, *পঞ্চক্রোশী পদে কর,
নখজালে গঙ্গা মণিকর্ণিকার সনে ॥
দ্বিপদে অলক্ত আভা, অসি বরুণার শোভা,
হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে।
প্রসাদ আছে খেদযুক্ত, শান্ত করা উপযুক্ত,
কিবা কাজ অভিযুক্ত পুরী গমনে ॥১৬৬॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন করনা সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা ॥
হয়ে ধর্ম্মতনয়† ত্যজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা ॥
হয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক, তবু শিবের দৈন্য দশা।
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে, মন সুখের আশে বড় কসা ॥
হরিষে বিষাদ আছে মন, কর না একথায় গোঁসা।
ওরে সুখেই দুখ দুখেই সুখ, ডাকের কথা আছে ভাষা ॥
মন ভেবেছ কপট ভক্তি, করে পুরাইবে আশা।
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া, এড়াবে না রতি মাসা ॥
প্রসাদের মন হও যদি মন, কর্ম্মে কেন হওরে চাষা।
ওরে মনের মতন কর যতন, রতন পাবে অতি খাসা ॥১৬৭॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন কর না দ্বেষা দ্বেষি।
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী ॥
আমি বেদাগম পুরাণে, করিলাম কত খোজ তল্লাসি।
ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম, সকল আমার এলোকেশী ॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ওমা, রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি ॥
দিগম্বরী দিগম্বর, পীতাম্বর চিরবিলাসী।
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুল নিবাসী ॥
যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে একবয়সী।
যেমন অনুজ ধানকী সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী ॥ ১৬৮ ॥

[রাগিণী—মুলতান, তাল—একতালা]

মন কালী কালী বল।
বিপদনাশিনী কালীর নাম জপনা, ওরে ওমন কেন ভোল ॥

*পঞ্চক্রোশী—কাশী পঞ্চ ক্রোশ ব্যাপী।
†ধর্ম্মতনয়—যু, ধিষ্ঠির।

পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা করা, পাঁচে ডেকে পাঁচে মিলে।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশায়ে যাবে, কি হবে তাই প্রসাদ বলে ॥১৬২॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

ভাল মা ভাল এ মন্ত্রণা।
যারে খেদাইলে তার উঠল চর্বি, করেছ কি এই বাসনা।
সাধের ঘরে বাদ সেধেছে দিয়ে ছয়টা বাদী সেনা।
তারা আপন আপন পক্ষ টানে, নিমকের সর্ত্ত মানে না।
এক হাটে দুই দর করেছ, এই কি মা তোর বিবেচনা।
কারু শাকে দেও বালি, কারু দুগ্ধেতে দেও চিনির পানা।
প্রসাদ বলে বলবো কি মা, বল্‌তে কিছু চায় রসনা।
ঐ যে জোরকা লাঠি শির কা উপর, আমার মন বুঝেছে প্রাণ
বুঝেনা ॥১৬৩॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

ভূতের বেগার খাটিব কত।
তারা বল্ আমায় খাটাবি কত ॥
আমি ভাবি এক হয় আর, সুখ নাই মা কদাচিত ॥
পঞ্চ দিকে নিয়ে বেড়ায়, এ দেহের পঞ্চভূত।
ওমা, ষড়রিপু সাহায্য তায়, হল ভূতের অনুগত ॥
আসিয়া ভব সংসারে দুঃখ পেলেম যথোচিত।
ওমা, যার সুখেতে হব সুখী, সে মন নয় গো মনের মত ॥
চিনি বলে নিম খাওয়ালে, ঘুচল না সে মুখের তিত।
কেন ভিষক প্রসাদ মনে বিষাদ, হয়ে কালীর শরণাগত ॥১৬৪॥

[রাগিণী—গাড়া ভৈরবী, তাল—জৎ]

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়, মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্ত্তা বলে সবাই বলে।
আবার সে কর্ত্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে ॥
যার জন্য মর ভেবে, সে কি তোমার সঙ্গে যাবে।
সেই প্রেয়সী গোবর ছড়া দিবে, অমঙ্গল হবে বলে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে শমন যখন ধরবে চুলে।
তখন ডাক্‌বি কালী কালী বলে, কি করিতে পারবে কালে ॥১৬৫॥

[রাগিণী—মূলতানী, তাল—একতালা]

মন আমার যেতে চায় গো আনন্দ কাননে।
বট মনোময়ী সান্ত্বনা কেন কর না এই মনে ॥
শিবকৃত বারাণসী, সেই শিব পদবাসী,
তবু মন ধায় কাশী রব কেমনে।

অন্নপূর্ণা রূপ ধর, *পঞ্চক্রোশী পদে কর,
নখজালে গঙ্গা মণিকর্ণিকার সনে ॥
দ্বিপদে অলক্ত আভা, অসি বরুণার শোভা,
হউক পদারবিন্দে হেরি নয়নে।
প্রসাদ আছে খেদযুক্ত, শান্ত করা উপযুক্ত,
কিবা কাজ অভিযুক্ত পুরী গমনে ॥১৬৬॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন করনা সুখের আশা।
যদি অভয় পদে লবে বাসা ॥
হয়ে ধর্ম্মতনয়† ত্যজে আলয়, বনে গমন হেরে পাশা ॥
হয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক, তবু শিবের দৈন্য দশা।
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে, মন সুখের আশে বড় কসা ॥
হরিষে বিষাদ আছে মন, কর না একথায় গোঁসা।
ওরে সুখেই দুখ দুখেই সুখ, ডাকের কথা আছে ভাষা ॥
মন ভেবেছ কপট ভক্তি, করে পুরাইবে আশা।
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া, এড়াবে না রতি মাসা ॥
প্রসাদের মন হও যদি মন, কর্ম্মে কেন হওরে চাষা।
ওরে মনের মতন কর যতন, রতন পাবে অতি খাসা ॥১৬৭॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন কর না দ্বেষা দ্বেষি।
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী ॥
আমি বেদাগম পুরাণে, করিলাম কত খোজ তল্লাসি।
ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম, সকল আমার এলোকেশী ॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী।
ওমা, রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি ॥
দিগম্বরী দিগম্বর, পীতাম্বর চিরবিলাসী।
শ্মশানবাসিনী বাসী, অযোধ্যা গোকুল নিবাসী ॥
যোগিনী ভৈরবী সঙ্গে, শিশু সঙ্গে একবয়সী।
যেমন অনুজ ধানকী সঙ্গে, জানকী পরম রূপসী ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী ॥ ১৬৮ ॥

[রাগিণী—মুলতান, তাল—একতালা]

মন কালী কালী বল।
বিপদনাশিনী কালীর নাম জপনা, ওরে ওমন কেন ভোল ॥

*পঞ্চক্রোশী—কাশী পঞ্চ ক্রোশ
†ধর্ম্মতনয়—যুধিষ্ঠির।

কিঞ্চিৎ কর না ভয়, দেখে অগাধ সলিল।
ওরে অনায়াসে ভবনদীর কালী কুলাইবেন কূল॥
যা হবার তা হল ভাল, কাল গেল মন্ কালী বল।
এবার কালের চক্ষে দিয়ে ধূলা, ভব পারাবারে চল॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে ভুল না মন নিদান কালে।
ওরে, কালী নাম অন্তরে জপ, বেলা অবসান হল॥ ১৬৯॥

[প্রসাদী সুর, তাল – একতালা]

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধর্ত্তে পারে॥
মন অগ্রে শশী বশীভূত, কর তোমার শক্তি সারে।
ওরে কোটার ভিতর চোরকুটারী, ভোর হলে সে লুকাবে রে॥
ষড়্দর্শনে দর্শন পেলেম না, আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
সে ভাব লোভে পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্‌ব হাঁড়ি, বুঝরে মন ঠারে ঠোরে॥ ১৭০॥

[রাগিণী—জঙ্গলা মুলতানী, তাল—একতালা]

মন কি কর ভবে আসিয়ে।
ওরে দিবা অবশেষ, অজপার শেষ,
ক্রমেতে নিশ্বাস যায় ফুরায়ে॥
হং বর্ণ পূরকে হয়, সঃবর্ণ রেচকে বয়।
অহর্নিশি করে জপ হংস হংস বলিয়ে॥
অজপা হইলে সাঙ্গ কোথা তব রবে রঙ্গ।
সকলি হইবে ভঙ্গ, ভবানীরে না ভাবিয়ে॥
চলনে দ্বিগুণ ক্ষয়, ততোধিক নিদ্রায় হয়।
বিনয়ে রামপ্রসাদ কয়, ততোধিক সঙ্গম সময়ে॥ ১৭১

[প্রসাদী সুর, তাল – একতালা]

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া॥
নয়ন থাকতে না দেখলে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া রূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া॥
মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যাবে মৃত্যু শেষে।
মোলে দণ্ড দুচার কান্নাকাটী, শেষে দিবে গোবর ছড়া॥

ভাই বন্ধু দারা সুত, কেবল মাত্র মায়ার গোড়া।
মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কলসি, কড়ি দিবে অষ্ট কড়া॥
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ।
দোসর বস্ত্র গায় দিবে, চার কোণা মাঝখানে ফাঁড়া॥
যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাবে কালিকা তারা।
বের হয়ে দেখ কন্যারূপে, রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া *॥ ১৭২

[রাগিণী—জঙ্গলা, তাল—একতালা]

মন কেন রে পেয়েছ এত ভয়।
ও তুমি কেনরে পেয়েছ এত ভয়॥
তুফান দেখে ডরো নারে, ও তুফান নয়।
দুর্গা নাম তরণী করে, বেয়ে গেলে হয়॥
পথে যদি চৌকীদারে, তোরে কিছু কয়।
তখন ডেকে বলো, আমি শ্যামা মায়েরি তনয়॥
প্রসাদ বলে ক্ষেপা মন, তুই কারে করিস্ ভয়।
আমার এ তনু দক্ষিণার পদে, করেছি বিক্রয়॥ ১৭৩॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন কেনরে ভাবিস্ এত।
যেমন মাতৃহীন বালকের মত॥
ভবে এসে ভাবছ বসে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত॥
ফণী হয়ে ভেকের ভয়, এ যে বড় অদ্ভুত।
ওরে তুই করিস কি কালের ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ীর সুত॥
একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হলিরে পাগলের মত।
অমন মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত॥
মিছে কেন ভাব দুঃখ, দুর্গা বল অবিরত।
যেমন জাগরণে ভয়ং নাস্তি হবেরে তোর তেমি মত॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মন কররে মনের মত।
এখন গুরুদত্ত তত্ত্ব কর, কি করিবে রবিসুত॥ † ১৭৪॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন খেলাও রে দাণ্ডাগুলি।
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি॥

* গল্প আছে একদা রামপ্রসাদ গান গাইতে গাইতে ঘর হইতে বেড়া বাঁধিতেছিলেন এবং বাহির হইতে তাঁহার কন্যা বাঁধন বাড়াইয়া দিতেছিল। কথিত আছে যে কিয়ৎকাল পরে কন্যা কার্য্যান্তরে গমন করিলে, কালী স্বয়ং তাহার রূপ ধারণ করিয়া বেড়া বাঁধার সাহায্য করিতে করিতে রামপ্রসাদের গান শুনিতেছিলেন। সেই উপলক্ষে এই গানটি রচিত হয়।

† রবিসুত—যম। সূর্য্যের ঔরসে এবং সংজ্ঞার গর্ভে জন্ম হয়।

এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল, চাম্পাকলি খুলা খুলি।
আমি কালী নামে মারব বাড়ি, ভাঙ্গব যমের মাথার খুলি॥
ছয় জনের মন্ত্রণা নিলি, তাইতে পাগল ভুলে গেলি।
রামপ্রসাদের খেলা ভাঙ্গলি, গলে দিলে কাঁথা ঝুলি॥ ১৭৫ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন গরিবের কি দোষ আছে।

তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা, যেমি নাচাও তেমি নাচে॥
তুমি কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম, মর্ম্ম কথা বুঝা গেছে।
ওমা তুমি ক্ষিতি তুমি জল, ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে॥
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি, তুমিই মুক্তি শিব বলেছে।
ওমা তুমি দুঃখ তুমি সুখ, চণ্ডীতে তা লেখা আছে॥
প্রসাদ বলে কর্ম্মসূত্র, সে সুতার কাটনা কেটেছে। ওমা
সেই মায়া সূত্রে বেঁধে জীব, ক্ষেপা ক্ষেপি খেল খেলিছে॥১৭৬॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন জান না কি ঘটবে লেঠা।

যখন উর্দ্ধ বায়ু রুদ্ধ করে, পথে তোমার দিবে কাঁটা॥
আমি দিন থাকতে উপায় বলি, দিনের সুদিন যেটা।
ওরে শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে, মনে মনে হওরে আঁটা॥
পিঞ্জরে পোষেছ পাখী, আটক করিবে কেটা।
ওরে, জাননা যে তার ভিতরে, দুয়ার রয়েছ নটা॥*
পেয়েছ কুসঙ্গী সঙ্গী, ধিঙ্গি ধিঙ্গি ছটা।
তারা যা বলিছে তাই করিছ, এমনি বুকের পাটা॥
প্রসাদ বলে মন জানতো, মনে মনে যেটা।
আমি চাতরে কি ভেঙ্গে হাড়ী, বুঝাইব সেটা॥১৭৭॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন তুই কাঙ্গালী কিসে।
ও তুই জানিস্ নারে সর্ব্বনেশে॥

অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে।
ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি, দেখিস্‌নারে বসে বসে॥
মনের মত মন যদি হও, থাকরে যোগেতে মিশে।
যখন অজপা পূর্ণিত হবে, ধরবে না আর কাল বিষে॥
গুরুদত্ত রত্ন তোড়া, বাঁধরে যতনে কসে।
দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি, অভয় চরণ পাবার আশে॥১৭৮॥

* নটা,—নবদ্বার (দুই কর্ণ, দুই চক্ষু, দুই নাসারন্ধ্র, মুখ, প্রস্রাবদ্বার, মলদ্বার।

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন তুমি দেখরে ভেবে।

ওরে, আজি অব্দ শতান্তে বা অবশ্য মরিতে হবে॥

ভবঘোরে হয়ে রে মন, ভাবলিনে ভবানী ভবে।

সদা ভাব সেই ভবানী পদ, যদি ভব পারে যাবে॥ ১৭৯॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন তুমি কি রঙ্গে আছ।

(ও মন রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ)

তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোরা, দুঃখে রোদন সুখে নাচ॥

রংয়ের বেলা রাংয়ে কড়ি, সোনার দরে তা কিনেছ।

ও মন, দুঃখের বেলা রতন মাণিক, মাটীর দরে তা বেচেছ॥

সুখের ঘরে রূপের বাসা, সেই রূপে মন মজায়েছ।

যখন সে রূপে বিরূপ হবে, সে রূপের কিরূপ ভেবেছ॥ ১৮০॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।

কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লে না॥

ওরে, ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি মন তাই জান না॥

জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা।

ওরে, কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়, দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।

ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁয়,

আলো চাল আর বুট ভিজনা॥

জগৎকে পালিছেন যে মা, সাদরে তাও কি জান না।

ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি, মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা॥

প্রসাদ বলে ভক্তি মাত্র কেবল রে তাঁর উপাসনা।

তুমি লোক দেখান কর্ব্বে পূজা, মাতো আমার ঘুষ খাবে না॥ ১৮১॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন তোমার ভ্রম গেল না।

তুমি কালী কে তা চিনলে না॥

মা আমার জগৎময়ী, জগতে তাঁর নাই তুলনা।

তুমি মাটীর মূর্ত্তি গড়ে কি চাও, কর্ত্তে মায়ের উপাসনা॥

জীব মাত্র মায়ের ছেলে, কেহ নয় তাঁর পর ভাবনা।

তুমি খুসি কর্ত্তে চাও কি মাকে, কেটে একটা ছাগল ছানা॥

প্রসাদ বলে রে মূঢ় মন, ভক্তি মাত্র উপাসনা॥

কর্ত্তে লোক দেখান কালীপূজা, মা তো তোমার ঘুস খাবে না॥ ১৮২॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন তোর এত ভাবনা কেনে।

একবার কালী বলে বসরে ধ্যানে॥

জাঁক জমকে করলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে।

তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা, জানবে না রে জগজ্জনে॥

ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে।

তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি পদ্মাসনে॥

আলো চাল আর পাকা কলা, কাজ কি রে তোর সে আয়োজনে।

তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্তি কর আপন মনে॥

ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কি রে তোর সে রোসনায়ে।

তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে, দেওনা জলুক নিশিদিনে॥

মেষ ছাগল মহিষাদি, কাজ কি রে তোর বলিদানে।

তুমি জয় কালী জয় কালী বলে, বলি দেও ষড়রিপুগণে॥

প্রসাদ বলে ঢাক ঢোলে, কাজ কি রে তোর সে বাজনে।

তুমি জয় কালী বলি দেও করতালি, মন রাখ সেই শ্রীচরণে॥ ১৮৩॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন তোরে তাই বলি বলি।

এবার ভাল খেল খেলিয়ে গেলি॥

প্রাণ বলে প্রাণের ভাই, মন যে তুই আমার ছিলি।

ওরে ভাই হয়ে ভুলায়ে ভাইয়ে, শমনেরে সঁপে দিলি॥

গুরুদত্ত মহাসুধা, ক্ষুধায় খেতে নাহি দিলি।

ওরে খাওয়ালি কেবল মাত্র, কতকগুলো গালাগালি॥

যেম্নি গেলি তেম্নি গেলাম, করে দিলি মেজাজ আলি।

এবার মায়ের কাছে বুঝা আছে, আমি নই বাগানের মালী॥

প্রসাদ বলে মন ভেবেছ, দেবে আমায় জলাঞ্জলি।

ওরে জাননা কি হৃদে গেঁথে, রেখেছি দক্ষিণা কালী॥ ১৮৪॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন রে ভালবাস তাঁরে।

যে ভবসিন্ধু পারে তারে॥

এই কর ধার্য্য কিবা কার্য্য আমার সংসারে॥

ধনে জনে আশা বৃথা, বিস্মৃত সে পূর্ব্বকথা।

তুমি ছিলে কোথা এলে কোথা যাবে কোথাকারে॥

সংসার কেবল কাচ কুহকে নাচায় নাচ।

মায়াবিনী কোলে আছ পড়ে কারাগারে॥

অহঙ্কার দ্বেষ রাগ অনুকূলে অনুরাগ।

দেহ রাজ্য দিল ভাগ বল কি বিচারে॥

যা করেছ চায়া কিবা প্রায় অবসান দিবা।
মণিদ্বীপে ভাব শিবা, সদা শিবাগারে॥
প্রসাদ বলে দুর্গা নাম সুধাময় মোক্ষধাম।
জপ কর অবিরাম সুধাও রসনারে॥ ১৮৫॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন ভুলনা কথার ছলে।
লোকে বলে বলুক মাতাল বলে॥
সুরাপান করিনেরে, সুধা খাই যে কুতূহলে!
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ, মদ মাতালে মাতাল বলে॥
অহর্নিশি থাক বসি, হরমহিষীর চরণ তলে।
নৈলে ধরবে নেশা ঘুচবে দিশা, বিষম বিষয় মদ খাইলে॥
যন্ত্র ভরা মন্ত্র সোঁড়া, অশু ভাসে যেই জলে।
সে যে অকুল তারণ কুলের কারণ, কুল ছেড় না পরের বোলে॥
ত্রিগুণে তিনের জন্ম, মাদক বলে মোহের ফলে।
সত্ত্বে ধর্ম্ম তমে মর্ম্ম, কর্ম্ম হয় মন রজ মিশালে॥
মাতাল হলে বেতাল পাবে, বৈতালী করিবে কোলে।
রামপ্রসাদ বলে নিদান কালে, পতিত হবে কুল ছাড়িলে॥১৮৬॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন ভেবেছ তীর্থে যাবে।
কালী পাদ-পদ্ম-সুধা ত্যজি' কূপে পড়ে আপন খাবে॥
ভব জরা পাপ রোগ লীলাচলে নানা ভোগ।
ওরে জ্বরে কাশী সর্ব্বনাশী, ত্রিবেণী স্নানে রোগ বাড়াবে॥
কালী নাম মহৌষধি, ভক্তি ভাবে পান বিধি।
ওরে গান কর পান কর, আত্মারামের আত্ম্য হবে॥
মৃত্যুঞ্জয়ে উপযুক্ত সেবায় হবে আশু মুক্ত।
ওরে সকলি সম্ভবে তাঁতে, পরমাত্মায় মিশ্র হবে॥
প্রসাদ বলে মন ভায়া ছাড়ি কল্পতরু ছায়া।
ওরে, কাঁটা বৃক্ষের তলে গিয়ে, মৃত্যু ভয়টা কি এড়াবে॥১৮৭॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন যদি মোর ঔষধ খাবা।
আছে শ্রীনাথ দত্ত পটল সত্ব, মধ্যে মধ্যে এটি চাবা॥
সৌভাগ্য কররে দূরে, মৃত্যুঞ্জয়ের কর সেবা।
রামপ্রসাদ বলে তবেই সে মন, ভব রোগে মুক্ত হবা॥১৮৮॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মনরে আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও করি স্তুতি॥

যা পড়াই তাই পড় মন, পড়লে শুনলে দুধি ভাতি।
ওরে জাননা কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি॥
কালী কালী কালী পড় মন, কালী পদে রাখ প্রীতি।
ওরে পড় বাবা আত্মারাম, আত্মজনার কর গতি॥
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে, বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
ওরে গাছের ফলে কদিন চলে, কররে চার ফলের স্থিতি॥
প্রসাদ বলে ফলা গাছে, ফল পাবি মন শোন্ যুকতি।
ঘরে বসে মুখে কালী বলে, গাছনাড়া দেও নিতি নিতি॥১৮৯॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মনরে আমার ভুলা মামা।
ও তুই জানিস্ নারে খরচ জমা॥
যখন ভবে জমা হলি ; তখন হতে খরচ গেলি।
ওরে জমা খরচ ঠিক্ করিয়ে, বাদ দিয়ে তিন শূন্য নামা॥
বাদে হলে অঙ্ক বাকী, তবে হবে তহবিল বাকী।
তহবিল বাকী বড় ফাঁকি, হবে না তোর লেখার সীমা॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে দেখরে বুঝে, কিসের খরচ কাহার জমা।
ওরে অন্তরেতে ভাব মন, কালী তারা উমা শ্যামা॥১৯০॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মনরে কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমি রৈলো পড়ে, আবাদ করলে ফলতো সোণা॥
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
(মনরে আমার)
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসেনা॥
অদ্য অব্দ-শতান্তে বা বাজেআপ্ত হবে জাননা।
(মনরে আমার)
আছে একতারে মন এই বেলা, তুই চুটিয়ে ফসল কেটে নে না॥
গুরু বীজ রোপণ করে বীজ, ভক্তিবারি তায় সেঁচনা।
(মনরে আমার)
ওরে একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা* ॥১৯১॥

---

* অপরবিধ পাঠ :—
(১) মন তুমি কৃষি কাজ জান না।
(২) মন তোমার কৃষি কাজ এলে না।
(৩) এখন আপন ভাবে তিন করে।
(৪) গুরুদত্ত বীজ বপন করে।
(৫) ডেকে নেনা। (দ্রষ্টব্য)

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মনরে তোর চরণ ধরি।
কালী বলে ডাকরে, ওরে ও মন, তিনি ভবপারের তরি॥
কালী নামটা বড় মিঠা, বলরে দিবা সর্ব্বরী।
ওরে, যদি কালী করেন কৃপা, তবে কি শমনে ডরি॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কালী বলে যাব তরী॥
তিনি তনয় বলে দয়া করে, তরাবেন এ ভব বারি॥১৯২॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মনরে তোর বুদ্ধি একি।
ও তুই সাপ ধরা জ্ঞান না শিখিয়ে তালাস করে বেড়াস ফাঁকি॥
ব্যাধের ছেলে পক্ষী মারে, জেলের ছেলে মৎস্য ধরে।
মনরে, ওঝার ছেলে গরু হইলে, গোসাপে তায় কাটে নাকি॥
জাতি ধর্ম্ম সর্প খেলা, সেই মন্ত্রে কর না হেলা।
মনরে, যখন বলবে বাপে সাপ ধরিতে, তখন হবি অধোমুখা॥
পেয়ে যে ধন হেলায় হারায়, তার চেয়ে কে অবোধ ধরায়।
প্রসাদ বলে হারাব না, সময় থাকৃতে শিখে রাখি॥১৯৩॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মনরে শ্যামা মাকে ডাক।
ভক্তি মুক্তি করতলে দেখ॥
পরিহরি ধনমদ, ভজ পদ কোকনদ,
কালেরে নৈরাশ কর, কথা শুন কথা রাখ॥
কালী কৃপাময়ী নাম, পূর্ণ হবে মনস্কাম,
অষ্ট যামের অর্দ্ধ যাম, আনন্দেতে সুখে থাক॥
রামপ্রসাদ দাস কয়, রিপু ছয় করে জয়,
মার ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা, দূর ছাই করে হাঁক॥১৯৪॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন হারালি কাজের গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাব বসি, কোথায় পাব টাকার তোড়া॥
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র, শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া।
তুই কাঁচমূলে কাঞ্চন বিকালি, ছি ছি মন তোর কপাল পোড়া॥
কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন, কেবা পাবে তার বাড়া।
মিছে এ দেশ সে দেশ করে বেড়াও, বিধির লিপি কপাল যোড়া॥
কাল করিছে হৃদয়ে বাস, বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া।
ওরে সেই কালের কর বিনাশ, শ্বাস ধরবে মন্ত্র সোড়া॥

প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন, পাঁচ, পোয়ারের তুমি ঘোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচা পাঁচি, তোমায় করবে তোলাপাড়া ॥১৯৫॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন তোমারে করি মানা।
তুমি পরের আশা আর করো না ॥
তুমি বা কার কেবা তোমার ভেবে মর কার ভাবনা।
ওরে তোর ভাবনা কেউ ভাবেনা, ভাব দেখে কি যায় না জানা ॥
সুখের ভাগী অনেকে হয়, দুঃখের ভাগী কেউ হবে না।
যখন শমন এসে ধরবে কেশে তখন কেবল ত্রিনয়না ॥
সুদিন দেখে অধীন জনে করবে কত উপাসনা।
যেদিন কুদিন হবে প্রসাদ বলে, সেদিন অধীন কেউ রয়না ॥ ১৯৬ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন তোমার এ'ক বিবেচনা।
তোমায় বুঝাইলে তো বুঝ না ॥
কয় গৃহ সুবিস্তার, গৃহে রত্ন অগণনা।
আছে মহাগ্রহ রবিসুত, সে গ্রহ শান্তি কর না ॥
গৃহে তব গৃহভেদী, আছে গ্রহ যে ছ'জনা।
তারা নিজ গৃহ থেকে করে গৃহদাহ কুমন্ত্রণা ॥
তারা পদ গৃহ কর, ত্যজ গ্রহ সে ছ'জনা।
রামপ্রসাদ বলে সকল গ্রহের গৃহ শ্যামা ত্রিনয়না ॥১৯৭॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন তোমার একি বাসনা।
কেন অহরহ কর কুবাসনা ॥
ষড়্‌রিপু বলে বাস, অবাসনা উপাসনা।
যদি স্ববলে না বাস কর কিসে পাবে শবাসনা ॥
ভাই বন্ধু দারা সুত ভালবাস সে বাসনা।
যেদিন রবিসুত বশে বাস, এবাসে বাস হবে না ॥
ষড়্‌ ঐশ্বর্য্যে বাস, কোটি রত্নে বিভূষণা।
রামপ্রসাদ বলে শূন্য বাস যে বাসে নাই বিবসনা ॥১৯৮॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

ময়লেম ভূতের বেগার খেটে।
আমার কিছু সম্বল নাইক গেঁটে ॥
নিজে হই সরকারী মুটে, মিছে মরি বেগার খেটে।
আমি দিন মজুরী নিত্য করি, পঞ্চভূতে খায় গো বেঁটে ॥

পঞ্চভূত ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে।
তারা কার কথা কেও শুনে না, দিন তো আমার কেটে
যেমন অন্ধজনে হারা দণ্ড, পুন পেলে ধরে এঁটে।
আমি তেমি মত ধর্ত্তে চাই মা, কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী কর্ম্মডুরি দে না কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা, ব্রহ্মরন্ধ্র যায় যেন ফেটে ॥১৯৯॥

[রাগিণী—বিভাস, তাল—ঢিমা তেতালা]

মরি ! ও রমণী কি রণ করে !
রমণী সমর করে, ধরা কাঁপে পদ ভরে,
রথ রথী সাথী তুরঙ্গ গরাসে।
কলেবর মহাকাল, মহাকালে শোভে ভাল,
দিনকর কর ঢাকে চিকুর পাশে ॥
আতঙ্কে মাতঙ্গ ধায় পতঙ্গে পতঙ্গ প্রায়,
মনে বাসী শশী খসি পড়ে তরাসে।
নিরুপপমা রূপ ছটা ভেদ করে ব্রহ্ম কটা,
প্রবল দনুজ ঘটা গেলে গরাসে ॥
ভৈরবী বাজায় গাল, যোগী ধরিছে তাল,
মরি কিবা সুরসাল গান বিভাসে।
নিকটে বিবুধ-বধু, যতনে যোগায় মধু,
দোলায়ে বদন বিধু মৃদু মৃদু হাসে ॥
সবার আসার আশা, ঘুচায়েছে আশা বাসা,
জীবনে নিরাশা ফিরে না যায় বাসে।
ভণে রামপ্রসাদ সার, নাম লয়ে শ্যামা মার,
আনন্দে বাজায়ে দামা চল কৈলাসে ॥২০০॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মরি গো এই মন দুঃখে।
(ওমা, মা বিনে দুঃখ বলব কাকে) ॥
একি অসম্ভব কথা, শুনে বা কি বলবে লোকে।
ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী, তার ছেলে মরে পেটের ভুকে ॥
সে কি তোমার সাধের ছেলে মা, রাখহে যারে পরম সুখে।
ওমা, আমি কত অপরাধী, নুন মেলে না আমার শাকে ॥
ডেকে ডেকে কোলে লয়ে, পাছাড় মারিলে আমার বুকে।
ওমা, মায়ের মত কাজ করেছ, ঘোষিবে জগতের লোকে ॥২০১॥

[প্রসাদী সুর, তাল একতালা]

মা আমায় ঘুরাবি কত।
যেন নাক ফোঁড়া বলদের মত ॥

আশি লক্ষ যোনি ভ্রমি, পশু পক্ষী আদি যত।
তবু গর্ভ ধারণ নয় নিবারণ, যাতনাতে হলেম হত॥
কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখন নয়।
রামপ্রসাদ কুপুত্র তোমার, তাড়ায়ে দেও জনমের মত॥২০২॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মা আমায় ঘুরাবে কত।
কলুর চোক ঢাকা বলদের মত॥
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছটা কলুর অনুগত॥
আশি লক্ষ যোনি ভ্রমি, পশু পক্ষী আদি যত।
তবু গর্ভ ধারণ নয় নিবারণ, যাতনাতে হলেম হত॥
মা শব্দ মমতাযুত, কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে মা চোকের ঠুলি, হেরি গো তোর অভয় পদ॥
কুপুত্র হয় অনেক গো মা, কুমাতা নয় কখনও।
প্রসাদ যে কুপুত্র তোমার, করে রেখো পদানত॥২০৩॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মা আমার খেলান হল।
(খেলা হল গো আনন্দময়ী)॥
ভবে এলেম কর্ত্তে খেলা, করিলাম ধুলা খেলা।
এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা, কাল যে নিকটে এলো॥
বাল্যকালে কত খেলা, মিছে খেলায় দিন গোঁয়ালো।
পরে জায়ার সঙ্গে লীলা খেলায়, অজপা ফুরায়ে গেল॥
প্রসাদ বলে বৃদ্ধকালে, অশক্ত কি করি বল।
ওমা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়ে, মুক্তি জলে টেনে ফেল॥২০৪॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা॥
তুমি পাষাণ-মেয়ে বিষম মায়া, কতই মা কাচাও গো কাচ।
উপাসনা ভেদে তুমি, প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচেরে এক করে ভাবে, তার হাতে মা কোথা বাঁচ॥
বুঝে ভার দেয় না সে জন, তার ভার নিতে হাঁচ।
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভুলে পেয়ে কাচ॥
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হয়ে, মনোময়ী হয়ে নাচ॥২০৫॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মা আমার বড় ভয় হয়েছে।
লেখা জমা ওয়াশীল দাখিল আছে॥
রিপুর বশে চল্লেম আগে, ভাবলেম না কি হবে পাছে।
ঐ যে চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত, যা করেছি তাই লিখেছে॥
জন্ম জন্মান্তরের যত, বকেয়া বাকীর জের টেনেছে।
যার যেমি কর্ম্ম তেমি ফল, কর্ম্মফলের ফল ফলেছে॥
জমায় কমি খরচ বেশী, তহূব কিসে রাজার কাছে।
ঐ যে রামপ্রসাদের মনের মধ্যে, (কেবল) কালীনাম ভরসা আছে॥২০৬॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মা আমি পাপের আসামী।
এই লোকসানি মহাল লয়ে, বেড়াই আমি॥
পতিতের মধ্যে লেখা, যার এই জমী।
তাই বারে বারে নালিস করি, দিতে হবে কমী॥
আমি মোলে এ মহলে, আর নাই হামি।
মাগো এখন ভাল না রাখত, থাকুক রাম রামি॥
গঙ্গা যদি গর্ভে টেনে, লইল এই ভূমি।
কেবল কথা রবে কোথা রব, কোথা রবে তুমি॥২০৭॥

[রাগিণী খাম্বাজ, তাল—রূপক]

মা কত নাচ গো রণে।
নিরুপম বেশ বিগলিত কেশ, বিবসনা হর-হৃদে কত নাচ গো রণে॥
সদ্য-হত দিতি-তনয় মস্তকহার লম্বিত সুজঘনে।
কত রাজিত কটীতটে, নরকরনিকর, কুনপশিশু শ্রবণে॥
অধর সুললিত বিম্ব বিনিন্দিত, কুন্দ বিকশিত সুদশনে।
শ্রীমুখমণ্ডল কমল নিরমল, সাট্টহাস সঘনে॥
সজল-জলধর কান্তি সুন্দর, রুধির কিবা শোভা ও বরণে।
প্রসাদ প্রবদতি মম মানস নৃত্যতি, রূপ কি ধরে নয়নে॥২০৮॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মাগো আমার কপাল দোষী।
(দোষী বটে গো আনন্দময়ী)॥
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হয়ে, যেতে নারলাম বারাণসী।
নৈলে অন্নপূর্ণা মা থাকিতে, মোর ভাগ্যেতে একাদশী॥
অন্ন ত্রাসে প্রাণে মরি, নানাবিধ কৃষি করি।
আমার কৃষি সকল নিল জলে, কেবল মাত্র লাঙ্গল চষি॥
না করিলাম ধর্ম্মকর্ম্ম, পাপ করেছি রাশি রাশি।
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে, পথ ভুলে রয়েছি বসি॥

জনমি ভারতভূমে মা, কি কর্ম্ম করিলাম আসি।
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, ভাবতে নারি দিবানিশি।
ওমা যখন শমন জোর করিবে, দুর্গা নামে দিব ফাঁসি ॥২০৯॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মা গো তারা ও শঙ্করী।
কোন্ অবিচারে আমার উপর, কল্লে দুঃখের ডিক্রীজারি ॥
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বল মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে ঐ ছটারে, গরল খাইয়ে প্রাণে মারি ॥
প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তি, তারে দিলি জমিদারী ॥
হুজুরে দরখাস্ত দিতে, কোথা পাব টাকা কড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে, বসে আছে রাজকুমারী ॥
হুজুরে উকীল যে জন, ডিস্‌মিস্ তাঁর আশয় ভারি।
করে আসল সন্ধি সওয়াল বন্দী, যে রূপেতে আমি হারি ॥
ছিল স্থানের মধ্যে অভয় চরণ, তাও নিয়াছে ত্রিপুরারি ॥ ২১০ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মা আর কি দেখ্‌ছ বসে।
যদি তারা থাকৃতে নিবে বাতি মা, শুনিলে বিপক্ষ হাসে ॥
তেল থাকৃতে নিবায় বাতি মা, ছটা গোবরে পোকা এসে।
এদের এক এক পোকার এক এক গুণ মা,
এক এক জনে লাগায় দিশে ॥
প্রসাদ বলে আলোয় আছি মা, আলো লয়ে যাব দেশে ॥
যখন মুঁদব তারা, দেখ্‌বে তারা অন্ধকার বিনাশে ॥২১১॥

[রাগিণী—লগ্নী, তাল—আড়খেমটা]

মা বসন পর।
বসন পর, বসন পর, মাগো বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা, পদে দিব আমি গো ॥
কালীঘাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো ॥
পাতালেতে ছিলে মাগো, হয়ে ভদ্রকালী।
কত দেবতা করেছে পূজা, দিয়ে নরবলি গো ॥
কার বাড়ী গিয়াছিলে, মাগো কে করেছে সেবা।
শিরে দেখি রক্ত চন্দন, পদে রক্ত জবা গো ॥
ডানি হস্তে বরাভয়, মাগো বাম হস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড, করেছ রাশি রাশি গো ॥
অসিতে রুধির ধারা, মাগো গলে মুণ্ডমালা।
হেট মুখে চেয়ে দেখ, পদতলে ভোলা গো ॥

মাথায় সোনার মুকুট, মাগো ঠেকেছে গগনে।
মা হয়ে বালকের পাশে, উলঙ্গ কেমনে গো ॥
আপনি পাগল, পতি পাগল, মাগো আরও পাগল আছে।
ওমা, রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল, চরণ পাবার আশে গো॥* ॥ ২১২ ॥

[রাগিণী—জংলা. তাল—একতালা]

মা তোমারে বারে বারে, জানাব আর দুঃখ কত।
ভাসিতেছি দুঃখনীরে, স্রোতের সেহলার মত ॥
আমার যে মা মূল বাঁধা নাই, কোথায় যেতে কোথায় দাঁড়াই।
ছয় দিকেতে ছয় রিপুর টান্, মাঝে পড়ে হলাম হত ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, মা বুঝি নিদয়া হলে।
দাঁড়াও একবার হৃদ্‌কমলে, দেখে যাই জনমের মত ॥ ২১৩ ॥

[রাগিণী—পিলুবাহার, তাল—জৎ]

মা বলে ডাকিস্ নারে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই।
থাকলে এসে দিত দেখা, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই ॥
গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশপুত্তল দাহন করে।
ওরে অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে, কালাশৌচে কাশী যাই ॥ ২১৪ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মা বিরাজে ঘরে ঘরে।
একথা ভাঙ্‌ব কি হাঁড়ি চাতরে ॥
ভৈরবী ভৈরব সঙ্গে, শিশু সঙ্গে কুমারী রে।
যেমন অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে, জানকী তার সমিভ্যারে।
জননী তনয়া জায়া, সহোদরা কি অপরে।
রামপ্রসাদ বলে বল্‌ব কি আর, বুঝে লওগে ঠারে ঠোরে ॥ ২১৫ ॥

[রাগিণী—গৌরীলঙ্কার, তাল—একতালা]

মা মা বলে আর ডাকবনা।
ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা ॥
ছিলাম গৃহবাসী করিলে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী।
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মাগি খাব,
মা বলে আর কোলে যাব না ॥
ডাকি বারেবারে মা মা বলিয়ে, মা কি রয়েছ চক্ষুকর্ণ খেয়ে,
মা বিগুমানে এদুঃখ সন্তানে, মা মলে কি আর ছেলে বাঁচেনা।
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের কি এ সূত্র, মা হয়ে হলি মা সন্তানের শত্রু,
দিবানিশি ভাবি আর কি করিবি, দিবি দিবি পুন জঠর যন্ত্রণা ॥ ২১৬ ॥

---

* এই গানটি আমরা শৈশবে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও কালীপূজা উপলক্ষে বিক্রমপুর অঞ্চলে বহুবার শুনিয়াছি।

[রাগিণী—জংলা, তাল—একতালা]

মায়ের এ পরম কৌতুকে।

মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, অবদ্ধ জনে লুটে সুখ ॥

আমি এই আমার এই, এভাব ভাবে মূর্খ সেই,

মনরে ওরে, মিছামিছি সার ভেবে, সাহসে বাঁধিছ বুক ॥

আমি কেবা আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা,

মনরে ওরে, কে করে কাহার সেবা, মিছে ভাব দুখ সুখ ॥

দীপ জেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে,

মনরে ওরে, তখনি নির্ব্বাণ করে, না রাখেরে একটুক্ ॥

প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ,

রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলে, দেখরে আপন মুখ ॥ ২১৭ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা

মায়ের এম্নি বিচার বটে।

যেজন দিবানিশি দুর্গা বলে, তারি কপালে বিপদ ঘটে ॥

হজুরেতে আরজি দিয়া মা, দাঁড়াইয়া আছি করপুটে।

কবে আদালত শুনানি হবে মা, নিস্তার পাব এ শঙ্কটে ॥

সওয়াল জবাব করব কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।

ওমা ভরসা কেবল শিব বাক্য, ঐক্য বেদাগমে রটে ॥

প্রসাদ বলে শমন ভয়ে মা, ইচ্ছে হয় পালাই ছুটে।

যেন অন্তিমকালে দুর্গা বলে, প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে ॥২১৮ ॥

[রাগিণী—মূলতান, তাল—একতালা]

মায়ের নামে লইতে অলস হইও না ;

(রসনায় যা হবার তাই হবে)

দুঃখ পেয়েছ (আমার মনরে), না আরো পাবে ॥

ঐহিকের সুখ হলো না বলে কি ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে ?

রেখো রেখো সে নাম সদা সযতনে,

নিওরে নিওরে নাম শয়নে স্বপনে।

সচেতনে থেক (মনরে আমার), কালী বলে ডেক,

এ দেহ ত্যজিবে যবে ॥২১৯॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মায়ের চরণ তলে স্থান লব।

আমি অসময়ে কোথা যাব ॥

ঘরে জায়গা না হয় যদি, বাহিরে রব ক্ষতি কি গো।

মায়ের নাম ভরসা করে, উপবাসী হয়ে পড়ে রব ॥

প্রসাদ বলে উমা আমায়, বিদায় দিলেও নাইক যাব।

আমার দুই বাহু প্রসারিয়ে, চরণতলে প্রাণ ত্যজিব ॥২২০॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মা হওয়া কি মুখের কথা।
(কেবল প্রসব করে হয়না মাতা)
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা ॥
দশমাস দশদিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা।
এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না, এল পুত্র গেল কোথা ॥
সন্তানে কুকর্ম্ম করে, বলে সারে পিতা মাতা।
দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড, তাতে তোমার হয় না ব্যথা ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, এ চরিত্র শিখলে কোথা।
যদি ধর আপন পিতৃধারা, নাম ধরো না জগন্মাতা ॥২২১॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী।
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি ॥
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা, ভুলেছ কি রাজমহিষী।
তারা কতদিনে কাটিবে আমার, এ দুরন্ত কালের ফাঁসি ॥
প্রসাদ বলে কি ফল হবে, হই যদি গো কাশীবাসী।
ঐ যে বিমাতাকে মাথায় ধরে, পিতা হলেন শ্মশানবাসী ॥২২২॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মোরে তরা বলে কেন না ডাকিলাম।
(আমার) এ তনু তরণী ভব সাগরে ডুবাইলাম ॥
ভবতরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম।
(তাতে) ত্যজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পূরাইলাম ॥
বিষম তরঙ্গ মাঝে চেয়ে না দেখিলাম।
মনডোরে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম ॥
প্রসাদ বলে মাগো আমি কি কার্য্য করিলাম।
(আমার) তুফানে ডুবিল তরী আপনি মজিলাম ॥২২৩॥

[রাগিণী—মল্লার, তাল—খয়রা]

মোহিনী আশা বাসা, ঘোর তমোনাশা বামা কে।
ঘোর ঘটা কান্তি ছটা, ব্রহ্ম কটা ঠেকেছে ॥
রূপসী শিরসি শশী, হয়োরসি এলোকেশী,
মুখ ঝালা সুধা ঢালা কুলবালা নাচিছে ॥
ক্রস্ত চলে আস্ত টলে, বাহুবলে দৈত্যদলে,
ডাকে শিবা কব কিবা দিবানিশি করেছে।
ক্ষীণ দীন ভাগ্যহীন, দুষ্ট চিত্ত সুকঠিন,
রামপ্রসাদে কালীরবাদে, কি প্রমাদে ঠেকেছে ॥২২৪॥

[রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—একতালা]

যদি ডুব্‌ল না ডুবায়ে বা ওরে মন মেয়ে।
মন হাল ছেড়না ভরসা বাঁধ, পারবি যেতে বেয়ে ॥
মন চক্ষু দাঁড়ি বিষম হাড়ি, মজায় মজে চেয়ে।
ভাল ফাঁদ পেতেছে শ্যামা, বাজিকরের মেয়ে ॥
মন, শ্রদ্ধা বায়ে ভক্তি বাদাম, দেওরে উড়াইয়ে।
রামপ্রসাদ বলে কালীনামের, যাওরে সারি গেয়ে ॥২২৫॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

যারে শমন যারে ফিরি।
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি ॥
পাপপুণ্যের বিচারকারী, তোর যম হয় কালেক্টরি।
আমার পুণ্যের দফা সর্ব্বে শূন্য, পাপ নিয়ে যা নিলাম করি ॥
শমন দমন শ্রীনাথ চরণ সর্ব্বদাই হৃদে ধরি।
আমার কিসের শঙ্কা মেরে ডঙ্কা, চলে যাব কৈলাসপুরী ॥
রামপ্রসাদের মা শঙ্করী, দেখ না চেয়ে ভয়ঙ্করী।
আমার পিতা বটেন শূলপাণি, ব্রহ্মা বিষ্ণু দ্বারের দ্বারী ॥২২৬॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

যাও গো জননী, জানি তোরে।
তারে দাও দ্বিগুণ সাজা মা, যে তোর খোসামদি করে ॥
মা মা বলে পাছু পাছু, যেজন স্তুতি ভক্তি করে।
দুঃখে শোকে দগ্ধে তারে, দাখিল করিস্ যমের ঘরে ॥
অল্পে কারে পাওয়া যায়, ক্ষীণ আলে বারি ধায়,
যেজন হয় শক্ত, তার ত্রিকাল মুক্ত, জোর জবরে ॥
চোকে আঙ্গুল না দিলে পর, দেখ্‌বি না মা বিচার করে।
ওমা হরের আরাধ্য পদ, ভয়ে দিলি মহিষাসুরে ॥
যে দুকথা শোনাতে পারে, সে জনা হেতের ধরে।
তার হয়ে আশ্রিত সদা, থাকিস্ মা পরাণের ডরে ॥
রামপ্রসাদ কৃতার্থ হবে, কৃপাকণা জোরে।
সাধরে শ্যামার পদ এ নব ইন্দ্রিয় হরে ॥২২৭॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

রইলি না মন আমার বশে।
ত্যজে কমলদলের অমল মধু, মত্ত হলি বিষয় রসে ॥
শক্তি-কুলকুণ্ডলিনী, তারেও ত মন জাগালি নে।
হেবে গুড়ের কলস হলি অলস, এমন অবশ হলি কিসে ॥
এ দেহ পাঁচ ফুলের সাজি, তুই হলিনে কাজের কাজী।
প্রসাদ বলে রত্ন ত্যজি, ঘুরে মর কর্ম্ম দোষে ॥২২৮॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

রসনায় কালী কালী বলে।
আমি ডঙ্কা মেরে যাব চলে।
সুরা পান করিনে রে সুধা খাই রে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ, মদ মাতালে মাতাল বলে॥
খালি মদ খেলেই কি হয়, লোকে কেবল মাতাল বলে।
যা আছে কর্ম্ম, কে জানে মর্ম্ম, জানে কেবল সেই পাগলে॥
দেখা দেখি সাধয়ে যোগ, সিজে কায়া বাড়য়ে রোগ।
ওরে মিছে মিছি কর্ম্মভোগ, গুরু বিনে প্রসাদ বলে॥২২৯॥

[রাগিণী—জংলা, তাল—একতালা]

রসনে কালী নাম রটরে।
মৃত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জঠরে॥
কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে।
এ কেবল বাদার্থ মাত্র, খুঁজতেছে ঘট পটরে॥
রসনারে কর বশ, শ্যামানামামৃত রস।
তুমি গান কর পান কর, সে পাত্রের পাত্র বটরে॥
সুধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্যধাম।
করে জপনা কালীর নাম, কি তব উৎকটরে॥
শ্রুতি রাখ সত্ত্ব গুণে, দ্বি-অক্ষরে কর মনে।
প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া, কালী বলে কাল কাটরে॥২৩০॥

[রাগিণী—ললিত, তিওট]

শঙ্কর পদতলে, মগনা রিপুদলে, বিগলিত কুন্তলজাল।
বিমল বিধুবর, শ্রীমুখ সুন্দর, তনুরুচি বিজিত তরুণ তমাল॥
যোগিনী সকল, ভৈরবী সমরে, করে করে ধরে তাল।
ক্রুদ্ধা মানস, ঊর্দ্ধে শোণিত, পিবতি নয়ন বিশাল॥
নিগম সারিগম, গণ, গণ, গণ, মবরব যন্ত্রমণ্ডল জাল।
তা তা থেই থেই দ্রিমৃকি দ্রিম্‌কি, ধা ধা ডম্ফ বাদ্য রসাল॥
প্রসাদ কলয়তি, হে শ্যামা সুন্দরি, রক্ষ মম পরকাল।
দীনহীন প্রতি, কুরু কৃপা লেশ, বারয় কাল করাল॥২৩১॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

শমন আশার পথ ঘুচেছে।
আমার মনের সন্ধ দূরে গেছে॥
ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে, চারি শিব চৌকি রয়েছে।
এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে, তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে॥
সহস্রদলকমলে শ্রীনাথ অভয় দিয়ে বসে আছে।

দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা, চৌকীদারা তার রয়েছে ॥
সে শক্তির জোরে চেতন করে, তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে।
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে কণ্ঠমূলে ভুরু মাঝে ॥
এ চারি স্থানে চারি শিব, নবদ্বারে চৌকী আছে ॥
রামপ্রসাদ বলে এই ঘরে, চন্দ্রসূর্য্যের উদয় আছে।
ওরে তমো নাশ করি তারা, হৃদ্‌-মন্দিরে বিরাজিছে ॥২৩২॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

শমন হে আছি দাঁড়ায়ে।
আমি কালী নামের গণ্ডী দিয়ে ॥
কালোপরে কালীপদ, সে পদ হৃদে ভাবিয়ে।
মায়ের অভয় চরণ যে করে স্মরণ, কি করে তার মরণ ভয়ে ॥২৩৩॥
(এ গানের শেষ অংশ পাওয়া যায় নাই।)

[রাগিণী—বিভাস, তাল—ঢিমা তেতালা]

শ্যামা বামা কে বিরাজে ভবে।
বিপরীত ক্রীড়া ব্রীড়াগতা শবে ॥
গদ গদ রসে ভাসে, বদন ঢুলায়ে হাসে,
অতনু সতনু জনু অনুভবে।
রবিসুতা মন্দাকিনী, মধ্যে সরস্বতী মানি,
ত্রিবেণী সঙ্গমে মহাপুণ্য লভে ॥
তরুণ শশাঙ্ক মিলে, ইন্দীবর চাঁদ গিলে,
অনলে অনল মিলে, অনল নিভে।
কলয়তি প্রসাদ কবি, ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী ছবি,
নিরখিলে পাপ তাপ কোথায় রবে ॥২৩৪॥

[রাগিণী—ঝিঁঝিট, তাল—আড়া]

শ্যামা বামা কে ?
তনু দলিতাঞ্জন, শরদ-সুধাকর-মণ্ডল-বদনী রে ॥
কুন্তল বিগলিত, শোণিত শোভিত,
তড়িত জড়িত নব ঘন ঝলকে ॥
বিপরীত একি কাজ, লাজ ছেড়েছে দূরে,
ঐ রথরথী গজবাজী বয়ানে পূরে।
মম দল প্রবল, সকল হত বল, চঞ্চল বিকল হৃদয় চমকে ॥
প্রচণ্ড প্রতাপরাশি মৃত্যুরূপিণী,
ঐ কামরিপু পদে, এ কেমন কামিনী।
লঙ্ঘে গগন ধরণীধর সাগর, ঐ যুবতী চকিতে নয়ন পলকে ॥

ভীম ভবার্ণব তারণ হেতু, ঐ যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু।
কলয়তি কবি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন,
কুরু কৃপা লেশ জননী কালীকে ॥২৩৫॥

[রাগিণী—বেহাগ, তাল—তিওট]

শ্যামা বামা গুণধামা কামান্তক উরসি।
বিহরে বামা স্মরহরে ॥
সুরী কি অসুরী, কি নাগী কি পন্নগী, কি মানুষী ॥
নাসে মুকুতাফল বিলোর, পূর্ণচন্দ্র কোলে চকোর,
সতত দোলত থোর থোর, মন্দ মন্দ হাসি।
একি করে! করে করী ধরে রণে পশি,
তনুক্ষীণা সুনবীণা বস্ত্রহীনা ষোড়শী ॥
নীলকমল দল জিতাস্য, তড়িত জড়িত মধুর হাস্য,
লজ্জিতা কুচকলি অপ্রকাশ্য, ভালে শিশু শশী।
কত ছলা কত কলা, এ প্রবল চিত্তে বাসি,
রামা নব্যা ভব্যা অব্যাহতগামিনী রূপসী ॥
দিতিসুতচয়, সমর প্রচণ্ড, সলিলে প্রবেশি।
এটা কেটা চিত্তে যেটা, হরে সেটা দুঃখরাশি ॥
মম সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব করে একি সর্ব্বনাশী ॥
কলয়তি রামপ্রসাদ দাস, ঘোর তিমিরপুঞ্জ নাশ,
হৃদয়কমলে সতত বাস, শ্যামা দীর্ঘকেশী।
ইহকালে পরকালে, জয়ীকালে, তুচ্ছবাসি,
কথা নিতান্ত, কৃতান্ত শান্ত, শ্রীকান্ত প্রবেশি ॥২৩৬॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি।
(ভবসংসার বাজারের মাঝে)
ঐ যে, মন ঘুড়ি, আশা বায়ু, বাঁধা তাহে মায়া-দড়ি ॥
কাক গণ্ডী মণ্ডি গাঁথা, তাতে পঞ্জরাদি নাড়ি।
ঘুঁড়ি স্বগুণে নির্ম্মাণ করা, কারিগরি বাড়াবাড়ি ॥
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা, কর্কশা হয়েছে দড়ি।
ঘুড়ি লক্ষে ছুটা একটা কাটে, হেসে দেও মা হাতচাপড়ি ॥
প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুঁড়ি যাবে উড়ি।
ভব সংসার সমুদ্র পারে, পড়বে যেয়ে তাড়াতাড়ি ॥২৩৭॥

[রাগিণী—মল্লার, তাল—খয়রা]

সদাশিব শবে আরোহিনী কামিনী।
শোভিত, শোণিতধারা মেঘে সৌদামিনী ॥

একি দেখি অসম্ভব, আসন করেছে শব,
মূর্তিমতী মনোভব, ভবভামিনী।
রবি শশী বহ্নি আঁখি, ভালে শশী শশিমুখী,
পদনখে শশীরাশি গজগামিনী।
শ্রীকবিরঞ্জন ভণে, কাদম্বিনী রূপ মনে,
ভাবয়ে ভকতজনে, দিবস রজনী ॥২৩৮॥

[রাগিণী—টোরি জায়নপুরী, তাল—একতালা]

সময় তো থাকবে না গো মা, কেবল কথা রবে।
কথা রবে, কথা রবে, মাগো জগতে কলঙ্ক রবে ॥
ভাল কিবা মন্দ কালী, অবশ্য এক দাঁড়া হবে।
সাগরে যার বিছানা মা, শিশিরে তার কি করিবে ॥
দুঃখে দুঃখে জর জর, আর কত মা দুঃখ দিবে।
কেবল ঐ দুর্গানাম, শ্যামা নামে কলঙ্ক রটিবে ॥২৩৯॥

[রাগিণী—ঝিঁঝিট, তাল—আড়া]

সমর করে ও কে রমণী।
কুলবালা ত্রিভুবনমোহিনী ॥
ললাট নয়ন বৈশ্বানর, বাম বিধু, বামেতর তরণি।
মরকত মুকুর বিমল মুখমণ্ডল, নূতন জলধর বরণী ॥
শব শিব শিরে হৃদয় মন্দাকিনী, রাজত, ঢল ঢল উজ্জ্বল ধরণী।
তদুপরি যুগপদ, রাজিত কোকনদ,
সুচারু নখর নিকর, সুধা ধামিনী ॥
কলরতি কবিরঞ্জন করুণাময়ী, করুণাংকুরু হর-মোহিনী।
গিরিবর কন্যে, নিখিল শরণ্যে, মমজীবন ধন জননী ॥২৪০॥

[রাগিণী—ছায়ানাট, তাল—খয়রা]

সমরে কেরে কালকামিনী?
কাদম্বিনী বিড়ম্বিনী, অপরা (অপরী) কুসুমাপরাজিতা বরণী, কে রণে রমণী।
সুধাংশু-সুধা কি শ্রমজ বিন্দু, শ্রীমুখ না একি শারদ ইন্দু,
কমল বন্ধু, বহ্নি, সিন্ধুতনয় এ তিন নয়নী ॥
আ মরি আ মরি মন্দ মন্দ হাস, লোক প্রকাশ, আশুতোষবাসিনী।
ফণী ফণাভরণ জিনি, গণি দন্ত কুন্দশ্রেণী ॥
কেশাগ্র ধরণীপরে বিরাজ, অপরূপ শব-শ্রবণে সাজ।
না করে লাজ, কেমন কাজ, মম সমাজে তরুণী ॥
আ মরি আ মরি চণ্ডমুণ্ডমাল, করে কপাল একি বিশাল,
ভাল ভাল কালদণ্ডধারিণী।
ক্ষীণ কটীপর, নৃকর নিকর, আবৃত কত কিঙ্কিণী ॥

সর্ব্বাঙ্গে শোভিত শোণিত স্রুতে, কিংশুক ইব ঋতু বসন্তে।
চরণোপান্তে, অনন্তুরন্তে, রাখ কৃতান্ত দলনী॥
আ মরি আ মরি সঙ্গিনী সকল, ভাবে চল চল,
হাসে খল খল টল টল ধরণী।
ভয়ঙ্কর কিবা, ডাকিতেছে শিবা, শিব উরে শিবা আপনি॥
প্রলয়কারিণী কয়ে প্রমাদ, পরিহর ভূপ বৃথা বিবাদ (বিষাদ)।
কহিছে প্রসাদ, দেহ মা প্রসাদ, বিষাদ নাশিনী॥২৪১॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

সাধের ঘুমের ঘুম ভাঙ্গে না।
ভাল পেয়েছ ভবে কাল-বিছানা॥
এই যে সুখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না।
তোমার কোলেতে কামনা-কান্তা, তারে ছেড়ে পাশ কৈর না॥
আশার চাদর দিয়াছ গায়ে, মুখ ঢেকে তাই মুখ খোল না।
আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, রজক ঘরে তায় কাচ না।
[পাঠান্তর—জ্ঞান রজক দিয়ে তা কাচ না]
খেয়েছ বিষয়-মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচে না।
আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে, ভ্রমেও কালী বল না॥
অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই, ঘুমিয়ে আশা পূরে না।
তোর ঘুমে মহা ঘুম আসিবে, ডাকলে আর চেতন পাবে না॥ ২৪২॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

সামাল্ সামাল্ ডুব্‌ল তরী।
আমার মনরে ভোলা গেল বেলা, ভজলে না হরসুন্দরী॥
প্রবঞ্চনার বিকিকিনি করে ভরা কৈলে ভারি।
সারাদিন কাটালে ঘাটে বসে, সন্ধ্যাবেলা ধরলে পাড়ী॥
একে তোর জীর্ণ তরী, কলুষেতে হল ভারি।
যদি পার হবি মন ভবার্ণবে, মায়েরে (শ্রীনাথেরে) কর কাণ্ডারী॥
তরঙ্গ দেখিয়ে ভারি, পলাইল ছয়টা দাঁড়ী।
এখন গুরু ব্রহ্ম সার কর মন, প্রসাদ মায়ের আজ্ঞাকারী॥২৪৩॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

সামাল ভবে ডুবে তরী।
তরী ডুবে যায় জনমের মত॥
জীর্ণ তরী তুফান ভারি, বাইতে নারী ভয়ে মরি।
ঐ যে দেহের মধ্যে ছয়টা রিপু, এবার এরাই কচ্ছে দাগাদারী॥
এনেছিলি বসে খেলি, মন মহাজনের মূল খোয়ালি।
যখন হিসাব (করে) দিতে হবে (মন।) তখন তহবিল হবে হারি॥

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে অল্প নীরে বুঝি ডুবায় তরী।
তুমি পরের ঘরের হিসাব কর, আপন ঘরে যায়রে চুরি ॥২৪৪॥

[রাগিণী—জংলা, তাল—একতালা]

সে কি এমনি মেয়ের মেয়ে।
যাঁর নাম জপিয়া মহেশ বাঁচেন হলাহল খেয়ে ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে, কটাক্ষে হেরিয়ে।
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে, উদরে পুরিয়ে ॥
যে চরণে শরণ লয়ে, দেবতা বাঁচে দায়ে।
দেবের দেব মহাদেব, যাঁহার চরণে লুটায়ে ॥
প্রসাদ বলে রণে চলে, রণময়ী হয়ে।
শুম্ভ নিশুম্ভকে বধে, হুঙ্কার ছাড়িয়ে ॥ ২৪৫ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

সে কি শুধু শিবের সতী।
যারে কালের কাল করে প্রণতি ॥
ষটচক্রে চক্র করি, কমলে করে বসতি।
সে যে সর্ব্বদলের দলপতি, সহস্রদলে করে স্থিতি ॥
নেংটা বেশে শত্রু নাশে, মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি।
ওরে, বল দেখি মন সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে লাথি ॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলি জানি ডাকাতি।
ওরে, সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধমতি ॥ ২৪৬ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

হয়েছি (মা) জোর ফরিয়াদী।
(এবার বুঝে বিচার কর আমা)
ঐ যে মন করিছে জামিনদারী, নেচে উঠে ছটা বাদী ॥
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা, তারা ছটা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হইত, পুর হতে দূর করে দি।
বিমাতা মরেন শোকে, ছটায় যদি আমল না দি ॥
সুখে নিত্যানন্দ পুরে থাকি, পার হয়ে যাই ভবনদী (আশা নদী)।
হুজুরে তজবিজ কর মা, হাজির ফরিয়াদী বাদী।
এই স্বোপার্জ্জিত ভজনের ধন, সাধারণ নয় যে তা দি ॥
মাতা আদ্যা মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি।
ও মা, তোমায় পুত্রে সতীন সুতে, জোর করে কার কাছে কাঁদি ॥
প্রসাদ ভণে ভরসা মনে, বাপ তো নহেন মিথ্যাবাদী।
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি, আর কি এবার ফাঁদে পা দি ॥২৪৭॥

[রাগিণী—বাহার, তাল—ঢিমা তেতালা]

হুঙ্কারে সংগ্রামে ও কে বিরাজে বামা।
কামরিপু মোহিনী ও কে বিরাজে বামা ॥
তপন দহন শশী ত্রিনয়নী ও রূপসী, কুবলয়দল তনুশ্যামা ॥
বিবসনা এ তরুণী কেশ পড়িছে ধরণী, সমর নিপুণা গুণধামা।
কহিছে প্রসাদ সায়, তারিণী সম্মুখে যায়, যমজয়ী বাজাইয়া দামা ॥২৪৮॥

[রাগিণী—কালেংড়া, তাল—ঠুংরি]

হের কার রমণী নাচে রে ভয়ঙ্করা বেশে।
কেরে, নব-নীল-জলধর-কায় হায় হায়,
কেরে, হর-হৃদি-হ্রদ পরে দিগবাসে ॥
কেরে, নির্জ্জনে বসিয়া নির্ম্মাণ করিল,
পদ রক্তোৎপল জিনি, তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী।
হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় করে, বাঁধি প্রেমডোরে,
রাখি হৃদি সরোবরে হিল্লোলে ভাসে ॥
কেরে, নিন্দিত রামকদলী তরু, হেরি উরু, দর দর রুধির ক্ষরে,
যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে, অতি রোষবলে,
ভুজঙ্গম দলে, নাভি-পদ্মমূলে, ত্রিবলীর ছলে, দংশিল এসে ॥
কে রে উন্নত কুচকলি, মুখশতদলে অলি,
গুণ গুণ করিয়া বেড়ায়, যেন বিকসিত সিতাম্বুজ বনরোহায় (মৃণাল বন-জল)
কিবা ওষ্ঠ শোভা অতি, লোল জিহ্বা, হর মনোলোভা,
যেন আসব আবেশে, শিশু সুধা ভাসে ॥
কেরে কুন্তলজাল আবৃত মুখমণ্ডল, লম্বিত চুম্বি ধরায়,
তাহে ভুরু ধনুর্ব্বাণ সন্ধান করা, অর্দ্ধচন্দ্র ভালে, সিঁথি মূল (মুছ) দোলে,
কি চকোর খেলে, কিবা অরুণ কিরণে গজমতি হাসে।
কত ডুম্বা ডুম্বী, নাচিছে ভৈরবী,
হি হি হি হি করিছে যোগিনী, কত কটরা ভরিয়া সুধা যোগায় অমনি।
রামপ্রসাদ ভণে, কাজ নাই রণে, এ বামার সনে,
যাঁর পদতলে শবছলে আশুতোষ ॥২৪৯॥

[রাগিণী—গাড়া ভৈরবী, তাল—আড়া]

হৃৎ কমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মন পবনে দোলাইছে দিবস রজনী ও মা ॥
ইড়া পিঙ্গল নামা, সুষুম্না মনোরমা।
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা, ব্রহ্মসনাতনী ও মা ॥

আবির রুধির তায়, কি শোভা হয়েছে গায়।
কাম আদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ও মা॥
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল।
রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোলমারা বাণী ও মা॥২৫০॥

শিব সঙ্গীত

[মিশ্র কাহাড়বা]

হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া,
শিঙ্গা করিছে ভোঁ। ভোঁ। ভোঁ। বমম্ বমম্,
বব বম্ বব বম্ গাল বাজিয়া॥
মগন হইয়া প্রমথনাথ, ঘটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটি কোটি কোটি দানব সাথ শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া।
কটীতটে কিবা বাঘের ছাল, গলায় দোলিছে হাড়ের মাল,
নাগ যজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরব মানিয়া॥
শশধর কলা ভালে শোভে, নয়ন চকোর অমিয় লোভে,
স্থির গতি অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাবিয়া।
আধ চাঁদ কিবা করে চিকি মিকি,
নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি,
প্রজ্জ্বলিত হয় থাকি থাকি থাকি, দেখে রিপু যায় ভাগিয়া॥
বিভূতি ভূষণ মোহন বেশ, তরুণ অরুণ অধর দেশ।
শব আভরণ গলায় শেষ, দেবের দেব যোগিয়া॥
বৃষভ চলিছে থিমিকি থিমিকি, বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি।
ধন্নত তান্স ত্রিম্‌কি ত্রিম্‌কি, হরি গুণে হর নাচিয়া॥
বদন ইন্দু ঢল ঢল ঢলা, শিরে দ্রবময়ী করে টলা টল।
লহরি উঠিছে কল কল কল, জটাজুট মাঝে থাকিয়া॥
প্রসাদ কহিছে এ ভব ঘোর, শিয়রে শমন করিছে জোর।
কাটিতে পারিনু করম ডোর, নিজ গুণে লহ ভাবিয়া॥২৫১॥

অতিরিক্ত পদাবলী

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

এবার ভেবে হলেম সারা।
হল পাঁচ পাগলে বসত করা॥
মাতা ক্ষেপী পিতা ক্ষেপা, চেলা ভূটো ক্ষেপা তারা।
মা তোর অভয়পদ চিন্তা করে, আমি হলেম পাগল পারা॥
তেমন ক্ষেপা কে দেখেছে, হৃদিপদ্মে পদধরা।
ঐ যে ত্যজ্য করে সোনার কাশী শ্মশানে বসতি করা॥
ঘরের কথা বলবো কারে, যেমন হাঁড়ি তেম্নি শরা।
ওরে এমন মেয়ে আর কে আছে, মুণ্ডমালা গলায় পরা॥
প্রসাদ বলে দেখে শুনে, আমি হলেম দিশেহারা।
মা তুই যা করিস্ তা করিস মেনে, শমন ভয়টি ক্ষান্ত করা॥ ২৫২ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

বাঁচিতে সাধ আর নাই মা তারা।
আমি 'তারা তারা তারা' বলে ধনে প্রাণে হলেম সারা॥
জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী ত্রিজগদুদরে ধরা।
ওমা আমি কি তোর ধর্ম্মছেলে, আকাশ ফোঁড়া মোফৎ খোরা॥
যদি বল দোষী পুত্র, দোষাদোষের তুমি সূত্র।
আমি উপলক্ষ মাত্র, মায়াপাশে আছি ঘেরা॥
নামে কালের ভয় থাকে না, শিবের বচন আছে ধরা।
এখন কালগুণে সে কালের কথা, ভুলে হলি ভয়ঙ্করা॥
প্রসাদ বলে তোমার লীলা (মা), সাধ্য কি যে বুঝ্‌তে পারা।
ঐ যে রাখা মারা স্বভাব তোমার, কেবল আমায় কল্লে জীয়ন্তে মরা ২৫৩।

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

শমনজয়ী হুকুম পেয়েছি।
শ্যামা মায়ের হুজুর থেকে, (আমি)॥
মা দিয়েছেন ব্রহ্ম অস্ত্র, হৃদয় তূণে রেখেছি।
আমি করে যতন পুরশ্চরণ, তীক্ষ্ণ খর শান করেছি॥
ঘরভেদী যে ছ'জন ছিল, তাদের পরাজয় করেছি।
এবার যমকে মেরে যাব চলে, সেইটা মনে সার ভেবেছি॥
রাম করেছেন লঙ্কা জয়, নীলকমলে চরণ পূজি।
আমি শতদল দিয়ে সে পদে, ডঙ্কা মেরে বসে আছি॥
প্রসাদ বলে সাধ করে কি, সে অভয় পদে ডুবেছি।
যাতে মরণ হয়না শরণ নিলে, তাই সে পদে প্রাণ সঁপেছি॥ ২৫৪ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

আছে তোমার মা মনে কত।
কেবল সার হল ভ্রমণ পথ ॥
হয়ে তারিণী-তনয় গেল মা আলয়, হব গিয়ে কার অনুগত ॥
ছিল ভগ্ন ঘরখানি মা, দেখিতে সে শোভান্বিত।
ওমা ভূতের বাসা হল সেটা, দশদিশি সশঙ্কিত ॥
পাপ-লোনা লাগি দেওয়াল করিলেক জরাযুক্ত।
আমার চালের বাঁধন কেয়ে কেটে ছ'টা রুয়ে অবিরত ॥
প্রসাদ বলে ওমা তারা, বল কিসে হবে হিত।
আমায় ঘর বেঁধে ঘর করতে হ'লে, একাল আখেরের মত ॥ ২৫৫ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

কও শমন কি মনে করে।
নাহি লাজ এলে সাজ করে ॥
আমি সে দয়া করেছি রফা কালী নামে কবজ পুরে ॥
আসা করে এলে যদি, খালি মুখে যাবে ফিরে।
আছে ষড়্‌রিপু করে কাবু, নে যা বাপু দেই গো ধরে ॥
জারিজুরি কর কিরে, ঘর নাই তোর অধিকারে।
আমি কালি নামে চৌহদ্দি পাটা, লয়েছি খারিজ করে ॥
প্রসাদ বলে যাও না চলে, ভয় নাহি তোর অন্তরে।
সে যে মা মোর কালী মুণ্ডমালী, আজি বলি লবেন তোরে ॥ ২৫৬ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

শমন কি ভয় দেখাও আসি।
আমি যাব কাশীনাথের কাশী ॥
শেষে 'বম্ বম বম শিব' মুখে বলে হব সন্ন্যাসী।
বারাণসী থাকবো বসি, দূরে যাবে পাপরাশি।
আমি কালী বলে কাটিব কাল, কাল বেড়ায় কি আমায় শাসি ॥
মহাকাল সে রাজ্যের রাজা, পঞ্চাননের পঞ্চক্রোশী।
নাহি কালের ভয় তথা আছে, মা মোর কালী কাল বিনাশী ॥
হালিসহর পরগণায় বসত, কুমারহট্ট গ্রামবাসী ।*
সে যে রামপ্রসাদ কিঙ্কর, ভদ্রকালী পদ অভিলাষী ॥ ২৫৭ ॥

*এই অপ্রকাশিত পদাবলীটি ভিন্ন অন্য কোন গানে প্রসাদের গ্রামের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই হিসাবে এই ভণিতাযুক্ত পদ যে সাহিত্যিকগণের নিকট অতি মূল্যবান ইহা সম্ভবতঃ কেহই অস্বীকার করিবেন না।

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

জননী তাই ভাব্‌ছি বসি।

শমন দ্বারে দ্বারে করে আমায় দোঁষী ॥

আবাদ করি কেমন করে, বল দেখি মা মুক্তকেশী।

ওমা ছ'জন পেয়াদা করে কায়দা মসীল আছে দিবানিশি ॥

প্রসাদ বলে ধন্য ধন্য পুণ্যহীনের জন্য কাশী।

ঘুচাই দুরন্ত এ ভ্রান্ত জ্বালা, দে মা স্থান বারাণসী ॥ ২৫৮॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন কেন হও কর্ম্মদোষী।

এই অসার সংসারে আসি ॥

রিপু ছয় দুরাশয়, দুগ্ধ কলা দিয়া পুষি।

তুমি তাদের বশে যা কর, শেষে বিষে দগ্ধ ভস্মরাশি ॥

রবিসুত দূত, দণ্ড হাতে সে যে আছে শিয়রে বসি।

তারে সাধিলে না করে দয়া, বাঁধে গলায় রশা-রশি ॥

ধন-জন পরিবার, যাদের পেয়ে বড় খুসি।

তারা সময় কালে কেউ কারো নয়, একা যাই আর একা আসি ॥

প্রসাদ বলে ভাবতে গেলে, নিশির স্বপন কান্না হাসি।

যদি সকল দোষে মুক্ত হবে, ভাব শ্যামা এলোকেশী ॥ ২৫৯ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

আর হব না গঙ্গাবাসী।

গঙ্গার সতীন পো সম্বন্ধে আসি ॥

পিতার ভালে অগ্নি জ্বলে, শিরে গঙ্গা অহর্নিশি।

জননী সংসার পালেন, কোপ করে তাঁর বুকে বসি ॥

বিমাতার চরিত্র যেমন, কত আর বলিব প্রকাশি।

তার সাক্ষী দেখ কৈকেয়ী কল্লে রামকে জটাবাকলবাসী ॥

রামপ্রসাদ দাসে ভণে, এই মনে অভিলাষী।

এক স্থানে পাই তিনে যদি, যাই না তবে বারাণসী ॥ ২৬০ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

এ যে বড় বিষম লেটা।

যেটা কবুলতি সেই সত্য হল, মিথ্যে করে দিলি পাটা ॥

এক জনাকে জমি দিলি মা, ভাগ করিয়ে দিলি ছটা।

এবার ভবেতে ভূমিষ্ঠ হয়ে, আমায় সইতে হল খোঁটা ॥

জমী জরিপ করে দিলি মা, কোণে কোণে মেপে কাঠা।

এবার কিস্তির সময় বুঝবে শম্ভু, আমি কেমন কালীর বেটা ॥

প্রসাদ বলে ওমা তারা, এবার কেমন উল্টা লেঠা।

আমি কিস্তি মত খাজনা দিলেম, তবু টাকায় সিকি বাটা ॥ ২৬১ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

ঘর সামালো বিষম লেঠা।
ঘরের কর্ত্তা সে যে নয়কো আঁটা॥
যার ইচ্ছে সেই তা করে, আপনা আপনি দেখে ঘোঁটা।
এঘর নয় ঘোরে পড়ে, করলে আমায় লাটাপাটা॥
ঘরের গিন্নি পড়ে ঘুমায়, দিবারাত্রে নাইকো উঠা।
সে মাগী কি সাধে ঘুমায়, মিন্সের সঙ্গে আছে ঘোটা॥
প্রসাদ বলে না নড়ালে, সে ঘুমেতে জাগায় কেটা।
মাগী একবার জাগলে পরে, এসে সবাই হবে কাঁটা॥ ২৭২॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মা আমার অন্তরে ছিলে।
বুঝি দোষ দেখে অন্তরে গেলে॥
ও কথা কি বলবার কথা, কথা সই জননী বলে।
যদি দোষী তুমি নির্দ্দোষী তুমি তবে আমার কি দোষ পেলে॥
উমাতে হও উগ্রচণ্ডা, উচিত কথা কইতে গেলে।
আছে শিবের কথা যে কথা মা সে কথা কি শিকেয় থুলে॥
দুটি আঁখি ছল ছল, সভয়ে রামপ্রসাদ বলে।
আমায় যেমন রাখ তেমনি থাকি, তবে আমার কি দোষ পেলে॥ ২৭৩

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

তাই ডাকি শ্রীদুর্গা বলে।
আছে চরণ-তরী ভবের কূলে॥
তন্ত্রে তুমি স্বতঃসিদ্ধ মা, মন্ত্রে মন্ত্রী বিশ্বমূলে।
এবার ভবে এসে কর্ম্মদোষে রয়েছি মা স্থূলে ভুলে॥
ত্রিধারা যাঁর শিরে ধরা, সে পড়ে তোর পদতলে।
রামপ্রসাদ বলে অন্তিমকালে, দেখা দিও মা অন্তর্জলে॥ ২৭৪॥

[প্রসাদী সুর, তাল— একতালা]

মাগো রয়েছে বুড়া।
যে ও চরণে প্রাণ সঁপেছে সে সবাকার মাথার চূড়া॥
যেখানে আছে এ ভোগ, সেখানে নাহিক রোগ।
ওর ভজনে এই হয়, গাছের পাড়া তলার কুড়া॥
ওর ভজনে স্বেচ্ছাচারী, কেহ নয় মা ব্রহ্মচারী।
ওগো নানা তীর্থ পর্য্যটনে, শেষে করে মাথামুড়া॥
কৌতুকে প্রসাদ ভণে বাসনা আমার মনে।
আমায় লোকে বলুক রামপ্রসাদ, তোমার মুখে দেই গো হুড়া॥ ২৭৫॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

এবার আমার বিপদ ভারি।
আমার মন ঘুমাল মায়া ঘুমে, বল মা কিসে চেতন করি॥
নবদ্বার ঘর বেঁধেছিলাম মা, রেখেছিলাম ন'জন দ্বারী।
ও তার প্রধান দ্বারী রসনারে, কিছুতে বাগাতে নারি॥
লোকে বলে রামপ্রসাদ পাগল, ভাষা কবি আমি করি।
আমার এ যে ভাষা কি তামাসা, বলে না বুঝাতে পারি॥২৬৬॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

এই নিবেদন করি কালী।
কেন দুঃখের বোঝা আমায় দিলি॥
দিবানিশি মুদে আঁখি, 'কালী কালী' সদাই বলি।
ওমা তাইতে কি দীন দয়াময়ী, আমার প্রতি নিদয়া হলি॥
শুন বলি ও মা কালী, সাধ করে কি পাষাণ বলি।
ওমা আমায় ফাঁকি দিয়ে তারা, অভয় চরণ শিবকে দিলি॥
মা হয়ে মা ওমা তারা, ছেলের দশা এই করিলি।
এবার ভবে এনে রামপ্রসাদকে, জন্ম অন্ধ করে থুলি॥ ২৬৭ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

অবোধ মন তাই তোরে বলি।
তুই অজ্ঞান পতঙ্গ হয়ে জ্ঞান-প্রদীপটি নিবাইলি॥
ভেবেছ যে ভদ্র হবে, ভাই বন্ধু আছে বলি।
তাদের আত্মতা জীবনাবধি, কেউ ছোঁবে না মৃত্যু হলি॥
যদি বল এ পাপদেহ, মুক্ত হবে তীর্থে গেলি।
ঐ যে 'গঙ্গায়াং' জ্ঞানত মোক্ষ ব্যাস লিখিছেন হস্তে তুলি॥
প্রসাদ বলে তীর্থযাত্রী, মুক্তিযুক্তি হয় সকলি।
যদি দিনান্তে একান্ত মনে, একবার বল কালী কালী॥ ২৬৮ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

বল মন মলে কোথায় যাবি।
আমার মনের সঙ্গে মন মেলেনা তাইতে
আকাশ-পাতাল ভাবি॥
অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে মন,
কতইবার আসবি যাবি।
এবার আসা যাওয়ায় ক্লান্ত হয়ে,
কবে ভবে মরতে পাবি॥
পড়েশুনে বিদ্যারত্ন, ভিক্ষারত্ন উপজীবী।
তোমার জ্ঞানরত্নে যে অযত্ন, নিত্যরত্ন কিসে পাবি॥

কালীপদ সুধাহ্রদে, সুধাপানে শুদ্ধ হবি।
রামপ্রসাদ বলে মৃত্যুকালে, মুক্তিপদে মিশাইবি ॥ ২৬৯ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

একি লিখেছ কপাল জুড়ে।
ঐ যে দিনান্তে শ্রীদুর্গা নাম বলে মা রসনা জোড়ে ॥
ভার নয় বোঝা নয় মা, কেবল খাটের মাটি খুঁড়ে।
তাতে বিল্বপত্র দিতে শক্তি হয় না কেনে জটের মুড়ে ॥
প্রসাদ বলে ওমা তারা, হয়ে আছি আদি কুড়ো।
আমায় ছয়রিপু ছয় পেয়াদা হয়ে জপের মালা নিলে কেড়ে ॥ ২৭০

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

তাই কালোরূপ ভালোবাসি।
করে শমন দমন ধ'রে অসি ॥
দলবল আট রমণী, তারা সব একবয়েসী।
তার মাঝে মাঝে থাকেন যেমন, তারাগণ মধ্যে শশী ॥
পদতলে ত্রিপুরারি পড়ে আছেন দিবানিশি।
শ্যামা ব্রহ্মময়ী, রণজয়ী, উমামুখে মৃদু হাসি ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মা আদি, ধ্যানে না পায় যোগী ঋষি।
আমি মুদে আঁখি, হৃদে দেখি, মা মোর বামা এলোকেশী ॥ ২৭১ ॥

[প্রসাদী সুর তাল—একতালা]

আয় মন ব্যাপারে যাবি।
ক'রে সাধুসঙ্গে বেচাকেনা, মুনাফা দ্বিগুণ পাবি ॥
গুরুদত্ত যে ধন আছে, দেহতরী সাজিয়ে নিবি।
ওরে মূল মাস্তুলে বাদাম তুলে, দুর্গা বলে বেয়ে যাবি ॥
কামাদি তুফানে, হাল দমনে সতর্ক হবি।
ওরে জ্ঞান কিনারায় লাগিয়ে তরী ভক্তি ডোরে বেঁধে থুবি ॥
প্রসাদ বলে সাধু বাণিজ্যে, যে ধন ব্যাপারে পাবি।
সে ধন বিলাইলে ফুরাবে না, যখন চাবি তখন পাবি ॥ ২৭২ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

আমার মন যদি হও মনের মত।
থাক রামপ্রসাদের অনুগত ॥
কুগ্রাম বসতি ত্যজ, ত্যজ বন্ধু দারাসুত।
কালী কল্পতরু মূলে বাসা, কর এ জনমের মত ॥
কামাদি বিপক্ষ ছ'টা, তাদের কর বশীভূত।
মন জেনেছ তো সে যন্ত্রণা, জননী জঠরের যত ॥
তোমার রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিয়ে, পালাইবে রবিসুত।
তুমি পরমার্থ পাবে নিত্য, তাই তোমারে সাধি এত ॥ ২৭৩ ॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন্ত্র চাইরে মনের মত।

এমন আছে যোগী কত শত॥

বাঁধিয়ে মাথায় জটা, করে ফোঁটা ঋষির মত।

তারা বলে এক করে আর, আছে বট বৃক্ষ মত॥

পাষাণ পূজে হর যদি পায়, শুনরে অজ্ঞান যত।

তবে আমি দিবানিশি, বসি বসি, পাহাড় পূজি অবিরত॥

যদি বল নয়ন মুদে থাকলে পাব গুরুপদ।

তবে পায় না কেন আপন ধনে, অন্ধ আছে পড়ে কত॥

প্রসাদ বলে মাকে বলরে মন দিবে তোরে মনের মত।

তারে সাধিলে হইবে সিদ্ধি বাধ্য হবে রিপু যত॥ ২৭৪॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন কি যাবি জগন্নাথে।

খাবি আনন্দবাজারে ভাত ভক্তি রেখে আপন মাথে॥

জগন্নাথ আত্মারাম, হৃদি পদ্মে তাঁর ধাম।

পূর্ণ হবে মনস্কাম ভজলে তাঁরে অন্তরেতে॥

ঘরে আছে পরম রত্ন, ভ্রান্তিক্রমে কাচে যত্ন।

ওরে মিছে কেন ভ্রমণ করা, ভ্রান্তি সেত সাথে সাথে॥

গুরুবাক্য শিরে ধর, আত্মতত্ত্ব তত্ত্ব কর।

বিষ্ণুতত্ত্ব, রাখ নিয়ে পাতে পাতে॥

প্রসাদ বলে যাব কোথা, মাথা নেই তার মাথা ব্যথা।

ওরে এ যেন রাত কাণার কথা, উড়ে বেড়ায় বাতে বাতে॥ ২৭৫

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

বলগো মা উপায় কি করি।

আমি এবার বুঝি প্রাণে মরি॥

পতিত জমী দিয়ে আমায় মা, রাখ্‌লে আমায় পতিত করি।

জমি আবাদ কর্‌তে গেলে হয় মা, ভূতের সঙ্গে মারামারি॥

মহামন্ত্র বীজ করি মা যদি জমী আবাদ করি।

রিপু ছ'জন জুটে, খায় মা লুটে, হয় না তাহে চারাচুরি॥

মন আথেরী হলেগো মা, শমন করবে শমনজারি।

জমি নাইকো হাসিল, করলে তশিল, কিসে হবে মালগুজারি॥

দীন রামপ্রসাদ বলে মা এই নিবেদন তোমায় করি।

আমার মৃত্যুকালে চরণতলে স্থান দিও মা শঙ্করী॥ ২৭৬॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

যদি যাবি মন ভবনদী পারে।

একবার ডাক দেখি শ্যামামারে॥

যুগল চরণ তরি সহায় করি,
মনকে মাঝির স্বরূপ করে।
দাঁড়ি রিপু ছ'জন
করবে দমন,
নইলে ঘটবে বিপদ ঘোর পাথারে।
আগে যদি যুক্তি করে দেখ
শেষে সময় মিলবেনাক *
প্রসাদ বলে ঘোর তরঙ্গে ডুবাবে তোরে ঐ ছজনায় যুক্তি করে ॥২৭৭॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

তারা বলে হব সারা।
এবার দেখবো বাদী ছ'জন যারা ॥
হৃদ্‌কমলোপরে দোলে, শবশিবে আলো করা।
তারা নামের মর্ম্ম, পরম ব্রহ্ম, সুধারসে বদন ভরা ॥২৭৮॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

আমি হব না তীর্থবাসী।
মরব গলে দিয়ে তোর নামের ফাঁসি ॥
সবে করে গয়া কাশী, আমি করি পাপ রাশি রাশি।
সে যে এমন তীর্থ নাইকো যাতে, আমার পাপ করে নির্দ্দোষী ॥
পিতৃ পুরুষ উদ্ধারিতে, সবে করে গয়া কাশী।
করে সে পায়েতে পিণ্ডদান, পরে করে তার দিবসী ॥২৭৯॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতাল']

কাজ কি আমার মুক্তি পদে।
যদি ভক্তি থাকে দুর্গা নামে মাকে ডাকি মনের সাধে ॥
সালোক্য সাযুজ্য মুক্তি, নির্ব্বাণ আদেশ শিব উক্তি ॥
ভক্তি মুক্তি করতলে, আদ্যাশক্তি যার হৃদে ॥
কালী নামের পেলে অন্ত, কি করবে রে সে কৃতান্ত।
শ্যামার চরণ পাব অন্তে, তুচ্ছ করি ব্রহ্মপদে ॥

(শেষাংশ পাওয়া যায় নাই) ২৮০॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

মন আমার কি ভাবছো বল।
মুখে জয়দুর্গা শ্রীদুর্গা বল ॥

* * * *

এই ভবের চড়ায় ভঙ্গুর জাহাজ ডুবে বুঝি প্রায় গরভ হল ॥
চড়া কেটে যদি পাবে উপায় বলি শুন তবে।
ও মন মহামন্ত্র দমকলেতে গঙ্গাজলে সেচে ফেল ॥২৮১॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

কাজ কি থেকে কালের ফাঁসে।

শ্যামা মায়ের চরণ, ভাব ওরে মন,

হবে শমন দমন অনায়াসে॥

রেখে ভক্তি মায়ের পদে, তরে যাবি ঘোর বিপদে,

কেন মিছে মত্ত বিষয় মদে কিছুইত পাবিনে শেষে ॥১০২॥

[প্রসাদী সুর, তাল—একতালা]

শমন আমি কি তোর খাজানা ধারি।

শ্যামা ত্রিভুবনের কর্ত্রী, তুমি কেবল পাটোয়ারী॥

তুমি যেমন আমি তেমন, তোমায় আমায় ভায়াচারী।

শোন্‌রে শমন দুরাচার, করোনা আর জোর জবরী॥

দুর্গা নামের সাল্‌তা কবচ বৃথা কি আমি হৃদয়ে ধরি॥ ২৮৩॥

আগমনী

[রাগিণী—মালশ্রী]

আজ শুভনিশি পোহাল তোমার।

এই যে নন্দিনী আঁইল, বরণ করিয়া আন ঘরে।

মুখশশী দেখ আসি, দূরে যাবে দুঃখরাশি,

ও চাঁদ মুখের হাসি, সুধারাশি ক্ষরে॥

শুনিয়া এ শুভ বাণী, এলোচুলে ধায় রাণী, বসন না সম্বরে।

গদ গদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,

পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধরে॥

পুন কোলে বসাইয়া, চারু মুখ নিরখিয়া, চুম্বে অরুণ অধরে।

বলে জনক তোমার গিরি, পতি জনম ভিখারী,

তোমা হেন সুকুমারী, দিলাম দিগম্বরে॥

যত সহচরীগণ, হয়ে আনন্দিত মন, হেসে হেসে এরে ধরে করে।

কহে বৎসরেক ছিলে ভুলে, এত প্রেম কোথা খুলে,

কথা কহ মুখ তুলে, প্রাণ মরে মরে॥

কবি রামপ্রসাদ দাসে, মনে মনে কত হাসে,

ভাসে মহা আনন্দসাগরে।

জননীর আগমনে, উল্লাসিত জগজ্জনে,

দিবানিশি নাহি জানে, আনন্দে পাসরে॥

[রাগিণী—মালশী]

ওগো রাণি, নগরে কোলাহল, উঠ চল চল,
নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
চল, বরণ করিয়া, গৃহে আনি গিয়া, এসো না সঙ্গে আমার গো॥
জয়া, কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি, কি দিলি শুভ সমাচার।
তোমার, অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো॥
রাণী ভাসে প্রেম জলে, দ্রুতগতি চলে, খসিল কুন্তল তার।
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে, গৌরী কত দূরে আর গো॥
যেতে যেতে পথ, উপনীত রথ, নিরখি বদন উমার।
বলে মা এলে মা এলে, মা কি মা ভুলেছিলে,
মা বলে, একি কথা মার গো॥
রথ হতে নামিয়া শঙ্করী, মায়েরে প্রণাম করি,
সান্ত্বনা করে বার বার।
দাস শ্রীকবিরঞ্জনে, সকরুণে ভণে, এমন শুভ দিন আর কার গো॥

[রাগিণী—পিলুবাহার, তাল—খং]

গিরি এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কার কথা শুন্‌ব না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে কর্‌ব ঝগড়া, জামাই বলে মান্‌ব না॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না।

বিজয়া

[রাগিণী—ললিত]

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা দিবসে আঁধার॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশ মাতা ডাকে বারে বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এদেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ না হল বিদার॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না মানে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন নিরাশা সুধার॥

শ্রীশ্রীকালীকীর্ত্তন

[কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত শ্রীশ্রীকালীকীর্ত্তন সংগ্রহ-করিয়া প্রথম প্রকাশ করেন। সেই প্রথম প্রকাশের বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল।]

কালীকীর্ত্তন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ। প্রকাশিত প্রথম পুস্তকখানির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭।

ইহার আখ্যাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীশ্রীতারা। / ত্রিভুবন সারা। / কালীকীর্ত্তন গ্রন্থ। / লোকান্তর গত ৺রামপ্রসাদ সেনের কৃত। / শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যত্নানুসারে সংগ্রহণ পূর্ব্বক / সংশোধিত হইয়া কলিকাতায় মৃজাপুরে / শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তীর গুণাকর / যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। / এই গ্রন্থ গ্রহণে যাঁহার অভিলাষ হয় তিনি মোং / জোড়াসাঁক চাষাধোবা পাড়ায় / শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট অথবা বাগবাজার / নিবাসি শ্রী মহেশচন্দ্র ঘোষের বাটী / তে স্বয়ং কিম্বা লোক প্রেরণ / করিলে প্রাপ্ত হইতে / পারিবেন ইতি। / শকাব্দা ১৭৫৫ ইং ১৮৩৩ সাল।

'কালীকীর্ত্তন'ই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রকাশিত রামপ্রসাদের প্রথম গ্রন্থ। এই পুস্তকখানির ভূমিকা স্বরূপ গুপ্তকবি যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

ঈশ্বরস্য হৃদয়ে পদাম্বুজং সন্নিধায় শশিখণ্ডভালিকে
চণ্ডমুণ্ডমুখমুণ্ডখণ্ডনভ্রান্তিমন্তরয় দেবী কালিকে॥

অথ কালীকীর্ত্তনানুষ্ঠান

স্বস্তি কবিরঞ্জনাপরনাম রামপ্রসাদসেনকালীভক্তাবতারাবতারিত নবীন পদ্ধতী কালীকীর্ত্তনাভিধান ভক্তিরস-প্রধান মধুরগান পদাবলী পুস্তক অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বজনশ্রবণগোচর হয় নাই যদ্যপি গায়ক দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহার যৎকিঞ্চিদংশ কোন কোন মহাশয়ের কর্ণপথগত হইয়াও থাকে তথাপি সমুদয় শ্রবণ ব্যতিরেকে তাদৃশাপূর্ব্ব রসাস্বাদন হইবার সম্ভাবনা হয় না ইহাতে তত্তন্মহাশয়েরদের যৎকিঞ্চিদংশ শ্রবণোত্তর কালে তত্তাবদংশ শ্রবণ স্পৃহাতে মনের ব্যগ্রতা সর্ব্বদা থাকে।

অপরঞ্চ কালীকীর্ত্তনব্যবসায়ি গায়ক যে কয়েকজন দৃষ্ট হয় তাহারদের উচ্চারণানভিজ্ঞতা ও সামান্যতো অজ্ঞতা প্রযুক্ত গীতকর্ত্তার অভিপ্রেত রস ভাবার্থব্যতিক্রমজন্য রসভঙ্গ হওয়াতে শ্রবণকালে মনে সুখোদয় না হইয়া বরং খেদোদয় হয় এবং এই পরকীয় দোষে গ্রন্থকর্ত্তার দোষানুমান হওয়াতে তাঁহার এই মহাকীর্ত্তিসুধাকরে কলঙ্কোদয় সম্ভাবনা হইলেও হইতে পারে।

অতএব পূর্ব্বোক্ত নানা দোষ পরীহারার্থ এবং ঐ অপূর্ব্ব গীতগ্রন্থের

অবৈকল্যরূপে বহুকালস্থায়িত্বার্থ আমি আকরস্থান হইতে মূলপুস্তক আনয়নপূর্ব্বক সংশোধিত করিয়া কালীকীর্ত্তনপুস্তক মুদ্রিত করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহাতে সাধুসদাশয় মহাশয়েরা নয়নান্তপাত করিলে তাঁহারদের মনে কালীভক্তিকল্পলতাঙ্কুর বৃদ্ধি ও পরগুণগ্রাহিতা প্রকাশ হয় এবং গ্রন্থকর্ত্তার মহাকীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হয় এবং আমারও এতাবৎ পরিশ্রমের সুফলসিদ্ধি হয়।

সংশোধিতামপি ময়া বহুলপ্রয়াসৈর্গীতাবলীং পুনরিমাং প্রতিশোধয়ন্তু। সন্তঃ সুশান্তনয়নান্তনিরীক্ষণেন কৃত্বা কৃপামিহ ময়ীশ্বরচন্দ্রগুপ্তে॥

কালীকীর্ত্তন সংগ্রহকারের উক্তি

পয়ার। মত্ত হও বন্ধুগণ কালীপদ্মপায়। যে পদ ধরিয়া শিব শিবপদ পায়॥ কালহরা কালদারা কালিকার পদে। ভবভয় নাহি রয় সুখ পদে পদে॥ শ্যামানাম মোক্ষধাম বেদাগমে কয়। স্মরণ করিলে নামে ধামে টেনে লয়॥ এক চিত্ত করি তাঁরে ভজ এই ভবে। যদি মনে লয় তাহে লয় হবে তবে॥ ঘোর দুর্গে ডাক সদা দুর্গে দুর্গে রবে। দিনেশতনয়ক্লেশলেশ নাহি রবে॥ শিবাশিব তেজি সবে শবে ভাব শিবে। শিবাশিবপ্রদা শিবা শিব দেন শিবে॥ ভয় দিয়া মিথ্যা আশা মগ্ন হও ধ্যানে। তারাতত্ত্ব কর তত্ত্ব গুরুদত্ত জ্ঞানে॥ ভাবে ভাব ভাবি ভাব তাহা নহে দূর। ভাবি ভাবি ভাবি দুঃখ করিবেন দূর॥ ভাবির স্বভাব কভু অভাব না হয়। সে ভাব ভাবিলে শ্যামা চিত্তে নিত্য রয়॥ অতএব হও সবে ভাবি ভাবাধীন। তারা তারা মুদে ধ্যান কর দিন দিন॥ শক্তি শক্তি-মত্তে যেই ভজে ভক্তিপানে। তারে তারে তারিণী করুণা দৃষ্টি দানে॥

দেহ দেহশুদ্ধি হেতু মন যোগে যাগে। কালীকালি নাহি দিয়া হৃদে তাহা জাগে॥ কর করযত্নে বাঞ্ছা বিষয় না চাও। নিত্য নিত্য নৃত্যকালী হৃদয়ে নাচাও॥ মূলাধার স্থান তাঁর মহাকালনারী। মূলাধার জ্ঞান কর মহাকালনারী॥ স্থায় তাঁর ভাব নেয় নানা স্থায় পেতে। স্থায় যদি ত্যজ সবে তবে পার পেতে॥ তর্ক করে বৃথা তর্ক চরণে চরণে। তর্ক ত্যজ স্থান পাবে চরমে চরণে॥ দরশন তত্ত্ব নাহি পায় মিছা ভাবে। দরশন পাবে যদি ভাব ভক্তিভাবে॥ তন্ত্রমন্ত্রফাঁদে পড়ে না হইও ভোলা। তন্ত্র কে বুঝিবে তাঁর ভোলা ভেবে ভোলা॥ দেখ সেই মায়ার মায়ায় বশ সব। হররাণী হরে হরে করে সদা শব॥ ত্রিভুবন মায়ের মায়ের মূলাধার। কালীরূপ কর চিত্র চিত্ত করি সার॥ সাধকের কোমল কমল হৃদিপরে। শ্যামা থাকে থাকে থাকে সদানন্দ ভরে॥ যথা শত শত শতদল ফুটে জলে। তেমতি মা সর্ব্বঘটে সর্ব্বঘটে চলে॥ পেলে দুর্গাপদ তার তরি এই ভব। কিন্তু ভবপারে পারে পাঠাইতে ভব॥ ভব সিন্ধুপার হেতু সেতু কর হরে। ভব সিন্ধু সম দুঃখ নিমিষেতে হরে॥ কারে দিব উপদেশ দেশ ভাল নয়। দ্বেষে দ্বেষে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব পণ্ড হয়॥ নাহি জেনে অহং কার করে অহম্‌কার। জানে না যে জীবন জীবনবিম্বাকার॥ ভব পার হেতু সবে ভবে করে হেলা। না করে সে পদ

জ্যালা জ্যালা জ্যালা ॥ বালক বা লোক সব এই কলি কালে। দিন দিন জ্ঞানহান বদ্ধ পাপজালে ॥ লঘু সঙ্গে রঙ্গে সদা চালে মনোরথ। লোচন হীনের ন্যায় ভ্রমে ভ্রমে পথ ॥ সেই অন্ধ তার স্কন্ধে যেই অন্ধ চড়ে। উভয়ে ভ্রমিতে বর্ত্ম কূপ মধ্যে পড়ে ॥ নীচের নিকট সদা উপদেশ লওয়া। নাবিকেরে অর্থ দিয়া ডুবে পার হওয়া ॥ সাধু সহ বাসে হয় বিজ্ঞান লোচন। পরম পদার্থ তাহে হয় দরশন ॥ জ্ঞানচক্ষু হত হেতু ইহা নাহি মানে। দর্পণেতে যত সুখ অন্ধে কি তা জানে ॥ লোকের বারণমন না মানে বারণ। ললাটের ফেরে ফেরে না জানে কারণ ॥ অজ্ঞান মনুষ্য প্রতি বৃথা দিই দোষ। কপালে সকল করে কেন করি রোষ ॥ করে করে তম নষ্ট যেই সুধাকর। সে চাঁদে কলঙ্ক গাঁথা ব্যক্ত চরাচর ॥ শিবের প্রধানপুত্র সর্ব্বসিদ্ধিদাতা। বিঘ্নহর গণেশের কুঞ্জরের মাথা ॥ কর্ম্মভোগ নাহি খণ্ডে শাস্ত্র যুক্তি সার। দেবের দুর্গতি এই মনুষ্য কি ছার ॥ ভাল ভাল বিনে ভাল নাহি হয় তায়। অদৃষ্ট অদৃষ্ট লেখা খণ্ডান না যায় ॥ কিন্তু সিদ্ধ বাক্য এই পূজ হরদারা। কপালের কপাল তারিণী সর্ব্বসারা ॥ কালি দিয়া কালীনাম ললাটেতে রেখে। বিধি দত্ত বিধি যাহা রাখ তাহা ঢেকে ॥ গুপ্তমর্ম্ম এই সেই শ্রীনাথের উক্তি। ভাবিলে তাঁহাকে লোক তায় পায় মুক্তি ॥ একান্ত বাসনা তাঁর যাহে লোক তরে। তাইতো ঈশ্বরগুপ্ত মর্ম্ম ব্যক্ত করে ॥

ত্রিপদী

ভাব জীব তেজে মায়া মহেশমোহিনীমায়া মহাবিদ্যা মহেশ্বরীতারা। গত কালাগতকাল হৃদে ধর সহকাল কাল সর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্বকারা ॥ করহ নিগূঢ় ভক্তি তাহে পাবে মহাশক্তি যুক্তিযুক্ত ব্যক্ত এই ধরা। জানতো বচনসার করিলে উত্তমাচার সরোবরে মীন পড়ে ধরা ॥ কে জানে কালীর মর্ম্ম নখজ্যোতি পূর্ণব্রহ্ম ভাবে মত্ত সর্ব্ব সর্ব্বসহা। ভাবে যথা পুণ্যবানে তদ্রূপ মা কোলে টানে যেমন চুম্বকে টানে লোহা ॥ ত্রিগুণে ভুবনজয়ী বর্ণরূপা ব্রহ্মময়ী কুলকুণ্ডলিনী হংসবধূ। দুর্গানামামৃত পানে সবিশেষ গুণজ্ঞানে বদন কমলে ক্ষরে মধু ॥ কখনো পদ্মিনীবামা কখনো চিত্রিণীরামা ছলেতে পুরুষ ছলে নারী। নানা বেশে বেশ ধরে মায়া কত মায়া করে সার মর্ম্ম বুঝিতে না পারি ॥ ব্রহ্মারূপে পালে ক্ষিতি বাণীরূপে কণ্ঠে স্থিতি অন্নদা অম্বিকা কাশীমধ্যে। কমলে কমলা হন মাতা কত মতে রণ হরগৌরী হন মধ্যে মধ্যে ॥ দ্বৈত ভাব ত্যাজ্য কর জ্ঞানচক্ষু যত্নে ধর লহ লহ সার উপদেশ। জীবে দিতে মোক্ষধাম সেই ব্রহ্ম গুণধাম ধারণ করেন নানাবেশ ॥ যে জন যে ভাবে ভাবে তারে তুষ্ট সেই ভাবে না দেয় ভক্তের মনে কালি। সদাশিব আত্মারাম কভু সীতা কভু রাম বিধি বিষ্ণু যা রাধা সা কালী ॥ কৃষ্ণরূপে বাঁশী করে সদা রাধা নাম করে প্রেমানন্দে প্রফুল্ল গোকুল। কুঞ্জবনে নানা ছলে গোপীকার মন ছলে মনোরম্য স্থান সে গোকুল ॥ রাধারূপে ব্রজনারী সে ভাব বুঝিতে নারি কলঙ্কিনী বলে ঘরে পরে। লজ্জাভয় পরিহরি মুখে বলে হরি হরি

হরিপ্রেমভূষা অঙ্গে পরে ॥ কালীরূপে কাল পরে কটিপরে কর পরে গলে দোলে শবমুণ্ড সব। এলোকেশী সর্ব্বনাশী অট্টহাসি সর্ব্বনাশি অসী করে রণে করে শব ॥ শিবরূপে যোগবলে সদা বোম বোম বলে হাড়মালা গলে করে শিঙ্গে। গায় ধুলা যোগে ভোলা হয়ে ভোলা ভাব ভোলা শিঙ্গে ফুঁকে পাবে সবে শিঙ্গে ॥ ধনুর্দ্ধারি রামরূপে যুদ্ধ করে নানারূপে পাষাণ ভাষাণ সিন্ধুজলে। ছলেতে হইয়া সীতা জনকে বলিয়া পিতা নিজে নিজাজনা নিজ বলে ॥ হইয়া অদ্বৈতবাদী জগতের বস্তু আদি কালী রাজা পায় রাখ মন। এক ভিন্ন দুই নয় বিরূপ যে জন কয় ধরাতলে মূঢ় সেই জন ॥ উপাসনা ভেদমাত্র বারিপূর্ণ করি পাত্র রবিছায়া দেখ সেই জলে। হবে ব্রহ্ম নিরূপণ ত্রিভুবনে সর্ব্বক্ষণ প্রশংসা প্রদীপ তবে জলে ॥ অতএব বন্ধুবর্গ তেজিয়া কর্ম্মের বর্গ ব্রহ্ম উপসর্গ করি রহ। না কর অভক্তি দ্বেষ লয়ে সার উপদেশ ঈশ্বরের ভাব সদা লহ ॥

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তস্য।

এই পুস্তকের একখণ্ড রাজা রাধাকান্তদেবের লাইব্রেরীতে আছে।

পরবর্ত্তীকালে—১ পৌষ ১২৬০ সালের 'সংবাদপ্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র "কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেনের 'জীবন বৃত্তান্ত' এবং তাঁহার প্রণীত 'কালীকীর্ত্তন' ও কৃষ্ণকীর্ত্তনাভিধানভক্তিরসপ্রধান—মধুর গান এবং অবস্থাভেদের শান্তি, করুণা, হাস্য, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীর প্রভৃতি কতিপয় রস ঘটিত পদাবলী" প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইহা পুস্তাকাকারে প্রকাশ করিবার অভিলাষে তিনি ১৭ অক্টোবর ১৮৫৫ তারিখে 'সংবাদপ্রভাকরে' নিম্নধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন—

কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন।

উক্ত মহাত্মার "জীবন চরিত" এবং তাঁহার প্রণীত সঙ্গীতাদি নানা বিষয়ক কবিতা সকল আমরা অবিলম্বেই টীকা সহিত পুস্তকাকারে প্রকটন করিব, তাহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া পরে প্রকাশ করা যাইবেক।......এই বিষয় সংগ্রহ করণার্থ আমরা বিংশতি বৎসরাবধি গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছি,...। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই।

শ্রীশ্রীকালী কীর্ত্তনং

ভবজলধিনিমগ্ন-রুগ্ন-জনগণ-বিমোচন-করণ-কারণ ভুবন-
পালিকা কালিকার গোষ্ঠাদি লীলা বর্ণন।

অথ গুরু বন্দন।

বন্দে শ্রীগুরুদেবকি চরণং।
অন্ধপুট (পথ) খোলে ধন্ধ সব হরণং ॥
জ্ঞানাঞ্জন দেহি অন্ধ কি নয়নং।
বল্লভ নাম শুনায়ত কারণং ॥

কেবল করুণাময় গুরু ভবসিন্ধুতারণং।
তপন-তনয়-ভয়-বারণ-কারণং॥
সুচারু চরণদ্বয় হৃদে করি ধারণং।
প্রসাদ কহিছে হয় মরণের মরণং॥

অথ কালীকীর্ত্তনারম্ভ

মায়ের বাল্যলীলা

গৌরচন্দ্রা

গিরিবর আর আমি পারিনে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননি সরে॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা ধরে দে উহারে।
আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে॥
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়,
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে॥
উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী,
মুকুর লইয়া দিল করে॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত কোটী শশধরে॥
শ্রীরামপ্রসাদ কয়, কত পুণ্যপুঞ্জচয়,
জগৎ জননী যার ঘরে।
কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা
শোয়াইল পালঙ্ক উপরে॥
প্রভাত সময় জানি, হিমগিরি রাজরাণী,
উমার মন্দিরে উপনীত।
মঙ্গল আরতি করি, চেতনা জন্মায় রাণী
প্রেমভরে অঙ্গ পুলকিত॥

বারে বারে ডাকে রাণী, জননী জাগৃহি জাগৃহি জাগৃহি,
আগত ভানু রজনী চলি যায়।
পুলকিত কোকবধূ শোক নিবায়॥
উঠ উঠ প্রাণ গৌরী, এই নিকটে দাঁড়ায়ে গিরি (উঠগো)
উদয়িতি দিনকৃতি, নলিনী বিকশতি,
এবমুচিতমধুনা তব নহি নহি নহি॥
সূত মাগধ বন্দী, কৃতাঞ্জলি কথয়তি,
নিদ্রাং জহিহি জহিহি জহিহি॥
গাত্রোত্থানং কুরু করুণাময়ি।
সকরুণ দৃষ্টি ময়ি দেহি দেহি দেহি॥

ভজন

চলগো মন্দাকিনী জলে, শিবপূজা বিল্বদলে,
মাঈ শুনয়লো মাইকি ভাষ।
তখন গৌরীর কনক কমল মুখে মৃদু মৃদু হাস॥
মা ডাকিছে রে॥
কোকিল কলরুত, শীতল মারুত।
হতরুচি সম্প্রতি ভাতি শিখী।
নায়ক মলিন, বিলোকনে কুমুদিনী
কম্পিতবিগ্রহা মলিনমুখী॥
কলয়তি শ্রীকবিরঞ্জন, দীনদয়াময়ি দুর্গে,
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি।
ভীমভবার্ণবমম্বুধু তারয়, কৃপাবলোকনে,
মাম্পাহি মাম্পাহি মাম্পাহি॥

মায়ের বাল্যরূপ দর্শনে গিরিরাজ ও গিরিরাণী বিমোহিত হইতেছেন

তখন রত্নসিংহাসনে গৌরী, নিকটে মেনকা গিরি,
অনিমেষে শ্রীঅঙ্গ নেহারে।
রাণী বলে, পুণ্যতরুফল সেই, মন্দিরে প্রকাশ এই,
দুঁহে ভাসে আনন্দ সাগরে॥
প্রভাতে অঙ্গ নেহারই রাণী।
দলিত কদম্ব পুলকে তনু, সুললিত লোচন সজল,
হরল মুখে বাণী॥
ঘেরল অবল, সবহুঁ রমণী মুখমণ্ডল,
জয় জয় কিয়ে প্রতিবিম্ব অনুমানি।

কাঞ্চন তরুবরে চন্দ্র কি মাল, বিলম্বিত ঝলমল,
কো বিধি দেয়ল আনি ॥
হিমকর বদন, রদন মুকুতাবলি
করতল কিশলয়, কমল পাণি।
রাজিত তঁহি কনকমণিভূষণ,
দিনকর ধাম চরণতল খানি ॥
ভব কমলজ শুক নারদ মুনিবর জপই
ধ্যান অগোচর জানি ॥
দাস প্রসাদে বলে সেই ব্রহ্মময়ী,
জগজন মন বিকচকর তহিঁ ভনি ॥

পুষ্পচয়ন ও শিবপূজা

পূজে বাঞ্ছা বৃষকেতু, পুষ্পচয়ন হেতু,
উপনীত কুসুমকাননে গো—
(নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মাতা)।
নানা ফুল তুলি, চিত্তে কুতূহলী,
গমন কুঞ্জরগমনে ॥
করুণাময়ী সঙ্গে সহচরী, প্রেমানন্দে গৌরী,
স্নান মন্দাকিনীর জলে।
"হরিষ তোমার যে কপালে চাঁদের আলো,
সে কপালে বিভূতি কি সাজে ভাল।
অঙ্গে কৌশেয় বসন সাজে,
দেখ, আমার বুকে যেন শেল বাজে,"
অন্তরে পূজেন শঙ্কর করবী বিল্বদলে ॥

করুণাময়ী গৌরীর গালবাদ্য বন

গাল বাদ্য বন, সজললোচন,
প্রণাম যেমন বিধি।
অৰ্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, প্রসীদ শঙ্কর, দেব দিগম্বর,
কৃপাময় গুণনিধি ॥
করুণা কর দেবদেব শঙ্কর।
ও প্রভু করুণা কটাক্ষ কর দেব দেব শঙ্কর ॥
সেই ব্রহ্মময়ীর এত ক্লেশ।
শ্রম বিনা কে করে কটাক্ষ লেশ ॥

গৌরীর অনশন ব্রতে মেনকার স্নেহ প্রকাশ

ব্রত অনশন, স্বস্তিক আসন,
মানসে শঙ্কর ধ্যান।

দিনকয়করে, শ্রমবারি ঝরে,
মলিন সে চাঁদ বয়ান ॥
কবি রামপ্রসাদের বাণী, কান্দে মেনকা রাণী,
কি কর কি কর মা এটা।
এ নব বয়সে, কুমারী এদেশে,
এমন কঠোর করে কেটা।
গৌরীর আমার ননীর পুতলী তনু, উপরে প্রচণ্ড ভানু,
কিরণে উনয় নবনীত।
মরি মরি সুকুমারী, নবীন কিশোরী গৌরী,
বাছা কেন কর গো মা এমন অনীত ॥
স্বর্গ যদি মনে লয়, পিতা তব হিমালয়,
হিমালয় আলয় সবার।
কিম্বা বাঞ্ছ হৃদে ঈশ, তার লাগি এত ক্লেশ,
রতনে যতন করে কার ॥
কণ্ঠেতে রুদ্রাক্ষমালা, কার লাগি মা হয়েছ ভৈরবী বালা,
তুমি যারে চিন্ত রাত্রিদিবা, সেই নির্গুণের গুণ কিবা,
তার চিন্তায় পাপপুণ্য, সে কেবল মহাশূন্য,
যারে পূজ বিল্বদলে, শুনেছি গো মা সে তোমার পদতলে।
একাসনে অনাহার, আরাধনা কর কার,
এ কঠোর তপে কিবা ফল।
মরমে পরম ব্যথা, মা রাখ মায়ের কথা,
ছাড় এ কঠোর, গৃহে চল ॥
তনয় মৈনাক ছিল, সিন্ধুজলে সে ডুবিল,
সেই শোক যখন উঠে মনে।
প্রাণ আমার যেমন করে তা প্রাণ জানে ॥
সে শোক ভুলেছি বাছা তোর মুখ চেয়ে।
রামপ্রসাদ বলে, তিতে রাণী আঁখির জলে,
এ কি কর মায়ের মাথা খেয়ে ॥

মেনকা গৌরীকে গৃহে আসিতে কহিতেছেন

দয়াময়ি আইস আইস ঘরে।
তোমার ও চাঁদ বয়ান, নিরখিয়ে প্রাণ,
কেমন কেমন কেমন করে ॥
দুটি আঁখির পুতলি গো, আমার বাছা,
আমার হৃদয়ের সে প্রাণ।

প্রেমানন্দ সিন্ধু,   তার পূর্ণ ইন্দু,
মন গজেন্দ্র আলান ॥
এ-মন তোমাতে রয়েছে বান্ধা,
ত্রিভুবনসারা পরা গো ধন্যা।
কি পুণ্য করেছি,   উদরে ধরেছি,
ত্রিগুণধারিণী কন্যা ॥
যদি কন্যা ভাবে দয়া গো,   তবে বাছা,
এই কথা রাখ মার।
গিরিরাজার কুমারী,   ভৈরবীর বেশ ছাড়,
ব্রহ্মচারিণীর আচার ॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে গো,   ভাষে জননী,
মা কত কাচ গো কাচ।
তুমি মাতা মহেশ পিতা, পিতার প্রসবস্থলী মাতা,
মহেশ ঘরে আছ।

ভগবতীর গৃহে গমন

কোন্ জন বুঝে মায়া বিশ্বমোহিনীর।
জগদম্বা মন্দিরে চলিলেন কর ধরি জননীর ॥
নিরখি জননীর মুখ মৃদু মৃদু হাসে।
ধরণীধরেন্দ্র রাণী প্রেমানন্দে ভাসে ॥
তুরীয়া চৈতন্যরূপা বেদের অতীতা।
মা বিদ্যা অবিদ্যা রাণী ভাবে সে দুহিতা ॥
অঙ্গনে বৈঠল রাণী ব্রহ্মময়ী কোলে।
আনন্দে আনন্দময়ী হাসি হাসি দোলে ॥
নিরখি নিরখি বদন ইন্দু।   পুলকে উথলে প্রেমসিন্ধু ॥
ছল ছল ছল নয়ন।   লোলচন্দ্রবদনে চুম্বন ॥
মধুর মধুর বিনয় বাণী।   গদ গদ গদ কহত রাণী ॥
কোটি জনম পুণ্যজন্ম।   কোলে কমললোচনা ॥
দর দর দর ঝরত লোর, চর চর চর তনু বিভোর,
কবহুঁ কবহুঁ করত কোর, থোর থোর দোলনা।
রাণী বদন হেরি হেরি, হসিত বদন বেরি বেরি,
চোরি চোরি থোরি থোরি, মন্দ মন্দ বোলনা ॥
ঝুনুর ঝুনুর ঘুঙুর নাদ,   কিঙ্কিণী রব উভয় বাদ,
পদতল স্থলকমলনিন্দি,   নখ হিমকর-গঞ্জনা।
কলিত ললিত মুকুতাহার,   মেরুবিকচহিমকরাকার
বিবুধ তটিনী বিষদনীর,   ছলে তনুরঞ্জনা ॥

কষিত কনক বিমল কান্তি, মনহি তাপ করত শান্তি,
তনু তিরপিত নয়নসুখ, কল্মষনিকরভঞ্জনা।
ক্ষীণ দীন প্রসাদ দাস, সতত কাতর করুণাভাষ,
বারয় রবিতনয় শঙ্কা, মদনমথন-অঙ্গনা॥
রাণী বলে ওগো জয়া, ভাল কথা মনে গো হইল।
জয়া বলে পুণ্যবতী, কি কথা তোমার মনে গো হইল॥
রাণী বলে, আমি কব কথা ভেবেছিলাম।
আরবার আমি ভুলে গেলাম॥
এখন উমার অঙ্গ চেয়ে মনে গো হইল॥
রাণী বলে, নিজ অঙ্গ প্রতিবিম্ব হেরি উমার কায়।
পুন হেরি উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে শোভা পায়॥
একথা বুঝাব আমি কারে। তোমরা এমন কোথাও শুনেছ গো।
আপন অঙ্গে যখন পড়ে গো আঁখি। উমার অঙ্গ আপন অঙ্গে গো দেখি॥
কি গুণে এ গুণ জন্মিল অঙ্গে। ওগো পাষাণ প্রকৃতি আমার নাহি কোন গুণ গো॥
সুকাঞ্চন দর্পণ উমার অঙ্গ বটে। প্রতিবিম্ব দেখা যায় দাঁড়ালে নিকটে॥
সকলের প্রতিবিম্ব দর্পণেতে লয়। দর্পণের যে গুণ সে গুণ জলে কেমনে রয়॥
স্ফটিকে গ্রহণ করে জবা পুষ্প আভা। স্ফটিকের শুভ্রতা কেমনে লবে জবা॥
হাসিয়া বিজয়া বলে ভাগ্যবতী শুন। তোমার অঙ্গের গুণ নয় ও শ্রীঅঙ্গের গুণ॥
তব অঙ্গের আভা যখন শ্রীঅঙ্গে পশিল। শ্রীঅঙ্গের যেই গুণ গো সেই গুণে মিশাইল॥
(তুমি) উমাছাড়া হয়ে একবার দেখ দেখি অঙ্গ।
(ওগো রাণি) অমন আর কি দেখা যায় তার প্রসঙ্গ॥

ভজন

হয় নয় অন্তরে গো রয়্যা।
আপন অঙ্গ দেখ গো চায়্যা॥
প্রাণধন উমা আমার পূর্ণ (গুণ) সুধাকর।
আমা সবাকার তনু নির্ম্মল সরোবর॥
এক চন্দ্র আভা শত সরোবরে লখি।
তোমা কর্য়া নয়, সকল অঙ্গময়,
মা বিরাজে যখন যে নিরখি॥
এক মুখে কত কব উমার রূপগুণ।
উমার রূপে নানা রূপ প্রসবে সংহারে পুনঃ॥
দাস প্রসাদে বলে এই সার কথা বটে।
পুষ্পে যেমন গন্ধ তেমনি মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে॥
রাণী বলে ওগো জয়া কুস্বপনে প্রাণ আমার কাঁদে।

গত ঘোরতর নিশি, রাহু যেন ভূমে খসি,
গিলিতে ধায়্যাছে মুখচাঁদে ॥
শুনেছি পুরাণে বহু, মুখখানা বটে রাহু,
শরীরের সংজ্ঞা বটে কেতু।
এ রাহুর জটা মাথে, দারুণ ত্রিশূল হাতে,
বুঝিতে নারিলাম ইহার হেতু ॥

ভজন

রাহু গ্রাস করে যে শশীরে, সেই শশী রাহুর শিরে ॥
কোথা গেলে গিরিবর, শিবস্বস্ত্যয়ন কর,
গঙ্গাজল বিল্বদল আনি।
সর্ব্ব ঔষধির জলে স্নান করাও,
জয়া বলে সর্ব্ববিঘ্ন নাশ তাহে জানি ॥
শ্রীরামপ্রসাদ দাসে, একথা শুনিয়া হাসে,
শিব স্বস্ত্যয়নে কিবা কাম।
যদি দুর্গা বুঝে থাক, আমার বচন রাখ,
জপ করাও মায়ের দুর্গানাম ॥

ভজন

শিবস্বস্ত্যয়নে কিবা কাম। শিব জপে এই দুর্গা নাম ॥
শ্রীদুর্গানাম গুণ গানে। শিব না মরিল বিষপানে ॥
মার নামের ফলে, চরণবলে। শিবে মৃত্যুঞ্জয় বলে ॥
দুর্গানাম সংসার সাগরে তরি। কাণ্ডারি তায় ত্রিপুরারি ॥
যে দুর্গা নামে বিঘ্ন হরে। সেই দুর্গা কন্যারূপে তোমার ঘরে ॥
আমি সার কথা তোমারে কই।
ওতো তোমার কন্যা নয়, ঐ ব্রহ্মময়ী ॥

(পাঠান্তর—গিরিরাজ সুন্দরী)

হিমগিরি সুন্দরী, স্নান করাইয়া গৌরী,
পুনঃ বসাইল সিংহাসনে ॥
তখন গদগদ ভাবভরে ঝরঝর আঁখি ঝরে,
সাজাইল যেমন উঠে মনে ॥
সুচারু বকুল মালে, কবরী বান্ধিল ভালে,
হরিচন্দনের বিন্দু দিল।
উপরে সিন্দুরবিন্দু, রবি কোলে যেন ইন্দু,
হেরি হেরি নিমিষ তেজিল ॥

দোথরি মুকুতা হার, কোন সহচরী আর,
গেঁথে দিল উমার কপালে।
অনুমানে বুঝি হেন, চাঁদ বেড়া তারা যেন,
উদয় করেছে মেঘের কোলে॥
তারার কপালে তারা, তারাপতি যেন তারা,
ঘেরা তারায় তারা সাজে ভাল।
বদন সুধাংশু যেন, তাহে তারা মুক্ত ঘন,
কেশরূপ ঘন করে আলো॥
হাসিয়া বিজয়া বলে, মেঘ নয় কেশ দলে,
রাহুর গমন হেন বাসি।
মুখ বিস্তারিয়া ধায়, দন্তশ্রেণী দেখা যায়,
মুক্তা নয় গ্রাস করে শশী॥
জয়া বলে বটে এই পুণ্যকাল ইথে দান করা ভাল,
চিত্ত বিত্ত দান উমার পায়।
কৃপানাথ উপদেশ, প্রসাদ ভক্তের শেষ,
প্রয়াণ দান দিয়া লৈতে চায়॥

জয়া বলে এ বদনে দিলে চাঁদের তুলনা। ছি ছি ও কথা তুলনা॥ ছি ছি যার পায়ে চাঁদ উদয় হয়। তার মুখে কি কি তুলনা সয়॥ শ্রীমুখমণ্ডল হেরি বিদগ্ধ বিধি। নিরজনে বসে নিরমিল কলানিধি॥ শ্রীমুখ তুলনা যদি না পাইল চাঁদে॥ সেই অভিমানে চাঁদ পায়ে পড়ে কাঁদে॥ একথা শুনিয়া সখী বলিছে অনেক। সবে মাত্র এক চাঁদ এ দেখি অনেক॥ ভুবনবিখ্যাত চাঁদ সুধার আধার। পরিপূর্ণ হৈলে দেবে করয়ে আহার॥ এই হেতু ও চাঁদের দেবপ্রিয় নাম। বিচার করিল মনে বিষ্ণু গুণধাম॥ বাসনা হইল সুধাসঞ্চয় কারণে। চাঁদ পাত্র বদলিয়া রাখিল বদনে॥ পুরাতন পাত্র চাঁদ ভূমে আছাড়িল। দশখণ্ড হোয়ে রাজা চরণে পড়িল॥ কতজনে কত কহে সার শুন কই। এক চাঁদ দশ খণ্ড চেয়ে দেখ অই॥ চাঁদ পদ্ম দুই সৃষ্টি করিল বিধাতা। চাঁদ আর কমলে শাত্রবতা॥ হাসিয়া বিজয়া বলে একি শুনি কথা। কেন চাঁদ কমলে হইল আমার শাত্রবতা॥ চাঁদ বলে, ইহা সয় কি আমার। শোভা যার মুখে রে যায়। ছিয়ে কমল তাই হইতে চায়॥ এত বলি মহা অহঙ্কারে চাঁদ উঠিল আকাশে। অভিমানে কমল সলিল মাঝে ভাসে॥ উচ্চপদ পেয়ে চাঁদ ক্ষমা নাহি করে। বিস্তারিয়া নিজ কর পদ্মশোভা হরে॥ বিধাতা জানিল চাঁদ তেজ করে বহু। করিল প্রবল শত্রু রাহু আর কুহু॥ নিরখি যুগল শত্রু ছাড়িয়া আকাশ। ভয় পেয়ে অভয় পদে করিল প্রকাশ॥ অভয় পদ ভজনের দেখহ প্রভাব। শত্রুভাব দূরে গেল দোঁহে মৈত্রভাব॥ দুই সৃষ্টি করি বিধি না পাইল সুখ। করিল তৃতীয় সৃষ্টি এই উমার মুখ॥ রাহু কুহু গরাসিল বদন প্রকাশি। উভয়তঃ সিত

পক্ষ নিত্য পূর্ণমাসী ॥ বাহিরের অন্ধকার গগন চাঁদে হরে। মনের আঁধার শ্রীবদনে আলো করে ॥

ভগবতীর নৃত্য

রাণী বলে, আমি সাধে সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম,
উমা একবার নাচ গো।
একবার নেচেছো ভবে, তেমনি করে আবার নাচিতে হবে,
নূপুর দিয়াছি পায়, সুমধুর ধ্বনি তায় গো ॥
শুনেছি নিগূঢ় বাণী, চারি বেদ নূপুরের ধ্বনি,
ওগো আমার উমা নাচে ভাল।
মা নেচে সফল কর, মায়ের ইহ পরকাল ॥

বাজে ডম্ফ জগঝম্প মৃদঙ্গ রসাল। বিজয়ার করে করতাল শোভে ভাল ॥
চৌদিগে বেড়িল নব নব বধূজাল। পূর্ণচন্দ্র বেড়া যেন স্বর্ণপদ্মমাল ॥
প্রসাদ বলে ভাগ্যবতীর প্রসন্ন কপাল। কন্যা সেই যার পদ হৃদে ধরে কাল ॥
কুমারী দশমবর্ষা স্বর্ণকান্তিছটা। শশহীন শশাঙ্ক সুপূর্ণ মুখঘটা ॥
ভুবনে ভূষিত রূপ এটা মাত্র ছল। ভুজঙ্গ ভূষণ রূপ করে টলমল ॥
রূপ চোয়ায়ে লাবণ্য গলে। বান্ধা কি ভূষণ ছলে ॥
প্রভাতে নূতন গান শুন স্মেরযুতা। উষাকালে উক্তি উল্লাসিত শৈলসুতা ॥
শ্রীরাজকিশোরে মাতা তুষ্টা সুতজ্ঞানে। প্রসিদ্ধ প্রকাশ গান পুরান প্রমাণে ॥
অরসিক অভক্ত অধম লোকে হাসে। করুণাময়ীর দাস প্রেমানন্দে ভাসে ॥
শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন। রচে গান মহাঅন্ধের ঔষধ অঞ্জন ॥

জয়া বলে, আমি সাধে সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম,
জগদম্বা চল পুষ্পকাননে।
চল চল পুষ্পবনে, জয়া দাসী যাবে সনে ॥
জগদম্বে বিলম্বেও চলিত চিত্তপদচলনা।
লোহিতচরণতলারুণপরাভব,
নখরুচি হিমকরসম্পদদলনা ॥
নীলাঞ্চল নিচোল বিলোল পবনে ঘন,
সুমধুর নূপুর কিঙ্কিণী কলনা।
সকল সময়ে মম হৃদয়সরোরুহে,
বিহরসি হর শিরসি শশি ললনা ॥
কল্পতরুতলে, শ্রীরাজকিশোর ভাবে, বাঞ্ছা ফল ফলনা।
ভাগ্যহীন শ্রীকবিরঞ্জন কাতর, দীন দয়াময়ী সন্তত ছল ছলনা ॥

ভগবতীর উদ্যানে ভ্রমণ ও মহাদেবের বিচ্ছেদ-জন্য খেদ উক্তি

জয়া বিজয়া সঙ্গে নগেন্দ্রজাতা। পুষ্পকাননে ক্রীড়তি বিশ্বমাতা ॥
মত্ত কোকিল কূজিত পঞ্চস্বরে। গুণ গুণ গঞ্জিত মন্দ মন্দ ভ্রমরে ॥

তরু পল্লব শোভিত ফুল্ল ফুলে। মাতা বৈঠতি চারু কদম্বমূলে ॥
মুখমণ্ডলমে শ্রমবারি ঝরে। পরিপূর্ণ সুধাংশু পীযূষ ক্ষরে ॥
চারু সৌরভসঙ্গ সুধীর সমীর। প্রভু বিচ্ছেদ খেদ সুবাক্য গভীর ॥
পুলকে তনু পূরিত প্রেমভরে। শিবশঙ্করী শঙ্কর গান করে ॥
করুণাময় হে শিব শঙ্কর হে। শিব শম্ভু স্বয়ম্ভু দিগম্বর হে ॥
ভব ঈশ মহেশ শশাঙ্কধর। ত্রিপুরাসুরগর্ব্ব বিনাশকর ॥
জয় বেদবিদাম্বর ভূতপতে। জয় বিশ্ববিনাশক বিশ্বগতে ॥
ত্রিগুণাত্মক নির্গুণ কল্পতরু। পরমাত্মা পরাৎপর বিশ্বগুরু ॥
কমনীয় কলেবর পঞ্চ মুখে। মম চারু নামাবলি গান সুখে ॥
সুর শৈবলিনীজলে পূত জটা। জটালম্বিত চারু সুধাংশুছটা ॥
জটা ব্রহ্মকটাহ তব ভেদ করে। করে শৃঙ্গ বিষাণ শশী শিখরে ॥
প্রসীদ প্রসীদ প্রসীদ প্রভু হে। লোকনাথ হে নাথ প্রভু শম্ভু হে ॥
ভবভাবিনী ভাবিত ভীম ভাবে। ভবভঞ্জন ভাব প্রসাদ ভাবে ॥

পুষ্প কাননে শিব পার্ব্বতীর মিলন ও কথোপকথন

প্রেয়সীর খেদ গানে, সদা শিবের উচাটন করে প্রাণ,
লোলচিত্ত উঠে চমকিয়া।
ধ্যান করে প্রাণেশ্বরী, গমন শিখরিপুরি,
নন্দী আন বৃষভে সাজাইয়া ॥
কদম্বকুসুম অঙ্গ, পুলকে পূর্ণিত অঙ্গ,
ঈশান বিষাণ পূরে নাচে।
উভয়তঃ মত্ত গূঢ়, বৃষারূঢ় চন্দ্রচূড়,
ভৈরব বেতাল চলে পাছে ॥

ধুয়া

কাল ভৈরব বেতাল রে।
নাচিছে কাল, বাজিছে গাল,
বেতাল ধরিছে তাল ॥
কেহ নাচিছে গাইছে তুলিছে হাত।
বলিছে জয় জয় কাশীনাথ ॥
প্রেয়সীর প্রেমরসে, গদ গদ তনু বশে,
খসিছে কটির বাঘাম্বর।
শিরে সুরতরঙ্গিণী, কুল কুল উঠে ধ্বনি,
সঘনে গরজে বিষধর ॥
ভণে রামপ্রসাদ ভাল, সুখদ বসন্তকাল ॥

উপনীত মন্দাকিনী তীরে।

নিরখি সুন্দরী মুখ, মরমেঁ পরম সুখ,
লোচন তিতিল প্রেম নীরে॥

নন্দি, একি রূপ মাধুরী, আহা মরি আহা মরি,
গঠিল যে সে কেমন বিধি।

চঞ্চল মনোমীন, হৃদিসরোবর ত্যজি,
প্রবেশিল লাবণ্যজলধি॥

আহা আহা মরি মরি, কিবা রূপ মাধুরী,
হাসি হাসি সুধারাশি ক্ষরে।

অপাঙ্গ লোচনে, মোহিনী কি গুণে,
চৈতন্য নিগূঢ় হরে॥

কেরে কুঞ্জরগামিনী, তনু সৌদামিনা,
প্রথম বয়স রঙ্গিনী।

যৌবন সম্পদ, ভাবে গদ্গদ,
সমান সঙ্গে সঙ্গিনী॥

কেরে নির্ম্মলবর্ণাভা, ভুজগ মণি ভূষণ শোভা হরে,
ভূষণে কিবা কায।

পূর্ণচন্দ্র কোলে, খদ্যোত যেমন জ্বলে,
নাহি বাসে লাজ॥

ভণে রামপ্রসাদ কবি, নিরখি সুন্দরী ছবি,
মোহিত দেব মহেশ।

ভুলে কাম রিপু জর জর বপু,
সে রূপের কি কব বিশেষ॥

যদি বল অনূঢ়া কালের একি কথা। শিবশিবা ভিন্ন ভাব কে শুনেছে কোথা॥
উভয়তঃ সুসম্ভাষ সঙ্কেত সম্বাদ। উভয়তঃ চিত্তমধ্যে জন্মে মহাহ্লাদ॥
আজ্ঞা কর কাল কত কাল হেথা রব। কালক্রমে কল্যাণি কৈলাসপুরে লব॥
রমণীর শিরোমণি পরম রতন। রতনভূষণে কার নাহি বা যতন॥
নিজ হংসে হংসী সদা মানসগামিনী। চৈতন্যরূপিণী নিত্য স্বামীর স্বামিনী॥
নখজ্যোতি পরংব্রহ্ম শুনেছ কি সেটা। নিখিলব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী কর্ত্তা তব কেটা॥
আমার এই ভস্ম অঙ্গ ভুজঙ্গ ভূষণ। তোমার বিহীনে নাহি অন্য প্রয়োজন॥
পুরুষ বিহীনে হয় বিধবা প্রকৃতি। প্রকৃতি বিহীনে আমার বিধবা আকৃতি॥

অনুচ্চার্য্যানাদিরূপা গুণাতীত গুণ। নির্গুণে সগুণ কর প্রসব ত্রিগুণ॥
নিজে আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব। তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব॥
তুমি মন বুদ্ধি আত্মা পঞ্চভূত কায়া। ঘটে ঘটে আছ যেমন জলে সূর্য্যছায়া॥
বেদে বলে তত্ত্বী যোগী তত্ত্ব করে ফিরে। সেই বস্তু এই তুমি মন্দাকিনী তীরে॥
দাক্ষায়ণী দেহ ত্যাগে দক্ষে অপমান। শিখরিকে দয়া করি তব অধিষ্ঠান॥
মর্ম্ম কোয়ে স্বস্থানে প্রস্থান শূলপাণি। জননী চলিল যথা গিরিরাজরাণী॥
বাল্যলীলা এই মার জনক ভবনে। গোষ্ঠলীলা অতঃপর একাম্রকাননে॥

গোষ্ঠলীলারম্ভ

শঙ্করী কহেন প্রভু শঙ্করের কাছে। শঙ্করী সমান স্থান আর নাকি আছে॥
শঙ্করীর কথায় হাসেন পঞ্চানন। শঙ্করী সমান স্থান একাম্রকানন॥

গৌরীর গোষ্ঠে গমন

ভজন

আজ্ঞা কর ত্রিনয়নে। যাব হে একাম্রবনে॥
কাশী হৈতে হৈল কাশীনাথের আদেশ। একাম্রকাননে মাতা করিল প্রবেশ॥
চরাইতে ধেনু বেণু দান দিল ভব। অধরে সংযোগ করি উর্দ্ধমুখে রব॥
সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু। পাতাল হইতে উঠে শুনে মার বেণু॥

ধুয়া

জগদম্বারে যব পুরে বেণু, যব পুরে বেণু,
ধায় বৎস্য ধেনু, উঠে পদরেণু।
রেণু ঢাকে ভানু, ভাবে ভোর তনু॥
গতি মত্ত মাতঙ্গ, দোলায়ত অঙ্গ।
কি প্রেম তরঙ্গ, সো মাকি রঙ্গ, নেহারে পতঙ্গ॥
হর্ত্ত কোকিল মান, সুমাধুরী তান, স্বরে হরে জ্ঞান।
যোগী ত্যজে ধ্যান, ঝুরে মন প্রাণ॥
ক্ষণে মন্দ ভাষে, ক্ষণে মন্দ হাসে, চপলা প্রকাশে।
রামপ্রসাদ দাসে, প্রেমানন্দে ভাষে॥

গিরিশগৃহিণী গৌরী গোপবধূবেশ। কম্বিত কাঞ্চনকান্তি প্রথম বয়েস॥
বিচিত্র বসন মণিকাঞ্চন ভূষণ। ত্রিভুবন দীপ্ত করে অঙ্গের কিরণ॥
স্বয়ম্ভু যুগল হর সুরনদী কূলে। স্বয়ম্ভু পূজেন নিত্য করপদ্ম ফুলে॥
নাভিপদ্ম ভেদি ভ্রমে বেণী ক্রমে ক্রমে। লোমাবলী ছলে চলে করিকুম্ভ ভ্রমে॥
ঈশ্বর মোহন ইষু নয়ন তরল। বিধি কি কজ্জল ছলে মাখিল গরল॥

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরীর কি কাণ্ড। ফেরে করে লয়ে ছাঁদ ডোর দুগ্ধভাণ্ড॥
ভালেতে তিলক শোভে সুচারু বয়ান। ভণে রামপ্রসাদ দাস মার এই এক ধ্যান॥

ভজন

এমন রূপ যে একবার ভাবে।
ভাবিলে সাযুজ্য পাবে॥
একাম্রকাননে জগতজননী ফিরে।
ঘন ঘন হই হই রব করে সঙ্গিনীরে॥
সব নিন্দি গজপতি গমন ধীরে ধীরে।
নীলাম্বরাঞ্চল, পবনে চঞ্চল, আকুল কুন্তল ব্যাপিল শিরে।
মহা চিত্ত অরুন্তুদ, কোপে বিধুন্তুদ গরাসে যেমন পূর্ণ শশীরে॥
বিবুধ বন্দ্য, যোগায় মধু, তনু সুশীতল ধীর সমীরে।
ঘন ঝরে শ্রমজল গলিত কজ্জল,
যেমন কালসাপিনী ধায় লভি বিবরে॥

ধুয়া

মা ডাকিছে রে, আয় সুরভি।
নব নব তৃণ, তটিনী জল শীতল, দূরে ধায়ত কাছে মার রে সুরভি॥
উমার মধুর বেণু শুনিয়া শ্রবণে। সারি সারি নিকটে দাঁড়াল ধেনুগণে॥
ঊর্দ্ধমুখে বিধুমুখী নিরখিয়া থাকে। দুনয়নে প্রেমধারা হাম্বা রবে ডাকে॥
লোমাঞ্চ সকল তনু দুগ্ধ স্রবে বাঁটে। সুরভির নব বৎস উমার অঙ্গ চাটে॥
সুরভির নব বৎস শোভা উরূপরে। মন্দাকিনী ধারা যেন সুমেরু শিখরে॥
ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি জগদম্বাশিরে। সঙ্গের সঙ্গিনী নাচে ভাসে প্রেমনীরে॥
কৌতুকে আকাশ পথে হরিহর ধাতা। গোচারণে গমন করিল বিশ্বমাতা॥
ভুবনমোহন মার গোচারণলীলা। মহামুনি বেদব্যাস পুরাণে বর্ণিলা॥
একবার ভুলায়েছ ব্রজাঙ্গনা বাজাইয়া বেণু। এবে নিজে ব্রজাঙ্গনা বনে রাখ ধেনু॥
আগে ব্রজপুরে যশোদারে করেছিলে ধন্যা। এবার হয়েছ কোন গোপালের কন্যা॥

আগো! তোমার গুণ কে জানে। ধ্রু
মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদি দশ অবতার। নানা রূপে নানা লীলা সকলি তোমার॥
প্রকৃতি পুরুষ তুমি তুমি সূক্ষ্মস্থূলা। কে জানে তোমার মূল তুমি বিশ্বমূলা॥
তারা তুমি জ্যেষ্ঠা মূলা অচরম সতী। তব তত্ত্বমূলে নাই শ্রুতিপথে শ্রুতি॥
বাচাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব। শক্তিযুক্ত শিব সদা শক্তিলোপে শব॥
অনন্তরূপিণী চারি বেদে নাহি সীমা। স্বামী মৃত্যুঞ্জয় তব অনন্ত মহিমা॥
ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী চিন্ময়রূপিণী। আধার কমলে থাক কুলকুণ্ডলিনী॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বটে নাশ করে কাল। সেই কালে গ্রাস করে বদন করাল॥

এই হেতু কালী নাম ধর নারায়ণি। তথাচ তোমারে বলে কালের কামিনী॥
ব্রহ্মরন্ধ্রে শুক্ল ধ্যান করে সব জীব। কালীমূর্ত্তি ধ্যানে মহাযোগী সদাশিব॥
পঞ্চাশৎ বর্ণ বটে বেদাগম সার। কিন্তু যোগীর কঠিন ভাবা রূপ নিরাকার॥
আকার তোমার নাই অক্ষর আকার। গুণভেদে গুণময়ী হয়েছ সাকার॥
বেদবাক্য নিরাকার ভজনে কৈবল্য। সে কথা না ভাল শুনি বুদ্ধির তারল্য॥
প্রসাদ বলে কালরূপে সদা মন ধায়। যেমন রুচি তেমনি কর নির্ব্বাণ কে চায়॥

পশুপতিকান্তা কান্তি নেত্রে একবার। নিরখ পতিত জনে ক্ষতি কি তোমার॥
তৃণে শৈলে কূপে গঙ্গাজলে চন্দ্রকর। সমান নিপাত বিশ্বব্যক্ত শশধর॥
দুর্গানাম দুর্ল্লভ লবার প্রাক্‌কালে। জপিলে জঞ্জাল যায় নাহি লয় কালে॥
কি জানি করুণাময়ী কারে হৈলে বাম। সম্পদ রক্ষার হেতু জপে দুর্গানাম॥
দুর্গানাম মোক্ষধাম চিত্তে রাখে যেই। সে তরে সংসার ঘোরে সর্ব্ব পূজ্য সেই॥
ব্রহ্মা যদি চারি মুখে কোটী বর্ষ কয়। তথাচ মহিমা গুণ সীমা নাহি হয়॥
মহাব্যাধি ঘোরে দুর্গে দুর্গা যদি বলে। কষ্ট নষ্ট চিরায়ু অচিন্ত্য ফল ফলে॥
দুঃস্বপ্নে গ্রহণে দুর্গা স্মরণে পলায়। পুনরাগমন ভয় পরবর্ণে গায়॥
শ্রীদুর্গা দুর্ল্লভ নাম নিস্তারের তরি। কেবল করুণাময়ী শ্রীনাথ কাণ্ডারী॥
তথাচ পামর জীব মোহকূপে মজে। ইচ্ছা সুখে বিষপানে তাপানলে ভজে॥
বদন কমল বাক্য সুধারস ভর। সুবোধ কুবোধ বেদে গম্য নহে নর॥
তবগুণ বর্ণনে অক্ষরে ক্ষরে মধু। সুধারস মাধুরী কি স্মরহর বধূ॥
শ্রীরাজকিশোরে তুষ্টা রাজরাজেশ্বরী। কালিকা বিজয়ী হরি চিত্ত মোহ হরি॥
আসনে আনন্দময়ী অধিষ্ঠান সুখে। তব কৃপালেশে বাণী নিবসতি মুখে॥
চঞ্চলা অচলা গৃহে তব পূর্ণ দিয়া। অকাল মরণ হরা অচল তনয়া॥
প্রসাদে প্রসন্না ভব ভবনিতম্বিনী। চিত্তাকাশে প্রকাশ নবীন কাদম্বিনী॥

অথ ভগবতীর রাসলীলা

জগদম্বা কুঞ্জবনে মোহিনী গোপিনী। ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী॥
শ্রমবারি বিন্দু বিন্দু ঝরে মুখচাঁদে। সশঙ্ক শশাঙ্ক কেশরাহু ভ্রমে কাঁদে॥
সিন্দুর অরুণ আভা বিষম মানসী। উভয় গ্রহণে মেঘ পূর্ণিমার নিশি॥
বিনতানন্দনচঞ্চু সুনাসিকা ভান। ভূরূ ভুজঙ্গম শ্রুতি বিবরে পয়ান॥
ও রূপ লাবণ্য জলনিধি স্থির জলে। নয়ন সফরী মীন খেলে কুতূহলে॥
কনক মুকুরে কি মাণিক্য রাগ প্রভা। তার মাঝে মুক্তাবলী ওষ্ঠ দন্ত শোভা॥
শ্রীগণ্ডে কুণ্ডল প্রতিবিম্ব শ্রীবদন। চারুচক্র রথে চড়ি এসেছে মদন॥
নাসাগ্রে তিলক চারু ধরে অচলজা। মীননিকেতনে কি উড়িছে মীনধ্বজা॥
করিকর ভুজঙ্গ মৃণাল হেমলতা। কোন তুচ্ছ কমনীয় বাহুর তুল্যতা॥
ভুজদণ্ড উপমার একমাত্র স্থান। সুর তরুবর শাখা এই যে প্রমাণ॥

হরি গঙ্গা প্রবাহ যমুনা লোমশ্রেণী। নাভিকুণ্ডে গুপ্তা সরস্বতী অনুমানি॥
মহাতীর্থ বেণী তীরে স্বয়ম্ভু যুগল। স্নান করো মন রে অনন্ত জন্ম ফল॥
উত্তরবাহিনী গঙ্গা মুক্তাহার বটে। সুচারু ত্রিবলী বিরাজিত তার তটে॥
কবি করে বিবেচনা যে ঘটে যে জ্ঞান। মণিকর্ণিকার ঘাটে সুচারু সোপান॥
রসময় বিধাতার কিবা কব কাণ্ড। রূপসিন্ধু মন্থিবার মধ্যদেশ দণ্ড॥
কাঞ্চিদাম রজ্জু তায় বুঝহ প্রবীণ। ঘর্ষণে ঘর্ষণে কটি ক্ষীণতর ক্ষীণ॥
মধ্যদেশ ক্ষীণ যদি সন্দেহ কি তার। সহজে জঘনে ধরে গুরুতর ভার॥
ভব স্থানে মনোভাব পরাভব হয়ে। তূণবাণ দ্বিগুণ এসেছে বুঝি লয়ে॥
জঙ্ঘা তূণ পদাঙ্গুলি নখ ফলি শরে। রতিকান্ত নিতান্ত জিতিবে বুঝি হরে॥

অথ কালীকীর্ত্তম্ সমাপ্ত

কালীর শতনাম

করালবদনা কালী কামিনী কমলা কলা। ৫॥
ক্রিয়াবতী কোটরাক্ষী কামাখ্যা কামসুন্দরী। ৯॥
কপোলাচ করালাচ কাশী কাত্যায়নী কুহু। ১৪॥
কংকালী কালদমনী করুণা কমলার্চ্চিতা। ১৮॥
কাদম্বরী কালহরা কৌতুকী কারণপ্রিয়া। ২২॥
কৃষ্ণা কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণপূজিতা কৃষ্ণবল্লভা। ২৬॥
কৃষ্ণাপরাজিতা কৃষ্ণপ্রিয়াচ কৃষ্ণরূপিণী। ২৯॥
কালিকা কালরাত্রিশ্চ কুলজা কুলপণ্ডিতা। ৩৩॥
কুলধর্ম্মপ্রিয়া কামা কাম্যকর্ম্ম বিভূষিতা। ৩৬॥
কুলপ্রিয়া কুলরতা কুলিনপরিপূজিতা। ৩৯॥
কুলজ্ঞা কমলাপূজা কৈলাশনগভূষিতা।৪২॥
কুটজা কেশিনী কামা কামদা কামপণ্ডিতা। ৪৭॥
করালাস্যাচ কন্দর্প কামিনীরূপশোভিতা। ৫০॥
কেলস্থ কাকেলরতা কেলিনী কেলভূষিতা। ৫৪॥
কেশবস্য প্রিয়া কেশা কাশ্মীয়া কেশবার্চ্চিতা। ৫৮॥
কামেশ্বরী কামরূপা কামদান বিভূষিতা। ৬১॥
কালহন্ত্রী কূর্ম্মমাংসপ্রিয়া কূর্ম্মাদি পূজিতা। ৬৪॥
কেলিনী করকা কারা করকূর্ম্মনিষেবিনী। ৬৮॥
কটকেশর মধ্যস্থা কটকী কটকার্চ্চিতা। ৭১॥
কটপ্রিয়া কটরতা কটকূর্ম্মনিষেবিনী। ৭৪॥
কুমারী পূজনরতা কুমারীগণ সেবিতা। ৭৬॥
কুলাচারপ্রিয়া কৌলপ্রিয়া কুলনিষেবিনী। ৭৯॥
কুলীনা কুলধর্ম্মজ্ঞা ভীতিবিমর্দ্দিনী। ৮২॥

কামধর্ম্মপ্রিয়া কাম্যা নিত্যকামস্বরূপিণী। ৮৫ ॥
কামরূপা কামহরা কামমন্দির পূজিতা। ৮৮ ॥
কামাগার স্বরূপাচ কামাখ্যা কামভূষিতা। ৯১ ॥
ক্রিয়া ভক্তিরতাকাম্যা কাঞ্চনীচৈবকামদা। ৯৩ ॥
কোলপুষ্পম্বরাকোলা নিষ্কোলা কলহান্তকা। ৯৬ ॥
কৌষিকী কেতকী কুণ্ডী কুন্তলাদিবিভূষিতা ॥ ১০০ ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

[রামপ্রসাদের কৃষ্ণ কীর্ত্তন গ্রন্থের সম্পূর্ণ অংশ পাওয়া যায় নাই। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বহু অনুসন্ধানে উহার যে কয়েক পংক্তি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা সন ১২৬০ সালের ১লা পৌষ তারিখে মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত করেন। আমরা এখানে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।]

প্রথম বয়স রাই রসরঙ্গিণী।
ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী ॥
রাই বদন চেয়ে ললিতা বলে।
রাই আমার মোহনমোহিনী ॥
রাই যে পথে প্রয়াণ করে।
মদন পলায় ডরে ॥
কুটিল কটাক্ষশরে।
জিনিল কুসুমশরে ॥
কিবা চাঁচর সুন্দর কেশ।
সখী বকুলে বানাইল বেশ ॥
তার গন্ধে অলিকুল হইয়া আকুল,
কেশে করিছে প্রবেশ ॥
নব ভানু ভালেতে নিবাস,
মুখপদ্ম করেছে প্রকাশ।
উরে কলিকা যে আছে,
কি জানি ফুটে পাছে,
সখীর হৃদয়ে তরাস ॥
ভাবে পূর্ণচন্দ্র কোলে তার,
অপরূপ শোভা হল আর।
একি শ্রীবদন ছবি, উপরেতে চাঁদ রবি,
সদন মদন রাজার ॥
অলকা কোলে মতিহার,
কিবা বিচিত্র ভাব বিধাতার।

যেন রাহুর মুখমাঝে, বসনরাজি রাজে,
চাঁদেরে করেছে আহার ॥
আঁখি লোল অনুমানি এই,
চাঁদে হরিণ শিশু আছে যেই।
তনু সুধায় লুকায়েছে, ব্যাধে বধে পাছে,
দিগ নিহারই সেই ॥
চারু অপাঙ্গ কাম কামান,
নাসাতিলক শর খরসান।
সেই শ্যামসুন্দর, মানস মৃগবর,
ভাবে বুঝি করিছে সন্ধান ॥

সঙ্গীত—কৃষ্ণবিষয়ক

ওহে নূতন নেয়ে। ভাঙ্গা নৌকা চল বেয়ে ॥
দুকূল রহিল দূর, ঘন ঘন হানিছে চিকুর,
কেমন কেমন করেছে দেয়া, মাঝ্ যমুনায় ভাসে খেয়া,
শুন ওহে গুণনিধি, নটো, হোক ছানা দধি,
কিন্তু মনে করি এই খেদ।
কাণ্ডারী যাহার হরি, যদি ডুবে সেই তরী,
মিছা তবে হইবে হে বেদ ॥

যমুনা গভীরা ভাঙ্গা তরী, অবলা বালা কৃশোদরী,
প্রাণ রক্ষার তুমি মাত্র মূল।
অবসান হলো বেলা, একি পাতিয়াছ খেলা,
ঝটিৎ পারে চল প্রাণ নিতান্ত আকুল ॥

কহিছে প্রসাদ দাস রসরাজ কিবা হাস,
কুলবধূর মনে বড় ভয়।
এক অঙ্গ আধা আধা, তোমারি অধীনা রাধা,
তাহে এত বাদ সাধা উচিত কি হয় ॥

ও নৌকা বাওহে ত্বরা করি নূতন কাণ্ডারী,
রঙ্গে ব্রজ বধূর সঙ্গে ॥
আতপ লাঘব হেতু, তরুণী ভরা তরণী,
চালন কর মনের রঙ্গে।
আপন ব রহে পণ, চাওহে যৌবন ধন,
হাস ভাষ প্রেম তরঙ্গে ॥

আগে চরাইতে ধেনু, বাজায়ে মোহন বেণু,
বেড়াইতে রাখালের সঙ্গে।
এখন হয়েছ নেয়ে, কোন্ বা বিষয় পেয়ে,
খেয়ে হাত দিতে এস অঙ্গে॥
ভণে দাস রামপ্রসাদ, হায় একি পরমাদ,
কাজ কি হে কথার প্রসঙ্গে।
সময় উচিত কও, কোন রূপে পার হও,
দোষ আছে পাছে মন ভাঙ্গে॥

সীতা বিলাপ

মোরে বিধি বাম, গুণনিধি রাম,
কি দোষে গেলে ছাড়িয়ে হে।
জনক দুহিতে কাঁদিতে কাঁদিতে,
লব কুশ দোঁহে লইয়া সহিতে,
আইল জীবননাথেরে দেখিতে,
শিরে কর হানি পড়িয়া মহীতে,
হাহাকার রব করিয়ে হে॥
(সীতার) লোচনে সলিল পড়িছে ঝরিয়া,
রামের দুখানি চরণ ধরিয়া,
কাঁদেন জননী করুণা করিয়া,
কোথাকারে প্রভু গেলে হে চলিয়া,
কোন্ অপরাধ পাইয়ে হে॥
অভাগিনী ডাকে উঠনা ত্বরিতো,
শুনিয়া না শুনো এ কোন্ উচিতো,
কমল নয়নে চাহনা চকিতো,
বিদরে পরাণো কর না স্থকিতো,
প্রবোধ দেহ না উঠিয়ে হে!
ধূলায় ধূসর এ হেন শরীর,
দু'কূলে আকুল হোয়েছে কটীর,
ললাট ফলকে পড়িছে রুধির,
দিবসে সকলি দেখিযে তিমির,
আলো কর প্রভু জাগিয়ে হে॥
কর হোতে ধনু পড়েছে খসিয়া,
কে হানিল বাণ বিষম কসিয়া,
নাশিল জীবন হৃদয়ে পশিয়া,

কেমনে এমন দেখিব বসিয়া,
পরাণ যাইছে ফাটিয়ে হে।
যখন ছিলাম জনক বাসেতে,
আমারে দেখিয়া কহিত লোকেতে,
বিধবা চিহ্ন নাহিক তোমাতে,
এবে এই ছিল মোর কপালেতে,
সখা কোথা গেলে চলিয়ে হে॥
ললাট লিখন ঘুচাতে নারে,
আপনি উদরে ধরিছি যারে,
তনয় হইয়া বধিল পিতারে,
আহা নাথ নাথ কি হলো আমার এ,
উপায় না দেখি ভাবিয়ে হে।
ধিক্ ধিক্ তোরে বলি রে তনয়,
বুঝিলাম তোরা আমার তো নয়,
এমন করিতে সমুচিত নয়,
প্রভুরে লইলি যমের আলয়,
ইহা দেখি আমি বসিয়ে হে॥
এছার জীবন কেমনে রাখিব,
তোমার নিকটে এখনি মরিব,
জালি চিতা আমি তাহাতে পশিব,
নহে হলাহল অশন করিব,
কি কাজ এ দেহ রাখিয়ে হে॥
প্রসাদ কহিছে শুন মা জানকী,
রামের মহিমা তুমি না জান কি,
প্রবোধ মান মা কমল কানকী,
এখনি উঠিবেন রাঘব কানুকী,
দেখিবে নয়ন ভরিয়ে গো॥

কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর

অথ গণেশ বন্দনা

পরম পুরুষ পঁহু পুনঃ পুনঃ প্রণমহু
পর্ব্বতেশ পুত্রী-প্রিয়-সুত।
বিভু বেদবিদাম্বর, বিনায়ক বিঘ্নহর,
বারণবদন গুণযুত ॥
তরুণ অরুণ অণু, অতি জ্যোতির্ম্ময় তনু,
আজানুলম্বিত ভুজদণ্ড।
আভরণ নানা মত, মণি হেম মরকত
সিন্দূরে সুন্দর শুণ্ড-গণ্ড ॥
অদিতি-অঙ্গজ-শ্রেষ্ঠ, আরোহণ আখু-পৃষ্ঠ,
আসরে উরহ একবার।
জনে যদি জপে নাম, যম যিনি যোগ্য ধাম,
যায় তায় করি অধিকার ॥
দেবদেব দীনবন্ধু, দাসে দেহি দয়াসিন্ধু,
সবিশেষ উপদেশ সার।
শিব কর্ম্মে তুমি মূল, হও শীঘ্র অনুকূল,
আমি শিশু বঞ্চিত সংস্কার ॥
রামরাম সেন নাম, মহাকবি গুণধাম
সদা যারে সদয়া অভয়া ॥
তৎসুত রামপ্রসাদে, কহে কোকনদ পদে,
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কর দয়া ॥

অথ সরস্বতী বন্দনা

যত্নে পুটাঞ্জলি অতি, বন্দে মাতা সরস্বতী,
মহাবিদ্যা সরসিজাসনী।
কুচভর-নমিতাঙ্গী, ভুবনমোহন ভঙ্গী,
বিদ্যারূপা ব্রহ্মাণ্ডজননী ॥
শ্বেতপদ্ম শ্রীচরণ, হংসবধূ অনুক্ষণ,
হৃদিমধ্যে বিহর মা নিত্য।
ক্ষুদ্র আমি ক্ষীণ প্রজ্ঞা, পাল মাতা নিজ আজ্ঞা,
কণ্ঠে বসি কহ সুকবিত্ব ॥

নানা যন্ত্র তাল মান, আলাপে মোহিত জ্ঞান,
রাগ ছয় সহিত রাগিণী।
ন বিষ্ণা সংগীত পর, যে গানে ত্রিপুরহর,
দ্রব কৈলা দেব চক্রপাণি॥
সেই বস্তু এই গঙ্গা, নির্ম্মল সুতুঙ্গভঙ্গা,
কণা মাত্রে মহাপাপ হরে।
সত্য সত্য বেদে উক্তি, দর্শনে কৈবল্য মুক্তি,
স্নানফল কহিবে কি নরে॥
ব্যাস বাল্মীকাদি-চয়, মহাকবি মহাশয়,
তব কৃপালেশে প্রজ্ঞাবান।
বহুকষ্টে চিত্তে খেদ, সঙ্কলন করি বেদ,
নানা শাস্ত্র করিলা বিধান॥
তব কৃপাদৃষ্টি যারে, জগত জিনিতে পারে,
ধরাতলে সেই জন ধন্য।
তুমি গো যাহারে বাম, জীয়া তার কিবা কাম,
মূঢ়মতি সে অতি জঘন্য॥
তুমি বিশ্ব অন্তর্যামী, স্তব কিবা জানি আমি,
বেদাগমে অতুল্য মহিমা।
শ্রীপ্রসাদে বলে মাতা, স্মরহর হরি ধাতা,
কোনরূপে না পাইলা সীমা॥

অথ লক্ষ্মী বন্দনা

কমলে কমলা বন্দে কোমল শরীর। কমল-চরণে শোভে মঞ্জুল মঞ্জীর॥
গুরু উরু ডমরু-সুচারু মধ্যদেশ। ত্রিবলী গভীর নাভি কি কব বিশেষ॥
কান্তি মধ্যে উভ তটে গুপ্ত যুগ্ম কোক। তব রোমাবলী কুচ কুম্ভ কহে লোক॥
পঙ্কে বাস বিস সে কি বাহুদণ্ড অণু। তুলা নহে বিসে কি সে ভেবে ক্ষীণ তনু॥
নাসা তিলফুল তাহে বিলোল বেসোর। পূর্ণচন্দ্র শোভা যেন পিবতি চকোর॥
জিনিয়া আরক্ত মুক্তাফল দন্তশোভা। বিম্বাধর প্রতিবিম্ব মুক্তা মনোলোভা॥
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অঞ্জনে রঞ্জিত। মনোহর মনোহরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ॥
নিন্দিয়া গিধিনিশ্রুতি শ্রবণ যুগল। দরিদ্র-দ্রবিণ-আশা সুদীর্ঘ কুণ্ডল॥
উপযুক্ত ভূষণ ভূষিত ঠাঁই ঠাঁই। কি কব রূপের কথা ত্রিভুবনে নাই॥
সর্ব্বগুণহীন যদি ধনবান্ হয়। তৃণ তুল্য দ্বারে তার কত গুণালয়॥
তব কৃপাপাত্র মাত্র ধরাতলে পূজ্য। সত্ত্ব দানে বিত্ত গুণে সে লভে সাযুজ্য॥
যে গৃহিজনের প্রতি জন্মে তব কোপ। কি তার ঐহিক ধর্ম্ম পূর্ব্ব ধর্ম্ম লোপ॥
বিষম দারিদ্র্যদোষে গুণরাশি নাশে। থাকুক আদর কেহ কথা না জিজ্ঞাসে॥

কি আর কহিব বাড়া স্ত্রীপুত্র অবশ। বিরস বদনে কহে বচন কর্কশ॥
এ সর্ব্ব তোমার মায়া জানি গো জননী। প্রসাদে প্রসন্ন হও জলধিনন্দিনী॥

অথ কালী বন্দনা

কলিকাল-কুঞ্জর-কেশরী কালী নাম। জপিলে জঞ্জাল যায়, যায় যোগ্যধাম॥
কাল কর পৃথক চিন্তহ মনে এই। লকারে ঈকার দীর্ঘ খড়্গ বটে সেই॥
রসনাগ্রে মুখভরে যত্ন করে লও। ভক্তি গজপৃষ্ঠে চড়ি যমজয়ী হও॥
ভয় নাহি ভয় নাহি ভয় নাহি আর। শ্রীনাথ কহিলা তত্ত্ব বস্তু সারাৎসার।
নাম নিত্যা নৃত্যাতি নিখিলনাথ-উরে। বিপরীত কাজ লাজ পরিহরি দূরে।
কাদম্বিনী জিনিয়া নির্ম্মল বর্ণ কালো। কলেবর-কিরণ তিমির-পুঞ্জ আলো॥
কটিতটে করাল লম্বিত মুণ্ডমাল। লোলজিহ্বা বিশালাক্ষী বদন বিশাল।
হেরি বপু রিপুচয় ভয়ে কম্পমান্। বামে অসি মুণ্ড যামে বরাভয় দান॥
অপরূপ শবযুগ শ্রবণ যুগলে। বিগলিত কুন্তল লোটায় ধরাতলে॥
বিবস্ত্রা যোগিনীঘটা দীর্ঘ জটা মাথে। বিকট বদন সুধাপানপাত্র হাতে॥
সিত পিত লোহিত অসিত রূপ জটা। যুদ্ধে ক্রুদ্ধে ঊর্দ্ধমুখে গিলে রিপু ঘটা॥
হত রথী সারথি তুরঙ্গ করিবর। শিবাকুলে সঙ্কুল শ্মশান শঙ্কাকর॥
একান্ত কাতর অতি মহী যায় তল। অকালে প্রলয় সৃষ্টি মজিল সকল॥
অখিল জননী তব চরিত্র এমন। হেদে গো করুণাময়ী এ আর কেমন॥
ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে। আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব। কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপামই। আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই॥

অষ্ট-রসাধার জগদম্বা-পাদপদ্ম। পরম রহস্য-কথা শুন গুণসদ্ম॥
বিলোকনে যে যে চিত্তে জন্মে যে যে রস। বর্ণনা যোগ্যতা বটে কার্য্যকর্ত্তা যশ॥
স্বকীয় সুন্দরী পাদপদ্ম হৃদে রাখি। প্রাজ্ঞ মাত্র সদাশিব বিঘূর্ণিত আঁখি॥
মহাকবি পদ্ম প্রতি ঘৃণা জন্মে মনে। কি গুণে তুলনা ছি ছি এ হেন চরণে॥
দর্পে কহে মদন বিগত যুদ্ধ ভয়। চির কালান্তরে পরিপূর্ণ পরাজয়॥
চন্দ্র সূর্য্য এ কোন উদয় ত্রিভুবনে। ক্রোধযুক্ত বিধুন্তুদ শক্র নিরীক্ষণে॥
সতী সঙ্গি সভক্তি হৃদয় পদ্ম বৃন্দ। নিতান্ত বিস্মিত বিরিঞ্চ্যাদি সুরবৃন্দ॥
মহাভীতা ধরণী সুস্থির নহে প্রাণ। চিন্তয়তি কোনরূপে পাই পরিত্রাণ॥
স্মেরমুখীসহচরীগণ মহাহ্লাদ। নয়ন নিমিষহীন বিগত বিষাদ॥
ত্রিগুণজননী তব নিরখিয়া পদ। উথলে করুণাসিন্ধু অঙ্গ গদগদ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপামই। আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই॥

বিদ্যার পাত্রান্বেষণে, মাধব ভাটের কাঞ্চিপুর গমন

বীরসিংহ মহামতি, হৃদয়ে চিন্তিত অতি,
দুহিতার যোগ্য পতি কই।
রূপে গুণে কুলে শীলে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এ সকলে,
বিশেষত বিদ্যালাপে জই ॥
সে জন তাহার প্রভু, প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন কভু,
নহে কোথা সুপাত্র এমন।
যত যত ভূপসুত, রূপেতে বটে অদ্ভুত,
বিদ্যা নাহি উপায় কেমন ॥
নিকটে মাধব ভাট, কত মত করে ঠাট,
আমি মিলাইব যোগ্য পাত্র।
শুন শুন মহাশয়, একথা অন্যথা নয়,
কিন্তু কিছু কাল গৌণ মাত্র ॥
ভাটবাক্যে অট্টহাসে, সুধাসিন্ধু মধ্যে ভাসে,
সিরপা করিলা তাজি ঘোড়া ॥
ছিঁড়িয়া গলার হার, নানা রত্ন দিল আর
খাস পোষাকের খাসা যোড়া ॥
বিদায় করিয়া ভাটে, পুনরপি রাজপাটে,
রাজকর্ম্মে মন দিলা ভূপ।
মিলিবে উত্তম বর, সুপুরুষ গুণধর,
মনে মনে জানিলা স্বরূপ ॥
মাধব তুরঙ্গ চাপে, গোঁপে পাক দিয়া দাপে,
সেঁটে মারে পিছাড়ে চাবুক।
পবনগমনে যায় পাছু পানে নাহি চায়,
প্রসাদেতে পরম কৌতুক ॥
ভ্রমিল অনেক ঠাঁই, উপযুক্ত মিলে নাই,
শেষ কাঞ্চিদেশ উপনীত।
পাঠশালে পড়ুয়া সঙ্গে, সুকবি সুন্দর রঙ্গে,
রূপ দেখি ভট্ট হরষিত ॥
কোন শাস্ত্রে নাহি ত্রুটি, যে যে কহে দৃঢ় কোটি,
ক্ষণ মাত্রে তাহার সিদ্ধান্ত।
মাধব জানিল দড়, ভবানীর ভক্ত বড়,
নিতান্ত বিদ্যার এই কান্ত ॥

চিত্তে চমৎকার লাগে, করজোড়ে খাড়া আগে,
রায়বার পড়ি করে স্তব।
শিরে উঠাইয়া হাত, কহিতেছে হিন্দি বাত,
শুনি সুখী সুন্দর নীরব॥
বাবুজী কুর্ণিস মেরা, বর্দ্ধমান বিচ ডেরা,
নাম তো হামারা মাধো ভাট।
আরজ করে ঁাগে পিছে, ঘড়ী এক বৈঠে নীচে,
আর তো লাগায় তোম চাট॥
আয়া হোঁ যো চড়ে ঘোড়ে, তস্‌দিয়া পায়া হোঁ বড়ে,
ও লেকেন ভুল গেয়া সব।
খেলাপ না কহো বাবু, তোম্‌নে মুঝে কিয়া কাবু,
মেই রোই তুঝে দেখা যব॥
চিন্‌ লিয়ে দেওকে এয়্‌সে, আপ কে সুরত যেয়্‌সে,
ছুনিয়ামে পয়দা কিয়া সোহি।
দেখা হো মুলুক কেত্তা, ছত্রিয়েমে রাজা যেত্তা,
তেরা মোকাবিলা নাহি কোহি॥
বীরসিংহ নামে রাজা, জাত্‌মে হ্যায়্‌ বড়া তাজা,
শোন হোঁগে ওন্‌কা জেকের।
ওন্‌কা ঘরমে লেড়্‌কী এক, তারিফ করোঁ মে কেত্তেক,
রাত দিন সাদিকা ফেকের॥
কওল এত্না কি হেয় ও, হুজিমত্‌ হি দেগাযেও,
শাস্ত্রমে ওহি ওস্‌কা নাথ।
তোমারা হোঁ এসা জান, যো কহোঁ সো কহা মান,
তোম সকোগে আও হামারে সাত॥
বিরলে ডাকিয়া নিয়া, সুন্দর সুস্থির হৈয়া,
শুনিলা বিশেষ আর কথা।
বিবাহ হইল বাই, পক্ষী হৈয়া উড়ে যাই,
নিবসি রমণীমণি যথা॥
পিয়া-বিদ্যানাম সুধা, সুন্দরের গেল ক্ষুধা,
রত্নাগারে করিলা শয়ন।
ঘোরতর নিশি শেষ, ধরি কালী নিজ বেশ,
সবিশেষ কহেন স্বপন॥
ভাব কেন ওরে ভক্ত, আমি তব অনুরক্ত,
সেও তো আমার দাসী বটে।
পরম রূপসী সেই, একান্ত জানিবে এই,
তরুণী তোমার তরে ঘটে॥

প্রথমেতে গুপ্ত কায, ব্যক্ত শেষে মহারাজ,
কোটালে কহিবে কাটিবারে।
সে কিছু মানস নয়, কেবল দর্শাবে ভয়,
পরিচয় লইবার তরে ॥
সন্ধান করিবে পুনঃ, কারণ ইহার শুন,
প্রাতে চল বীরসিংহ দেশ।
একাকী যাইবা তুমি, সঙ্গে সঙ্গে যাব আমি,
কদাচ না ভাবিও রে ক্লেশ ॥
দশম দিবস গৌণ, এত বলি মাতা মৌন,
স্বস্থানে প্রস্থান কৈলা শিবা।
শ্রীকবিরঞ্জনে কয়, রজনী প্রভাতা হয়,
নিদ্রাভঙ্গে দেখে ধীর দিবা ॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা

স্বপ্নে শৈলসুতা আজ্ঞা সত্য মনে বাসি। জায়া হেতু যোগে যাত্রা করে গুণরাশি ॥
বিল্বপত্র আঘ্রাণ লইয়া গুণধাম। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হেতু জপে দুর্গানাম ॥
সেইক্ষণ মাহেন্দ্র কহিব বাড়া কিবা। দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ বামে শব শিবা ॥
ধেনু বৎস প্রযুক্ত সম্মুখে বরাঙ্গনা। পূর্ণকুম্ভ কক্ষে মত্তকুঞ্জরগমনা ॥
বুঝিলা বিনোদবর বিদ্যাবতী লাভ। প্রসন্না পর্ব্বতপুত্রী প্রকৃষ্ট প্রভাব ॥
এড়াইল স্বদেশ বিদেশ দিল দেখা। মহারণ্যে মহাকবি প্রবেশিলা একা ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা নাহি চলে রাত্র দিবা। কি ভয় সঙ্কটে সদা সঙ্গে সঙ্গে শিবা ॥
পথশ্রমে যদ্যপি জন্মায় বড় ক্ষুধা। শ্রুতিপথে পিয়ে বিদ্যানামরসসুধা ॥
বনে বনচর কত চরিয়া বেড়ায়। তুষ্টতর তারা তারে ফিরে না তাকায় ॥
ভক্তে ভয় দর্শাইতে দেবী ভগবতী। মায়ায় সৃজিলা নদী বেগবতী অতি ॥
ছিল না কাণ্ডারী তরী অত্যন্ত গভীর। তালবৃক্ষ তুল্য ভাসে প্রলয় কুম্ভীর ॥
সুতুঙ্গতরঙ্গরঙ্গ অঙ্গ কাঁপে ডরে। ফাঁপর হইল ফিরে যেতে চাহে ঘরে ॥
হেনকালে শুনহ অপূর্ব্ব এক কথা। অকস্মাৎ মহাযোগী উপস্থিত তথা ॥
বিভূতিভূষিত তনু কণ্ঠে অক্ষমাল। তাম্রবর্ণ জটাভার দুই চক্ষু লাল ॥
করোপরে ত্রিশূল শার্দ্দূলচর্ম্ম কক্ষে। উৎপত্তি প্রলয়স্থিতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষে ॥
যোগী জেনে যতনে যুড়িয়া দুই পাণি। ধরা লোটাইয়া পড়ে চরণ দুখানি ॥
যোগী জিজ্ঞাসিল কহ সত্য সমাচার। কি নাম কোথায় ধাম তনয় কাহার ॥
সুন্দর কহেন নিবেদন মহাশয়। কাঞ্চিদেশ ধাম গুণসিন্ধুর তনয় ॥
সুন্দর আমার নাম বিদ্যা-ব্যবসাই। বিদ্যা অন্বেষণে বীরসিংহদেশে যাই ॥
যোগী বলে একাকী বিষম ঘোর বনে। পথপ্রাজ্ঞ নহ তুমি যাইবে কেমনে ॥
পুনরপি কহে আমি পথপ্রাজ্ঞ নই। ভরসা কেবলমাত্র কালী কৃপাময়ী ॥
দনুজ-দলনী শ্যামা জননী যাহার। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ভয় কি তাহার ॥

আরবার যোগী বলে শুনহে বালক। শিবপদ ভজ তিনি জগতপালক॥
আশুতোষ দেবদেব সৌখ্যমোক্ষদাতা। সঙ্কটে শঙ্কর বিনা কেবা ভয়ত্রাতা॥
স্নান কর শুচি হও দণ্ড তুই রহ। কালীমন্ত্র পরিহর হরমন্ত্র লহ॥
কোপে কাঁপে কলেবর কবি কহে কটু। বুঝিলাম আগমে নিগমে বড় পটু॥
কেন নহিবেক চাহি এমনি যে ভক্তি। কোন গুরু কহেছেন শিব ছাড়া শক্তি॥
শৈলপুত্রী মুক্তিকর্ত্রী জগদ্ধাত্রী কালী। মূঢ়তা প্রকাশ কর একি ঠাকুরালী॥
তোমার বাতাসে সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয়। এত বলি অধোমুখে মৌনভাবে রয়॥
ক্ষণেক অন্তরে কবি ফিরে দেখে পাছে। ঘুচিল মায়ার নদী যোগী নাহি কাছে॥
শুনিলা শ্রবণে কবি দৈববাণী এই। মিথ্যা নহে স্বপ্নকথা সত্য সত্য সেই॥
ভয় নাই ভকত ভুবনে শীঘ্র যাবা। গুণনিধে গুণবতী গত মাত্র পাবা॥
আনন্দসাগরে ভাসে কবি গুণধাম। সেই নিশি সেইখানে করিলা বিশ্রাম॥
পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন। শ্রীদুর্গা স্মরণ করি করিলা গমন॥
কাঞ্চিপুর হইতে সহর বর্দ্ধমান। ছয় মাসে আসে লোক কণ্ঠাগত প্রাণ॥
কেমন কালীর কৃপা কি কব বিশেষ। দশম দিবসে কবি করিলা প্রবেশ॥
প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপামই। আমি তুয়া দাস-দাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ

(রাজধানী ও গড় বর্ণন)

প্রভাতে উদয়াদিত্য, সুন্দর প্রফুল্লচিত্ত,
প্রবেশিলা বীরসিংহদেশ।
স্বচ্ছন্দ সকল লোক, নাহি রাগ দুঃখশোক,
নাহি কোন অধর্ম্মের লেশ॥
দিব্য পরিচ্ছদ পরে, গান বাদ্য ঘরে ঘরে,
তিলেক নাহিক তালভঙ্গ।
বালবৃদ্ধ যুবা কিবা, এই রসে রাত্রিদিবা,
রাগরঙ্গ উত্তম প্রসঙ্গ॥
পরস্পর সুকৌতুক, কাব্যছাড়া একটুক,
কদাচিৎ মুখে নাহি ভাষা।
গোধনরক্ষক যারা, সঙ্কীর্ত্তন ভাষে তারা,
কে বুঝে পণ্ডিত কেবা চাষা॥
পরম পবিত্র রাজ্য, পরস্পর পুণ্যকার্য্য,
সুরাচার্য্য সদৃশ অনেক।
কল্পতরুতুল্য ভূপ, আধিপত্য নানারূপ,
দীন নাহি সে দেশে জনেক॥
চৌদিকে চৌপাড়িময়, পাঠ, চায় পড়ুয়াচয়,
দ্রাবিড়-উৎকল-কাশীবাসী।

কারো বা ত্রিহুত বাড়ী, বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি,
আগমন বিদ্যা অভিলাষী ॥
দেবালয় ঠাঁই ঠাঁই, অতিথির সীমা নাই,
ব্রহ্মচারী যতি বানপ্রস্থ।
বেদবেত্তা আগমজ্ঞ, ভূত-ভবিষ্যৎ-প্রাজ্ঞ,
স্বধর্ম্মেতে নৈষ্ঠিক সমস্ত ॥
অযাচক লক্ষ লক্ষ, বাসনা সাযুজ্য-মোক্ষ,
ভক্ষণ কেবলমাত্র বায়ু।
প্রচণ্ড-প্রতাপ-ধর, জ্যোতির্ম্ময় কলেবর,
যোগবলে দীর্ঘ পরমায়ু ॥
প্রাচীন পণ্ডিত বৈদ্য, ঔষধ প্রয়োগে সদ্য,
ব্যাধি মুক্ত, কালেতে বিয়োগ।
ভূপতির আস্থা আছে, যাতায়াত নিত্য কাছে,
চিরবৃত্তি সুখে করে ভোগ ॥
দেখিতে দেখিতে দূর, দেখিলেন রাজপুর,
অমরাবতীর প্রায় লাগে।
বাহিরে সহরখানা, আগে নেওয়াতির থানা,
ধমকে অমনি ভূত ভাগে ॥
থামে বান্ধা কত বাজী, ইরাণি তুরকি তাজি,
মধ্যে গাজী বসেছে সবাই।
বুকেতে ঝাম্পান ঢাল, যুগল লোচন লাল,
গোরা গায় চিক্কণ কাবাই ॥
তার আগে দড় দড়, পাঠানের চৌকী বড়,
ফাটকে আটক আঁটাআঁটি।
বিদেশীর লয় ঝাড়া, সেপাই আছয়ে খাড়া,
হুজ্জতে ফেলায় মাথা কাটি ॥
আফিঙ্গে হামেশা মত্ত, হুঁসিয়ার দরবস্ত,
ঘুমে আঁখি কুমারের চাক।
ব্যাঘ্রতুল্য বস্থে আছে, গোলাম দাঁড়ায়ে কাছে,
গর্ব্বেতে গোঁপে দেয় পাক ॥
কিবা কহে বিজিবিজি, কত বুঝি নাও বুঝি,
বিষম মগজ সদা টেরা।
ওরে বহিনা ভুরজারি, এয়সারে শ্বশুরা গারি,
বাঙ্গালিরে দেখে যেন ভেড়া ॥
মগধী শোয়ার যারা, বিষম কাটাও তারা,

মহিমা অসীম পরাক্রম।
তাকাইতে একটুক, ভয়ে প্রাণ ধুকধুক,
কেবল সাক্ষাৎ তুল্য যম॥
তুরাণি মোগলঘটা, চাঁপদাড়ী মেতীকটা,
মাথার উপরে হেঁড়ে পাগ।
পারসি আরবি কয়, কভু নাহি মৃত্যুভয়॥
সমরে প্রখর যেন বাঘ॥
মোল্লা মোকাদিমা কাজি, আখিল এন্সাফ রাজি,
ইয়ে হফীজকে কিয়ে আওয়াজ।
কোনরূপে নহে কাঁচা, দিন এমানত সাঁচা,
পাঁচ ওক্তে করয়ে নমাজ॥
কোহি দেলমে নেহি সুজে, ক্যা হোগা আখের মুঝে
কিয়া হোঁ বহুত বুরা কাম।
সাহেব জি পানা দেও, এস্থাই আরজ লেও,
পড়াহোঁ লাচার বড়া হাম॥
তার আগে খোবখানা, নানা রঙ্গে পক্ষী নানা,
ময়না মদনা কাকাতুয়া।
টিয়া তোতা ফরিয়াদী, কাজালা চন্দনা আদি,
হিরামন লালমন শুয়া॥
পাহাড়িয়া যত পাখী, দেখিতে জুড়ায় আঁখি,
দাঁড়ের উপরে আছে ঝুলি।
শিবদুর্গা শিবরাম, সদা রাধা কৃষ্ণনাম,
না পড়াতে পড়ে এই বুলি॥
পিলখানা তার আগে, চিত্তে চমৎকার লাগে,
নীলগিরি তুল্য করিবর।
হাজার হাজার আর, ঠাঁই ঠাঁই কৃষ্ণসার,
নীলগাই বাউট বিস্তর॥
লোহার জিঞ্জির পায়, চক্ষু পাকাইয়া চায়,
পিঁজারায় পোষা কত শের।
উল্লুক ভল্লুক মেড়া, সেয়াগোস ভৈঁস গড়া,
জোরায়র জানোয়ার ঢের॥
যাম্যে দামোদর নদ, গড়ভুক্ত বাঁকা নদ,
চৌদিকে বেষ্টিত বঁড়ুবাঁশ।
বুরুজ বিষম উচ্চ, পাহাড় তাহার তুচ্ছ,
জলে চরে লক্ষ লক্ষ হাঁস॥

তোপধ্বনি সীমা কিবা, হুড় হুড় রাত্র দিবা
নিরন্তর ভূমিকম্প তথা।
নামজাদা মালগুলা, গায় মাথা রাঙ্গা ধূলা,
বিক্রমের কত কব কথা॥
গাছে ডানা মারে আঁটী, ধমকেতে মাটী ফাটী,
গোড়াসুদ্ধা উপাড়ে অমনি।
পিছে হটে মারে তাল, দেখিতে সাক্ষাৎ কাল,
অকালেতে জলদের ধ্বনি॥
বাহুযুদ্ধে যুঝে ভেলা, ভূমে পড়ে করে খেলা,
সন্ধান সবাই ভাল জানে।
পরস্পর ছিদ্র চায়, যে যারে পালোটে পায়,
হাঁ করিয়া একা চোট হানে॥
কোটি কোটি তিরন্দাজ, যে যা বিন্ধে একান্দাজ,
রায় বাঁশে কেহ নহে টুটা।
বাঘে ও মহিষে লড়ে, ধারা বয়্যা রক্ত পড়ে,
কম কে সমান যুঝে তুটা॥
সপ্ত গড় ক্রমে ক্রমে, সুকবি সুন্দর ভ্রমে,
কত ঠাঁই কত চমৎকার।
কালিকার পূর্ণ দৃষ্টি, পুরী বিশ্বকর্ম্মাসৃষ্টি,
সৃষ্টিতে তুলনা নাহি যার॥
ধন্য ধন্য পুণ্য দেশ, কি কহিব সবিশেষ,
সাক্ষাতে শঙ্করী হেন বাসি।
কালী-পাদপদ্ম-তলে, শ্রীকবিরঞ্জন বলে,
আনন্দিত কবি গুণরাশি॥

বাজার বর্ণন

তায় আগে দেখে কবি রাজার বাজার। বিদেশী বেপারি বৈসে হাজারে হাজার॥
বণিজি দোকান কত শত শত ঠাঁই। মণি মুক্তা প্রবাল আদির সীমা নাই॥
বনাত মখমল পট্টু ভুসনাই খাসা। বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাসা॥
মালদই নলাটী চিকণ সরবন্দ। আর আর কত কব আমির পছন্দ॥
বিলাতি বহুত চিজ বেস কিম্মতের। খরিদ্দার নাহি পড়্যা পড়্যা আছে ঢের॥
সুলভ সকল দ্রব যা চাই তা পাই। বাজারে বেসাত্তি নাই রাজার দোহাই॥
হাতির আমারি পিঠে বাঘাই কোটাল। শমন সমান দর্প দুই চক্ষু লাল॥
চৌগোঁফা গ্রজাই দাড়ি খুলিয়াছে ভাল। সফেদ পোষাক পরা কলেবর কাল॥
রক্ত চন্দনের ফোঁটা বিরাজিত ভালে। পূর্ব্বদিক প্রকাশ যেমত উষাকালে॥

ভবানীর বড় ভক্ত ভয় নাহি মাত্র। যার পানে চায় তার কাঁপি উঠে গাত্র॥
দুই পাশে চৌরি ঝাড়ে হাবেশী গোলাম। সরদার লোকে যত করিছে শেলাম॥
আগে ডঙ্কা সন্তরি সন্তরি চন্দ্রবাণ। বাজে দামা জগঝম্প ভেঁওরি বিষাণ॥
হাজার সোয়ার সঙ্গে পাঠান সকল। ধমকে চমকে তনু ধরা যায় তল॥
নকিব ফুকারে সদা হাজারির ভুর। সহরে সোরত পড়ে যার বাহাদুর॥
সুন্দর হাসেন মনে থাক দিন কত। পাছে যাবে বুঝাপড়া বাগাদুরি যত॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সরোবর বর্ণন

তদন্তরে দেখে কবি দিব্য সরোবর। স্ফটিকে নির্ম্মিত ঘাট পরম সুন্দর॥
তীরতরু সুবর্ণ-নিবদ্ধ শাখামূল। মঞ্জুল বঞ্জুলবনে মত্ত অলিকুল॥
নিরমল জল শতদল বিকসিত। ঈষৎ পাণ্ডুর সিতাসিত রক্ত পীত॥
হংসহংসীসঙ্গে সঙ্গ রঙ্গরস ক্রীড়া। বিয়োগীজনার চিত্তে জন্মে মহাপীড়া॥
শৈত্য ও সৌগন্ধ মান্দ্য ত্রিবিধ পবন। তত্র মনোভাব আবির্ভাব অনুক্ষণ॥
ধন্য বনস্থল সেই কি কহিব কথা। এককালে মূর্ত্তিমন্ত ছয় ঋতু যথা॥
অতি চিত্র বিচিত্র শুনহ ক্রমে ক্রমে। ক্ষণেক নলিনীশোভা হত হিমাগমে॥
ক্ষণে শীত বিপরীত কম্পমান তনু। সুধাসম হিতকারী ভানু ও কৃশানু॥
বলবন্ত বসন্ত দুরন্ত অদভুত। রতিপতি রথী পথ মলয়মরুত॥
এমত রহস্য কাম সে নিজে অনঙ্গ। ধৃত পুষ্পধনু চারু গুণচর ভৃঙ্গ॥
মহাপাত্র সুপাত্র স্বকীয়গণ ওই। তথাপিও মনোরথ ত্রিজগত-জই॥
অলিকুল বিকল বকুলে পিয়ে মধু। গুঞ্জরে মঞ্জির রব পরভৃতবধূ॥
পুষ্করাগ্রে পুষ্কর করীতে লয় তুলি। নিকটে করিণীমুখে যাচে কুতূহলী॥
চক্রবাক চক্রবাকী খেলে চঞ্চুপুটে। খঞ্জন-খঞ্জনী-প্রেম তিলেক না টুটে॥
ক্ষণে বিষতুল্য কর সুতাপিত মহী। সুপ্ত শিখী তদঙ্কে নিঃশঙ্কে রহে অহি॥
মৃগেন্দ্রে গজেন্দ্রে নিবসতি একঠাঁই। এমন জাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রমধ্যে নাই॥
কষ্টতাপে চাতকচাতকী উর্দ্ধে তাকে। বুঝা যায় সঠিক ফটিকজল ডাকে॥
ক্ষণেক গগনে ঘন ঘোরতর রব। সখি দেখি শিখী শিখি সঘনে তাণ্ডব॥
ডাহুকা ডাহুকী ডাকে ভেকের কৌতুক। প্রমদা প্রমোদ নাহি ত্যজে একটুক॥
সারস সারসী নাচে দোঁহে মত্তজ্ঞান। বিষম মকরকেতু তাহে বলবান॥
উচ্চতর বিকসিত কদম্ব মঞ্জুল। বিরহিণী কামিনীজনার নেত্রশূল॥
ক্ষণে ক্ষণে গুরুতর গরজে জলদ। বিন্দুপাত নাহি মাত্র কেবল শবদ॥
প্রসাদ কহিছে কালীচরণ কমলে। বসিল বিনোদবর বকুলের তলে॥

বকুলতলায় সুন্দর দর্শনে নগর-নাগরীদিগের উক্তি

[রাগিণী বাহার, তাল যৎ]

কি মনোহর রূপপুঞ্জ সখি ঐ, তুলনা কব কি বলনা সই।
নিকটে বারেক চলনা যাই॥

কি মেরুশিখর, কিবা বিধুবর, বিবেচনা কর, কি তরুতলে।
শিখরী অচল, এ দেখি সচল, সপঙ্ক সমল, সকলে বলে॥
কেহ কহে হাসি, মনে হেন বাসি, সৌদামিনীরাশি, এমনি হবে।
আর জন কহে, যে কহ সে নহে, সৌদামিনী রহে, স্থিরতা কবে॥
কি রূপ-লাবণ্য, এ পুরুষ ধন্য, বিধি কার জন্য, গঠিল বটে॥
কহে এক সতী, সেই ভাগ্যবতী, সুন্দর এ পতি, যারে লো ঘটে॥
হৃদয়মাঝারে, রাখিয়ে ইহারে, নয়ন দুয়ারে, কুলুপ দিয়া।
রূপ নহে কালো, নিরখিতে আলো, দেখ সখি আলো, আঁখি মুদিয়া॥
কহে রামা আর, গলে পরি হার, এ হার কি ছার, ফেলি গো টেনে।
আশা পুরে তবে, হেন দিন হবে, কোনদিন কবে ঘটাবে এনে॥
কহে কোন আই, আমি যদি পাই, পলাইয়া যাই এ দেশ থেকে।
নারীকলা ফান্দে, বান্ধি নানা ছান্দে, প্রাণ বড় কান্দে, দেনা লো ডেকে॥
কেহ কহে আজি, ওকে করো রাজি, শেষে দিয়া বাজী না দিব ছেড়ে।
শাশুড়ি-শ্বশুর, নাহি পতি দূর, শূন্য মোর পুর, কে দিবে তেড়ে॥
কহে কোন নারী, হয় আজ্ঞাকারী, ভুলাইতে পারি, এ গুণ আছে।
বিধবা যে গুলা, বিষম ব্যাকুলা, চক্ষে দিয়া ধূলা, লবে গো পাছে॥
কেহ বলে চল, দাঁড়ায়ে কি ফল, হৃদয়ে বিকল, হৈয়াছি মোরা।
কামানল চয়, করিছে সঞ্চয়, তনু অপচয়, হবে গো ত্বরা॥
তুমি মনোরথ, বুঝেসুঝে ব্রত, আগুলিলা পথ, না পারি যেতে।
পরস্পর বলে, চরণ না চলে, আইলাম জলে, আপনা খেতে॥
কত কুলদারা, চকোরীর পারা, নিরখিছে তারা, সে মুখশশী।
কে ভরে জলসে, ভাসায়ে কলসে, অতনুঅলসে, রহিল বসি॥
শ্রীপ্রসাদে ভণে, পীড়া দিয়া মনে, নিজ নিকেতনে, সকলে চলো।
শুন সার কই, এ কবি বিজই, বিদ্যা হেতু ওই, এসেছে ওলো॥ ধ্রু।

কুলের কামিনী কুঞ্জরগামিনী কি অপরূপ রূপসী।
নাভি-সরোবর, পীন পয়োধর, বদন বিমল শশী॥
দশনমুকুতা, মৃদুহাস্যযুতা, অমিয়জড়িত ভাষা।
সুনীল উৎপল, লোচন চঞ্চল, বেসোরে ভূষিত নাসা॥
কি ভুরুভঙ্গিমা, দিঠী সুরঙ্গিমা, যোগিজন-মন হরে।
নিন্দিত অমিয়, কান্তি কমনীয়, চপলা চমকে ডরে॥
চারু কৃশোদরী, গর্ব্ব পরিহরি, হরি বনবাসী ওই।
রম্ভাতরু উরু, অতিশয় গুরু, নিতম্ব তুলনা কই॥
যুবতী নবোঢ়া, কত বেনে প্রৌঢ়া, স্নান হেতু চলে জলে।
যুবক সুন্দর, রূপ মনোহর, বিশ্রাম বকুল-তলে॥

জাগত অনঙ্গ, ঘন কাঁপে অঙ্গ, কক্ষচ্যুত হেমঘট।
রূপ পানে চেয়ে, ধৈর্য্যমাথা খেয়ে, হিয়ে করে ছটফট ॥
কেহ কহে রাম, কেহ কহে কাম, কহে আর এক সতী।
রাম কাম নয়, এই মহাশয়, অমরাবতীর পতি ॥
কেহ কহে সই, নাগো আমি কই, পুরুষের কালা কানু।
ইথে নাহি বাধা, বিদ্যাবতী রাধা, এবে দোঁহে গোরাতনু ॥

মালিনীর সহ সুন্দরের পরিচয়

মালাকার দারা হীরা, পুষ্প দিয়া ঘরে ফিরা
যেতে পথে শুনে লোকমুখে।
তরুতলে রূপরাশি, নিরখে নিকটে আসি,
আপনা পাসরে রামা সুখে ॥
জিজ্ঞাসে জুড়িয়া কর, হেদে হে পুরুষবর,
কোথা ঘর কাহার নন্দন।
মনুষ্যশরীরছলে, সহস্রাক্ষ ক্ষিতিতলে,
কিবা হবে রোহিণীরমণ ॥
অথবা মকরকেতু, বিদ্যাবতী লাভ হেতু,
আগমন কারণ বিশেষ।
পূর্ব্বে পোড়াইল হর, হারাইলা পঞ্চশর
তথাপিও জয়ী সর্ব্বদেশ ॥
কিবা রূপ কি লাবণ্য, জনক তোমার ধন্য,
কত পুণ্যে জন্মে হেন পুত্র।
যে তব প্রসবস্থলী, ভাগ্যবতী তারে বলি,
সে ধনী সমান নাহি কুত্র ॥
হাসি কহে গুণধাম, সুন্দর আমার নাম,
গুণসিন্ধু রাজার নন্দন।
কিন্তু বিদ্যা ব্যবসাই, বিদ্যা অন্বেষণে যাই,
বিদ্যা হেতু বিদেশে গমন ॥
অধিক কহিব কিবা, বিদ্যা বিদ্যা রাত্রি দিবা,
মনে মনে একান্ত ভাবনা।
সেবি বিদ্যা, বিদ্যা লাগি, হইয়াছি দেশত্যাগী,
যদি বিদ্যা পুরান্ কামনা।
বুঝিয়া বাক্যের ছল, হীরাবতী খল খল,
হাসে ভাষে বটে হে বুঝেছি।
বিদ্যায় ভকতি আছে, বিদ্যালাভ হবে পাছে,
আমি পরিচয় যে দিতেছি ॥

হীরাবতী নাম ধরি, বাসে বসি একেশ্বরী,
পতি পুত্র কন্যা কেহ নাই।
উদর উপায় মূল, রাজকন্যা লয় ফুল,
যাতায়াত নিত্য সেই ঠাঁই॥
পরম রূপসী রামা, তুষ্টা শ্যামা গুণধামা,
বিচারে জিনিবে যেই জন।
সেই তার হৃদয়েশ, খ্যাত ইহা সর্ব্বদেশ,
বিষম ধনুকভাঙ্গা পণ॥
বাকি কোথা আছে কেটা, যতেক রাজার বেটা,
এসে হাসাইয়া গেল মুখ।
আগে শুনি বড় ভুর, শেষে হয় দর্প চুর,
কিন্তু নৃপতির নাহি সুখ॥
সে ধনী পাইবে যেই, বড় ভাগ্যবন্ত সেই,
তুলনা তাহার কার সঙ্গে।
সমুদ্রমন্থনে নিধি, উপজিল যত বিধি,
নিরমিল প্রতি অঙ্গে অঙ্গে॥
আর শুন গুণযুত, তব নামে ভয়ীসুত,
কহিতে বড়ই ভয় বাসি।
যদ্যপি না ঘৃণা কর, থাকহ আমার ঘর,
ধর্ম্মত তোমার আমি মাসী॥
গুণরাশি কহে হাসি, ভাল গো ভাল গো মাসি,
বল মাসি বাড়ী কতদুর।
মালিনী কহিছে দূর, নহে বাপু ওই পুর,
এসো মোর বাপের ঠাকুর॥
মালি-মহিলার সঙ্গে, চলিল পরম রঙ্গে,
সেনারূপে পথ করে আলো।
কালীপাদপদ্মতলে, শ্রীকবিরঞ্জনে বলে,
বাসা তো মিলিয়া গেল ভালো॥

বিদ্যার রূপ বর্ণন

সুন্দর কহেন মাসি মোর দিব্য লাগে। বিদ্যার রূপের কথা কহ শুনি আগে॥
আগো মেনে একি ঠাট ঠাটে কহে হীরা। বালাই সেটের বাছা কেন দেও কিরা॥
সে রূপের সীমা করে এত শক্তি কার। সে পারে কহিতে কিছু শতমুখ যার॥
পৃথিবীতে বড় আর কেবা তোমা বই। না কহিলে নয় তাই যা জানি তা কই॥
চাচর চিকুরজাল জলধর জিনি। শ্রুতিযুগে পরাভব পাইল গিধিনি॥

ডুবিল কুরঙ্গশিশু মুখেন্দুসুধায়।   লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়॥
নয়নের চঞ্চলতা শিখিবার তরে।   অদ্যাপি খঞ্জন নিত্য কর্ম্মভোগ করে॥
অমিয়জড়িত ভাষা নাসা তিল ফুল।   বিম্বাধর দশনে মুকুতা নহে তুল॥
পুষ্পধনু ধনু অণু কি ভুরুভঙ্গিমা।   বাহু তুল নহে বিসে কিসের গরিমা॥
যৌবনজলধি মধ্যে মগ্ন মত্ত গজ।   উরে দৃষ্ট কুম্ভস্থল সে নহে উরজ॥
নাভিপদ্ম পরিহরি মত্ত মধু পান।   ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণকুম্ভস্থান॥
কিম্বা লোমরাজিছলে বিধি বিচক্ষণ।   যৌবন কৈশোরে দ্বন্দ্ব করিল ভঞ্জন॥
কেহ বলে মধ্যস্থল নাহি কি রহস্য।   কেহ বলে দেবসৃষ্টি থাকিবে অবশ্য॥
সূক্ষ্ম বিবেচনা তাহে বুঝিবে প্রবীণ।   বিজ্ঞ বট ভাব দেখি কি প্রকার ক্ষীণ॥
নিবিড় বিপুল চারু যুগল নিতম্ব।   কাম-পারাবার-পার-সার-অবলম্ব॥
যদ্যপি অচির প্রভা চিরস্থির হয়।   তবে বুঝি তনুশোভা হয় কিবা নয়॥
মন্দ মন্দ গমনে যদ্যপি বাঁকা চায়।   মনোভব পরাভব লইয়া পলায়॥
কোন্ বা বড়াই তার পঞ্চশর তূণে।   কতকোটি খরশর সে নয়নকোণে॥
পোড়াইয়া কাম নাম বটে স্মরহর।   তাঁহার অসহ্য বালা হানে দৃষ্টিশর॥
রূপবান্ বট বাপু গুণ কত ঘটে।   বিচারে জিনিতে পার তবে জানি বটে॥
হৃদয়ে সন্তোষ গুণরাশি কহে হাসি।   গুণ না থাকিলে মাসি এতদূরে আসি॥
কালীপাদপদ্মেতে যদ্যপি মন রহে।   অবলা বিচারে জিনা বড় কর্ম্ম নহে।
ফিরে বলে হীরে শুন পুরুষরতন।   তরুণী তোমার তরে বুঝিলাম মন।
ক্ষণেমাত্র উপনীত মালিনীনিলয়।   রন্ধন ভোজন করে কবি মহাশয়॥
বিনোদ শয্যায় সুখে করিল শয়ন।   পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন॥
শ্রীরামপ্রসাদ কহে কালী পদতলে।   নিদ্রা ত্যজি সুন্দর উঠিলা কুতূহলে॥

অথ মালঞ্চ বৃত্তান্ত

অদূরে উদয় রবি,   নিদ্রা ত্যজি উঠে কবি।
শিরসি-কমলে, দশ-শতদলে, চিন্তয়ে শ্রীনাথচ্ছবি॥
জপয়ে শ্রীদুর্গানাম,   পূর্ণ হেতু মনস্কাম।
প্রাতঃস্নান করি, ধৌত ধুতি পরি, সঙ্কল্প গুণধাম॥

নিকটে মালঞ্চ শুষ্ক,   দেখি মনে বড় দুঃখ.
সে জন গমনে, কুসুম কাননে, বিকসিত হয় পুষ্প॥
কাঞ্চন কস্তুরী বক,   অপরাজিতা চম্পক।
মালতী মল্লিকা, কুন্দ সেফালিকা, কেতকী বর্ণে কনক॥

জুতি গন্ধরাজ ফুল,   নাগকেশর বকুল।
কিংশুক রঞ্জন, কদম্ব মঞ্জন, কামিনীনয়নশূল॥
সুন্দর সৌরভ ছুটে,   মন্দ মন্দ বায়ু বটে।
নাসারন্ধ্রে ঘ্রাণ, স্মরে দহে প্রাণ, চমকিয়া হীরা উঠে॥

গতি গজ জিনি মন্দ, হৃদয় পরমানন্দ।
কোকিল কুজিত, ভ্রমর গুঞ্জিত, ফুলে পিয়ে মকরন্দ॥
ভ্রমিতে কাননমাঝ, সম্মুখে যুবকরাজ।
পুটাঞ্জলিপাণি, মুখে মৃদু বাণী, কহে তব এই কাজ॥
সামান্য পুরুষ নহ, স্বরূপে আমাকে কহ।
পূর্ণব্রহ্ম হরি, নররূপ ধরি, কি হেতু তুমি ভ্রমহ॥
কত পুণ্যপুঞ্জ মম, ধন্য কেবা মম সম।
শুন মহাশয়, ধন্য মমালয়, অতিথি শ্রীনরোত্তম॥
গুণরাশি কহে হাসি এ কথা না ভালবাসি।
হেদে শুন কই, সাপরাধি হই, তুমি গো ধর্ম্মত মাসী॥
হীরাবতী মনে হাসে, সুধার সাগরে ভাসে।
শ্রীপ্রসাদ বলে, কবি কুতূহলে, চলিল মালিনীবাসে।

মালিনীর পুষ্পচয়ন ও হাটে গমন

সুন্দর চলিয়া গেলা মালিনীনিলয়। পরম কৌতুকে রামা তোলে পুষ্পচয়॥
তোলে বক চম্পক কস্তুরী সেফালিকা। জাতি জুতি গন্ধরাজ মালতী মল্লিকা॥
শতদল স্থলপদ্ম সূর্য্যমণি ফুল। কুন্দ জবা কৃষ্ণকেলি টগর বকুল॥
কাঞ্চন মাধবীলতা শোণ সর্ব্বজয়া। অশোক অপরাজিতা নিশিগন্ধা কেয়া॥
সেউতি গোলাব নাগকেশর সুগন্ধ। কিংশুক ধাতকি ঝিন্টি তোলে মুচকন্দ॥
তুলিল কুসুম যত কত কব নাম। পাঁচ সাত সাজি পূরি চলে নিজ ধাম॥
বার দিয়া বসিল বিনোদবর পাশে। বাসনা বলিতে নারে ফিক্ ফিক্ হাসে॥
ভাবে কবি এ মাগী বয়সে দেখি পোড়া। ভাবে দেখি এ প্রকার হয় নাই বুড়া॥
কটির কাপড় গাটি কতবার খোলে। ভুজপাশ উদাস গা ভাঙ্গে হাই তোলে॥
হেসে হেসে আরো এসে ঘনায় নিকটে। কি জানি কপালে মোর কোনখান ঘটে॥
কামাতুরা হইলে চৈতন্য থাকে কার। বিশেষত নীচজাতি নীচ ব্যবহার॥
ভয়ে অতি হীরাবতী প্রতি কহে হাসি। গোটাকত টাকা নিয়া হাটে যাও মাসী॥
প্রমথপতির প্রিয়া পূজা ইচ্ছা আছে। এতবলি বারো টাকা ফেলে দিল কাছে॥
আমি আজি গাঁথি মালা তোমার বদলে। দেখদেখি নৃপতি-নন্দিনী কিবা বলে॥
ভাল বাপু বলিয়া আঁচলে বান্ধে তঙ্কা। হাটে যায় মালিনী সংপ্রতি ঘুচে শঙ্কা॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালীপদ সার। বিরলে বিনোদবর গাঁথে পুষ্পহার॥

সুন্দরের মাল্য গ্রন্থন

বিনা সুত, কি অদ্ভুত, গাঁথে পুষ্পহার।
কিবা শোভা, মনোলোভা, অতি চমৎকার॥
জবা বক, সুচম্পক, কুন্দ সেফালিকা।
জাতিফুল, ও বকুল, মালতী মল্লিকা॥

গাঁথে বীর, করবীর, অশোক কিংশুক।
বাছি লয়, পুষ্পচয়, পরম কৌতুক॥
পদ্ম সঙ্গে, গাঁথে রঙ্গে, স্থলপদ্ম ভালো।
মাঝে মাঝে, গন্ধরাজে আরো করে আলো॥
সমভাগ, গাঁথে নাগ কেশর ধাতকী।
সর্ব্বশেষ, গাঁথে বেশ, কুসুম কেতকী॥
তুলা নাই কোন ঠাঁই, একি অসম্ভব।
দৃষ্টিমাত্র কাঁপে গাত্র জন্মে মনোভব॥
কহে রাম, মনস্কাম, পূর্ণ কর কালী॥
নৃপবালা, পাবে জ্বালা এ গাঁথনী ভালী॥

কবির মাল্যসংক্রান্ত পরিচয় লিখন

যতনে লইয়া কবি ফুল্ল সরসিজ। প্রতি দলে দলে লিখে সবিশেষ নিজ॥
গুণসিন্ধু মহারাজা গুণের গরিমা। প্রবল প্রতাপ ধীর কি কব মহিমা॥
নির্ম্মল সুযশ দশদিক্ করে আলো। সেই অভিমানে চন্দ্র অন্তরেতে কালো॥
সে তেজ তুলনা হেতু ক্রোধযুক্ত রবি। উদয়কালীন নিজ রক্তবর্ণ ছবি॥
ক্রমে সব তেজ প্রকাশিল নানারূপে। তথাপিও কদাচ সমতা নহে ভূপে॥
স্ত্রী পাইয়া হ্রাস পুনঃ হৃদে জন্মে ভয়। ভাস্কর ভাস্কর করে প্রদোষ সময়॥
রত্নাকর নাম বটে ধরয়ে সমুদ্র। নৃপ-রত্নাকর কাছে সে সমুদ্র ক্ষুদ্র॥
অধিকন্তু দোষ তাহে অপেয় সে নীর। ক্ষণজন্মা ক্ষিতিপতি নির্দ্দোষ শরীর॥
কর্ণে শুনি কর্ণ মহাদাতা লোকে কহে। চক্ষে দেখি বুঝিলাম নৃপযোগ্য নহে॥
বিস্তারিয়া বার্ত্তা কি বদনে যায় কহা। ক্ষমাগুণে সমা নন যিনি সর্ব্বসহা॥
সেই মহাশয় পিতা কাঞ্চীপুর ধাম। শঙ্করীর কিঙ্কর সুন্দর কবি নাম॥
শ্রুত মাত্র পণপ্রাণ হেতু সে তোমার। প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণ সকল আমার॥
কর্ণ কহে প্রথমে জন্মিল মম সুখ। চক্ষু কহে দর্শন কর্ত্তব্য বিধুমুখ॥
কাতর রসনা কহে চিরদিন ক্ষুধা। বাসনা বড়ই বিধু-বদনের সুধা॥
নাসা কহে পদ্মিনী সে তদঙ্গ-সুঘ্রাণ। প্রাপ্তমাত্র যাবতীয় দুঃখপরিত্রাণ॥
বিকলে সকলে সাক্ষী করে কহে বাহু। তনু হেম তব আলিঙ্গনে ইচ্ছা বহু॥
মন কহে মিথ্যা নহে সত্য কহি আমি। তোমরা পশ্চাতে রহ হই অগ্রগামী॥
দেহরাজ্যে রাজা সেই কমলিনী শুন। রহিল নিকটে তব না বাহুড়ে পুন॥
নপুংসক মন তবু সুখে করে ক্রীড়া। পাণিনি ব্যবসা যার তার চিত্তে ব্রীড়া॥
কি গুণে বন্দিলা তারে চঞ্চলাক্ষী ধন্যা। অবিচার কর কেন তুমি রাজকন্যা॥
সাজির ভিতরে রাখে সাজাইয়া হার। প্রসাদ কহিছে বালা যায় কোথা আর॥

মালিনীর হাট পরিচয়

হাট করি হীরাবতী ফিরে এলো ঘরে। কোঁথাইয়া বসিল কবির বরাবরে॥
হারামের হাড় মাগী কথা কহে ঠাটে। মাটি খেয়ে বাপু আজি গিয়াছিনু হাটে

প্রথমেতে বণিকের হাতে দিতে টাকা। টঙ্কারিয়া হাতে নিতে মুখ করে বাঁকা॥
ছটা ছিল গরশাল ছটা ছিল মেকি। হরেদরে বুঝিতে টাকায় নাই সিকি॥
বাটাবাদে পাইলাম আড়কাট নয়। কিনিতে বণিকদ্রব্য থোকে গেল ছয়॥
তবে বটে বাপু বাকী তিন টাকা থাকে। মুখে মুখে লও লেখা দিতেছি তোমাকে॥
অগ্নিতুল্য দ্রব্য যত কব আর কি। দু'টাকায় লইলাম দুই সের ঘি॥
এক টাকা সবে মাত্র রহে অবশেষ। কিনিলাম তাহে বলি উপযুক্ত মেষ॥
উপহারদ্রব্য কিছু কিনা যায় নাই। হাতকর্জ্জা লইলাম তেলিনীর ঠাঁই॥
তাও বুঝি হতে পারে সিকা ছয় সাত। খুচরার লেখাজোখা বড়ই উৎপাত॥
স্নান করি খাইদাই লেখা দিব শেষে। উচক্ক সময় এত মনে নাহি এসে॥
পাঁচকড়া কড়ি বাপু খাই নাই মুই। প্রত্যয় না হয় বল গঙ্গাজল ছুঁই॥
টাকা সিকা কোন্ বস্তু কতকাল খাব। বিশ্বাসঘাতকি করে নরকেতে যাব॥
পূর্ব্বজন্মপাপে এত পরিতাপ পাই। দুকুলে এমন নাহি তার মুখ চাই॥
বিধি গুণনিধি মিলাইল তোমা হেন। চোরবাদ হবে মোর না মরিনু কেন॥
এই যে তোমার মাসী বোধে নহে টুটা। কে পারে ভুলাতে কার ঘাড়ে মাথা দুটা॥
পুরুষের কাণ কাটে ধরে শক্তি হীরা। ফাঁকি দিয়া চাকি ভুক্তে গায় করে ফিরা॥
সুন্দর হাসেন মনে আমি এক চোর। চাতুরী করিয়া মাগী কড়ি খায় মোর॥
কবি বলে মরি পাইয়াছ বড় দুখ। স্নানে যাও মাথা খাও শুকায়েছে মুখ॥
হীরা বলে আরে বাছা স্নানে যাব কি। না জানি কি করে মোরে নৃপতির ঝি॥
বিষাদ ভাবিয়া হীরা করে লয় সাজি। প্রসাদ কহিছে কালী রক্ষা কর আজি॥

পুষ্প লইয়া মালিনীর বিদ্যার নিকট গমন

মনে বড় ভয়, না জানি কি হয়, গগনে উঠেছে বেলা।
বীরসিংহ-সুতা, আছে কোপযুতা, কহিবে করিল হেলা॥
যা করেন শিবা, আর চারা কিবা, না গেলে এড়ান নাই।
দাঁড়াইল এই, ত্বরা করি সেই, চলিল বিদ্যার ঠাঁই॥
দাঁড়াইল আগে, সতী কহে রাগে, হেদে বা কোথায় ছিলা।
সকল যোগান, করি সমাধান, কি ভাগ্য যে দেখা দিলা॥
ভুলিলা সে কাল, এবে ঠাকুরাল, গরবে উলয়ে গা।
কানে দোলে গেঁটে, পথে যাও হেঁটে, ঠাহরে না পড়ে পা॥
তোরে বৃথা কই, নিজে ভাল নই, এ পাপ চক্ষের লাজ।
নতুবা ইহার, জানি প্রতিকার, যেমন তোমার কাজ॥
ভূমে সাজি রাখি, ছল ছল আঁখি, কৃতাঞ্জলি হীরা কহে।
রুষ্ট নবগ্রহ, বচন নিগ্রহ, বিগ্রহ আমার দহে॥
ছিল উপরোধ, ক্ষুদ্র দোষে ক্রোধ, এত কি উচিত তব।
বটি নিজ দাসী, চিত্তে এই বাসি, ক্ষমহ বাড়া কি কব॥

এতেক বলিয়া, চলিল কাঁদিয়া, হীরা ফিরে যায় ঘরে।
কালীপদতলে, শ্রীপ্রসাদ বলে, ত্রাহি মা নিজ কিঙ্করে॥

মালা দৃষ্টে বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থা

স্নান করি বিধুমুখী, হৃদয়ে পরম সুখী
পূজে ইষ্টদেবতা শারদা।
চিকণগাঁথনি ফুল, অতিশয় চিন্তাকুল,
অনিমিখে নিরখে প্রমদা॥
দেখিয়া পুষ্পের হার, পূজা করে কেবা কার,
ধ্যানজ্ঞান দুই গেল দূরে।
কাছে ডাকি সুলোচনা, পাতি পড়ে বিচক্ষণা,
অব্যাজে যুগল আঁখি ঝুরে॥
মনেতে জানিল এই, পুরুষ রতন সেই,
দরশন পাইব কিরূপে।
তিলেক বৎসরপ্রায়, বুক ফেটে জিউ যায়,
সখি প্রতি কহে চুপেচুপে॥
হেদে কি হইল সই, দেখদেখি হীরা কই,
ফিরা আমি পায় ধরি তার।
যদি ক্ষমা করে রোষ, এতে কিছু নাহি দোষ,
শুনি গো সকল সমাচার॥
কারে ঘরে দিলা ঠাঁই, বুঝি বা তেমন নাই,
বিদ্যাধর ধরণীমণ্ডলে।
বিরহিণী দেখি আমা, প্রসন্ন হইল শ্যামা,
বিধু মিলাইলা করতলে॥
সখী কয় ধৈর্য্য হও, আজিকার দিন রও,
প্রভাতে পাইবা দেখা হীরা।
এতই কেন উন্মত্ত, মিলিবে সকল তত্ত্ব,
জিজ্ঞাসা করিও দিয়া কিরা॥
বিদ্যা বলে বল বটে, এখনি প্রমাদ ঘটে,
আজি সে বাঁচিলে হৈবে কালি।
হের কণ্ঠাগত প্রাণ, ঝাঁট কর পরিত্রাণ,
সব শেষে যত দাও গালি॥
বুঝি হারা পুন তারা, কহে সারা হও পারা,
বাধ্য নহ সাধ্য কিবা আছে।
রাণীঠাকুরাণী যথা, যাই তথা সব কথা,
নিবেদন করি তাঁর কাছে॥

ভয় দর্শাইয়া নানা, জনে জনে করে মানা,
কষ্টে সৃষ্টে শাস্তাইয়া রাখে।
শ্রীকবিরঞ্জন বলে, জলনিধি উথলিলে,
বালির বন্ধনে কোথা থাকে॥

মালিনীর প্রতি বিদ্যার অনুনয়

যথোচিত মনোভঙ্গ, দুঃখানলে দহে অঙ্গ,
হীরাবতী ভবনে চলিল।
সুকবি সুন্দরবরে, পাছু দিয়া ঢোকে ঘরে,
অনশনে রজনী বঞ্চিল॥

কুহরে কোকিলকুল, ফুটে বনে নানা ফুল
তুলি গাঁথে মনোহর মালা।
নৃপতি-নন্দিনী যথা, লঘুগতি চলে তথা,
বলে লও নৃপতির বালা॥
রাখি হার পরিহার, করে করে ধরি তার,
বলে বিদ্যা বচন মধুর।
কন্যা প্রতি কর কোপ, বুড়ী নও বুদ্ধিলোপ,
মমতা সকল গেল দূর॥

আদ্যোপান্ত এই ধারা, ক্রোধে হই জ্ঞানহারা,
ক্ষণেক সে ভাব নাহি থাকে।
অন্য কে ডরান পিতা, ততোধিক মাতা ভীতা,
জাননা গো তুমি কি আমাকে॥

সহস্র মাথার কিরা, ওগো হীরা চাও ফিরা,
বুক চিরা হৃদে থুই তোরে।
যে কহি সে কথা মান, পুরুষরতন আন,
দুঃখে পরিত্রাণ কর মোরে॥
হীরা কহে করি ছল, ভাল পাইলাম ফল,
বাকী বল আর কিবা আছে।
মরি শোকে নিত্য মোকে, হাসে লোকে কহে তোকে,
বিদ্যা বিনোদিনী ডাকে কাছে॥

তুমি মান্যা রাজকন্যা, বট ধন্যা এত অন্যা-
সনে করিয়াছ কিবা কাজ।
রসময় শুন কই, যুবা নই বৃদ্ধ হই,
একা রই আই মা কি লাজ॥

এতোকাল আছি নিষ্ঠা,, দেখ মিথ্যা অপ্রতিষ্ঠা,
কহ কি শুনিলা কার ঠাঁই।
ক্ষমা কর ঠাকুরাণী, ভব্যতা তোমার জানি,
নির্লজ্জ আমার পর নাই॥
পুনঃ রামা কহে ভাব, ছাড় হীরা পরিহাস,
তোমার চিহ্নিত আমি বটি।
শ্রীকবিরঞ্জন কহে, মিথ্যা নহে, দেহ দহে,
বিদ্যার ধরেছে ছটফটি॥

মালিনী ও বিদ্যার পরস্পর কথোপকথন

একান্ত কাতরা বুঝি বিদ্যা বিনোদিনী। কহে হীরাবতী হাসি শুন কমলিনী॥
জন্মে জন্মে নানা পুণ্যপুঞ্জ তব ছিল। সেই ফল হেতু বর এমনি মিলিল॥
দৃষ্ট নহে শ্রুত নহে রূপ হেনরূপ। গুণসিন্ধু-সুত গুণসিন্ধুর স্বরূপ॥
কাঞ্চীনাম দেশ ধাম সুধাময় হাস্য। সুন্দর সুন্দর নাম পদ্মসুন্দরাস্য॥
বদনে বিরাজে বাণী বিদ্বান্ বিপুল। পঞ্চবক্ত্র পদ্মযোনি প্রায় সমতুল॥
দৃষ্টিমাত্র মম দেহ দহে দিবানিশি। বৃদ্ধার বাসনা হয় বাঁচে কি রূপসী॥
অপরূপ কথা এই কে শুনেছে কবে। ফুটিল মালঞ্চ শুষ্ক যার অনুভবে॥
বিদ্যা বলে বাড়াবাড়ি কথায় কি কাজ। স্নানছলে আমাকে দেখাও যুবরাজ॥
এ দুঃখসাগরে হীরা তুমি এক তরী। হের দাঁতে করি কুটা দুটা পায়ে ধরি॥
ইহা বলি ছিঁড়িয়া দিলেন গলহার। হীরা কহে ঘটকের পাছে পুরস্কার॥
ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে। আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে।
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব। কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

মালিনীর সুন্দর নিকটে বিদ্যার বার্ত্তা কথন

হার দিলা নৃপসুতা, হীরাবতী হাস্যযুতা,
হৃষ্টমতি শীঘ্রগতি চলে।
যথা কবি গুণরাশি, আসি হাসি কহে বসি,
তব জন্ম ধন্য ধরাতলে॥
হীরা কহে শুন শুন, যে করেছি নিবেদন,
তার সাক্ষী হাতে হাতে এই।
জনে করে বহু যত্ন, কোনরূপে মিলি রত্ন,
রত্নজনে যত্ন করে সেই॥
সে ধনী রতন বটে, যতনে পুরুষ ঘটে,
তার ইচ্ছা তুমি হও কান্ত।

চিত্তে বিবেচনা কর, ভাগ্য কি ইহার পর,
শিব-শিবা সদয় নিতান্ত ॥
তব পত্র পাবামাত্র, শিহরিল সর্ব্বগাত্র,
চেতনা রহিত পড়ে মহি।
সখী ডাকে পরিত্রাহি, রামা করে আইঢাহি,
মরমে দংশিল কাম-অহি ॥
ক্ষণেকে ক্ষণেকে জ্ঞান, কহে দহে মোর প্রাণ,
পরিত্রাণ কর মোরে সই।
বিলম্ব বিহিত নয়, না জানি কি পরে হয়,
ফিরাও ফিরাও হীরা কই ॥
আমারে কহিল মন্দ, চিত্তে বড় নিরানন্দ,
প্রভাতে গেলাম তার কাছে।
বিনয় করিল যত, এক মুখে কব কত,
তাহা কি সকল মনে আছে ॥
দশনে লইয়া কুটা, যত্নে ধরে হাত দুটা,
পুনঃ পুনঃ বলে মাথা খাও।
স্নানছলে সরোবরে, সুপুরুষ গুণধরে,
যাও যাও বারেক দেখাও ॥
হীরাবতী যত ভাষে, সুকবি সুন্দর হাসে,
হাতে পায় আকাশের ইন্দু।
কালী পাদপদ্মতলে, শ্রীকবিরঞ্জন বলে,
তারিণী তরাও ভবসিন্ধু ॥

বিদ্যাসুন্দরের পরস্পর দর্শন

সুপুরুষ সুন্দর সুধীর ধীরে ধীরে। মিলিল সঙ্কেত সেই সরোবর-তীরে ॥
বিদ্যা বিনোদিনী বসি বাতায়ন-তলে। বিদগ্ধ বিনোদ চলে বকুলের তলে ॥
শুভক্ষণে উভয়ত মুখবিলোকন। দৃষ্টি শর পরস্পর জরজর মন ॥
মোহিতা মহীতে পড়ে মহীপাল-বালা। শান্তি নাই বিষম কুসুম-শর-জ্বালা ॥
উথলে বিরহ-সিন্ধু ভাঙ্গে শান্তিসেতু। মনোমীন ধরিল ধীবর মীনকেতু ॥
কলেবর কম্পিত কদলী যেন ঝড়ে। বিদ্যার বাসনা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে ॥
সতী কহে কাম-অহি দংশিল মরমে। লোমে লোমে পুড়ে উঠে প্রমাণ সরমে ॥
নিকটে দশম দশা চেষ্টা কর সই। কোথা সেই রোঝা ওঝা ধন্বন্তরি কই ॥
সখী কহে সুবদনী সাবধান হও। হীরা ডেকে কিরা দিয়া কিরা তত্ত্ব লও ॥
সহসা এমত কার্য্য তুমি ত অভব্যা। যদ্যপি পণ্ডিতা হও তথাপিও নব্যা ॥
বিষম প্রতিজ্ঞা তব বিখ্যাত জগতে। পরাস্ত নহিলে বল বরিবা কি মতে ॥
ভূপতিকে জানাও আনাও বন্ধুচয়। পশ্চাৎ যাহাতে লাজ কাজ ভাল নয় ॥

বন-মত্ত-হস্তী মন দুষ্টাচারী বড়। ক্ষমাঙ্কুশক্ষেপে কর কুম্ভে দড়দড়॥
রসময়ী কহে সই প্রতিজ্ঞা তাবত। স্মরশরে ভেদ তনু নহেক যাবত॥
ক্ষমাঙ্কুশ খোয়া গেল অনঙ্গ-অলসে। মনমত্ত বারণ বারণ হবে কিসে॥
কান্ততনু এ কান্ত একান্ত মোর বটে। আর ইচ্ছা নাই সই স্বামী হেন ঘটে।
সুন্দর স্বরূপ রূপ ভূপসুত কই। যত্নে রত্ন মিলাইলা কালী কৃপাময়ী॥
দেবীপুত্র দীপ্তিমানা মহাজন এই। এজনে যে কহে মূর্খ মহামূর্খ সেই॥
সুন্দর লইয়া কিছু শুন বিবরণ। রূপস রূপসী-রূপ করে নিরীক্ষণ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে ঘনায়েছে দিন। মিলিবে সুন্দর বর সকলে প্রবীণ॥

সুন্দর দর্শনে বিদ্যার সখী প্রতি উক্তি

সুন্দর সুন্দর বর এই বটে আলি। দড়দড় কি কব কহ কি শুনে আলি॥
সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি মুখকমলজ। কি রূপ কি রূপ করি কৈল কমলজ॥
তনু তনু চিন্তায় কেমনে জ্বালা সই। জীবন জীবনমধ্যে ত্যজি মেনে সই॥
মন্দ মন্দগ্রহ মোর বুঝেছি একান্ত। কালী কালী দিলা মনে না দিলা এ কান্ত॥
বারণ বারণমন কদাচ না মানে। ক্ষপা ক্ষপাদিবা ছোটে কি করিবে মানে॥
সর্ব্ব সর্ব্বকাল পূজি পীড়া এই ধারা। নিত্যা নিত্যাবধি দিলা দুনয়নে ধারা॥
তারা তারাপতি যদি মিলাইলা করে। ফের ফের দিয়া বিধি বঞ্চনা বা করে.
হর হরবধূ দুঃখ তনয় প্রসাদে। বিদ্যা বিদ্যা কবিবরে করহ প্রসাদে॥

বিদ্যা দর্শনে সুন্দরের মোহ

কি রূপসী, অঙ্গে বসি, অঙ্গ খসি পড়ে।
প্রাণ দহে, কত সহে, নাহি রহে ধড়ে॥
মধ্য ক্ষীণ, কুচ পীন, শশহীন শশী।
আস্যবর, লম্বোদর, বিম্বাধর রাশি॥
নাসাতুল, তিলফুল, চিন্তাকুল ঈশ।
বাক্যসৃষ্টি, সুধাবৃষ্টি, লোলদৃষ্টি বিষ॥
দন্তাবলী, শিশু অলি, কুন্দকলি মাঝে।
ভুরু অনু, কামধনু, হেমতনু সাজে॥
নীলগিরি, শুকপুরি, তনুপরি ভুজ।
মঞ্জুরব, মনোভব, মহোৎসব রঙ্গ॥
নৃপসুত, মোহযুত, এ অদ্ভুত দেখি।
কহে রাম, অনুপাম, গুণধাম একি॥

বিদ্যা কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব

বিদ্যা রূপবতী সতী, কৃতাঞ্জলি শুদ্ধমতি,
কায়মনোবাক্যে করে স্তব।

তুমি নিত্যা পরাৎপরা,　　জন্ম জরা মৃত্যু হরা,
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু তুমি ভব ॥
তুমি জল তুমি স্থল,　　ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলাফল,
তুমি সন্ধ্যা দিবা বিভাবরী।
তুমি কুলাচল সিন্ধু,　　তুমি রবি তুমি ইন্দু,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী ॥
তুমি শান্তি পুষ্টি সুধা,　　তুমি লজ্জা তুমি মেধা,
মহামায়া করালরূপিণী।
শক্তিরূপা সর্ব্বভূতে,　　বিহরসি শৈলসুতে,
কুণ্ডলিনী চক্রবিভেদিনী ॥
ত্রিগুণা সচ্চিদানন্দ,　　রূপিণী লিখন কন্দ,
স্থূলসূক্ষ্মা ধরণী-ধারিণী।
অপর্ণা অভয়া উমা,　　ভবানী ভৈরবী ভীমা,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী ॥
কৃপা কর কৃপাময়ি,　　কেহ নাহি তোমা বই,
শঙ্করি কিঙ্করী তব ডাকে।
সুন্দর সুন্দরতনু,　　অভিন্ন কুসুমধনু,
সেই পতি দেহি মা আমাকে ॥
একান্ত কাতরা বিদ্যা,　　তুষ্টা মহাবিদ্যা আদ্যা,
পড়িলা প্রসাদ জবাফুল।
শ্রবণে শুনিলে এই,　　তোমার হৃদেশ সেই,
আজি নিশি সকল প্রতুল ॥
পুলকিতা পঙ্কজিনী,　　হাসি কহে মৃদু বাণী,
কর সখি উচিত যে কাজ।
ভাগ্যের নাহিক লেখা,　　নিশিযোগে হবে দেখা,
ভেটিবে সুন্দর যুবরাজ ॥
বিদ্যার মনের কথা,　　বুঝি সখিচয় তথা,
কৌতুকে করয়ে চারুবেশ।
কালীপাদপদ্মতলে,　　শ্রীকবিরঞ্জন বলে,
দূর কর নিজ সুত ক্লেশ ॥

বিদ্যার বাসর সজ্জা

সুন্দরীর সহচরী ভাল জানে চর্য্যা। রতন মন্দিরে করে মনোহর শয্যা ॥
দুই দুই তাকিয়া খাটের দুইপাশে। রূপবতী বিদ্যাবতী মনে মনে হাসে ॥
বড় এক গিরদা শিয়রে সখা রাখে। এই বটে দেখ এসে হেসে হেসে ডাকে ॥

ডোল ভাজি টাঙ্গাইল চিকণ মশারি। ভৃঙ্গারে পূরিত রাখে সুবাসিত বারি॥
ভক্ষ্যদ্রব্য নানাজাতি মণ্ডা মনোহরা। সরভাজা নিখুঁতি বাতাসা রসকরা॥
অপূর্ব্ব সন্দেশ নামে এলাইচ দানা। ফুল চিনি লুচি দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা।
সাজাইল বাটাতে কর্পূর সাঁচি বিড়া। ভক্ষণে যুবকজনা সুখে করে ক্রীড়া॥
কৌটা ভরা ছাঁকা চূণ কর্পূরের সঙ্গ। এলাইচ জায়ফল জইত্রি লবঙ্গ॥
কালাগুরু মৃগমদ কুঙ্কুম কস্তুরী। সুগন্ধ চন্দনগন্ধে আমোদিত পুরী॥
মল্লিকা মালতী মালা সুবর্ণের পাত্রে। যুবকযুবতী দেহ দহে ঘ্রাণমাত্রে॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

কবির ভগবতীর স্তব

এথা কবিবর, সুন্দর সুন্দর, নিরখি নৃপজারূপ।
ভাবে গদগদ, নাহি চলে পদ, শর হানে স্মর ভূপ॥

কহ উপদেশ, কিরূপে প্রবেশ, হব বিদ্যাবতী বাসে।
দুরন্ত প্রহরী, দিবা বিভাবরী, জাগে তনু কাঁপে ত্রাসে॥

নমো ভগবতি, কিবা জানি স্তুতি, প্রধানা প্রকৃতি কালী
শ্মশানবাসিনী, দনুজনাশিনী মুণ্ডমালী মা করালী॥

ত্রৈলোক্যবন্দিনী, ভূধরনন্দিনী, অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-মাতা।
সকল সিদ্ধিদা, গিরিশ-প্রমদা, তুমি হরি হর ধাতা॥

স্তব করে কবি, পরিতুষ্টা দেবী, পুনরপি আজ্ঞা হয়।
ভয় নাহি বচ্ছ, ইহা কোন তুচ্ছ, সুখে কর পরিণয়।

অপরূপ কথা, অকস্মাৎ তথা, হইল সুড়ঙ্গপথ।
প্রসাদের বাণী, ভক্তের ভবানী, পুরাইলা মনোরথ॥

কবির সুড়ঙ্গপথে গমনোদ্যোগ

বিজবর বরাবর বিবরবিশিষ্ট। হ্রীরূপিণী হ্রীরাখিণী হৃদয়েতে হৃষ্ট॥
নিভৃতে নাগর নানা রস করে রঙ্গে। চন্দনে চর্চ্চিত চারু চামীকর অঙ্গে॥
কম্বুকণ্ঠে কলিত কাঞ্চন-কণ্ঠমাল। মস্তকে মুকুট মণি-মুকুতা-মিসাল॥
মোহন মুকুরে মঞ্জুমুখ নিরখিয়া। উথলে অমিয়াসিন্ধু উল্লাসিত হিয়া॥
যামিনী যামার্দ্ধে যাত্রা জায়া হেতু কবি। আলো করে আন্ধারে আপন অঙ্গচ্ছবি॥
ভাগ্য ভাল ভাবিতে ভাবিতে ভয় ভাগে। চলিতে চঞ্চল চিত্ত চমৎকার লাগে॥
ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে। আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব। কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থায় সুন্দরের দর্শন

ধন্য সে যামিনী মধু, কুহরে কোকিলবধু,
পূর্ণবিধু উদয় গগনে।
মত্ত মধুকরবৃন্দ, ফুলে পিয়ে মকরন্দ,
মুখরিত কুসুমকাননে॥
গগনেতে মেঘ দেখি, আনন্দ-অপার শিখী,
মন্দ মন্দ মলয় সমীর।
সুচারু কুসুম ঘ্রাণ, স্মরশরে দহে প্রাণ,
বিদ্যা বিনোদিনী নহে স্থির॥
রসময়ী কহে সই, কত সে নাগর কই,
তাহা বই মনে নাহি ভায়।
নাহি সুখ একটুক, মহাদুঃখ ফাটে বুক,
প্রায় বুঝি মোর প্রাণ যায়॥
এই যুক্তি করে বসি, শারদ-পূর্ণিমা-শশী,
হেনকালে উপস্থিত কবি।
রূপ তুল্য বটে নাম মহাকবি গুণধাম,
প্রচণ্ড প্রতাপে যেন রবি॥
সব-সখী-সম্বলিতা, চন্দ্রমুখী চমকিতা,
নিরখই চঞ্চল নয়নে।
কিঙ্করী যোগায় বারি, পদযুগ ধৌত করি,
বসিলা রতন-সিংহাসনে॥
ধন হেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত,
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী॥
সেই বংশসমুদ্ভূত, ধীর সর্ব্বগুণযুত,
ছিল কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরলহৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তার, কহে পদে কালিকার,
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া॥

বিদ্যা ও সুন্দরের বিচার

কামদেব-ব্যাধ তুল্য কুমার সুন্দর। ভুরু ছলে ধৃত ধনু দৃষ্টি খরশর॥

৪১৭

কিঞ্চিৎ সন্ধানে হানে মানভঙ্গ-রঙ্গ। কি আর করিবে বিত্তা বিত্তার প্রসঙ্গ॥
জ্ঞানহারা গোমধ্যা গোযুগে জল ঝরে। ধূলায় ধূসর ধড় ধড়ফড় করে॥
চমকিতা চঞ্চলাক্ষী চেতনা জন্মিল। সলজ্জিতা শশিমুখী সম্ভ্রমে বসিল॥
ক্ষণেক রমণী চাহে মৌনভাবে থাকে। হেনকালে পর্ব্বতশিখরে শিখী ডাকে॥
হাস্যযুতা সখী প্রতি কহে কমলিনী। সুলোচনা সুধাও কিসের রব শুনি॥
ভাব বুঝি গুণরাশি মন্দ মন্দ হাসে। অমিয়াসদৃশ শ্লোক অন্যোত্তর ভাষে॥

শ্লোক

গোমধ্যমধ্যে মৃগগোধরে হে
সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাম্।
নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা
নৃত্যন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ॥

অস্যার্থ

হে গোমধ্যমধ্যে বাল-কুরঙ্গলোচনি। সহস্রগোভূষণ-কিঙ্কর নাদ শুনি॥
গোভৃতশিখরে মত্ত পরম উৎসব। গোকর্ণ-শরীর-ভক্ষ করয়ে তাণ্ডব॥
সখী সম্বোধিয়া কহে বুঝা নাহি যায়। পুনরপি হাসি কহে সুবিদগ্ধ রায়॥

শ্লোক

স্বযোনি ভক্ষধ্বজসম্ভবানাং
শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু।
তমোঽরিবিম্বপ্রতিবিম্বধারী
রুরাব কান্তে পবনাশনাশঃ॥

অস্যার্থ

স্বযোনিভক্ষকধ্বজ তাহাতে উৎপত্তি। তার নাদে উন্মত্ত গিরিমধ্যে স্থিতি॥
তিমিরারি বিম্ব-প্রতিবিম্বধারী যেই। পবন ভক্ষের ভক্ষ্য ঘন ডাকে সেই॥
চমৎকার কথা শুনি বটে গুণধাম। পুনরপি কে সখি সুধাও দেখি নাম॥
কৃতাঞ্জলি-সহচরী কহে পুনর্ব্বার। কহ শুনি মহাশয় কি নাম তোমার॥

শ্লোক

বসুধা বসুনা লোভে বন্দতে মন্দজাতিজম্।
করভোরু রতিপ্রজ্ঞে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যহম্॥

বসু হেতু সুমূর্খ মানব গুণযুত। বন্দয়ে মন্দ যে জাতি লোভে অনুগত॥
করভোরু রতি প্রজ্ঞে তিষ্ঠ মন্দ যাম। চিন্তা কর দ্বিতীয় পঞ্চমে মোর নাম॥
এক বস্তু তিন কিন্তু একে তিন লাভ। কহ কহ তরলাক্ষি এবা কোন্ ভাব॥
আদ্য অন্তে যেটা সেটা কামনা সদাই। আদ্য অন্তে পাঠে তুল্য কৃপালেশ পাই॥
চারি মধ্যে সুবিখ্যাত বর্ণচারি সার। আশ্রয়েতে চারি ফল পঞ্চ সুপ্রচার॥
কালীকিঙ্করের কাব্যকথা বুঝা ভার। বুঝে কিন্তু সে কালী-অক্ষর হৃদে আছে যার।

হেসে বলে হরিণাক্ষী হারিলাম আমি। সুপুরুষ সুন্দর সুধীর সত্য স্বামী॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ী। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ

মাস মধু ডাকে মধুকরবধূচয়। কুলবধূ কামবধূ ইচ্ছা অতিশয়॥
সুশীতল সময় মলয় মন্দ বহে। স্মর হানে খরশর ভর কত সহে॥
পরাভব মানি সুখী বীরসিংহ-বালা। স্বয়ম্বরা কান্তকণ্ঠে সমর্পিলা মালা॥
উত্তম ঘটক সুন্দরের গাঁথা হার। বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তা চিত্ত দোঁহাকার॥
পুরোহিত হইলেন আপনি মদন। বিদ্যালাপছলে বুঝি পাড়িলা বচন॥
উলু দিছে ঘনঘন পিকসীমন্তিনী। নয়নচকোরী সুখে নাচিছে নাচনী॥
বরযাত্র মলয়পবন বিধুবর। মধুকর নিকর হইল বাদ্যকর॥
কান্তাকুচে জলদগ্নি বিচারিয়া কবি। করপদ্মে করে হোম স্নেহ করি হবি॥
উভয়ত কুটুম্ব রসনা ওষ্ঠাধর। পরস্পর ভুঞ্জে সুধা মুখেন্দু উপর॥
যুগল নিতম্ব উরু জালালি ফকির। বিজাতীয় শব্দ করে কাঁপায়ে মঞ্জীর॥
নূপুর কিঙ্কিণী জালে নানা শব্দ হয়। দুই দলে দ্বন্দ্ব যেন চন্দনসময়॥
পুনরপি শুন বিবাহের সমাচার। কামিনীর করুণা ভাটের রায়বার॥
সস্ত্রীক আইলা কাম দেখিতে কৌতুক। দম্পতিকে পঞ্চশর দিলেক যৌতুক॥
দম্পতিরে তুষ্ট হয়ে দম্পতি চলিল। দক্ষিণা পশ্চাতে হবে সম্প্রতি রহিল॥
পরাভব মানি সুখী বীরসিংহ-বালা। স্বয়ম্বরা কান্তকণ্ঠে আরোপিলা মালা॥
শুভক্ষণে অন্যান্য দর্শন কুতূহলি। সহচরীগণ রঙ্গে দেয় হুলাহুলি॥
পতি প্রদক্ষিণ সতী করে সপ্তবার। সুধার সাগরে ভাসে তনু দোঁহাকার॥
সুন্দরীরে সমর্পিলা সুন্দরের হাতে। সুন্দর সিন্দূর দিলা সুন্দরীর মাথে॥
এই তব দাসী গুণরাশি মিথ্যা নহে। আড়ালে আসিয়া আলি আড়ি পাতি কহে।
নানা উপহার কবি করিয়া ভোজন। কর্পূর তাম্বুলে করে মুখের শোধন॥
সুশীতল মরুত মলয় মন্দ বহে। স্মর হানে খরশর ভর কত সহে॥
রূপস-রূপসী নিশিশেষে নিদ্রা যায়। প্রভাকর প্রকাশিল রজনী পোহায়॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ী। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

শৃঙ্গার উপক্রমে বিদ্যার বিনয়

রমণী মণি নাগররাজ কবি। রতিনাথ বিনিন্দিত চারুছবি॥
ধনি-মুখ-চিবুক ধরে যতনে। মুখ চুম্বিত সুন্দর হৃষ্ট মনে॥
নাগরী রসিকা রসিক প্রবীণা। যুবতী সময়ে হৃদয়ে কঠিনা॥
কুচপদ্মকলি করপদ্মে ধরে। তনু রোমাঞ্চিত রসরঙ্গ ভরে॥
চমকি চমকি কহে কি করহে। নখ-ঘাতন-যাতন খেদ কহে॥
যুবরাজ এ কায তোমার নহে। নহি ধীরে এ বক্তু নহে পিবহে॥
দশনে জ্বলিছে সহেনা সহেনা। পুন তো প্রাণ তো রহে না রহে না॥
বঁধু জীবন জীবন দান কর। গুণরাশি এ দাসীর বাক্য ধর॥

রসকাল নহে হও কাল কেন। দেহ মর্ম্মপীড়া ছি ছি কর্ম্ম হেন॥
লাজ না বাস কি হাস বুক ফাটে। কি করে পিরীতে এ রীতে না আঁটে॥
ছাড় কান্ত নিতান্ত অশান্তপনা। প্রাণবল্লভ দুর্লভ সুলভনা॥
কহ যে সহজে নহে যে সে ধারা। এহি কায অকায কুকায করা॥
ধর হাত কি নাথ পুনঃ পুনঃ হে। হৃদয়েশ বিশেষ কথা শুনহে॥
এ কি সাধ কি সাধহ বাধ কহি। ভাব যেরূপ সেরূপ কিন্তু নহি॥
প্রভু মত্তকরী আমি পঙ্কজিনী। করি শৃঙ্গার যোগ্য বটে করিণী॥
একবার প্রকার রূপে তরিলে। হবে না হবে না হবে না মরিলে॥
শুন আলি ত কালি কুগালি দিবে। প্রভু চোর হবে কি তবে ছাড়িবে॥
মরি হে মরি হে ধরিহে চরণে। রমণে এমনে জানিহে কেমনে॥
রসিকঃ সুজনঃ প্রভুহে চতুর। মরি বালজনে কেন হে নিঠুর॥
বলে মুহুঃ মুহুঃ মুখে উহু উহু। যথা কোকিল কুজিত কুহুকুহু॥
নয়ন যুগল সলিলে গলিত। কনক-মুকুরে মুকুতা রচিত।
মদনজর না কর ছটফটি। কবিরাজ কহে কবিরাজ বটি॥
কুচমর্দ্দনালিঙ্গন চুম্বন লো। শুন এহি ত্রিদোষজ ভঞ্জন লো॥
যদি রোগ সুসম্যক সাম্য নহে। রসনারসপানে কি রোগ রহে হে॥
শ্রমনীরে শরীর সমস্ত ভাসে। করি ধীর সমীর সুধীর ভাষে॥
কবিরঞ্জন তোটক ছন্দ ভণে। করুণাঙ্কুর কালী সুদীন জনে॥

শৃঙ্গারে পরস্পরের উক্তি

কাতর কামিনী, বদন যামিনী, নাথ মলিন হি ভেল।
মুকুতা জৈসন, সোহত ঐসন, সরম জল উপজেল॥
সঘন রোদিতি, বদতি পতি প্রতি, রহত বিদগ্ধরাজ।
বাল দুরবল, ধরম কৈসল, নাহিক ভয় কটু লাজ॥
কোটি পরণাম, হে প্রভু গুণধাম, সুরতরস দেহ ভঙ্গ।
হাম কৃশোদরী, পুরুষ কেশরী, কৈসে সম তুহ সঙ্গ॥
কহই কবিবর, কুসুমশরবর, দহনে জরজর দেহ।
রমণীমণি ধনী, নব সরোজিনী, সবহু চাতুরী এহ॥
কলতি পরভৃত, মনহি কৃত হৃত, উয়ল নিরমল চন্দ।
মধু বিভাবরী, হে বর-সুন্দরী, মলয়ানিলগতি মন্দ॥
রসিক সো বিধি, বিরহবারিধি, তরণী দেয়ল তোরে।
কপট কহেসি, বিচেড়ু বয়েসি, কাহে নিকরুণ মোরে॥

শৃঙ্গারে সখীদিগের ব্যঙ্গোক্তি

অকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত। উহু উহু মুহু মুহু কেশপাশ মুক্ত॥
কাতরা কামিনী কান্দে কহে কলস্বরে। দিয়া পীড়া ক্রীড়া ব্রীড়া না বাস অন্তরে॥

চিরদিনে অনশনে ক্ষুধা বিপর্য্যয়। আধার সহিত সুধা পান ভাল নয়॥
যে পর্য্যন্ত কাননে কুসুম থাকে কলি॥ তদবধি তাহে মধু নাহি পিয়ে অলি॥
সময়ে সকল ভাল শুনহ নিশ্চিত। অসময় জানিবা সে হিতে বিপরীত॥
শীতে সুধাসম বহ্নি গ্রীষ্মেতে সে নহে। বসন্তে ভ্রমণ পথ্য বর্ষাতে কে কহে॥
হত্যা হই হউক মেনে হাস যুবরাজ। ক্ষীণা আমি ক্ষমা কর ক্ষেপাপারা কায॥
ভার্য্যা সঙ্গে চর্য্যা ইহা শুনি নাহি কভু। আজি ঘর কালি কি পান্দাড় ভাব প্রভু॥
আড়ে আলি হেস্তে পড়ে এ উহার গায়। মলি লো গোল্লায় গেলি নাম খেলি হায়॥
ঘুম গেল ধুম বড় ঘর মেনে ছাড়ি। বিয়ারাত্রে বেহায়া বড় না বাড়াবাড়ি॥
মিথ্যা কন্ত্যা অবলা অবলা বোল ছাড়। নামমাত্রা বলা দেখি ইচ্ছা বড় গাঢ়॥
মুখে মুখে ফাসকুস এ কি প্রেম ঈষ। আমরাই হইলাম দুচক্ষের বিষ॥
কেহ বলে তুমি মেয়ে হানফেনে বড়। ঘাগী বটে কত ঠাটে কথা দড় দড়॥
কেহ বলে থেকে থেকে পড়ে যেন চীল। শুন নাই আচট ভূমের ভাঙ্গে খীল॥
মর্দ্দ বড় শক্ত সই কেহ কেহ বলে। অনুমানি বুঝি ক্ষেতে সদ্য ফল ফলে॥
সহ্য নহে ক্রোধে কহে আলো আলি শোন। হানিয়া থাঁড়ার চোট ঘষ্টে দিস লোন॥
শিথিল অনঙ্গরস অঙ্গভঙ্গ দিয়া। হস্ত পদ পাখালিল বাহিরেতে গিয়া॥
পুনরপি শয্যায় বিহরে দোঁহে রঙ্গে। দোঁহে সমীরণ করে দোঁহাকার অঙ্গে॥
পরস্পর অঙ্গে রঙ্গে লেপয়ে চন্দন। হেসে হেসে উভয়ত বদন চুম্বন॥
শ্রীকবিরঞ্জন এই কহে কৃতাঞ্জলি। শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি॥

অথ বিপরীত শৃঙ্গার

ক্ষণেক অন্তরে কহে কবি মহামতি। বিপরীত রতি দান দেহ লো যুবতী॥
নেকা ঢঙ্গ হয়ে, রামা কহে সেই কি। প্রকার শুনিয়া লাজে দাঁতে কাটে জি॥
অন্তরে আনন্দ অতি সায় দিতে নারে। পুরুষের কায প্রভু রমণী কি পারে॥
বিদগ্ধ বটে হে প্রভো বিজ্ঞ নিজে হও। কেমনে এমন কথা মুখ ভরে কও॥
সাঁতারে হাঁপায়ে শেষে স্রোতে ঢাল গা। সেইরূপ চেষ্টা পাও মনে আছে যা॥
একথা না ভুলি আর মরমে রহিল। এখন সময় নহে কালেতে হইল॥
মিছা পরিহাস হাস কিবা প্রিয়ে ভাষ। ভাবে বুঝি ভর্ত্তাবধে ভয় নাহি বাস॥
লংঘনে স্বামীর বাক্য জন্মে মহাপাপ। সুধাংশু বদনে শীঘ্র শান্ত কর তাপ॥
বিদ্যা বলে পায় পড়ি সেকি এত মধু। গণিকা ত নহি প্রভু হই কুলবধূ॥
কবি কহে যে কহ সে কহ প্রাণপ্রিয়া। রক্ষা কর বিপরীত রতি দান দিয়া॥
নহিলে হে তাহা আমি যদি মরি আজি। ভ্রান্ত কান্ত শান্ত হও হইলাম রাজি॥
লাজের দুয়ারে ধনী ভেজায়ে কপাট। প্রবর্ত্ত প্রকৃত কার্য্যে তবু নানা ঠাট।
বিগলিত জঘন সঘনে বেণী দোলে। যেন পূর্ণশশী পূর্ণশশী করে কোলে॥
অদ্ভুত চরিত্র চিত্তমধ্যে লাগে ধন্দ। প্রফুল্ল কমলে মধু পিয়ে মকরন্দ॥
চকোর খঞ্জনে প্রেম আলিঙ্গন করে। বিকচকমলে চান্দে বারিবিন্দু ঝরে॥
মনের বাসনা পূর্ণ তূর্ণ রসে ক্ষমা। সুখে মন্দ মন্দ হাস বাস পরে রামা॥

রসকাল নহে হও কাল কেন। দেহ মর্ম্মপীড়া ছি ছি কর্ম্ম হেন॥
লাজ না বাস কি হাস বুক ফাটে। কি করে পিরীতে এ রীতে না আঁটে॥
ছাড় কান্ত নিতান্ত অশান্তপনা। প্রাণবল্লভ দুর্লভ সুলভনা॥
কহ যে সহজে নহে যে সে ধারা। এহি কায অকায কুকায করা॥
ধর হাত কি নাথ পুনঃ পুনঃ হে। হৃদয়েশ বিশেষ কথা শুনহে॥
এ কি সাধ কি সাধহ বাধ কহি। ভাব যেরূপ সেরূপ কিন্তু নহি॥
প্রভু মত্তকরী আমি পঙ্কজিনী। করি শৃঙ্গার যোগ্য বটে করিণী॥
একবার প্রকার রূপে তরিলে। হবে না হবে না হবে না মরিলে॥
শুন আলি ত কালি কুগালি দিবে। প্রভু চোর হবে কি তবে ছাড়িবে॥
মরি হে মরি হে ধরিহে চরণে। রমণে এমনে জানিহে কেমনে॥
রসিকঃ সুজনঃ প্রভুহে চতুর। মরি বালজনে কেন হে নিঠুর॥
বলে মুহুঃ মুহুঃ মুখে উহু উহু। যথা কোকিল কূজিত কুহুকুহু॥
নয়ন যুগল সলিলে গলিত। কনক-মুকুরে মুকুতা রচিত।
মদনজর না কর ছটফটি। কবিরাজ কহে কবিরাজ বটি॥
কুচমর্দ্দনালিঙ্গন চুম্বন লো। শুন এহি ত্রিদোষজ ভঞ্জন লো॥
যদি রোগ সুসম্যক সাম্য নহে। রসনারসপানে কি রোগ রহে হে॥
শ্রমনীরে শরীর সমস্ত ভাসে। করি ধীর সমীর সুধীর ভাষে॥
কবিরঞ্জন তোটক ছন্দ ভণে। করুণাঙ্কুরু কালী সুদীন জনে॥

শৃঙ্গারে পরস্পরের উক্তি

কাতর কামিনী, বদন যামিনী, নাথ মলিন হি ভেল।
মুকুতা জৈসন, সোহত ঐসন, সরম জল উপজেল॥
সঘন রোদিতি, বদতি পতি প্রতি, রহত বিদগ্ধরাজ।
বাল দুরবল, ধরম কৈসল, নাহিক ভয় কটু লাজ॥
কোটি পরণাম, হে প্রভু গুণধাম, সুরতরস দেহ ভঙ্গ।
হাম কৃশোদরী, পুরুষ কেশরী, কৈসে সম তুহু সঙ্গ॥
কহই কবিবর, কুসুমশরবর, দহনে জরজর দেহ।
রমণীমণি ধনী, নব সরোজিনী, সবহু চাতুরী এহ॥
কলাতি পরভৃত, মনহি কৃত হৃত, উরল নিরমল চন্দ।
মধু বিভাবরী, হে বর-সুন্দরী, মলয়ানিলগতি মন্দ॥
রসিক সো বিধি, বিরহবারিধি, তরণী দেয়ল তোরে।
কপট কহেসি, বিচেড়ু বয়েসি, কাহে নিকরুণ মোরে॥

শৃঙ্গারে সখীদিগের ব্যঙ্গোক্তি

অকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত। উহু উহু মুহু মুহু কেশপাশ মুক্ত॥
কাতরা কামিনী কান্দে কহে কলস্বরে। দিয়া পীড়া ক্রীড়া ব্রীড়া না বাস অন্তরে॥

চিরদিনে অনশনে ক্ষুধা বিপর্য্যয়। আধার সহিত সুধা পান ভাল নয়॥
যে পর্য্যন্ত কাননে কুসুম থাকে কলি॥ তদবধি তাহে মধু নাহি পিয়ে অলি॥
সময়ে সকল ভাল শুনহ নিশ্চিত। অসময় জানিবা সে হিতে বিপরীত॥
শীতে সুধাসম বহ্নি গ্রীষ্মেতে সে নহে। বসন্তে ভ্রমণ পথ্য বর্ষাতে কে কহে॥
হত্যা হই হউক মেনে হাস যুবরাজ। ক্ষীণা আমি ক্ষমা কর ক্ষেপাপারা কায॥
ভার্য্যা সঙ্গে চর্য্যা ইহা শুনি নাহি কভু। আজি ঘর কালি কি পান্দাড় ভাব প্রভু॥
আড়ে আলি হেস্তে পড়ে এ উহার গায়। মলি লো গোল্লায় গেলি নাম খেলি হায়॥
ঘুম গেল ধুম বড় ঘর মেনে ছাড়ি। বিয়ারাত্রে বেহায়া বড় না বাড়াবাড়ি॥
মিথ্যা কন্যা অবলা অবলা বোল ছাড়। নামমাত্রা বলা দেখি ইচ্ছা বড় গাঢ়॥
মুখে মুখে ফাসফুস এ কি প্রেম ঈষ। আমরাই হইলাম দুচক্ষের বিষ॥
কেহ বলে তুমি মেয়ে হানফেনে বড়। ঘাগী বটে কত ঠাটে কথা দড় দড়॥
কেহ বলে থেকে থেকে পড়ে যেন চীল। শুন নাই আচট ভূমের ভাঙ্গে খীল॥
মর্দ্দ বড় শক্ত সই কেহ কেহ বলে। অনুমানি বুঝি ক্ষেতে সন্ত ফল ফলে॥
সহ্য নহে ক্রোধে কহে আলো আলি শোন। হানিয়া খাঁড়ার চোট ঘস্তে দিস লোন॥
শিথিল অনঙ্গরস অঙ্গভঙ্গ দিয়া। হস্ত পদ পাখালিল বাহিরেতে গিয়া॥
পুনরপি শয্যায় বিহরে দোঁহে রঙ্গে। দোঁহে সমীরণ করে দোঁহাকার অঙ্গে॥
পরস্পর অঙ্গে রঙ্গে লেপয়ে চন্দন। হেসে হেসে উভয়ত বদন চুম্বন॥
শ্রীকবিরঞ্জন এই কহে কৃতাঞ্জলি। শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি॥

অথ বিপরীত শৃঙ্গার

ক্ষণেক অন্তরে কহে কবি মহামতি। বিপরীত রতি দান দেহ লো যুবতী॥
নেকা ঢঙ্গ হয়ে, রামা কহে সেই কি। প্রকার শুনিয়া লাজে দাঁতে কাটে জি॥
অন্তরে আনন্দ অতি সায় দিতে নারে। পুরুষের কায প্রভু রমণী কি পারে॥
বিদগ্ধ বটে হে প্রভো বিজ্ঞ নিজে হও। কেমনে এমন কথা মুখ ভরে কও॥
সাঁতারে হাঁপায়ে শেষে স্রোতে ঢাল গা। সেইরূপ চেষ্টা পাও মনে আছে যা॥
একথা না ভুলি আর মরমে রহিল। এখন সময় নহে কালেতে হইল॥
মিছা পরিহাস হাস কিবা প্রিয়ে ভাষ। ভাবে বুঝি ভর্ত্তাবধে ভয় নাহি বাস॥
লংঘনে স্বামীর বাক্য জন্মে মহাপাপ। সুধাংশু বদনে শীঘ্র শান্ত কর তাপ॥
বিদ্যা বলে পায় পড়ি সেকি এত মধু। গণিকা ত নহি প্রভু হই কুলবধূ॥
কবি কহে যে কহ সে কহ প্রাণপ্রিয়া। রক্ষা কর বিপরীত রতি দান দিয়া॥
নহিলে হে তাহা আমি যদি মরি আজি। ভ্রান্ত কান্ত শান্ত হও হইলাম রাজি॥
লাজের দুয়ারে ধনী ভেজায়ে কপাট। প্রবর্ত্ত প্রকৃত কার্য্যে তবু নানা ঠাট।
বিগলিত জঘন সঘনে বেণী দোলে। যেন পূর্ণশশী পূর্ণশশী করে কোলে॥
অদ্ভুত চরিত্র চিত্তমধ্যে লাগে ধন্দ। প্রফুল্ল কমলে মধু পিয়ে মকরন্দ॥
চকোর খঞ্জনে প্রেম আলিঙ্গন করে। বিকচকমলে চান্দে বারিবিন্দু ঝরে॥
মনের বাসনা পূর্ণ তুর্ণ রসে ক্ষমা। সুখে মন্দ মন্দ হাস বাস পরে রামা॥

রূপস-রূপসী নিশিশেষে নিদ্রা যায়। প্রভাকর প্রকাশিল রজনী পোহায়॥
সুকবি সুন্দর গেলা মানিনীর বাসে। কহিলা সকল কথা বসি তার পাশে॥
শ্রীকবিরঞ্জনে কালী হও কৃপাময়ী। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

পরদিন মালিনীর ও বিদ্যার রহস্য কথোপকথন

শুনিয়া নিশির কথা, মনে মনে হাস্যযুতা,
হীরাবতী প্রফুল্ল অন্তরে।
নানা ফুলে নানা ভাতি, যেন মুকুতার পাঁতি,
হার গাঁথি লইল সত্বরে॥
গেল নৃপসুতাপাশে, রামা হাসে লাজ বাসে,
অধোমুখে বিধুমুখ ঢাকে।
আগুসারি যত্ন করি, মালিনীর হাতে ধরি,
সমাদরে বসাইলা তাকে॥
হীরা বলে রও রও, কেন গো উতলা হও,
আজি কেন এত ঠাকুরালি।
হেদে বাছা ছাড় লাজ, সারাসোরা হল্যো কাজ,
দেহ পুরস্কার ঘটকালি॥
কুশলসম্বাদ কহ, ভাব যদি ভিন্ন নহ,
তুমি বধূ বটি গো শাশুড়ী।
হবে গো দুলাল তোর, সে দিন কেমন মোর,
সে ডাকিবে কোথা আই বুড়ী॥
কাছে আসি হাসি আলি, শিরে তৈল দিল ঢালি,
আপনি আঁচড়ে বিদ্যা কেশ।
কত ঠাট্ট জানে হীরা, পুনরপি কহে ফিরা,
বুড়ী আমি বৃথা কর বেশ।
বিদ্যা বলে নহ বুড়ী, মাসাশ রসের গুঁড়ী,
মর্ মাগী এত এসে তোরে।
ছাই কথা কি কহিস, পুনঃ পুনঃ লজ্জা দিস,
পায় পড়ি ক্ষমা কর্ মোরে॥
যেতে হবে ঠাঁই ঠাঁই, ভুলিয়াছি মনে নাই,
মালিনী কৌতুকে কহে হাসি।
হইল স্নানের কাল, মিছা করি গল্পগাল,
সকলি শুনিব কালি আসি॥
বিদ্যা দিল চালু কড়ী, কলাই কুমড়া বড়ী,
হীরাবতী ঘরে যায় রঙ্গে।

কি কয় শাশুড়ে বসে, কহে হেসে শুন এসে,
যে কথা হইল তার সঙ্গে ॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি, শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী,
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উমা আমা উরহ মানসে ॥

বিদ্যার মানভঞ্জন

কবি কহে বটে মাসি পরামর্শ পাকা। হীরা বলে চাহি বাপু ঘটকালি টাকা ॥
দেখাইল যে যে দ্রব্য পেয়েছিল তথা। দণ্ড দুই বসি কহে নানা রসকথা ॥
স্নান করি পূজে কবি শঙ্করঘরণী। যে পদপঙ্কজ ভবসাগরতরণী ॥
রন্ধন ভোজন করে রাজার নন্দন। নিদ্রালস্যে কিছুকাল করিল শয়ন ॥
নিশিযোগে নিজাঙ্গনাবাসে গেল রঙ্গে। কৌতুকে রমণ সুখ রমণীর সঙ্গে ॥
দিবাভাগে নানাবেশ ধরে গুণধর। ভ্রমণ করয়ে নিত্য রাজার সহর ॥
কখন পরমহংস যতি ব্রহ্মচারী। কখন বা বৈষ্ণব তিলককণ্ঠিধারী ॥
নগরের লোক কেহ লক্ষিতে না পারে। পরম পুরুষ জানি ভক্তি করে তারে ॥
একদিন কৈল কবি ঔদাস্য উদয়। না গেল সে দিন বিদ্যাবতার আলয় ॥
পতির বিরহে সতী অতি দুঃখযুতা। জাগিয়া যামিনী পোহাইল নৃপসুতা ॥
পরদিন উপনীত সুন্দরীর বাসে। কান্তমুখে হেরি মুখ যত্নে ঢাকে বাসে ॥
ধরি হাত দিয়া মাথে কত দিলা কিরা। না কহে বচন রামা নাহি চায় ফিরা ॥
নয়নসলিলে ভাসে অঙ্গের বসন। মানভঙ্গ না হয় বিমর্ষ বিলক্ষণ ॥
বিচারিল মনে মনে এক যুক্তি আছে। কপটে নিকটে গিয়া তৃণ দিয়া হাঁচে ॥
মৌনব্রত-ভঙ্গ-ভয়ে না কহিল জীব। তাড়ঙ্ক দোলায়ে বালা চিন্তা করে শিব ॥
অপ্রতিভ যুবরাজ অধোমুখে রহে। মৃদু মৃদু হাসি পুনরপি কিছু কহে ॥
রোদন করহ প্রিয়ে না করি নিষেধ। আমার হৃদয়ে সবে এই মাত্র খেদ ॥
গলিত সাঞ্জনধারা তাহে ম্লান মুখ। চিরদুঃখ গেল চিত্তে চান্দের কৌতুক ॥
সহজে কলঙ্কী সে তবাস্য সম নহে। লজ্জা ভয় দুই হেতু দিবা গুপ্তে রহে ॥
কদাচ না কহি কান্তে মিথ্যাকথাগুলা। হের হিমকর প্রিয়ে ও বদনতুলা ॥
ক্রোধে প্রিয়তমে তব তবে কিবা কাজ। আহারে ও ব্যবহারে কার আছে লাজ
ফিরা দেহ মদর্পিত চুম্ব আলিঙ্গন। আর কেন জানা গেল চরিত্র যেমন ॥
কবিবর বিনোদ বৈদগ্ধ্যগুণে ভাষে। ফুরাইল মান ফিরে ফিক্ ফিক্ হাসে ॥
আবেশ অধিক আরো আঁটি ধরে গলা। আলিগণ বলে মাগো এত জান ছলা ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

বিদ্যার গর্ভ দৃষ্টে সখীগণের নানা যুক্তিচিন্তা

কতকাল গৌণে বিদ্যা নবকুসুমিতা। সুলোচনা প্রভৃতি সকলে পুলকিতা ॥
পুনর্বিভা করে গুণসিন্ধুর তনয়। রজোযোগে রূপবতী গর্ভবতী হয় ॥

দুই তিন চারি পাঁচ মাসেতে প্রবর্ত্ত। সহচরী বলে বড় হইল অনর্থ॥
বিরলে বসিয়া যুক্তি করে জনে জনে। কেহ বলে এই দায় এড়াব কেমনে॥
কেহ বলে ভাবিয়া জন্মিল মোর বাই। কেহ বলে চল দেশ ছাড়িয়া পলাই॥
কেহ বলে নিরবধি ভয়ে কাঁপে প্রাণ। ভূপতি শুনিলে কাটিবেক নাক কাণ॥
কেহ বলে অকস্মাৎ হেদে কি উৎপাত। চেষ্টা কর কোনরূপে গর্ভ হয় পাত॥
কেহ বলে বিদ্যা মেনে কামগাতিশয়। রাজপুরে একি কাল তনয়া উদয়॥
কেহ বলে মরুক গলায় দিয়া দড়ি। রাতে দিনে পড়ে থাকে দুটা জড়াজড়ি॥
বিয়ারাত্রে দেখিলাম বর চান্দপারা। ছুঁড়ীর হাঁপানে ছোঁড়া হল তক্তসারা॥
কহিলাম কত মত ভূপতিকে বল। তখন করিল তুচ্ছ এখন এ ফল॥
কেহ বলে স্ত্রীবুদ্ধিতে পরমাদ ঘটে। কেহ কহে এই কথা শাস্ত্রসিদ্ধ বটে॥
স্ত্রীবুদ্ধে মরিল দশরথ পেয়ে শোক। স্ত্রীবুদ্ধে মজিল লঙ্কা খ্যাত তিন লোক॥
লয়েছি সবাই শিরে কলঙ্কের ডালী। কেহ বলে চারা নাই যে করেন কালী॥
কেহ বলে এত কেন চিন্তা কর সই। রাণীর নিকটে গিয়া সবিশেষ কই॥
ভাল মন্দ তাঁর ঘাড়ে আরের তা কি। উদরে ধরেছে কেন কুলখাকী ঝি॥
অতি বাম মো সবারে দূর করে দিবে। পৃথিবীটা পড়্যা আছে ঠাঁই না মিলিবে॥
জীব দিয়াছেন কৃষ্ণ দিবেন আহার। সে প্রভুকে লাগে সই সবাকার ভার॥
ভাল ভাল বলিয়া সখীরা উঠে ঝেড়ে। কেহ বলে তোরে মেনে প্রাণ দিব কেড়ে॥
রাণীর নিকটে সব সহচরী যায়। ভূমিষ্ঠ হইয়া তারা প্রণমিল পায়॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ি। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই।

সখীগণ কর্ত্তৃক রাণীর নিকট বিদ্যার গর্ভবার্ত্তা প্রদান

আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসে রাণী সতী। ভাল তো আছেগো মোর বিদ্যা গুণবতী॥
চিরদিন দেখি নাই সে চাঁদবয়ান। বড়ই দুরাত্মা আমি হৃদয় পাষাণ॥
তোমরাও ভালমন্দ না কহ সংবাদ। না জানি ঘটিল আজি কিবা পরমাদ॥
উষাকালে এসেছ অবশ্য হেতু আছে। আমার শপথ লাগে সত্য কহ কাছে॥
বিরস বদনে কেন বসিলা নিকটে। প্রাণ করে উড়ু উড়ু হেরে বুক ফাটে॥
নিদ্রায় দুঃস্বপ্ন দেখি ডানি চক্ষু নাচে। বড় ভয় বৃদ্ধকালে শোক পাই পাছে॥
সহচরীগণ বলে শুন ঠাকুরাণী। কি রোগ জন্মিল তার কারণ না জানি॥
এবে দেখি কিরূপে সে রূপ গেল দূর। উদর ডাগর বড় বরণ পাণ্ডুর॥
শয়ন সতত ভূমে মৃত্তিকা ভক্ষণ। মাথা ঘোরে উকি তোলে ইকি অলক্ষণ॥
রাণী বলে কি কহিলে সর্ব্বনেশে কথা। বুঝি বা খাইল বিদ্যা অভাগীর মাথা॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে দেও সাদ ভেট। সে বড় জোয়াল মেয়ে বাধায়েছে পেট॥

গর্ভ দর্শনে রাণীর বিদ্যা প্রতি ভর্ৎসনা

শুনি চমৎকার রাণী উঠে।
পাছে শোনে ভূপ চুপ, বুক করে ধুপধুপ,
কাঁপে কায় কালঘাম ছুটে॥

তয়ে মুখে উড়ে ধূলা, পাছে রহে সখীগুলা,
উপনীত নন্দিনী নিকটে।
যে কহিল রামাচয়, এ কথা অন্যথা নয়,
গর্ব্ভের লক্ষণ যত বটে॥
পূর্ব্বরূপ ছারখার, উদরের বড় ভার
ধরাতলে শুয়েছে রূপসী।
শিথিল কটির বাস, ঘন বহে মৃদুশ্বাস,
আস্ত-আভা প্রভাতের শশী॥
সম্মুখে প্রসবস্থলী, উঠে বিদ্যা কৃতাঞ্জলি,
প্রণমিল লাজে নতমুখ।
কান্দে কথা কহে শুদ্ধ, দেখিলাম মুখপদ্ম,
কব কি জন্মিল যত সুখ॥
অনাথিনী থাকি একা, ছমাস বৎসরে দেখা,
দিনেক তোমার সঙ্গে নাই।
জননী জীয়ন্ত যার, এতেক খোয়ার তার,
গর্ভে কেন দিয়াছিলে ঠাঁই॥
হেদে এক কথা শোন, যদি খাওয়াজিস লোন,
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মোরে।
বাল্লাই যাইত তবে, এত কথা কেন হবে,
অনুযোগ কে করিত তোরে॥
চর্য্যা বুঝিলাম আমি, মানব-রাক্ষসী তুমি,
যমের দোসর সেই বাপ।
আমার কপাল পোড়া, বিধাতা নষ্টের গোড়া,
পূর্ব্ব জন্মে ছিল কত পাপ॥
রাণী বলে পাপীয়সী, প্রাণ ছাড় নীরে পশি,
কিম্বা বিদ্যা খা লো তুই বিষ।
নহে খড়্গো কর্ ভর, এই ক্ষণে মর্ মর্,
কলঙ্কিণী কোন্ সুখে জিস্॥
নির্ম্মল রাজার কুল, তুই কলঙ্কের মূল,
জন্মিলি আমার গর্ভে আলো।
এই রাজ্য ত্যজ্য করে, যদ্যপি ভাতার ধরে,
বেরুতিস সেও ছিল ভালো॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি, শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী,
বিমুক্ত করগো মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উমা আমা উরহ মানসে॥

রাণীসহ বিদ্যার বাক্‌চাতুরী

ঝিঁঝিট মধ্যমান। একতালা।

বিদ্যা ময়লো কলঙ্কিনী ঝি।
আমার কপাল পোড়া তোর দোষ কি ॥ ধুয়া ॥

বাপের দুলালী ছিলি, তাহে তিলাঞ্জলি দিলি
কুলে খোঁটা কুলটা হলি ছি ছি ছি।
কার ঘরে নাই মেয়ে, চক্ষু খেয়ে দেখ্‌ চেয়ে,
পাপক্ষণে তোরে উদরে ধরেছি ॥
প্রসাদ কহিছে দড়, হেন মেয়ে আইবড়,
লাজে লোক দাঁতে কাটে জি ॥

আলো হেদে লো পাপিনী ঝি। বিদ্যা বলে দোষ বা দেখিলা কি ॥
আলো কেমনে মিলিল স্বামী। বিদ্যা বলে পুরুষ না দেখি আমি ॥
আলো কারে কর প্রতারণা। বিদ্যা বলে চক্ষু নাই বুঝি কাণা ॥
আলো গর্ভের লক্ষণ সর্ব্ব। বিদ্যা বলে বাতাসে কি জন্মে গর্ভ ॥
আলো উদর ডাগর তোর। বিদ্যা বলে উদরী হয়েছে মোর ॥
আলো স্তনে ক্ষরে কেন পয়। বিদ্যা বলে এ রোগে বাঁচা সংশয় ॥
আলো কুচাগ্রভাগেতে কালি। বিদ্যা বলে প্রলেপ দিয়াছে আলি ॥
আলো শয়ন কেন ভূতলে। বিদ্যা বলে নিরন্তর দেহ জ্বলে ॥
আলো মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম। বিদ্যা বলে নিদাঘ কালের ধর্ম্ম ॥
আলো পূর্ব্বরূপ গেল দূর। বিদ্যা বলে দেখ লক্ষণ পাণ্ডুর ॥
আলো ঘন ঘন উঠে হাই। বিদ্যা বলে বলাধান মাত্র নাই ॥
আলো ভক্ষণ যে পোড়া মাটি। বিদ্যা বলে ছি মাগী তোরে না আঁটি ॥
তারা মায় ঝিয়ে যত ভাষে। আড়ে আসি বসি আলি হাসে ॥
রস শ্রীকবিরঞ্জনে কহে। কভু গর্ভ ছাপা নাহি রহে ॥

রাণীসহ বিদ্যা ও সখীগণের পুনর্ব্বাক্‌ছল

এতক্ষণ জিয়া আছ তাই আমি চাই। বাসনা এমনি হয় আমি বিষ খাই ॥
প্রাণ সম বাসি পিতা পড়াইল তোকে। গালে দিলি কালি চুণ হাসিবেক লোকে।
সমুচিত শাস্তি বিদ্যা তুই পাবি কালি। উল্‌টা চোরে গৃহী বান্ধে মোরে দিস্‌ গালি॥
বিদ্যা বলে পুনঃ পুনঃ কত কটু কও। চারা নাই মাগো তুমি গুরুলোক হও ॥
গলায় অঙ্গুলি দিয়া কেন তোল কাস। আপনিই আপনার কর সর্ব্বনাশ ॥
কাল বড় কুৎসিত আমাকে কর মাপ। খুঁড়িতে কেচুয়া পাছে উঠে কালসাপ ॥
কিবা ডাক ছাড় তুমি কিবা হাত নাড়। ভাল বটে জীয়ন্ত মাছে পোকা পাড় ॥
বারে বারে যত কহি কথা নাহি মান। যেমন আমার রীত সুন্দর তা জান ॥
অনাথিনীপ্রায় পড়ে থাকি এই ঠাঁই। পুরুষ কেমন কভু চক্ষে দেখি নাই ॥
সবেমাত্র স্নেহভাবে দেখেছেন বাপ। গর্ভ গর্ভ বলে কেন দেহ মনস্তাপ ॥
দুঃখের উপর দুঃখ এ বড় উৎপাত। কোথা বান্ধিবেক তাগা শিরে সর্পাঘাত ॥

রাণী বলে মম্ মেনে একি আর পাপ। তবে বুঝি এ কর্ম্ম করেছে তোর বাপ॥
তোর এ কথায় গায় কাটে যেন বিছা। পেটে ছেলে লড়েচড়ে তবু বলে মিছা॥
ক্রোধে কম্পমান তনু ঘূর্ণিত লোচন। সখীগণ প্রতি কহে কর্কশ বচন॥
জাতিরক্ষা হেতু আছ বিদ্যার নিকটে। আপনারা ঘটক হইয়াছিলা বটে॥
তো সবার দোষ নাহি কাল নহে ভালো। মাথায় করাত দিব কি ভেবেছ আলো॥
করযোড়ে কহে তারা কেন কর রোষ। বিবেচনা করিলে কাহারো নাহি দোষ॥
জন্মাবধি দেখি নাই পুরুষ কেমন। রাজরাণী বট কেন কথা গো এমন॥
বাহিরে প্রহরী থাকে দুরন্ত কোটাল। মনুষ্যসঞ্চার নাহি একি ঠাকুরাল॥
উচিত কহিতে কিন্তু মর্ম্মে পাবে পীড়া। রমণী রমণী সঙ্গে নাহি করে ক্রীড়া॥
ভগীরথ জন্মকথা শুনিয়াছি কাণে। সে কালের মেয়ে তারা এ কালে না জানে॥
তবে কে করিল গর্ভ এত বড় রঙ্গ। ছাড় মেনে ঠাকুরাণি এ পাপপ্রসঙ্গ॥
আপনার মান গো আপনি যত্নে রাখি। লোকে বলে কাটা কাণ চুল দিয়া ঢাকি॥
আকাশে ফেলিতে ছেপ গায়ে এসে পড়ে। বাড়া কিবা কহিব কথায় কথা বাড়ে॥
অবিচারে কর নষ্ট তার চারা কিবা। যার রীত যেমন জানেন মাত্র শিবা॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে করি কৃতাঞ্জলি। শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি॥

বিদ্যার গর্ভসংবাদ শ্রবণে ভূপতির কোটালকে ধরিতে অনুমতি

নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে। অসম্বর অম্বর অম্বর পড়ে শিরে॥
জ্ঞানহারা তারাকারা ধারা শত শত। গোযুগে গলিত ধারা তৃষ্ণা নিষ্ঠা গত॥
বিগলিত কুন্তল জলদপুঞ্জছটা। নিরানন্দ গতি মন্দ জিনিয়া বরটা॥
ভূপ উপে উপনীত মলিন বদন। সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে শীঘ্র ধরণীভূষণ॥
বিমল কমলমুখ ম্লান কেন কবে। অদ্য কান্তে কৃতান্তে নিশান্তে কারে লবে॥
শিরে হানি পাণি রাণী বলে কব কি। শুন পর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব গর্ভবতী ঝি॥
কি বল কাঁপিয়া উঠে মুখে উড়ে ফাক্কা। ভাবনায় ভাতি ভিন্ন ভূপ যায় ভাক্কা॥
সমূলে রুষিল যেন মাতাল মাতঙ্গ। সুষুপ্তি সময়ে যেন দংশিল ভুজঙ্গ॥
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত নিকটে যেমন। সেইরূপ শুনি ভূপ মহিলাবচন॥
আপাদ পর্য্যন্ত অগ্নিশিখা যেন দহে। কোটালের কর্ম্ম এই আর কারু নহে॥
আরবার দরবার মধ্যে গিয়া ভূপ। কাঁপে গুরু উরু ওষ্ঠ লোচন বিরূপ॥
ক্রোধে কহে তোমরা সওয়র দশ যাও। এহি ওক্ত মেরে পাশ বাঘাই মাঙ্গাও॥
যো হুকুম বলিয়া সওয়ার দশ লড়ে। কেহ তাজি তুরকী টাঙ্গন পৃষ্ঠে চড়ে॥
দড়বড় গড় পাড়ে উঠাইয়া ঘোড়া। রজপুত যমদূত গোঁপে দেয় মোড়া॥
ঘেরে কোটালের বাড়ী কহে বেহেসাব। কাঁহা কোতোয়াল গিরি নেকাল সেতাব॥
বৈঠকখানায় কোতোয়াল শুয়ে খাটে। সোয়ারের ঘটা দেখি ভয়ে মার্গ কাটে॥
ধুতি পরি লেজা শির হইল হাজির। অমনি ঢেকার করে বেড়ার বাহির॥
পাছে থেকে মারে কেহ বন্দুকের হুড়া। আকটে পাপোস মারে হাড় করে গুঁড়া॥
কোটালমহিলা কান্দে করে হায় হায়। এক দণ্ডে নিয়া গেল রাজার সভায়॥

নিকটে নকীব ছিল করিল জাহির। নজর দৌলত এই বাবাই হাজির॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

ভূপতির তর্জ্জনে কোতোয়ালের বিনয়

মৌনরূপে ভূপ আছে, কোতোয়াল খাড়া আছে
কোপে কহে ঘন বাহু নাড়া।
কুকুরে প্রশ্রয় দিলে, কান্ধে চড়ে এক তিলে,
বিশেষ কহিব কিবা বাড়া॥
ক্রোধে কাঁপে মহীপাল, কহে ওরে কোতোয়াল,
বুঝিলাম তোর নাহি দোষ।
যেমন যুগের ধর্ম্ম, তেমন উচিত কর্ম্ম,
মিছামিছি আমি করি রোষ॥
কারে কব কাব্য কহ, যে যাহারে সঁপে দেহ,
সে নাকি তাহার কাটে শির।
করিয়া হারামখুরী, পশিয়া আমার পুরী,
রাজ্যে চুরি নাকে দিব তির॥
মনেতে আগুন জ্বলে, পুনঃ পুনঃ কটু বলে,
শান্তি নহে আরো ক্রোধ বাড়ে।
বিষম বিষয়ে মত্ত, না লও বিদ্যার তত্ত্ব,
সবংশে গাড়িব এক গাড়ে॥
সুরাপানে রাগরঙ্গে, থাক বারবধূ সঙ্গে,
অধর্ম্মে একান্ত পূর্ণ দৃষ্টি।
বিশ্বাসঘাতকী বেটা, হেন কাজ করে কেটা,
এই পাপে যাবে তোর সৃষ্টি॥
কোতোয়াল বিদ্যমান, থরথর কাঁপে প্রাণ,
ধীরে কহে কি করেছি আমি।
ক্রোধ সম্বরণ কর, সকলি করিতে পার,
মহারাজ আপনি ভূস্বামী॥
বিষ খেতে দেন মাতা, ধন লোভে বেচে পিতা,
জাতিবাদ যদি দেয় দারা।
অবিচারে রাজদণ্ড, গৃহ দহে বহ্নি চণ্ড,
কি আছে ইহার আর চারা॥
কিন্তু শুন মহাশয়, বিচার করিতে হয়,
দোষ দেখে এক গাড়ে গাড়।
যদ্যপি না ঘাটী থাকে, প্রাণ লও মিছা পাকে
এ নহে বিহিত ক্রোধ ছাড়॥

আর শুন গুণধাম, লইয়া বিদ্যার নাম,
তারে রক্ষা করি আমি সদা।
অন্তরে বিষম ভয়, রাত্রে নিদ্রা নাহি হয়,
সাক্ষী মাত্র কেবল শারদা॥
সতত সতর্ক থাকি, দণ্ডে দশ বার ডাকি,
সখী কহে প্রবোধ বচন।
হুসিয়ারে আছি ভাই, আমরা কি নিদ্রা যাই,
সবে বিদ্যা ঘুমে অচেতন॥
পিপীড়ার নাহি সন্ধি, নজরেতে হয় বন্দী,
ইহাতে মনুষ্য কোন্ ছার।
তবে যদি যায় চোরে, বিধাতা বিমুখ মোরে,
নিতান্ত এ কর্ম্ম দেবতার॥
রাজা বলে সে যা হোক, সাত দিন প্রাণ রোক,
ইতিমধ্যে চোর দিবে ধরে।
ধরিয়া আনিলে চোর, সম্মান করিব তোর,
জায়গির দিব বহু করে॥
যো হুকুম এই বাত, শিরে উঠাইয়া হাত,
ঘরে যায় সংপ্রতি সুসার।
পিছে দিল মহসিল, সরিবারে এক তিল,
নারে হুসিয়ার হুসিয়ার॥
সদা পুটাঞ্জলি পাণি, শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী,
বিমুক্ত করগো মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উর উমা আমার মানসে॥

চৌর্য্যসংবাদার্থ কোটালিনীর অন্তঃপুরে গমন ও রাণীর সহিত কথোপকথন

কহিল বিরূপ ভূপ দুঃখে অঙ্গ দহে। ঘৃণা বড় ঘরে গিয়া ঘরণীকে কহে॥
সৃষ্টি লোপ হয় প্রিয়ে কার মুখ চাও। এইক্ষণে রাণীর নিকটে তুমি যাও॥
বিদ্যার মন্দিরে কিবা দ্রব্য গেল চোরে। সেই দোষে সবংশে কাটিবে রাজা মোরে॥
শ্রুতমাত্র বিলম্ব না করে একটুক। অমনি চলিল ত্রস্ত ভয়ে কাঁপে বুক॥
নানা উপহার দ্রব্য সংহতি লইল। অবিলম্বে রাণীর নিকটে উত্তরিল॥
ভূমে লুঠি প্রণমিল করি যোড় পাণি। পরম দুঃখিতা রাণী না কহেন বাণী॥
সে ধারা দেখিয়া তার হৃদে জন্মে ভয়। সকরুণে কোটাল-মহিলা তবু কয়॥
এক নিবেদন মাতা চরণে তোমার: কৃপা করি কহ শুনি সত্য সমাচার॥

কি দ্রব্য হইল চুরি রাজকন্যাবাসে। জীয়ন্ত জীবনে মরা কোটাল হুতাশে॥
বিশেষ জানিলে চোর তবে ধরা যায়। নতুবা সবংশে নষ্ট হই এই দায়॥
অধোমুখে কহে রাণী কি মোরে সুধাও। মিলিবে সকল তত্ত্ব সেই খানে যাও॥
সে বড় দারুণ কথা বাড়া কব কি। অভিমানে মরমে মরিয়া রয়েছি॥
পুনঃ কহে যোড় হাতে নিশিনাথদায়া। বিড়ম্বনা কর যদি তবে নাই চারা॥
অবিচারে মহাপ্রাণি হত্যা বড় পাপ। কি কারণে ঠাকুরাণি দেহ মনস্তাপ॥
দুগ্ধপোষ্য নহি এত বুঝি কত কত। ভাল ত না শুনি মাগো বল তুমি যত॥
চোরে গেল দ্রব্য তার এত খেদ কেন। ভাবক্রমে বুঝি কিছু অপকর্ম্ম হেন॥
রাণী বলে সেই বটে কি জিজ্ঞাস আর। বিদ্যাবতী গর্ভবতী এই সমাচার॥
কহিবার কথা একি মৃত্যু ইচ্ছা হয়। শুনিলা এখন তুমি যাও নিজালয়॥
দশনে রসনা চাপে চমকিয়া উঠে। বাম্য করাঙ্গুলি তুলি দিল নাসাপুটে॥
আর কিছু না কহিল গেল নিজ বাসে। কোতোয়াল শুনি বার্ত্তা মনে মনে বাসে
ভূপতিকে হেয়জ্ঞান কৈল নিশিনাথ। রাম রাম বলি দুই কর্ণে দিল হাত॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

কোটালের ভূপতি প্রতি নিন্দা

ভূপতি কেবল অজা যে জন লুটিল মজা,
এড়াইল সেই আমি চোর।
কহিতে সরম করে, কন্যার ছিনালি ধরে,
গরদান লৈতে চাহে মোর॥
রাজলক্ষ্মী থাকে যার, সূক্ষ্ম বিবেচনা তার,
সত্যাচার প্রতাপ প্রচণ্ড।
পূর্ব্ব পুণ্যপুঞ্জ হেতু, কৃপান্বিত বৃষকেতু,
তেঁই ধরে শিরে ছত্রদণ্ড॥
নতুবা কি কোনরূপে, এ ছাড় অধম ভূপে,
কমলার কৃপাদৃষ্টি হয়।
মনেতে জন্মেছে অগ্নি, সে বিদ্যা ধর্ম্মত ভগ্নী,
কেমনে এমন কথা কয়॥
গ্রামের সম্বন্ধে যারে, যা বলিয়া ডাকে তারে,
সেই ভাব করণ কর্ত্তব্য।
এ আমি নেমকে পালা, হায় হায় একি জ্বালা,
রাজা বেটা বড়ত অভব্য॥
বিতুষ্টা জননী কালী, খেদমত কোতোয়ালী,
গালাগালি লতায় ছুতায়।
নাহি গণে আগাপিছা, যার যায় খড়গাছা,
প্রথমেতে আমাকে গুঁতায়॥

মারিয়া করিল ক্ষীণ, দেখি পাঁচ সাত দিন,
চোরের নাগাল যদি পাই।
মনেতে সকল আছে, দিয়া নৃপতির কাছে,
অধিকার ছাড়া হয়ে যাই॥
হইল সুন্দর শিক্ষা, মেগে খাব মুষ্টিভিক্ষা,
এমন সম্পদে কাজ নাই।
প্রসাদ বলিছে রও, এ দায় খালাস হও,
তবে তুমি যাও অন্য ঠাঁই॥

কোটালিনী কর্ত্তৃক ভদ্রকালীর স্তুতি ও প্রসাদপুষ্প মাথে প্রদান

কোটাল-কামিনী হেথা পূজে ভদ্রকালী। করপুটে কহে মাগো একি ঠাকুরালী॥
ভাল মন্দ কভু মোর প্রভু নাহি জানে। অপরাধ করে কেহ কেহ মরে প্রাণে॥
দয়া কর দাসে দয়াময়ি দাক্ষায়ণি। দনুজদলনি দুর্গে দুর্গতিনাশিনি॥
ধব তব ভব কব তার গুণ কিবা॥ আশুতোষ আখ্যা এক শুন মাগো শিবা॥
সদাশিব সদাশিব সমূহ বিনাশে। কৃপানাথ নামে কষ্ট নষ্ট অনায়াসে॥
শৈলরাজপুত্রি মাগো বিশ্ববিভুদারা। কৃপণতা অনুচিত নাম তব তারা॥
তবে যদি কাতর কিঙ্করে দয়া নহে। তোমাকে করুণাময়ী কেন লোকে কহে॥
তুষ্টা মহামায়া তার ঐকান্তিক ভক্তি। ভয় নাই শ্রবণে শুনিল দৈব উক্তি॥
অচিরে অবশ্য ধরা পড়িবেক চোর। সে কিন্তু মনুষ্য নহে বরপুত্র মোর।
দেবী-অনুকূল ফুল পাইল প্রসাদ। হাস্যযুতা বিধুমুখী হৃদয়ে আহ্লাদ॥
যত্নে সেই ফুল দিল প্রাণনাথ হাতে। ভক্তি করি কোতোয়াল রাখে নিজ মাথে॥
প্রমদার প্রিয়বাক্যে প্রাণ পায় ধড়ে। হুঁকে উঠে হুপ বাড়ে হুহুঙ্কার ছাড়ে॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

কোটালের চোর অন্বেষণে সজ্জা

সাজে কোতোয়াল, লে খঞ্জর ঢাল' দো আঁখিয়া লাল,
সোবাণ পতঙ্গ, চড়ে গজতুঙ্গ, ঘুমাওত অঙ্গ,
সেতাব করি।
যোযায়ত সাত, তুঝে দেওমে হাত, কহে মিঠী বাত,
পিছে হোকে আও, কোহি মত যাও, মেরে সির খাও,
হো পাঁও পরি॥
দেখো এহি যাও, ওঁহি চোর পাও, মেনে গারি গাও,
কহে মুঝে ভূপ, সো বাত সরূপ, আবি রহ চুপ,
জি এক ঘরি।

চলে কেত্তে ঠাট, হাঁকে কাট কাট, ভরে পুর বাট,
খোলাওব যোহি, লই ধুলি তৌহি, পড়ে সোকাঁহি,
হাম চোর ধরি ॥
হো ফৌজ হাজার, জাগাএটে বাজার, লোক হয়ে লাচার,
ফুকরে দোহাই, কাহে লুট ভাই, হজুরমে যাই,
ক্যা কিয়া হোঁ চুরি ।
কহি কহে আঁট, ইসে আগু হাঁট, মুড়ায়ে গো * *
হারাম কি হাড়, আভি * * ফাড়, মারো উস্কা * * ;
দোহাই তেরি ॥
কহে কবি রাম, হোঁ পামর হাম, তারা তেরে নাম,
পড়া হোঁ লাচার, ওহি পদ সার, মুঝে কর পার,
গমন কো ডরি ॥

সহরে চোর ধরণার্থে কোটালের দৌরাত্ম্য

চোর হেতু ঘরে ঘরে, বিষম বেদাতি করে,
বিদেশীকে বেন্ধে মারে কোড়া।
যাহার বাটীতে থাকে, ইটে খাড়া করে তাকে,
কোটালিয়া বিনষ্টের গোড়া ॥
স্তব্ধ হয় সব লোক, দিবারাত্র ভাবে শোক,
উৎপাতের সীমা কিছু নাই।
শিষ্ট লোক যত ছিল, আগে ভাগে পলাইল,
দূরাদূরে গেল ঠাঁই ঠাঁই ॥
গাদাও সহর তায় কত লোক আইসে যায়,
সদা দেখা পথিকের সাথে।
কাটকেতে রাখে বন্দী, কে বুঝে তাহার ফন্দী,
সাবল তাওইয়্যা দেয় হাতে ॥
মেগে খায় যারা যারা, তা সবার অন্ন মারা,
ভয়ে কেহ সহরে না ঢোকে।
পড়্যা পড়্যা থাকে মাঠে, কত বা নদীর ঘাটে,
তক্তসারা মাছি পড়ে মুখে ॥
নিশিতে প্রহর বাজে, তার পর কেহ কাজে,
দুই চারি দণ্ড যদি থাকে।
সে যেন প্রকৃত চোর, দুঃখের না থাকে ওর,
সারা রাত্রি হাড়্যা ঠুক্যা রাখে ॥
যে বেটাধা ছেঁচা বোঁচা, বড় বড় লম্বা কোঁচা,
হয় কোটালের হরকরা।

বুকে টোকা দিয়া কয়, বসে থাক মহাশয়,
একেদিনে যাবে চোর ধরা ॥
হর্ষযুক্ত কোতোয়াল, মাথায় জড়ায় শাল,
পিঠ ঠুক্যা কহে ভাই রহ।
চোর ল্যানে সকো যব, আর ভি ইনাম তব,
দেওঙ্গা ফেকের এস্কা কহ ॥
হুজুরে নালিশ রোজ, রাজা ভাবে বুঝি খোঁজ,
কোনরূপে পেয়েছে বাঘাই।
নতুবা কি এত জোর, হামেসা হাঙ্গামা সোর,
তথা কারু কথা লাগে নাই ॥
এথা চোরচূড়ামণি, দণ্ড-কমণ্ডলু-পাণি,
কখন বা ব্রহ্মচারি-বেশ।
অবধৌত কোন দিন, আসন শার্দ্দুলাজিন,
দীপ্যমান দ্বিতীয় দিনেশ ॥
কোতোয়াল করপুটে, স্তব করে সন্নিকটে,
নিজ দুঃখে বিশেষ রোদন।
পুরীশুদ্ধ হই নষ্ট, আশীর্ব্বাদ কর কষ্ট,
দূর হউক রহুক জীবন ॥
হাসি কহে গুণনিধি, অচিরে তোমাকে বিধি,
অবশ্য হবেন অনুকূল।
বাক্য মিথ্যা নহে মোর, ধরা পড়িবেক চোর,
ভয় নাই হের ধর ফুল ॥
পুলকিত নিশীশ্বর, ফুল নিল পাতি কর,
পুনরপি প্রণিপাত করে।
কালীপাদপদ্ম ভাবি, রচিল প্রসাদ কবি,
কোটাল চলিল স্থানান্তরে ॥

কোতোয়াল-চরসমূহের ছদ্মবেশে চৌর অন্বেষণ

কূটবুদ্ধি কোতোয়াল তর্ক করে নানা। ঠাঁই ঠাঁই বসাইল মজবুত থানা ॥
বিড়া উঠাইল পাঁচশত হরকরা। বুক ঠুক্যা কহে চোর জানা গেল ধরা ॥
কত পাটনির ঠাটে খেয়া দেয় ঘাটে। কত বা দানীর ছলে দান সাধে মাঠে ॥
দশ বিশ জনে ধরে ব্রজবাসি-বেশ। কত সবচুল কত মুড়াইল কেশ ॥
কটিতে কৌপীনমাত্র তাহাতে গিরস। সদা করে কেবল ভক্ষণ নামরস ॥
গৌড়রাজ্যে গোঁড়াগুলা চলে যে যে ঠাটে। সেরূপে ভ্রময়ে কত হাটে ঘাটে নাটে ॥
খাসা চীরা বহির্ব্বাস রাঙ্গা চীরা মাথে। চিক্কণ গুধড়ী গায় বাঁকা কোঁৎকা হাতে॥
মুঞ্জ গুঞ্জ ছড়া গলে ঠাঁই ঠাঁই ছাব। দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টিছাড়া ভাব ।

পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট। ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট॥
এক এক জনার ধুমড়ী দুটি দুটি। দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটী॥
ভুগলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে। বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম উঠে ডেকে॥
সে রসে রসিক নবশাক লোক যত। উঠে ছুটে পায় পড়ে করে দণ্ডবত॥
সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজ বাড়ী। ভালমতে সেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি॥
গোষ্ঠীসুদ্ধ খাড়া থাকে বাবাজীর কাছে। মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে॥
নানা রস ভুঞ্জায় শোয়ায় দিব্য খাটে। শেষে মেয়ে পুরুষেতে পাত্রশেষ চাটে।
বৈষ্ণববন্দনা গ্রন্থ সকলে পড়ায়। ছত্রিশ আশ্রম নিয়া একত্র জড়ায়॥
কেমন কলির কর্ম্ম কব আর কি। মজাইল গৃহস্থের কত বহু ঝী॥
শতাবধি জনে হয় খাসা রামানন্দী। অঙ্গ সঙ্গোপনে তারা ভাল জানে সন্ধি॥
পাঁচ হাতিয়ার বান্ধা বিষম দুরন্ত। জনেক তাহার মধ্যে প্রাচীন মহান্ত॥
দেবল দেখিলে যেন পায় ভক্ষ লাড়ু। ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়া কেড়ে লয় গাড়ু॥
মার পিটে ধুমধাম করয়ে লহর। ভয় নাই লুট্যা খায় রাজার সহর॥
কেহ বা বিষম বাঁকা জালালি ফকির। কাঁকালে কুঠার গাঁথা পায়েতে জিঞ্জির॥
বাঁ হাতে লোহার খাড়ু শিরে পাগ কালা। কান্ধে ঝুলি গলে কত তর তর মালা॥
যার বাটী যায় তার নাকে আনে দম। কয়েফেতে চুরচুর নদারদ গম॥
কত অবধৌত কত যতি ব্রহ্মচারী। হাজারে হাজারে ফিরে নানা ভেকধারী॥
হেকমতে কতগুলা হইল কাঙ্গালী। মরা পারা পড়্যা পড়্যা থাকে গলি গলি॥
লোকে জিজ্ঞাসিলে কেহ নাহি কাড়ে রা। দুই চক্ষু বুজে থেকে থেকে করে হা॥
মেয়ে হরকরা গৃহস্থের ঘরে ঘরে। চোর অন্বেষণ করে কত মায়া ধরে॥
নিদ্রা নাহি যায় লোকে কোটালের ডরে। খেতে শুতে শান্তি নাই কখন কি করে॥
সন্ধ্যার সময় বড় পড়ে তাড়াতাড়ি। রজনীতে কেহ নাহি যায় কারু বাড়ী॥
পূর্ব্বমত গানবাদ্য নাহি রাগরঙ্গ। মহাভয়যুক্ত লোক সদা রঙ্গ ভঙ্গ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ি। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

চোর সন্ধানে বিদু ব্রাহ্মণীর বৃত্তান্ত

না মিলে চোরের তত্ত্ব গেল পঞ্চ দিন। ভয়যুক্ত কোতোয়াল বদন মলিন॥
হীরা রায় নামে এক কোটালের খুড়া। বয়স বিস্তর বড় বুদ্ধিমান বুড়া॥
কহে বাপু কেন হাপু গণ যুক্তি আছে। সঙ্গোপনে যাও বিদু ব্রাহ্মণীর কাছে॥
তাহার অসাধ্য কর্ম্ম ভূমণ্ডলে নাই। অবশ্য চোরের তত্ত্ব পাবে তার ঠাঁই॥
এ কথা শুনিয়া কোতোয়াল কুতূহলী। শিরে বন্দে প্রযত্নে পিতৃব্যপদধূলি॥
চলিল বাঘাই একা মধ্যাহ্ন সময়। উপনীত সেই বিদুব্রাহ্মণী-নিলয়॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলি রহে। বৈস বাপু বিদু মৃদু হেসে হেসে কহে॥
কোন ঘাটে মুখ আজি ধুয়েছিনু মুই। বৌও বেটা বুঝেছি নিঠুর বড় তুই॥
ভাগ্যধর হবে বাপু কুড়ায়েছি ফুল। সুবচণ্ডী পূজে কত ছিঁড়িয়াছি চুল॥
পঞ্চম বৎসরে তোর মা মরে যখন। মৃত্যুকালে হাতে হাতে সঁপেছে তখন॥

এবে বাছা ঠাকুরালী দেশের ঠাকুর। আমি সেই ভাব ভাবি তুমি সে নিষ্ঠুর॥
কোতোয়াল কহে মাসি মিছা কথা থো। বিপাকে পড়িয়া তোর মরে বহীন পো॥
শুনিয়া থাকিবে গো বিদ্যার সমাচার। এ ঘোর সঙ্কটে মোকে করহ নিস্তার॥
তোমা বই গতি নাই পৃথিবীতে মোর। পূজিব চরণ দুটি পাই যদি চোর॥
বিদু বলে হাসি হাসি এত বড় দায়। আজি যাও কালি চোর মিলিবে তোমায়॥
বাহু তুলি কুতূহলী নাচে নিশিনাথে। আকাশের চাঁদ যেন পায় নিজ হাতে॥
কোটাল চলিয়া গেল আপনার ঘর। বিদু যায় বিদ্যা বিনোদিনীর গোচর॥
প্রণাম করিয়া বিদ্যা বসিতে বলিল। ব্রীড়ায় বদনবিধু বসনে ঝাঁপিল॥
কৌতুকে কপট কথা কহে বিদু হাসি। শুনেছি সকল তত্ত্ব শুন গো রূপসি॥
চিন্তা কি গো চন্দ্রমুখি চুপ করে রও। কিবা লাজ কার কাজ তার নাম লও॥
তার হাতে ঔষধ খাইয়া শীঘ্রগতি। যাবে গো উৎপাত গর্ভপাত হবে সতি॥
একান্ত চিহ্নিত বটি শঙ্কা নাহি মাত্র। তুমি গুণবতী দেখি সে কেমন পাত্র॥
কোটালের জানিত এ বুঝি বিনোদিনী। সখিগণ প্রতি কহে বড় আপ্ত ইনি॥
ইহার গুণের কথা কহা নাহি যায়। পুরস্কার দেও সখি মনে যেবা চায়॥
ইঙ্গিত পাইয়া উঠে উষা নামে আলি। এক গালে চুণ দিল আর গালে কালি॥
ঠেসে ধর্যা ঠোনা মারে ঠগিনী বলিয়া। ঘন ঘন মুখ ঘসে মাটিতে ফেলিয়া॥
কেবল ব্রাহ্মণী হেতু জীবন রহিল। ঢেকা মেরে বাড়ীর বাহির করে দিল॥
হাঁইফাঁই করে দুই চক্ষে পড়ে জল। মনে ভাবে অসৎকর্ম্মে বিপরীত ফল॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ি। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

বিদুর নিকটে কোটালের নিরাশ্বাসে মাঘাইর হিতোপদেশ

অর্দ্ধ ক্রোশ পথ চারি দণ্ডে গেল চলি। অমনি পড়িল শেষে মরি মরি বলি॥
আমালল শরীর উঠিতে শক্তি নাই। কেন্দে কহে এত দুঃখ দিলা হে গোঁসাই॥
প্রভাত হইল নিশা নিশানাথ আসি। দুয়ারে দাঁড়ায়ে কহে কি কর গো মাসি॥
কোঁথায়ে কোঁথায়ে কহে আরে বাপু মরি। অতি বুদ্ধি পোঁদে দড়ি তার ভোগ করি॥
স্বার্থ নাহি পরার্থে যে করে পরানিষ্ট। দেবতা তাহারে দেন বিধিমত কষ্ট॥
যে জাতীয় দুঃখ দিল নৃপতির ঝি। মেয়ে জাতি পাপমুখে কব আর কি॥
সেটে ধরে আঁটে কিল মর্ম্মে পাই পীড়া। কর্ম্মকারে পিটে যেন বড় লোহা ভিড়া॥
গালে গুঁতা গণে গণে গোটা বিশ গায়। শরীরেতে সহে কত কাষ্ঠ ফেটে যায়॥
অস্থানে গস্তানগুলা শাস্তি দিল বড়ি। স্বস্থানে প্রস্থান ইচ্ছা শক্তি নাই নড়ি॥
বিদু-বাক্যে বিস্তর হাসিল নিশানাথ। ক্ষমা কর মাসি বল্যে ধরে দুটি হাত॥
বস্ত্র দিল একখানি টাকা দিল দুটি। বিদায় মাগিল কিন্তু লাগে ছটফটি॥
কেন্দে কহে কি কর মা কৃপাময়ি কালি। আজ্ঞা তব বৃথা হয় একি ঠাকুরালি॥
যদ্যপি না মিলে চোর রাজা প্রাণ লবে। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা নাম কেন তবে॥
ছয় দিন গেল আজি কালি সপ্ত দিবা। মরণ নিকট মাগো বাড়া কব কিবা॥
চিন্তাযুক্ত বৃক্ষতলে বসিল বাঘাই। করপুটে কহে কিছু তার ছোট ভাই॥

বুদ্ধির সাগর তুমি বট মহাশয়। বিপদে বিশিষ্ট লোক বুদ্ধিহারা হয়॥
ভার্য্যাবাক্যে ভগবান ভুলিল আপনি। কনককুরঙ্গ পাছে গেলা রঘুমণি॥
নল হেন মহারাজ বিপদে পড়িয়া। ঘোর বনে পলাইলা ঘরণী ছাড়িয়া॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হৈল বুদ্ধিহারা। পাশায় করিলা পণ আপনার দারা॥
যত বুদ্ধি পাও দাদা মনে নাহি ধরে। সবে মেলি যাই চল রাজকন্যা-ঘরে॥
সিন্দূরে মণ্ডিত কর রাজকন্যা গৃহ। নিতান্ত মিলিবে চোর নাহিক সন্দেহ।
কুতূহলে কোতোয়াল কোলে করে ভাই। ভাল কথা বলেছিস্ ভাইরে মাধাই॥
অনুমতি হেতু কোতোয়াল কহে ভূপে। রাজা বলে ভাল চোর ধর কোনরূপে॥
ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম। তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ ধাম॥
শ্রীমণ্ডপ জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা। নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা॥
কিঞ্চিৎ তিষ্ঠিলে ফলাপেক্ষা ছিল কিবা। ক্ষীণ পুণ্য দেখি বিড়ম্বনা কৈল শিবা॥
শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুতা। শ্রীকবিরঞ্জনে ভণে কবিতা অদ্ভুতা॥

চোর ধরণার্থে বিদ্যার মন্দিরে সিন্দুর লেপন

তখন পঞ্চাশ মণ আনিল সিন্দুর। পাঁচ সাত জন গেল রাজকন্যা-পুর॥
কোটালে সম্মুখে দেখি চমকিত রামা। সখীসঙ্গে স্থানান্তরে গেলা গুণধামা॥
কূটবুদ্ধি কোতোয়াল কত জানে ফন্দী। সিন্দূরে মণ্ডিত কৈল না রাখিল সন্ধি॥
খট্টাদি যতেক ছিল বিচিত্র ভূষণ। সিন্দূরে মাখিয়া রাখে রজনী-রাজন॥
মুহূর্ত্তেকে পুনরপি হইল বাহির। বন্ধুবর্গ সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি করে স্থির॥
বাপীতটে রজকে যথায় বস্ত্র কাচে। অলক্ষিতে অনুচর রাখে তার কাছে॥
কোতোয়াল গেল জানি বিদ্যা বিধুমুখী। প্রবেশিলা নিজ গৃহে সঙ্গে যত সখী॥
গৃহ খট্টা যাবদীয় বিচিত্র বসন। সকলি সিন্দূর মাখা উচাটন মন॥
কিবা তঞ্চ করে গেল কাল কোতোয়াল। প্রাণনাথ লৈয়ে পাছে ঘটায় জঞ্জাল॥
ছিলা হর্ষ হরিণাক্ষী হুতাশে শুকায়। কি আছে কপালে মোর কহা নাহি যায়॥
ভাবিতে চিন্তিতে গেল নিশি অর্দ্ধযাম। হেনকালে উপস্থিত কবি গুণধাম॥
ভার্য্যাকে ভাবিতা দেখি ভয় পেয়ে মনে। যতনে জিজ্ঞাসে কবি মধুর বচনে॥
কহ লো কমলমুখি কি নিমিত্ত হেন। পেয়েছ পরমপীড়া প্রায় বুঝি যেন॥

বিদ্যা বলে প্রাণনাথ খেলে মোর মাথা।
কে কহিল তোমাকে আসিতে আজি হেথা॥

কি তঞ্চ করিয়া গেল কোটাল চতুর। সকল গৃহেতে হেদে দেখ না সিন্দুর॥
অকস্মাৎ কান্দে প্রাণ নাচে যাম্য আঁখি। পড়িবে প্রমাদে প্রভু এই তার সাক্ষী॥
হেসে কহে কবি হরি এ জন্যে ভাবনা। কোন চিন্তা নাহি শুন কুরঙ্গনয়না॥
সহস্র বৎসর যদি ভ্রমে নিশানাথ। তথাচ কদাচ তার নাহি হব হাত॥
রমণী লইয়া সুখে বঞ্চিলা রজনী। উষাকালে উঠে গেলা কবি শিরোমণি॥
বসনে সিন্দূরমাখা দেখি কবিবর। হীরা প্রতি কহে মাসি এক কর্ম্ম কর॥
নিশিযোগে বস্ত্রখানা দিও ধোপা বাড়ী। সংগোপনে কাচে যেন দুনা দিব কড়ী॥

এত বলি স্বীয় কর্ম্মে চলিলা সুন্দর। সন্ধ্যাকালে যায় হীরা রজকের ঘর॥
চুপে চুপে কহে কথা বিরলে ডাকিয়া। গুপ্তে একখানি বস্ত্র দিবে হে কাচিয়া॥
অন্য ঠাঁই যে পাও দ্বিগুণ দিব আমি। প্রকাশ না হয় যেন বুদ্ধিমান তুমি॥
ভাল ভাল বলিয়া রজক দিল সায়। হেসে হেসে হীরাবতী হাত নেড়ে যায়॥
ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে। আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব। কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সিন্দুর-চিহ্নিত বস্ত্র দৃষ্টে রজক ও হীরার শাস্তি এবং সুন্দরের সুড়ঙ্গ পথে পলায়ন

প্রভাতে রজক গেল সরোবর-তীর। আগে ভাগে সেই বস্ত্র করিল বাহির॥
কোটালের অনুচর আছিল নিকটে। সিন্দুরের চিহ্নে বুঝে চোরের এ বটে॥
দৌড়ে যেয়ে ঘাড় ধরে দেয় পাকলাড়া। তখনি কাপড় দিয়া বান্ধে পিঠমোড়া॥
ঢেকাইয়া নিল যথা কোতোয়াল আছে। সিন্দুরে চিহ্নিত বস্ত্র ফেলে দিল কাছে॥
কোপে কোতোয়াল কহে মুখে লাগে থুবী। কাঁহা চোর সেতাব বাতাওগে বে ধুবী॥
কোই কহে সাহেব জি রহো এক সাত। হকীকত বুঝা জাগা কহনে দেও বাত॥
করপুটে সম্মুখে রজক কহে বাণী। কার বস্ত্র ভাল মন্দ আমি তো না জানি॥
কালি রাত্রি মোর বাড়ী এসেছিল হীরা। বস্ত্র দিয়া বিস্তর দিলেক মাথা কিরা॥
যে পাও দ্বিগুণ তার পাবা মোর ঠাঁই। লুকায়ে কাচিবা যেন কেহ দেখে নাই॥
ইহা বই আমি নাহি জানি মহাশয়। অবিচারে নষ্ট কর উপযুক্ত নয়॥
বাত এস্‌কা এহি হ্যায় চল ওস্‌কা পাশ॥ বেতক্সির বেচারা কো দেওজী খালাস॥
ওকে নিয়া মাথায় বান্ধিয়া দিল চীরা। যাও শীঘ্র কি জানি পলায় পাছে হীরা॥
কালান্তক যম যেন করি-পৃষ্ঠে উঠে। মুখপানে তাকাইতে গায়ে ঘর্ম্ম ছুটে॥
লেঙ্গা তরোয়ার হাতে রাঙ্গা দুটি আঁখি। কাঁহা হীরা হীরা ডাকে করে হাঁকাহাঁকি॥
সরদার গেল যদি তবে থাকে কে। ঝাটায়ে চলিল পাছে বাকি ছিল যে॥
ঘোড়া উড়াইল বেগে সোয়ার হাজার। কাঁপে মাটি ডাকে হাঁকে রাজার বাজার॥
ঘোরঘটা ঘেরে ঘরবাড়ী মালিনীর। ডেক্যে হেঁকে হীরা বুড়ী হইল বাহির॥
হীরাবতী সম্মুখে কোটাল কোপে জ্বলে। অগ্নিতে ফেলিলে ঘৃত যেমন উথলে॥
কেঁওরে হারামজাদী এহি কাম তেরা। সাত রোজ ফাকা লবেজান হুয়া মেরা॥
কাঁহা সে লেয়াও চোর কৌন জাতি ওহি। কহ তুঝে কেত্তা মালিয়াৎ দিয়া সোহি॥
খেলাপ কহগী বাত শির মোড়াওঙ্গা। গান্ধামে চড়ায়কে হিমাইত তোড়ঙ্গা॥
কোটালের কটুবাক্যে কুপিল অধীরা। ভয় নাহি চোটপাট কথা কহে হীরা॥
এই সি রাঁড় নহি হোঁ দাবায় জাওগে। বেহেসাব কহগে তব সাজাই পাওগে॥
মু সামালো খুব নাহি কহ বের বের। রাজা কি সহরমে বেটা তেঁই হুয়া সের॥
কোতোয়াল কহে খান্দী তওভি কর্‌তি সোর।
ঝট নাহি কহো মেই তেরে ঘর্‌মে চোর॥

হাত লেড়ে হীরা বলে থাক মেনে থাক। বুঝা গেল আর মেনে বাড়া কথা রাখ ॥
আমি ঘরে চোর পুষি কহগে রাজারে। ওরে বেটা ঠেটা এটা কহে কেটা মোরে॥
লাফ দিয়া কোতোয়াল চুলে ধরে তার। দেখ তো হারামজাদী এ কাপড়া কার ॥
মজাইতে কুল ফুল যোগাইতে নিত্য। এ কলঙ্ক রহিল যাবৎ চন্দ্রাদিত্য ॥
নির্ম্মল রাজার কুলে তুই দিলি কালি। আরো কয়ো আঁটনী কুটনী মাগী শালী ॥
পয়জার চট চট কিল গুম গুম। আঁকপাঁক ঘুরাইল আর কোথা ঘুম ॥
মারণের চোটে বটে ভয়ে ভূত ছাড়ে। বুকে হাঁটু দিয়া ঠেঙ্গ তুল্যে বান্ধে ঘাড়ে ॥
তখনি কান্দিয়া কহে ভাইরে বাঘাই। নারীহত্যা করিও না জল দেও খাই ॥
কাতর দেখিয়া তার বন্ধন খুলিল। হাসিয়া কোটাল তারে ধরিয়া তুলিল ॥
রাখিল নজরবন্দী সোয়ার হাওয়ালে। কই চোর চোর বলি চৌদিকে নেহালে ॥
ফুলের বাগান ভেঙ্গে তচনচ করে। নেজা হাতে কোতোয়াল ঢুকে তার ঘরে ॥
সুন্দর সানন্দে জপে মহাকালী মন্ত্র। কোন কিছু নাহি জানে কোটালের তন্ত্র ॥
ওই চোর চোর করি ধরিতে চলিল। ধ্যান ভঙ্গ কাঁপে অঙ্গ সুড়ঙ্গে পশিল ॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

চোর ধরণার্থে কোটালের সুড়ঙ্গ খনন

অনিমিখে নিরখে বিবর নিশানাথ। অদ্ভুত মানিয়া চিত্তে নাকে দেয় হাত ॥
কেহ বলে এই চোর নাগলোকে থাকে। কেহ বলে তবে ধরা না গেল ইহাকে ॥
ঈষৎ হাসিয়া কহে কোটাল বাঘাই। আমি যাহা বলি তাহা শুনহ সবাই ॥
এই পথে আসে যায় বিদ্যার নিকটে। সায় দেয় সবাই স্বরূপ কথা বটে ॥
দেউড়ি জানিয়া কেহ প্রবেশে বিবরে। হাত পাঁচ সাত গিয়া হাঁপাইয়া মরে ॥
আকুরে হুকুরে পুনঃ উপরে উঠিল। বাপু বাপু এখনি পরাণ গিয়াছিল ॥
যে পার সে যাও ভাই খাও জায়গীর। বিদ্যার মন্দিরে নহে চোরের মন্দির ॥
খন্দক খনিতে করে কোটাল হুকুম। সহরে পড়িল বড় বেগারের ধুম ॥
যারে পায় তারে ধরে গালে মারে চড়। পলাবে বলিয়া রাখে কাড়িয়া কাপড় ॥
তখনি হাজার তিন আনিল কোদালী। মজুরের নিখাবাদা পাঁচ শত ঢালী ॥
খোষ তত্ত্ব কোতোয়াল ঘন ঘন ডঙ্কা। নগরনিবাসী লোক পায় বড় শঙ্কা ॥
কেহ বলে ধরা গেল কেহ বলে মিছা। কেহ বলে কে ভাই উহার করে পিছা ॥
সহরে গুজব উঠে একে একশত। গল্প ঝাড়ে বড়ই আঠারমেসে যত ॥
দরজায় বস্তে কেহ মণ্ডলের ঠাট। পথের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট ॥
এক সরা ভরা টিকা হুঁকা চলে ছুটা। পোয়া দেড় গুড়াকু তামাকু টেঁকী-কুটা ॥
কেসে কহে তোমরা শুনেছ ভাই আর। শুনিলাম এখনি আশ্চর্য্য সমাচার ॥
হাতকাটা একটা মানুষ গেল কয়ে। চোরের সহিত নাকি ছিল ছুটা মেয়ে ॥
পরম রূপসী তারা স্বর্গবিদ্যাধরী। বিপুল নিতম্ব হরিণাক্ষী কৃশোদরী ॥
চোর কাটা গেল যদি কোটালের হাতে। সেই ক্ষণে তারা পুড়ে মৈল তার সাতে ॥
এথায় খন্দক খনে মজুর সকল। বড় বড় গৃহস্থের বাড়ী গেল তল ॥

সীমা মুড়া পর্য্যন্ত কাটিল থাই যদি। দেখিয়া ডরায় লোক যেন এক নদী ॥
অতি পুরাতন লোক গ্রামে ছিল যারা। শুনি নাহি জন্মে কভু হেন কহে তারা ॥
কতকাল খন্দক খুদিল দিবা রেতে। কেহ বলে কুমার কুমার হবে জেতে ॥
জ্ঞানী কহে থাকিবেক গূঢ় কিছু মর্ম্ম। মনে নাহি বুঝি ইহা সামান্যের কর্ম্ম ॥
পরম পুরুষ সেই চোররূপ ছলে। দেবকন্যা বিদ্যাবতী শাপে ধরাতলে ॥
কেহ কহে মিথ্যা নহে সত্য বটে ভাই। এখনি সভার কাছে কয়েছে বাঘাই ॥
চকিতে দেখেছে চোর বলেছে সমস্ত। সুড়ঙ্গে পশিল যেন সূর্য্য গেল অস্ত ॥
প্রথমে যে দেখিল সে কহে শুন এহ। ইহাতে কে কহিবে সামান্য ব্যক্তি সেই ॥
কেহ কহে সে যে লোক এ বড় লহর। খন্দক খনিতে গেল চৌঠাই সহর ॥
কেহ কহে এতদিনে গেল যেনে ভয়। কেহ কহে দেখ ভাই আরো কিবা হয় ॥
ওথা কবি উপনীত প্রমদার পাশে। বিমল কমল মুখ মলিন হুতাশে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে বালা স্থির রও। ভয় কি ভবানী বাণী বদনেতে কও ॥

বিদ্যাবাক্যে সুন্দরের নারীবেশ ধারণ

নিরখিয়া পতি সতী অতি দুঃখযুতা। সজলনয়নে কহে বীরসিংহসুতা ॥
অমনি কোটাল আসি দেখিবে তোমাকে। রমণী নিমিত্ত কিছু না কবে আমাকে ॥
ধরিবে মারিবে প্রাণ একান্ত ভূপাল। পশ্চাতে উপায় নাহি গর্ভে মোর কাল ॥
তুমি নষ্ট হবে নষ্ট জন্ম অভাগীর। বিজ্ঞ বট প্রভু বিবেচিয়া কর স্থির ॥
এক নিবেদন করি অবধান কর। দোষ নাহি প্রভু তুমি নারীবেশ ধর ॥
আপনি ঈশ্বর ধরি মোহিনীর বেশ। ভুলাইলা কামরিপু ঠাকুর মহেশ ॥
ভীম পরাক্রম ভীম শমন দোসর। নারীবেশে বধিলা কীচক বীরবর ॥
সূর্য্যবংশে জন্মে দশরথ নাম ভূপ। বিপদ সময়ে রাজা ধরে নারীরূপ ॥
জাতি প্রাণ হেতু লোক তঞ্চ করে নানা। পরিণামদর্শী যেবা কি তার যন্ত্রণা ॥
সধর্ম্মিণী বাক্য শুনি সায় দিলা রায়। সুন্দরী সমূহ সুখে সুন্দরে সাজায় ॥
আঁচড়ে চিরুণে চারু চাঁচর চিকুর। ললাটে সিন্দূর শোভা তম করে দূর ॥
সহজে সুন্দর মুখ বিনির্ম্মল ইন্দু। চন্দ্রমধ্যে চন্দ্রদীপ্ত সুচন্দন বিন্দু ॥
দশন মুকুতাবলী ওষ্ঠ বিম্বফল। শতনবী হার গলে শ্রবণে কুণ্ডল ॥
চঞ্চল নয়ন কোণে কত কামশর। বস্ত্রাবৃত দাড়িম্ব যুগল পয়োধর ॥
ভূষণে ভূষিত তনু যেখানে যা সাজে। হেরি রূপ রূপবতী নতমুখ লাজে ॥
সুন্দরী বলিয়া বড় ছিল অভিমান। সুন্দর সুন্দর রূপে গেল সেই ভান ॥
বসনে ঢাকিয়া মুখ কহে সহচরী। কাহার রমণী গো নিছুনি লয়ে মরি ॥
নিশিযোগে যদ্যপি পুরুষ করে বিধি। বুক ছাড়া কে করে এ হেন রসনিধি ॥
কহে হাসি গুণরাশি সত্য বটে সই। ইচ্ছা হয় কিছুকাল এই বেশে রই ॥
বাঘাই কোটাল উপস্থিত হেনকালে। সসৈন্যে ঘেরিল পুরী চৌদিক নেহালে ॥
সকলি রমণী ঘটা পুরুষ না দেখে। বুদ্ধিহারা ভাকা পারা ধূলা উড়ে মুখে ॥
সাহসে করিয়া ভর বিচারিল মনে। নারীরূপে আছে চোর সহচরী সনে ॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাময়ী। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

চোরের স্ত্রীবেশানুভবে বিদ্যার সহচরীগণের খন্দক লঙ্ঘন পরীক্ষা

তক্ত করে নিশানাথ, দীর্ঘে কাটে দশ হাত,
পরিসর হাত তিন সাড়ে।
করে ধরে খড়্গ ঢাল, হাঁটু পাতি কোতোয়াল,
থামটি করিয়া বৈসে পাড়ে॥
ক্রোধে কহে পুনঃ পুনঃ, সহচরিগণ শুন,
তোমরা সকলে হও ধীরা।
মাতিয়া যৌবন মদে, রমণী দক্ষিণ পদে,
লঙ্ঘিবে যে তার বড় কিরা॥
অথবা পুরুষ যেই, লঙ্ঘিবে পরীক্ষা এই,
কদাচিৎ বাম পদে কেহ।
সারোদ্ধার কহি আমি, হইবে রৌরবগামী,
সপ্তম পুরুষ শুদ্ধ সেহ॥
কহিলাম আগে ভাগে, শত ব্রহ্মহত্যা লাগে,
ধর্ম্মপথে থাকিলে মঙ্গল।
জন্মিলে মরণ আছে, ভোগাভোগ হয় পাছে,
নারকির জনম বিফল॥
কোটালের কটু কথা, কবি করে হেঁট মাথা,
বিচারিল ধরিল কোটাল।
পূর্ব্ব জগদম্বাদেশ, কদাচ না রবে ক্লেশ,
কিন্তু দুঃখ সম্প্রতি জঞ্জাল॥
যা করেন কৃপাময়ী, যাম্য পদে পার হই,
কতকাল হৈয়া রব চোর।
যদি তরি বাম পায়, কোটাল সবংশে যায়,
ইহা কি উচিত ধর্ম্ম মোর॥
শশিমুখী শকুন্তলা, সত্যবতী শশিকলা,
সর্ব্বাণী সুশীলা সত্যভামা।
রাধিকা রুক্মিণী রমা, রাজেশ্বরী রম্ভা উমা,
অপর্ণা অম্বিকা উষা শ্যামা॥
জয়ন্তী যশোদা জয়া, মহেশ্বরী মহামায়া,
হৈমবতী হীরা হরিপ্রিয়া।
একে একে সহচরী, বাম পদে গেল তরি,
ও কূলেতে দাঁড়াইল গিয়া॥
যম তুল্য নিশানাথ, কখন দাড়িতে হাত,
কখন বা গোঁপে দেয় পাক।

সবাকার কাঁপে বুক, প্রাণ করে ধুকধুক,
কখন গভীর ছাড়ে ডাক ॥
সদা পুটাঞ্জলি-পাণি, শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী,
বিমুক্ত কর গো মায়া পাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উমা আমা উরহ মানসে ॥

সুন্দরের বামপদে খন্দক লঙ্ঘনার্থ বিদ্যার সহ কথোপকথন

একে একে পার হয় যত সহচরী। গদগদ কহে বিদ্যা কান্ত করে ধরি ॥
শুন শুন প্রাণনাথ বাক্য সারোদ্ধার। বাম পদে একান্ত খন্দক হও পার ॥
ধরা গেলে কাটা যাবে নৃপতি দুর্জ্জন। তোমার মরণে মোর নিশ্চয় মরণ ॥
নহে শাস্ত্র সম্মত সসত্ত্বা সহমৃতা। দুরাত্মা দুর্ব্বোধ বিবেচনা শূন্য পিতা ॥
অপমৃত্যু হবে তার যে করুন কালী। তুমি তো পণ্ডিত প্রভু একি ঠাকুরালী ॥
পূর্ব্বাপর শ্রুত বটে রাজনীতি ধর্ম্ম। জাতি প্রাণ হেতু সাধু করে দুষ্টকর্ম্ম ॥
ভার্য্যা হেতু রামচন্দ্র সুগ্রীবে মিতালী। বধিল নিরপরাধে বানরেশ বালী ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শুন তার কার্য্য। অশ্বত্থামা হত বাক্যে হত্যা দ্রোণাচার্য্য ॥
সুন্দরীর কথা শুনি কবি বিচক্ষণ। হাসি কহে শুন ইতিহাস রামায়ণ ॥
কাল করে মুক্তি প্রশ্ন রামচন্দ্র সনে। কেহ মাত্র সঙ্গে নাহি দোঁহে সঙ্গোপনে ॥
কহে কৃপাময় কিন্তু কর সত্য পণ। এখানে দেখিবা যারে করিবা বর্জ্জন ॥
কালবাক্যে কমলাক্ষ প্রতিজ্ঞা স্বীকার। লক্ষ্মণ ঠাকুরে দিলা রক্ষা হেতু দ্বার ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডান না যায়। দুর্ব্বাসা নামেতে মুনি মিলিলা তথায় ॥
ভক্তিযুক্ত প্রণমিল মুনীন্দ্র চরণে। মুনি বলে যাব শীঘ্র রাম সম্ভাষণে ॥
মুনিবাক্যে মহাবীর কম্পিত শরীর। কোনরূপে চিত্তে বিবেচনা নহে স্থির ॥
যদি দ্বার ছাড়ি মুনি যান সম্ভাষণ। শ্রীরামের আজ্ঞা তবে হইবে হেলন ॥
একান্ত বিহিত নহে গমনাবরোধ। বংশ নষ্ট হবে মুনি যদি করে ক্রোধ ॥
ত্যাজ্য হব যদ্যপিচ আমি যাই তথা। সেই ভাল প্রভুকে জানাই এই কথা ॥
মুনি প্রবোধিয়া গেল রঘুনাথ কাছে। কাল কহে প্রভু তব আজ্ঞা পূর্ব্ব আছে ॥
এইক্ষণে ত্যাগ কর ঠাকুর লক্ষ্মণ। সরযূর নীরে বীর ত্যজিলা জীবন ॥
সৌমিত্রেয় শোকে প্রভু সম্বরিলা লীলা। রামায়ণে মহামুনি বাল্মীকি রচিলা ॥
সত্য সত্য পুনঃ সত্য শুন প্রাণপ্রিয়া। প্রাণ গেলে সল্লোকে কি করে তুষ্ট ক্রিয়া ॥
সেই রাজা যুধিষ্ঠির শুন তার কর্ম্ম। বকরূপে যেকালে ছলিলা তারে ধর্ম্ম ॥
প্রশ্ন যদি কহিলেন কুন্তীর নন্দন। তথাপি কপটে প্রভু কহেন বচন ॥
তুষ্ট হইলাম আমি বর মাগো যাই। যারে ইচ্ছা তাহে চাহ জীবে এক ভাই ॥
ধর্ম্মবাক্য শুনি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। পরিণামদর্শী রাজা করিলেন স্থির ॥
সহদেব নাহি জীয়ে অথবা নকুল। তবে তো নৈরাশ তাঁর মাতামহকুল ॥
কিঞ্চিৎ থাকিয়া কহে সর্ব্বগুণযুত। বাঁচাও জনেক প্রভু ভাই মাদ্রীসুত ॥

ধর্ম্মনিষ্ঠ বুঝি ধর্ম্ম দিলা সাধুবাদ। চারি ভাই জীয়া উঠে ঘুচিল প্রমাদ॥
জমদগ্নি সুত জামদগ্ন্য মহাবীর। জনক আজ্ঞায় কাটে জননীর শির॥
পিতৃতুষ্টে পুনরপি পাপপুঞ্জে মুক্ত। মিথ্যা কথা নহে মহাভারতেতে উক্ত॥
সত্যবাক্য রক্ষা পায় যদি যায় প্রাণ। সেও ভাল পরকালে পায় পরিত্রাণ॥
সত্য হীন ধর্ম্ম হীন বৃথা জন্ম তার। যতোধর্ম্মস্ততোজয় বাক্য সারোদ্ধার॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ি। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

অথ চৌর ধরণ

অশ্বত্থামা হত প্রিয়ে কহিলে বচন। সেই পাপে নৃপতির নরক দর্শন॥
অবিচারে রঘুনাথ বালী কৈলা বধ। ব্যাধরূপে তার শোধ লইল অঙ্গদ॥
কর্ম্মভোগ কার খণ্ডে ধরণীমণ্ডলে। অন্য কে কোথা থাকে রামচন্দ্রে ফলে॥
মম হেতু নষ্ট হবে সবংশে কোটাল। কহ প্রিয়ে কিরূপে রহিবে পরকাল॥
বিদ্যা কহে প্রাণনাথ যে কহ সে বটে। কি কথা কহিবে গেলে ভূপতি নিকটে॥
সুন্দরীর বাক্য শুনি সুন্দরের হাস। সহজে বালিকা তুমি গণিছ হুতাশ॥
ভবিষ্যৎ কর্ম্ম এইক্ষণে কেন ভাবি। তখনি তেমন কব যে কহান দেবী॥
কোন চিন্তা নাহি মত্ত-কুঞ্জর-গামিনী। দুঃখ দূর করিবেন পুরারি-কামিনী॥
ভক্তিভাবে ভাব ভয়-ভাঙ্গা রাঙ্গা পদ। শক্তি কার কালিকার দাসে করে বধ॥
করাল-বদনী বলি বাড়াইল পা। হেরি পতি রূপবতী ভয়ে কাঁপে গা॥
দক্ষিণ চরণে তরি দাঁড়াইল পাড়ে। ব্যাঘ্রপ্রায় কোটাল পড়িল গিয়া ঘাড়ে॥
সুরত্ন ভূষণ যত টানি ফেলে দূরে। কৌতুকে কোটাল নাচে সিংহনাদ পূরে॥
কেহ বা বরশা হানে কেহ তরোয়ার। ঘিরিল কোটাল ঠাট নাহিক নিস্তার॥
কেহ বলে বহু দুঃখ পেয়েছি হে ভাই। ঘাড় ভেঙ্গে এ বেটার রক্ত আমি খাই॥
কেহ বলে লাঠিতে মাথার ভাঙ্গি খুলি। কেহ বলে থাক তুমি আমি করি গুলী॥
কেহ বলে চোর বটে তবে কেন ছাড়ি। কাঁকালি পর্য্যন্ত চল মৃত্তিকাতে গাড়ি॥
তীরে তীরে জরজর করি হে ইহারে। পোড়াইয়া মার রাজা কি করিতে পারে॥
পটুকা খুলিয়া কোতোয়াল বান্ধে হাত। বিদ্যা কহে ধর্ম্ম কোথা ওহে প্রাণনাথ॥
মর্ম্ম দহে স্থির নহে উঠে ডাক ছাড়ে। বুক চিরা মাণিক্য লইল কেবা কেড়ে॥
সহচরীগণ কান্দে কুমারের হেতু। তোমা পেয়েছিল বিদ্যা সেবি বৃষকেতু॥
পূর্ব্বের কঠোর পাপে বামদেব বাম। হারাইল তোমা হেন রূপ গুণধাম॥
কুপিল সুন্দর মুক্ত করে নিজ করে। ঢেকা মেরে দূরেতে ফেলিল নিশীশ্বরে॥
তখনি পরিল বস্ত্র পুরুষের ছান্দে। চুল ছিল এলো শীঘ্র দুই করে বান্ধে॥
পলাইতে পারে কবি কে রাখিতে পারে। মনঃসাধে ধরা দিল ভৎ র্সিতে রাজারে॥
মদনমোহনরূপে সবে মোহ যায়। অনিমেষ বাধাই সুন্দর পানে চায়॥
কেহ বলে সামান্য মানুষ নহে চোর। বিদ্যা বলে পরাণ-পুতলি বটে মোর॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাঞ্জলি। শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি॥

সুন্দরের বন্ধন দৃষ্টে বিদ্যার খেদোক্তি

দয়িত দুর্গতি দেখি, দগ্ধ দ্বিজরাজ-মুখী,
দুঃখসিন্ধু উথলিয়া উঠে।
ধরাতলে ধনী পড়ে, ধীহারা ধূচয় বাড়ে,
ধড়ে প্রাণ নাহি ঘর্ম্ম ছুটে॥
মণিহারা ফণি পারা, জীয়ন্তে মরমে মরা
মোহযুতা মুনি-মনোহরা।
নয়নে নির্গত নীর, নিশায় নিম্নগাতীর,
নাথার্থে পদ্মিনী যেন জরা॥
স্বপ্নে সতী স্বামী সঙ্গে, সরস চাতুরী রঙ্গে,
সুখে মুখে মুখ দিয়া রয়।
বিদ্যা বিনোদিনী বালা, বিনোদ বকুলমালা,
বিভু গলে দিতে জ্ঞান হয়॥
বিদ্যা কহে হে মা কই, কি করিলা কৃপামই,
কোথা যাব কি হবে উপায়।
এই যে ছিলাম সুখে, একি দশা এক টুকে,
আত্মহত্যা দিব গো তোমায়॥
বিষম বিরহানলে, বপু বিপরীত জ্বলে,
বিদগ্ধ বল্লভ দিলা আনি।
রোপিলাম প্রেমতরু, না ফলিল ফল চারু,
উপাড়িলা অঙ্কুরে আপনি॥
প্রভু পূর্ব্বে প্রাণ বলে, পশ্চাৎ পাবকে ফেলে,
পলাইলা পাপে দিলা মন।
তোমার তুলনা তুমি, তরুণ তরুণী আমি,
ত্যাগ কর ত্বদঙ্গজ জন॥
জনক যমের তুল, জননী যাতনা মূল,
জামাতা জীবনে করে বধ।
ভাবিয়া ভরসা সার, ভুবনে না দেখি আর,
ভয় ভাঙ্গা ভবানীর পদ॥
ঝাঁপরে ঝেপর রূপা, ফলত কর গো কৃপা,
ফিকিরে ফিরাও প্রাণনাথ।
শ্রীকবিরঞ্জন কহে, এমত উচিত নহে,
দূর কর দাসের উৎপাত॥

কোটালের প্রতি বিস্তার বিনয়োক্তি

ভূতলে আছাড়ে গা, কপালে কঙ্কণ ঘা,
বিন্দু বিন্দু বয়ে পড়ে রক্ত।
তাহে শোভা চমৎকার, অশোক কিংশুক হার,
গাঁথা চান্দে দিল যেন ভক্ত॥
যথোচিত স্বামী দণ্ড, কোতোয়াল ভানুচণ্ড,
প্রকৃষ্ট প্রকাশ সন্নিকটে।
রাকা সুধাকরমুখী, ফুল্ল ইন্দীবর আঁখি,
এবে কর্ম্মে ব্যক্ত সেই বটে॥
বিদ্যা বলে প্রভু ভাল, না বুঝিলা কালাকাল,
দেখ যুগধর্ম্ম এ সকল।
পরিণামে তব দৃষ্টি, অভাগীর মজে সৃষ্টি,
তার তো সাক্ষাতে এই ফল॥
হেদে হে কোটাল ভাই, ভগ্না আমি ভিক্ষা চাই,
ছাড়হ আমার প্রাণনাথ।
ধর্ম্ম পথে দৃষ্টি কর, বারেক বচন ধর,
হের এই যোড় করি হাত॥
প্রাণ মোর নহে চোর, এত জোর মিছা সোর,
এতে তব লাভ আছে কি।
পরিত্রাণ কর প্রাণ, দেহ দান রাখ মান,
পুণ্যবান তুমি শুনিয়াছি॥
মম কান্ত শিষ্ট শান্ত, রাজা ভ্রান্ত কি দুর্দ্দান্ত,
আদ্যোপান্ত কৃতান্ত সমান।
শুন ওহে মিথ্যা নহে, তনু দহে কত সহে,
সৃষ্টি রহে বল হে বিধান॥
কোন্ ধর্ম্ম হেন কর্ম্ম, পোড়ে মর্ম্ম গাত্র চর্ম্ম,
দিয়া দিব পাদুকা চরণে।
হৃদয়েশ এই বেশ, পায় ক্লেশ কৃপালেশ,
কর ভাই অকাল মরণে॥
চক্ষু লাল কোতোয়াল, কহে ভাল ঠাকুরাল,
এই কাল জঞ্জালের মূল।
জান আমা ওগো রামা, গুণধামা কর ক্ষমা,
ভাব শ্যামা হইবে প্রতুল॥
তুমি সতী গুণবতী, ভগবতী প্রতি মতি,
সামান্য মানুষ নহে এহ।

রঘুবর হলধর, পুরন্দর সুধাকর,
পঞ্চশর ইতিমধ্যে কেহ ॥
এত বলে বাক্য ছলে, যায় চলে রামা টলে,
পুনরপি পড়ে মহীতলে।
কহে রাম দুর্গানাম, অর্দ্ধ যাম জপ কাম,
পূর্ণ হবে দেবী অনুবলে ॥

চৌর দৃষ্টে রাণীর বিদ্যার প্রতি বিলাপ

শুনি লোক মুখে, রাণী মনোদুঃখে, গেল বিদ্যাবতী বাসে।
নন্দিনীর পতি, নিরখিয়া সতী, নয়ন সলিলে ভাসে ॥
অভিন্ন মদন, পূর্ণেন্দু বদন, কনকচম্পক কান্তি।
এ নহে তস্কর, শশী কি ভাস্কর, পামর লোকের ভ্রান্তি ॥
রূপ কব কিবা, চারু কম্বু গ্রীবা, শুক চঞ্চু তুল্য নাসা।
নিন্দি কুন্দ কলি, শোভে দন্তাবলী, সুধাধিক মৃদুভাষা ॥
আজানুলম্বিত, বাহু সুললিত, করি কর-দর্পহর।
ফুল্ল কোকনদ, মঞ্জু যুগপদ, নাভি ভূধর বিবর ॥
বিদ্যাবতী মুখে, মুখ দিয়া দুখে, ডুগরিয়া কান্দে রাণী।
জন্মে জন্মে পাপ, হেন মনস্তাপ, ভুঞ্জিব স্বপ্নে না জানি ॥
কি বিদগ্ধ বিধি, রসময় নিধি, নিরমিল তোর লাগি।
অনেক যতনে, লভ্য এ রতনে, হারালি ছি ছি অভাগী ॥
আরাধিলি বিদ্যা, ত্রিভুবনারাধ্যা, মহাবিদ্যা ভদ্রকালী।
পূর্ব্ব কর্ম্ম ভোগ, স্বামির বিয়োগ, যত তাঁর ঠাকুরালী ॥
কিবা কব তোরে, না কহিলি মোরে, গুপ্তে কণ্ঠে দিলি মালা।
বিধির লিখন, না হয় খণ্ডন, এখন কে পায় জ্বালা ॥
ভূপতি দুর্ব্বার, নাহক নিস্তার, নিতান্ত কাটিবে চোরে।
হয়ে থাক রাঁড়ী, পোড়াইতে নাড়ী, এতেক দুষ্কর্ম্ম তোরে ॥
শ্রীপ্রসাদ কহে, কথা মিথ্যা নহে, কালীর কিঙ্কর যেই।
তার দুঃখ কিবা, সদা সঙ্গে শিবা, ভুবন বিজয়ী সেই ॥

বিদ্যার স্তবে কালীর অভয় প্রদান

স্নান করি শুচি হয় নৃপতিনন্দিনী। মুদ্রিত লোচনে ভাবে রূপ কাদম্বিনী ॥
কৃতাঞ্জলি কহে কৃপাকর কৃপাময়ি। দাস তব দয়িত দুঃখিনী দাসী হই ॥
আজ্ঞা ছিল তব সে আসিবে এথা একা। এখন এ দশা একি অদৃষ্টের লেখা ॥
ক্ষিতিপতি ক্ষুদ্র দোষে ক্ষয় করে স্বামী। ক্ষেমঙ্করি ক্ষম দোষ ক্ষীণা দীনা আমি ॥
নিতান্ত দেখিনু দুর্গা মন্ত্র জপে যেই। হেদে গো করুণাময়ি তার দশা এই ॥
কি কব মহিমা সীমা পদতলে ভব। উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি কটাক্ষেতে তব ॥

তপস্বিনী ত্রিনয়নে তারা ত্রাণকর্ত্রী। যশোদা-জঠোরজাতা জায়া জগদ্ধাত্রি॥
পার্ব্বতি পরমেশ্বরি পশুপতিদারা। প্রভাকর-পুত্র-পীড়া-হরা পরাৎপরা॥
বিদেশে বল্লভ বীরসিংহ করে নষ্ট। দনুজদলনী দেবি কেন দেও কষ্ট॥
দৈববাণী শুনে রামা ভয় নাহি তোর। সুন্দর সামান্য নহে বরপুত্র মোর॥
প্রহরের পরে পুনঃ পতি পাবে সতি। কি করিতে পারে বীরসিংহ নরপতি॥
এ কথা কহিলা যদি শঙ্কর-ঘরণী। জলধি তরঙ্গে যেন মিলিল তরণী॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ি। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

চোর দর্শনে নাগরিক জনের খেদ

ধরা গেল চোর পড়িল নগরে। বাল বৃদ্ধ যুবা আর নাহি রয় ঘরে॥
স্তন্য পান করে শিশু কোলে যে ধনীর। মৃত্তিকায় ফেলি ধায় হৃদয় অস্থির॥
রন্ধনশালায় রামা রন্ধনে যে ছিল। আথার উপরে হাঁড়ী রাখিয়া চলিল॥
বেগে ধায় নাহি চায় পিছুপানে ফিরা। কেহ কহে দাঁড়া লো মাথায় লাগে কিরা॥
একজন প্রতি আরজন বলে কই। সে কহে অঙ্গুলি ঠারি ওই দেখ্ ওই॥
হেরি হেরি বদন দুখেতে অঙ্গ দহে। কুলবধূ চিত্রিত পুত্তলী যেন রহে॥
কেহ বলে এত রূপ নিরমিল বিধি। হারাইল অভাগিনী বিদ্যা হেন নিধি॥
সজল নয়নযুগে কোন ধনী বলে। আমাকে কাটুক রাজা চোরের বদলে॥
রাজা লবে প্রাণ সই কোন্ মূর্খ কহে। সাধ্য নহে তার যার দেহে আত্মা রহে॥
নিরখিয়া নরপতি এ রূপ বিচিত্র। না হবে নিতান্ত রূপ বিরূপ চরিত্র॥
আছাড়ি পাছাড়ি মহী কেন্দে কহে হীরা। ও চাঁদ মুখের কথা শুনিব কি ফিরা॥
পতিপুত্র হীনা দীনা শুন গুণরাশি। কে কহিল তোমাকে কহিতে মোরে মাসী॥
দ্বাদশ বৎসর বাছা খেয়েছি গোঁসাই। তারপর কিছুমাত্র শোক জানি নাই॥
মৃত্যু প্রতি কারণ হইলে তুমি মোর। লোকে বলে হীরা মাগী রেখেছিল চোর॥
কেন বাড়াইলে প্রেম রাজকন্যা সনে। তোমাকে ছাড়িয়া বিদ্যা বাঁচিবে কেমনে॥
তব মৃত্যু কথা তব শুনিলে মা বাপ। তখনি ত্যজিবে প্রাণ পেয়ে মনস্তাপ॥
বয়স্যতা তব যার যার সঙ্গে আছে। ছাড়িবেক প্রাণ তারা বার্ত্তা গেলে কাছে॥
তোমার মরণে এত লোকের মরণ। কি জানি বিধির লিপি ললাটে কেমন॥
দরবারে বার দিয়া বসেছে ভূপাল। হেন কালে চোর নিয়া গেল কোতোয়াল॥
শ্রীকবিরঞ্জন বলে করি পুটাঞ্জলি। শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি॥

রাজার সহিত চোরের ব্যঙ্গোক্তি

সিংহাসনে নরসিংহ বীরসিংহ রায়। তপ্ত তপনীয় তনু তারাপতি প্রায়॥
প্রমথেশ-প্রিয়া পূজা প্রসাদ চন্দন। ভালে বিন্দু বিধু মধ্যে বালার্ক যেমন॥
প্রচণ্ড চণ্ডার্চ্চি চয় চতুর্দ্দিকে দ্বিজ। পুরোহিত বেষ্টিত যেমন মখভুজ॥
কিঙ্কর নিকরে করে চামর ব্যজন। মস্তক ধবল ছত্র কিবা সুশোভন॥
তদুপরি চন্দ্রাতপ তমঃ করে দূর। বাম ভাগে মহাপাত্র পরম চতুর॥
পাঠ করে পুরাণ পাঠক নিত্য নিত্য। যন্ত্রিগণ যন্ত্রে গান করে হরে চিত্ত॥

ছদিকে সোয়ার খাড়া বুকে ধরে ঢাল। কারো নাহি মৃত্যুভয় যুদ্ধে যেন কাল॥
সেলাম করয়ে হাতী সম্মুখে মাহুত। পদাতিক দুরন্ত সাক্ষাৎ যমদুত॥
চোপদার নকীব হুজুরে খাড়া আছে। বাঘাই কোটাল চোরে নিয়া গেল কাছে॥
গরীব নেওয়াজ বলি আদবে সেলাম। নজর দৌলত এই চোর লেয়া হাম॥
ভূপতিকে প্রণিপাত করিলেন কবি। সতত নির্ভয় দীপ্যমান যেন রবি॥
অপাঙ্গ লোচনে নিরখিয়া রূপ ভূপ। পরমপুরুষ চিত্তে জানিলা স্বরূপ॥
ধন্যা কন্যা অন্বেষণে মিলাইল পতি। বররূপে কোন দেব ভ্রমে বসুমতী॥
রেবতী রমণ কিম্বা কিম্বা বৃষকেতু। কিম্বা নারায়ণ নিজে রামরম্ভা হেতু॥
কেমন পণ্ডিত বাপা জানা কিন্তু চাই। রাজা বলে কাট চোর মশানে বাঘাই॥
আঁখি ঠারে আরবার করে নিবারণ। মিছামিছি করে কত তর্জ্জন গর্জ্জন॥
পর্ব্বতজা পাদপদ্ম মানসে প্রণাম। হাসি হাসি সুধাভাষা কহে গুণধাম॥
কাট রাজা তিলার্দ্ধ না করি মৃত্যুভয়। গোটাকত কথা কহি শুন মহাশয়।

শ্লোক :

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুরোমরাজিম্।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং
বিদ্যাং প্রমাদ গণিতামিব চিন্তয়ামি॥

অস্যার্থ

অদ্যাপি সা কনকচম্পকদাম তনু। প্রফুল্ল কমলমুখী ভুরু কামধনু॥
নিদ্রা ভঙ্গে অলসাঙ্গী মদনবিহ্বল। চিন্তয়ামি নিরন্তর বিদ্যার কুশল॥
কথা শুনি কাঁপে তনু কুপিত ভূপাল। কহে মশানেতে চোর কাটরে কোটাল॥
কবি কহে কিছুকাল থাক রে বাঘাই। গোটা দুই চারি কথা আরো কহা চাই॥

শ্লোক :

অদ্যাপি তাং শশিমুখীং নবযৌবনাঢ্যাং
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরকান্তিং।
পশ্যামি মন্মথশরানল পীড়িতানি
গাত্রাণি সংপ্রতি করোমি সুশীতলানি॥

অদ্যাপি সে শশিমুখী সুলভ যৌবনা। পীনপয়োধরা বাল কুরঙ্গনয়না।
তদঙ্গ পরশে অঙ্গ সদা সুশীতল। চিন্তয়ামি নিরন্তর বিদ্যার কুশল॥
কাট কাট শব্দ রাজা করে পুনঃ পুনঃ। কবি কহে গোটা দুই কথা আরো শুন॥

শ্লোক :

অদ্যাপি তাং মলয়পঙ্কজগন্ধলুব্ধ
ভ্রাম্যদ্দ্বিরেফচয়চুম্বিতগণ্ডদেশাম্।
কেশাবধুতকরপল্লব কঙ্কণানাং
তাং নোদয়েতি নিচয়ঃ স্মরতং মদীয়ম্॥

অন্বয়ার্থ

অদ্যাপি মুখারবিন্দ সুগন্ধ বিশেষ। অলিকুল ব্যাকুল চুম্বিত গণ্ডদেশ॥
কম্পিত চিকুর কর কঙ্কণ সুধ্বনি। মন মম মোহিত স্মরতিনিতম্বিনী॥
রাজা বলে নিয়া যাও মশানে বাঘাই। কবি কহে গোটা দুই বচন শুনাই॥

শ্লোক :

অদ্যাপি সাস গৃহতো ময়ি নীয়মানে
দুর্ব্বারভীষণরবৈর্যমদূতকল্পৈঃ।
কিং কিং তয়া বহুবিধং ন কৃতং মদর্থে
কর্ত্তুং ন পার্য্যত ইতি ব্যথতে মনোমে॥

অন্বয়ার্থ

অদ্যাপি আমাকে বাসগৃহ হতে চর। কেশে ধরে নিল যেন শমন কিঙ্কর॥
কি কি চেষ্টা না পাইল মদর্থে কামিনী। কিবা কব দহে দেহ দিবসরজনী॥
অদ্যাপি সা বিদ্যা মম হৃদে বিহরতি। নিরখি মুদিলে আঁখি বিদ্যার মুরতি॥
সুপ্ত পতি মৃতপ্রায় বাক্য নাহি মুখে। বিপরীত কাজে বিদ্যা চড়ে তার বুকে॥
নগ্ন বিদ্যা মুক্ত কেশে দন্তে কাটে জী। নয়ন নিকটে দেখ নিবেদিব কি॥
থরথর কাঁপে ভূপ ক্রোধভাবে চায়। রাজা বলে কাট চোরে থর খড়্গা ঘায়॥
কবি কহে কন্যা তব পরম রূপসী। তাহার চঞ্চল দৃষ্টি খরতর অসি॥
পুনঃ পুনঃ হানে প্রাণে বক্র নিরখিয়া। জীয়ায় যুবতী বিম্বাধরামৃত দিয়া॥
ঘুর্ণিত লোচন বীরসিংহ কহে রাগে। এ বেটাকে ধর শীঘ্র কামানের আগে॥
কবি কহে কামান বিদ্যার যোড়া ভুরু। সতত নিকটে ধরা বটি কল্পতরু॥
তাহাতে নয়নবাণ বিষম সন্ধান। শশিমুখী হাসি ভস্মরাশি করে প্রাণ॥
কি জানি কি মন্ত্র জানে বিদ্যা গুণবতী। পুনরপি প্রাণদান পাই নরপতি॥
বাক্য পীড়া মহা ব্রীড়া বীরসিংহ বলে। এ বেটাকে ফেল নিয়া করি-পদতলে॥
মনোমত্ত কুঞ্জর মাহুত পুষ্পধনু। সতত হুলায় হাতী কমলিনী তনু॥
তার তলে পড়ে রাজা প্রাণ যায় মোর। চোর চোর বলে তুলি মিছা কর সোর॥
আপনি সাক্ষাৎ যম মৃত্যুরূপা কন্যা। রাণী ঠাকুরাণী বুঝি এইরূপ ধন্যা॥
মৃত্যু প্রতি ভূপতি কারণ কহে যা। বিদ্যায় ঘটায়ে কবীশ্বর কহে তা॥
রাজা বলে মিথ্যা বাক্যছলে কাজ নাই। মশানে কাটহ শীঘ্র তস্কর জামাই॥
হাসি হাসি গুণরাশি সভা সাক্ষী করে। জামাতা কহিলা সত্যবাদী নৃপবরে॥

শ্লোক :

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং নিজপৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্ব্বহতি দুর্ব্বহবাড়বাগ্নি-
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥

অন্বয়ার্থ

অদ্যাপিও হলাহল নমুঞ্চতি হর। অদ্যাপিও পৃষ্ঠে ধরা ধরে কূর্ম্মবর॥

অদ্যাপিও বাড়বাগ্নি জলনিধি বহে। সাধু বচন কদাচিৎ মিথ্যা নহে॥
রাজচক্রবর্ত্তী কিন্তু রীতি কদাচার। লোক ভয়ে ধর্ম্ম ভয় না দেখি তোমার॥
মম বীর্য্যে ভূপতি যে জন্মিবে সন্তান। পরম দুর্ল্লভ সে দিবেক পিণ্ডদান॥
জামাতা স্বীকার তুমি করিলে ভূপাল। তথাপিও সাম্য নহ একি ঠাকুরাল॥
একান্ত লজ্জিত রাজা কুমার বচনে। অধোমুখে রহে বাক্য না সরে বদনে॥
ভূপতির ভাব বুঝি কহে পাত্র ধীর। দুরক্ষর বাক্য কহ নির্ভয় শরীর॥
সত্য কথা কহ চোর থাক কোন্ গ্রাম। কাহার তনয় কোন্ জাতি কিবা নাম॥
দেহ পরিচয় সত্য দেহ পরিচয়। যদি মিথ্যা কহ তবে জীবন সংশয়॥
কহে গুণরাশি হাসি পাত্র তুমি মূঢ়। খাও হে বাপের কলা দিয়া ঝোলা গুড়॥
দাড়ি ভুঁড়ি সার কোন জ্ঞান নাহি মাত্র। হবচন্দ্র রাজা যেন গবচন্দ্র পাত্র॥
বন-পশু বুঝেছি বলিয়া দেন তুড়ি। রাজা বট যেন সার কাঁঠালের ভুঁড়ি॥
ছয়মাস গতে কর্ম্ম সুধাও কি জাতি। কেন না হইবে তুমি নিজে হও কাতি।
তব চর্য্যা চর্চ্চিলাম আলাপে ক্ষণেক। দ্বিপাদ পশুর মধ্যে তুমি হে জনেক॥
কদাচিৎ মিলে যদি তোমার দোসর। চাষায় পরশ পায় দুনা বাড়ে দর॥
অপমানে অঙ্গ দহে অঙ্গার সমান। সভাস্থ পণ্ডিতগণ হন হতজ্ঞান॥
দ্বিজগণ কহে কহ রূপগুণযুত। কোন্ কুলে জন্ম ধাম নাম কার সুত॥
কহে গুণরাশি হাসি শুন ধীরচয়। তোমা সবাকারে কহি নিজ পরিচয়॥
জনম মানবকুলে শম্ভুধাম ধাম। পিতামাতা শিবশিবা কালিদাস নাম॥
কোনরূপে নিতান্ত না পরিচয় মিলে। কোতোয়াল সঙ্গে রাজা বসিলা বিরলে॥
হেদে নিশানাথ সুতানাথ এই বটে। এমন সুপাত্র বহুভাগ্য হেতু ঘটে॥
বধ করা মত নহে দিব কন্যাদান। কিন্তু তুমি নিয়া যাও দক্ষিণ মশান॥
কোতোয়াল কহে ভাল এই বটে যুক্তি। কৌশলে কোটালে রাজা কহে কটু উক্তি॥
পুনঃ পুনঃ কহি যত কাটিবারে চোর। রেয়াতি করিস্ বেটা ও কি বাপ তোর॥
ভূপতিভারতী শুনি কুপিল কোটাল। দুই চক্ষু ঘুরায় ঘুরায় খড়্গ ঢাল॥
চল বল্যে কোতোয়াল পাছে মারে ঠেলা। কবি কহে কৃপাময়ি কালী কোথা গেলা॥
ক্ষণমাত্র উত্তরিল দক্ষিণ মশানে। কেহ চড় মারে কেহ চুল ধরে টানে॥
বরশি হানিতে বুকে চাহে কেহ কেহ। ফাঁপর হইল থরথর কাঁপে দেহ॥
মার্ মার্ কাট্ কাট্ করে মহাধুম। ফাঁকি ফুকি সার নাই কাটিতে হুকুম॥
কিছু কাল ছিল কবি ডরেতে নীরব। কৃতাঞ্জলি কায়মনোবাক্যে করে স্তব॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালি কৃপাময়ি। আমি তুয়া দাসদাসী দাসপুত্র হই॥

সুন্দরের চৌত্রিশাক্ষরে কালীস্তুতি

ক

কৃতাঞ্জলি কহে কবি কালি কপালিনি। কালরাত্রি কঙ্কালমালিনি কাত্যায়নি॥
কাটে কাল কোটাল কর মা প্রতিকার। কপর্দ্দি-কামিনি কিবা করুণা তোমার॥

খ

খ ভরে ভ্রমহ মাগো হের হের ভয়। খগেশবাহিনি শক্তি খনিকে প্রলয় ॥
খর খড়্গ করে ধর‍্যে খল খল হাসি। খলে বধে খেচরপালিনি রক্ষ আসি ॥

গ

গিরিবরসুতা গৌরি গণেশ-জননি। গগনবাসিনি বিদ্যা গিরাশ-গৃহিণি ॥
গয়া গঙ্গা গৌতমি গোমতি গোদাবরি। গুণত্রয় গুণময়ি গোকুল শঙ্করি ॥

ঘ

ঘনাঘন রূপা দেবি ঘননিনাদিনি। ঘেরিল কোটালঘটা ঘোর শব্দ শুনি ॥
ঘৃণায় ঘরণী কিন্তু ত্যজিবেক দেহ। ঘরে ঘরে ঘোষণা কুযশ তব এহ ॥

চ

চামুণ্ডা চণ্ডিকা চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি। চতুর্দ্দলচক্রে চক্রচরবিভেদিনি ॥
চঞ্চলচরণভরে চমকিত ফণী। চাঁচর চিকুর চারু চুম্বিত ধরণী ॥

ছ

ছার রিপু ছলেতে নাশ গো শীঘ্র শিবা। ছাওয়ালেরে ছেড়ে দেহ কর মাগো কিবা॥
ছলছল চক্ষু ছাতি ফাটে গো বন্ধনে। ছটফট করে প্রাণ ছাড়িবে কেমনে ॥

জ

জন্মভূমি জননী জনক জনার্দ্দন। জাহ্নবী জকার পঞ্চ দুর্ল্লভ বচন ॥
জন্মিলাম কোথায় জীবনে হেথা মরি। জয়ঙ্করি রক্ষা কর জগত ঈশ্বরি ॥

ঝ

ঝিকিমিকি খড়্গ করে ঝেকে উঠে ঢালি। ঝাটা পড়ে গায় ঝাট রক্ষা কর কালি ॥
ঝাড়া ঝাড়ে কোটালিয়া ঝাড়া লয়্যে হাতে। ঝিমাইতে মন গো ঝঞ্ঝনা পড়ে মাথে॥

ট

টঙ্কার ধনুক শব্দ টোটাই মা বলে। টল টল কাঁপে দেহ টাঙ্গী মারে গলে ॥
টিকী ধর‍্যে টানে টনটন করে শির। টলে পড়ি টাটাইল সকল শরীর ॥

ঠ

ঠগগুলা ঠেসে ধরে ঠোঁটে এল প্রাণ। ঠাকুরাণি ঠাকুরালি ছাড়ি কর ত্রাণ ॥
ঠাহর না পাই ঠাট ঠাটে কত ধায়। ঠেঁটা দায় ঠেকিলাম ঠাঁই দেহ পায় ॥

ড

ডুকরিয়া কান্দি ভয়ে বান্ধা দুটি হাত। ডরাইয়া উঠি ডাক ছাড়ে নিশিনাথ ॥
ডিঙ্গিয়া ডাইন পায় মারা যাই প্রাণে। ডাকিনী সহিত শীঘ্র উর গো মশানে॥

ঢ

ঢক্কা বাজে ঢোল বাজে ঢেকা মারে ঢালি। ঢঙ্গ বেটা ঢেমন বলিয়া দেয় গালি ॥
ঢাল খাঁড়া ঘুরিয়া ঢুলিয়া পড়ে গায়। ঢল ঢল করে আঁখি আড়ে আড়ে চায় ॥

তপস্বিনি ত্রিনয়নে তারা ত্রাণকর্ত্রি। ত্রিপুরারি-ত্রিপুরা-তারিণি জগদ্ধাত্রি॥
তব তত্ত্ব ত্রিলোচন সবে মাত্র জ্ঞাত। তথাপি তাঁহার তরে মায়া কর কত॥

থ

থরথর কাঁপি স্থির কর মহামায়া। স্থান দেহ স্থলপদ্মপদে শম্ভুজায়া॥
স্থাবরজঙ্গম তোমা ভিন্ন কিছু নহে। স্থান দিলে মোরে কৃপামই নাম রহে॥

দ

দিগম্বরি দনুজদলনি দাক্ষায়ণি। দুর্গতিহারিণি দুর্গে দুরিতমোচনি॥
দাসে দুঃখ দেখ মা কিরূপ দয়ামই। দাসীপুত্র দাসীর দয়িত দৈবে হই॥

ধ

ধূর্জ্জটিধামিনি ধরাধরেশকুমারি। ধীমান ধিয়ায় ধাম ধৈর্য্য মানা করি॥
ধরণীভূষণ ধীর ধর্ম্ম কিছু নাই। ধিক্ ধিক্ ধর্য্যে বধে বলিয়া জামাই॥

ন

নমো নিত্যে নারায়ণি নৃমুণ্ডমালিনি। নবীন-নীরদ-নীল-নিন্দিত-বরণি॥
নলিননির্জ্জিতে নেত্রকোণে চাও শিবে। নতুবা নিশ্চয় নরহত্যা মা লাগিবে॥

প

পতিতপাবনি পরা পর্ব্বতনন্দিনি। প্রমথেশপ্রিয়া পাপপুঞ্জবিমর্দ্দিনি॥
পদ্মযোনি প্রভৃতি পঙ্কজপদভারে। পার নাই মহিমার পামর কি পারে॥

ফ

ফাপরে ফিরিয়া চাও ফণীন্দ্ররূপিণি। ফের দিয়া ফান্দে ফেলে বধে গো জননি॥
ফট করে কটু কহে ফিক্ ফিক্ হাসে। ফুৎকারে কোটাল মারে রক্ষ নিজ দাসে॥

ব

বিশ্ববিভুদারা গো বারেক দয়া কর। বিধির বিধাতা বট বিঘ্নরাশি হর॥
বলিতে বদন এক বাক্য কব কি। বিবেক বিদরে বুক ব্যস্ত হইয়াছি॥

ভ

ভবানি ভৈরবি ভীমা ভবের বনিতা। ভেশ ভয়ঙ্করা রাজ্ঞি ভূধরদুহিতা॥
ভগবতি ভারতি গো ভবের ভাবিনি। ভক্তজনবৎসলা মা ভুবনপালিনি॥

ম

মহেশ্বরি মহামায়া মহেশমোহিনি। মূঢ়মতি মানব মহিমা কিবা জানি॥
মহীপতি মন্দমতি মত্ত ধনমদে। মহিষমর্দ্দিনি মাগো স্থান দেহি পদে॥

য

যোগরূপা যশস্বিনি যশোদানন্দিনি। যোগেন্দ্রযোষিতা যজ্ঞসমূলঘাতিনী॥
যুগল চরণপদ্মে যদি দেহ স্থান। যশ থাকে যদি মা করগো পরিত্রাণ॥

র

রণরসে রত রমা রুক্মিণি রোহিণি। রাক্ষসসংহারকর্ত্রি রাঘবরমণি॥
রঙ্গিণি রুদ্রাণি রক্ষ দক্ষিণ মশানে। রাজা করে বধ রাখ আসিয়া আপনে॥

ল

লহলহ লোলজিহ্বা লোহিত বদন। লীলায় বধিলা যত দুষ্ট দৈত্যগণ॥
লক্ষিতে না পারি মাগো চরিত্র তোমার। লক্ষ্মীরূপা ক্ষম দোষ যতেক আমার॥

ব

বিধিমত বিদ্যাবতী বিচারে হারিল। বাপে না বলিয়া বিদ্যা বিরলে বরিল॥
বিপাকে বিদেশে বধে বীরসিংহ রায়। বিরহিণী বিনোদিনী কি তার উপায়॥

শ

শিবে শবাসনা শবশিশু শোভে কানে। শত্রুগণে শিরে ধরি বধে গো শ্মশানে॥
শঙ্করি শরণ মাত্র তোমার চরণ। শীঘ্র শান্ত কর শ্যামা নিকট মরণ॥

স

সংসারসাগরে সার সবেমাত্র তুমি। স্মরণ লয়েছি সরসিজপদে আমি॥
সবে সুখসম্পদদায়িনি সনাতনি। সমর্পিলা শত্রুহস্তে শিবসীমন্তিনি॥
শঙ্করসুন্দরি সত্য তব ঠাকুরালি। সুন্দর শ্বশুরপুরে সারা হয় কালি॥

হ

হত্যা হই হুতাশে হিংসার তুমি মূল। হরপ্রিয়ে হৈমবতি হও অনুকূল।
হাকারিয়া হান হান কাট কাট ডাকে। হুহুঙ্কারে হিয়া ফাটে পড়েছি বিপাকে॥

ক্ষ

ক্ষীণ দেখি ক্ষিতিপতি ক্ষমা নাহি করে। ক্ষেমঙ্করি ক্ষুদ্র দোষে ক্ষয় করে মোরে॥
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষোভ পাই ক্ষুণ্ণ মন সদা। ক্ষপাদিবা জ্ঞান নাহি ক্ষম মা শারদা॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালি কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

সুন্দর প্রতি কালীর অভয়দান এবং শ্মশানে মাধব ভট্টের আগমন

চতুস্ত্রিংশাক্ষরে স্তব করি কহে কবি। দক্ষিণ শ্রবণে শুনি পরিতুষ্টা দেবী॥
কহেন করুণাময়ী কেন ভয় পাও। নৃপতিপূজিত হৈয়া নিজ দেশে যাও॥
ভয় নাহি ভয় নাহি বাছারে সুন্দর। কার শক্তি কাটে তুমি কালীর কিঙ্কর॥
পর্ব্বত চালিতে পুত্র পারে কি পতঙ্গ। ছায়ারূপে সদা আমি থাকি তব সঙ্গ॥
ভাবরে ভকত নর কালী কল্পতরু। তারা নাম তরী তাহে কাণ্ডারী শ্রীগুরু॥
চতুষ্পদ চতুষ্পদ না লভে একান্ত। আজ্ঞা কিন্তু আজ্ঞাপেক্ষা এ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত॥
ব্যতিক্রমে বিস্তর বিপদ পদে পদে। ক্ষিপ্ত সেই স্বধর্ম্ম খোয়ায় খোসামোদে॥
শিষ্ট কষ্ট রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ লোকে কেহ কহে। দ্বিতীয় ব্যক্তিতো সে সামান্য সাধ্য নহে॥
হলাহলামৃতামৃত রস হলাহল। ক্রিয়া ক্রিয়া কলিকালে শীঘ্র ফলাফল॥
পরম সংস্কৃত বিদ্যা গুরুরাতিগম্যা। বীর্য্যবন্ত সাধকজনার মনোরম্যা॥
সল্লোক যে পথগামী সেই পথে পথে। কহে কবিরঞ্জন আমার এই মত॥

কিরূপ কালীর কৃপা কহা নাহি যায়। মাধব নামেতে ভট্ট মিলিল তথায়॥
জরির পোষাক পরা বেশ চিরা মাথে। কনকে জড়িত হীরা নবরত্ন হাতে॥
চিকণ পাথর শিরে চকমক করে। বহুমূল্য তরুণতপনতেজো ধরে॥
ডোরে লট্‌কা তলোয়ার কোমরে খঞ্জর। চাঁদ মুখে চাঁপদাড়ি পরম সুন্দর॥
বুকেতে চাপ্রানি ঢাল তুরগের পৃষ্ঠে। বাঘাই কোটাল পানে চাহে কোপদৃষ্টে॥
ক্রোধেতে আরক্ত বক্ত্র দেহ স্থির নহে। কোটালের প্রতি কোপে কটু কথা কহে।
প্রসাদে প্রসন্না হও কালি কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

কোটালের প্রতি মাধব ভট্টের উক্তি

ভট্টভাখা। থরথর দেহ কোপযুত ঘনঘন নিরখই যামিনীনাথবয়ান।
রকত রদ ছদ বদহি রাজন দারুণ দরপ ছোড়ল তুহ জ্ঞান॥
লালন সুন্দর বিগ্রহ নিগ্রহ হোয়ত রোয়ত ভাট।
ধৃত করপর খর খঞ্জর ঝাঁকই হাঁকই বে পহেলা মুঝে কাট॥
ছুঁন্দর ছো গুণসিন্ধু কি নন্দন ক্যা কহুঁ যাকো ভয়ানী ছহায়।
জাকর লাগি জাগি বহু যামিনী চিরদিন পূজন পড়নি ধেয়ায়॥
পরম নরবর তুহ বি মুরখ বুঝাও হাম বাতমে ছাত মেরা আও।
রাজাকি পাছ খালাস করো যাকর সুন্দরকো গজরাজ ঠাহরাও॥
দো আঁখিয়া ঘোমাইয়া বের বের কোটালিয়া দেওতোর মুঝে গারি।
মট দোহাই লাগে তুঝে ভট্ট সেতাব কাঁহা চোর কোতোয়াল তোহারি॥
ভট্ট কহে কোতোয়ালের এয়ছারে গারি মত দিজিয়ে।
ঘড়ি এক বিচমে গাধি জান খোয়ায়ে গা বুঝ ছমুজ্‌কে বাত কিজিয়ে॥
জৈছন হেরবি ঐছন কবি ছবি বদন বিরাজিত নিরমল চান্দ।
কহে পরসাদ যো চোর কহে ছোঁ মূঢ় কুলরমণীমনোমোহন ফান্দ॥

মাধবের প্রতি কোটালের কটুবাক্য

কহো কোতোয়ালের হুকুম কেয়ে দিয়া।
ভয়ানী ছেবক কো এন্তরে হাল কিয়া॥
মহারাজকে বেটী বিদ্যা পূজকে মহাদেও।
সুন্দর কো খসম পায়া মেরে বাত লেও॥
ছবকা খয়ের হোগা বের বের কহোঁ মেই।
মেরে বাত না শুনেগা সাজা পাওগে তেঁই॥
ছোড় দিজে কানলাল কো লেকে চল সাত।
আপকে বরোবর যাকে কহো এহি বাত॥
কোপে কহে কোতোয়াল মৌত লাগা পাজি।
ফের এয়ছা কহেগা করোঙ্গা জুতি বাজী॥
চোরকো ছরদার তেঁই বুঝা গেয়া এহি।
রাজা কি দোহাই ভাই ছোড় মত কহি॥

কোহি কহে বেলফেয়াল মোচতো উখাড়ো।
কোহি কহে চোরকে সামিল লেকে গাড়ো॥
কোহি কহে চোরকো গাধেমে চড়াও।
এহি ওক্ত ছের মুড়ায়কে সহর ঘুমাও॥
কোহি কহে জানে দেও জি জেয়ছা হিয়া আয়া।
বুঝা গেয়া বাতমে ছাজাই তেয়ছা পায়া॥
মান ভঙ্গ মলিন মাধব মনোদুখে।
কাষ্ঠবৎ কায় কথা নাহি সরে মুখে॥
পথ্য দেখি গথ্য কথা যদ্যপিহ করে।
বৈদ্যগ্রন্থে সদ্য ফল বৈদ্যক হা করে॥
নব্যলোক ভব্য হয় সভাসঙ্গে বটে।
গুণ যেন দ্রব্য যোগ দিব্য গুণ ঘটে॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালি কৃপামই।
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

ভাটমুখে সুন্দরের বার্ত্তা শ্রবণে ভূপতির সভাশুদ্ধ মশানে গমন

কোটালিয়া কটু বলে, রাজার নিকটে চলে,
ভাট কহে নির্ভয় উত্তর।
শুন শুন মহারাজ, বিপরীত তব কাজ,
যথোচিত উঠে যেয়ো কর॥
গুণসিন্ধু ধরাধিপ, খ্যাত নামে জম্বু দ্বীপ,
কলিযুগে যেন রঘুবীর।
নির্ম্মল যাহার যশ, প্রকাশিত দিগ্‌ দশ,
তাঁর পুত্র সুন্দর সুধীর॥
পূর্ব্ব পুণ্যপুঞ্জ হেতু, কৃপান্বিত বৃষকেতু,
জামাতা মিলিল তেঁই হেন।
তুমি বিচক্ষণ ভূপ, চরিত্র এমন রূপ,
পেয়ো নিধি ঘৃণা কর কেন॥
বিদ্যা বিনোদিনী কন্যা, ধরণী মণ্ডলে ধন্যা,
শাপভ্রষ্টা জন্ম তব ঘরে।
সুন্দর সামান্য নর, না জানিও নৃপবর,
সত্য কহি তোমার গোচরে॥
জানকী জীবন রাম, কিম্বা শ্যাম কিম্বা কাম,
কিম্বা পুরন্দর কিম্বা শশী।
সন্দেহ নাহিক মাত্র, ভুবনে এমন পাত্র,
দৃষ্ট নহে শুন গুণরাশি॥

ভট্টমুখে সুধাভাষ, নৃপমুখে মৃতহাস,
উঠে দিল প্রেম-আলিঙ্গন।
খুলিয়া অঙ্গের যোড়া, বাছিয়া তুরুকি ঘোড়া,
আর দিল বহু রত্ন ধন॥
সভাশুদ্ধ নিয়া সঙ্গে, ভূপতি পরম রঙ্গে,
উপস্থিত দক্ষিণ মশানে।
কালীর কিঙ্কর যেই, ভুবনবিজয়ী সেই,
মহিমা তাহার কেবা জানে॥
রাজ্যশুদ্ধ ভেকধর, সভাই সাধক নর,
মুখে কহে রাধাকৃষ্ণ বাণী।
চিত্তে বান্ধা কালপ্রিয়া, আজ্ঞামত করে ক্রিয়া,
এইরূপে কাল কাটে প্রাণী॥
বৈশ্য ক্ষত্র বৈদ্য শূদ্র, নিত্যানন্দ বীরভদ্র,
কর্ম্ম ভাল নহে যেবা কহে।
তার কিন্তু নাহি স্বর্গ, শুন কবি ধীরবর্গ,
সেও পাপী সে সঙ্গে যে রহে।
সদা পুটাঞ্জলিপাণি, শ্রীকবিরঞ্জনবাণী,
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধু পার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উমা আমা উরহ মানসে॥

সুন্দরের প্রতি ভূপতির বিনয়োক্তি

শীঘ্রগতি নৃপবর, ধর্যে জামাতার কর,
মুক্ত কৈল নিগড়বন্ধন।
গলে বস্ত্র ত্রস্ত উঠে, নিকটে অঞ্জলিপুটে,
সবিনয় কহে সবচন॥
যেমন গোকুলপুরী, কৌতুকে নবনী চুরি,
কৈলা প্রভু ত্রিভুবনপতি।
গোপীমুখে শুনি বাণী, রজ্জু বান্ধে যুগপাণি,
তমোগুণে রাণী যশোমতী॥
অথবা অজ্ঞাত বাসে, বিরাটভূপতিপাশে,
বৎসরেক ছিলা যুধিষ্ঠির।
বিধাতা বিমুখ তাঁরে, অক্ষপাটী ফেলে মারে,
ফুট্যে ভালে পড়িল রুধির॥
শেষে পেয়ে পরিচয়, হৃদয়ে বিষম ভয়,
সকরুণে কহে গদগদ।

চিত্তে না জন্মিল রোষ, ক্ষমা কৈল তাঁর দোষ,
ধর্ম্মপুত্র শাস্ত্রবিশারদ ॥
যেমত বিরাটরাজ, না জানিয়া কৈল কাজ,
আমি সেইরূপ জ্ঞানহত।
তুমি গুণসিন্ধুসুত, ধীর সর্ব্বগুণযুত,
মার্জ্জনা করহ দোষ যত ॥

মাণিক নীচের ঠাঁই, যেন মূর্খে বুঝে নাই,
দুরদৃষ্ট হেতু জন্মে হেলা।
কিম্বা শিশু বুদ্ধিহীন, বান্ধা থাকে রাত্রিদিন,
শিলাপুত্র সঙ্গে রঙ্গে খেলা ॥

শুন শুন কল্পতরু, পর্য্যায় পরম গুরু,
বটি বাপা তোমার শ্বশুর।
অধিকন্তু কব কিবা, মনে কিছু না করিবা,
তুমি মোর বাপের ঠাকুর ॥

শ্বশুর বিনয় শুনি, মহাকবি-শিরোমণি,
কহে কেন হেন ঠাকুরালি।
নিজ নিজ কর্ম্মভোগ, পরে বৃথা অনুযোগ,
সকলি করেন ভদ্রকালী ॥

যেন রথচক্রাকৃতি, নরভাগ্য নরপতি,
চিরকাল সমান না যায়।
দুঃসময়ে ধীর যেবা, তারে নিন্দা করে কেবা,
উগ্রমতি মূর্খ কহি তায় ॥

ধন হেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত,
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী ॥

সেই বংশসমুদ্ভব, পুরুষার্থ কত কব,
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরলহৃদয় ॥

তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে, কহে কালিকার পদে,
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া ॥

কবির বিমোচন শ্রবণে রাণীর বিদ্যার প্রতি বিনয়

[একাবলী ছন্দ]

বাঁচিল সুকবি সুন্দর চোর। সাধুচিত্তে নাহি সুখের ওর ॥
বিদ্যার গোচর সকলে কহে। কমলিনী কথা মিথ্যা এ নহে ॥
বাঁচিল তোমার জীবননাথ। নিকটে নৃপতি জুড়িয়া হাত ॥
সজল যুগল লোচন লোল। গদগদ কহে মধুর বোল ॥
সথামুখে শুনি সুন্দর বাণী। নন্দিনী নিকটে চলিল রাণী ॥
ধূলা ঝাড়ি তোলে কোলেতে করি। চুম্বতি বদন চিবুক ধরি ॥
বারেক বদন তুলিয়া চাও। অভাগী মায়ের মাথাটি খাও ॥
রাগে কত কটু কয়েছি তোরে। জননী জানিয়া ক্ষমহ মোরে ॥
এ মহিমগুলে বটী গো ধন্যা। উদরে ধরেছি তো হেন কন্যা ॥
বিনোদিনী কহে ঈষৎ হাসি। আগো মাগো আমি তোমার দাসী ॥
কন্যাকে বিনয় কি হেতু কর। গুরু কেবা মোর তোমার পর ॥
মন দিয়া শুন করুণামই। গোটা দুই কথা তোমারে কই ॥
পুনরপি ধরাজন্ম লভিলে। তোমা হেন যেন জননী মিলে ॥
হাসি হাসি কহে যতেক আলি। সকলি কেবল করেন কালী ॥
কাতর শ্রীকবিরঞ্জনে কয়। তরাও তারিণী শমন ভয় ॥

সুন্দরের বন্ধন মোচন সংবাদে বিদ্যার উল্লাস

স্নান করি শশিমুখী মহাহৃষ্ট মনে। ভবানী ভাবয়ে ভীমা মুদ্রিত নয়নে ॥
পূজে পর্ব্বতেশ-পুত্রী পরম কৌতুকে। মেষ মহিষাদি বলি দিল মুহূর্ত্তেকে ॥
বদনে রসনারব যত সীমন্তিনী। শঙ্খঘণ্টাকোলাহল করে জয়ধ্বনি ॥
সঙ্গোপনে জপে রামা মহাশঙ্খ মালা। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বীরসিংহবালা ॥
কৃতাঞ্জলি কহে বিদ্যা প্রেমে গদগদ। পরকালে পাই যেন পদকোকনদ ॥
দীন দ্বিজবর্গে দিল নানা রত্ন ধন ॥ সাবিত্রী সমানা ভব কহে বিপ্রগণ ॥
করালবদনা কালী কলুষহারিণী। সংসারসাগরে ঘোরে নিস্তারকারিণী ॥
তুমি কৃপাময়ী মাগো কৃপানাথ ভর্ত্তা। জগদম্বা জননী জনক বিশ্বকর্ত্তা ॥
তথাপিও দুঃখরাশি না হইল দূর। সকলে করুণাময়ী এ দীনে নিষ্ঠুর ॥
অপার মহিমা নষ্ট হয় হেন বাসি। অসুর-নাশিনী আশু দয়া কর আসি ॥
বদরি-কোমল পূর্ণ সুধা রস ভরা। সুবোধ কুবোধ বোধগম্য নহে ত্বরা ॥
রসবেত্তা যে জন কি তার তৃষ্ণা ক্ষুধা। প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে প্রবিশতি সুধা ॥
পাঠ করে পুরাণ পণ্ডিত প্রেমে ভাসে। গবাগণ গুপ্তে গো ভঙ্গিমা করে হাসে ॥
অরসিক নিকটে রসস্থ নিবেদন। ততোধিক শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম হয় যে মরণ ॥
গ্রন্থমধ্যে সঙ্কেত রহিল যে যে স্থানে। মা জানেন মাত্র ব্যক্ত নহিলে কে জানে ॥
ধন্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে। আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে ॥

জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব। কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব।
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপাময়ি। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

ভূপতি হইতে সুন্দরের সম্মান প্রাপ্তি

বীরসিংহ গুণনিধি, পণ্ডিতে জিজ্ঞাসে বিধি,
তোমরা জানহ শাস্ত্রমর্ম্ম।
বিচারে পরাস্ত বালা, সুন্দরে দিলেক মালা,
এক্ষণে কিরূপ হবে কর্ম্ম॥
এক কালে বীরচয়, কহে শুন মহাশয়,
শাস্ত্রসিদ্ধ কথা বটে এহ।
গন্ধর্ব্ববিবাহ পর, পুনরপি নৃপবর,
বিবাহ না করে কোথা কেহ॥
কৃষ্ণচন্দ্র কুতূহলে, রুক্মিণী হরিলা বলে,
ভাব দেখি কোথা সংস্কার।
পার্থ বীর ব্রহ্মচারী, ভজিলা সুভদ্রা নারী,
সত্যভামা যুক্ত পাত্র আর॥
গ্রন্থশ্রেষ্ঠ ভাগবত, তার কিন্তু এই মত,
স্বামিটীকায় নাহি কর্ম্ম নাথে।
আদিপর্ব্বে হলায়ুধ, পরিহরি সর্ব্ব ক্রোধ,
পুনঃ সম্প্রদান কৈলা পার্থে॥
কল্পভেদে মতভেদ, মুনিবাক্য বটে বেদ,
পুনরপি বিবাহে কি ফল।
বিধিলিপি থাকে যেই, সভ্যটন হয় সেই,
নরনাথ না হবে বিফল॥
স্বপ্নে অনিরুদ্ধ সঙ্গে, নানা সুখভোগরঙ্গে,
নিদ্রাভঙ্গে উঠে বাণসুতা।
বিরহে শরীর দহে, কদাচিত সাম্য নহে,
কান্দে রামা মহাদুঃখযুতা॥
চিত্ররেখা সঙ্গে ছিল, অনিরুদ্ধে মিলাইল,
যাবতীয় দুঃখ গেল দূর।
শেষে সেই অনিরুদ্ধ, বাণ রাজা করে রুদ্ধ,
প্রভু তার কৈল দর্প চূর॥
আছে পূর্ব্বাপর নীত, কিবা তব অবিদিত,
কি ভাবনা কর মহীপাল।
দ্বিজে দেহ রত্নদান, জামাতার রাখ মান,
ঘুষিবেক কীর্ত্তি চিরকাল॥

ভূপতির শুদ্ধ মন, রত্ন করে বিতরণ,
অদৈন্য করিল দ্বিজবর্গ।
নরেন্দ্র নিকটে থাকি, বাহু তুলি কহে ডাকি,
নৃপতি অক্ষয় তব স্বর্গ॥
রত্ন সিংহাসন মাঝে, বসাইল যুবরাজে,
মন্দ মন্দ চামর-সমীর।
সিফাই সান্তিরি যারা, কুরনিস করে তারা,
আদবেতে লোটাইয়া শির॥
বাঘাই কোটাল কাছে, বুকে হাত খাড়া আছে,
নকীবেতে করিছে সেলাম।
নিরখি কোটালমুখ, হৃদে জন্মে লজ্জা সুখ,
ঈষৎ হাসিল গুণধাম॥
ঘুচিল সকল দুখ, হৃদে জন্মে পুনঃ সুখ,
দম্পতি মিলিল পুনর্ব্বার।
দ্বিগুণ বাড়িল প্রেম, মাণিক্যজড়িত হেম,
সেইরূপ ভাব দোঁহাকার॥
সদা পুটাঞ্জলিপাণি, শ্রীকবিরঞ্জনবাণী
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধুপার হেতু, অভয় চরণ সেতু,
উমা আমা উরহ মানসে॥

সুন্দরকে মাতৃবেশে কালীর স্বপ্নদান

শ্বশুরবাসেতে রহে কবি যুবরাজ। ভাবেন ভুবন-মাতা ভাল এই কাজ॥
শাপভ্রষ্ট জন্ম ধরা আমার সুন্দর। মম পূজা প্রকাশিতে পৃথিবী ভিতর॥
কামিনী পাইয়া সুখে ভুলিলা কুমার। তবে ত আমার পূজা হবে না প্রচার।
ক্ষণমাত্রে ধরি তার জননীর বেশ। চক্ষে বহে শত ধারা বিগলিত কেশ॥
মলিন বসন ভাতি শোকেতে ব্যাকুলা। কান্দে রাণী সকল শরীরে মাখা ধূলা॥
নিশি অর্দ্ধযামশেষে স্বপ্নে কহে শিবা। ওরে পুত্র সুন্দর তোমারে কব কিবা॥
এই হেতু করে লোক সন্তান কামনা। পেয়ে পিণ্ডদান খণ্ডে সকল যাতনা॥
বৃদ্ধকালে নানাজাতি সেবা করে সুত। কত বা সন্তান জন্মে কত জন্মে ভূত॥
তোমার সুখ্যাতি পুত্র শুনি ঠাঁই ঠাঁই। সুন্দর সমান ধীর ত্রিভুবনে নাই॥
কেন নহিবেক বাছা সন্তানের কার্য্য। পিতা মাতা ছাড়িলা ছাড়িলা নিজ রাজ্য॥
কি দোষ তোমার কলিযুগের এ ধর্ম্ম। ছাড়ান বিষম বটে রমণীর মর্ম্ম॥
ভাল বাছা তুমি কোনরূপে ভাল থাক। জুড়াক পরাণ মুখে মা বলিয়া ডাক॥
নিদ্রা ভঙ্গে উঠি কবি কান্দে উভরায়। কহে মাগো মোরে ছেড়ে গেলে গো কোথায়।

পতি করে রোদন রোদন করে সতী। কোন মতে সাম্য নহে ভূপতিসন্ততি।
শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাঞ্জলি। শ্রীরামদুলালে মাতা দেহি পদধূলি॥

সুন্দরের স্বদেশগমনার্থ বিদ্যার নিকটে বিদায় প্রার্থনা

কান্তকরে ধরে, কহে মৃদু স্বরে, বিদ্যাবতী বিনোদিনী।
আমি তুয়া দাসী, কহ গুণরাশি, বিশেষ কারণ শুনি॥
চিত্তে কেন দুখ, ম্লান বিধুমুখ, নয়নে সহস্র ধারা।
তুমি যুবরাজ, নাহি বাস লাজ, কান্দিছ অবলা পারা॥
কবিবর কহে, শোকে প্রাণ দহে, মনেতে পড়েছে মাতা।
প্রভাতে যামিনী, প্রত্যূষে কামিনী, যাব যে করে বিধাতা॥
অনুচিত কার্য্য, পরিহরি রাজ্য, চিরদিন গৌড়ে ভ্রমি।
গমন বিষয়, প্রেয়সীকে কয়, যাবে কি না যাবে তুমি॥
বিষম ভারতী, শুনি কহে সতী, নাথ কি কব তোমাকে।
পতি পূজে যেবা, করে পতিসেবা, সে নাকি বিচ্ছেদে থাকে॥
প্রভু কিন্তু কই, বৎসরেক বই, নিতান্ত যাব সে দেশ।
কান্তাকথা রাখ, বৎসরেক থাক, পাইয়াছ বড় ক্লেশ॥
নিকটে ললনা, সুখভোগ নানা, পরম কৌতুক কর।
যে মাসে যে গুণ, প্রভু শুন শুন, বিদগ্ধ কবিবর॥
ভীমসীমন্তিনী, ভূধরনন্দিনী, ভুবনবন্দিনী শ্যামা।
কিঙ্কর প্রসাদে, স্থান দেহ পদে, দোষ পুঞ্জ কর ক্ষমা॥

বিদ্যা কর্ত্তৃক বারমাস বর্ণন

প্রথমে প্রবেশ মেষ, কান্ত যার দূরদেশ,
সদা ক্লেশ রসলেশ নাই।
বিষম কুসুমশর, শরে তনু জর জর,
কিবা সুখ বিমুখ গোঁসাই॥
মলিন বদনশশী, ভাবয়ে ভুবনে বসি,
নীরে পশি নহে ভক্ষি বিষ।
নেত্রানলে ভস্ম যেই, মরে জীয়ে পুনঃ সেই,
বাণে হানে বিরূপাক্ষ ঈশ॥
বৃষে বিষতুল্য কর, বপু দহে নিরন্তর,
নিদাঘে শরীর যায় দহি।
সুনবীন তরুছায়, সুখে শিখী নিদ্রা যায়,
তদঙ্কে নিঃশঙ্কে রহে অহি॥
শুন শুন গুণরাশি, আমি তুয়া প্রিয়া দাসী,
আমার তোমার বড় কেবা।

মলয়জ পঙ্ক রঙ্গে, চর্চ্চিত করিব অঙ্গে,
ইচ্ছা আছে এইরূপ সেবা ॥
মিথুনে মিথুনে যেই, ধন্য পুণ্যবন্ত সেই,
অন্য কেবা সেজন সমান।
বিরহিণী কুলদারা, যারা তারা সেবে তারা,
প্রায় মরা কণ্ঠাগত প্রাণ ॥

ঘন ঘন ঘন রব, অবশ শরীর সব,
মনোভব নিতান্ত দুরন্ত।
কদম্বকুসুম ফুটে, বনতটে মন ছুটে,
দুঃখ শান্ত কান্ত কি কৃতান্ত ॥

কর্কটে বরিষা বাড়ে, পক্ষী নাহি বাসা ছাড়ে,
যাতায়াত সকলে রহিত।
ঘর ছাড়া পতি যার, অভাগ্য কপাল তার,
ধীরে ধীরে বিধি বিড়ম্বিত ॥

ধরাধর গুরু গর্জ্জে, যে বুঝি মদন তর্জ্জে,
আটনি দামনি বাহু লাড়া।
দেবরাজ দগ্ধে মর্ম্ম, দেখ কি অনীত কর্ম্ম,
মড়ার উপরে হানে খাঁড়া ॥

সিংহে মহী একাকার, জল ভিন্ন স্থল আর,
তিল অর্দ্ধ নাহি দেখি মাত্র।
ভেকের পরম সুখ, কাল কোকিলের দুখ,
কামিনীর কেঁপে উঠে গাত্র ॥

কন্যায় কেবল যুক্তি, ভক্তিভাবে পূজে শক্তি,
মুক্তি লাভ উক্তি উক্ত বেদে।
যে গৃহী সাধক দীন, সেই সে দিবস তিন,
মরমে মরিয়া থাকে খেদে ॥
মৃণময়ী দশভুজা করিব তাঁহার পূজা,
দাসীর বচন রাখ প্রভু ॥
যে আজ্ঞা করিবে যবে, ক্ষণেকে বিস্তর পাবে,
এ কথা অন্যথা নহে কভু ॥
তুলা তুলা আর নাই, তুলা কর এই ঠাঁই,
দ্বিজে দান দিতে পুণ্যচয়।
তুমি সুরতরুকল্প, আমি রামী অতি অল্প,
মনে বুঝি দেখ হেন নয় ॥

প্রথমত হিমাগম, বিরহি জনায় যম,
নলিনীর দর্প করে চূর।
যে যুবতী নহে দুই, শুয়্যে করে হাইফুই,
কান্দে সতী পতি অতি দূর॥
শুন প্রভু হৃদয়েশ, নিবেদন সবিশেষ,
বৃশ্চিকের বিস্তারিত গুণ।
মাস নিজে ভগবান্, হাটে ঘাটে মাঠে ধান,
সর্ব্ব দ্রব্য দুর্ল্লভ নূতন॥
ত্রিবিধ প্রকার লোক, নাহি দুঃখ রোগ শোক,
পার্ব্বণাদি করে চিত্তসুখে।
অগ্রে দিয়া কাকবলি, সবান্ধবে কুতুহলি
নূতন তণ্ডুল দেয় মুখে॥
একান্ত বিষম ধনু শীতে কম্পমান্ তনু,
তরুণী তপন তুলা সার।
কিসের ভাবনা আছে, সতত থাকিব কাছে,
সেবা হেতু চরণ তোমার॥
নিত্য উষ্ণ জলে স্নান, উচিত বটে হে প্রাণ,
উষ্ণ অন্ন ঘৃতাদি ভোজন।
দশদণ্ডমধ্যে হবে, দেশে কেন যাবে তবে,
ধীর তুমি ধৈর্য্য কর মন॥
হেদে প্রাণনাথ কবি, মকরে প্রখর রবি,
এই মাস বিখ্যাত ভুবনে।
প্রাতঃস্নানে মহাপুণ্য, করে যেবা সেই ধন্য,
পারে লোক জিনিতে শমনে॥
সবিশেষ কব কিবা, জপহোমে রাত্রি দিবা,
প্রভু তুমি থাকহ নিযুক্ত।
চেতনবিশিষ্ট মনু, জপেতে নিষ্পাপ তনু,
সংসারসাগরে হবা মুক্ত॥
আর এক শুন বোল, কুম্ভেতে গোবিন্দদোল,
দরশনে সর্ব্বপাপ নাশে।
বিজ্ঞ বট কি না জান, দেখ হে থাকি কেমন,
কিছুকাল গৌণে যাবে বাসে॥
পরম সুখদ মাস, শিশিরে যাতনাহ্রাস
মন্দ মন্দ মলয় পবন।

যুবক যুবতী সঙ্গে, বঞ্চে নিশি রসরঙ্গে,
উভয়ত বিদেশে মরণ॥
মীনে মীনকেতু পাপ, দ্বিগুণ জ্বালায় তাপ,
সহচর সখা সেই মধু।
তার দৈবে নাই লাজ, কলঙ্কী সে দ্বিজরাজ,
মৃত্যুরূপা পরভৃতবধূ॥
কহে করি প্রণিপাত, শুন শুন প্রাণনাথ,
বসন্ত দুরন্ত মন্দকারী।
রাজা মূর্খ মূর্খ পাত্র, ধর্ম্মজ্ঞান নাহি মাত্র,
বধ করে বিরহিণী নারী॥
এ কাল বিলম্ব কর, পশ্চাতে যাইবা ঘর,
দাসীবাক্যে কান্ত হও শান্ত।
শ্রীকবিরঞ্জন কহে, গমন বারণ নহে,
দেশে যাওয়া হইল নিতান্ত॥

বিদ্যার শ্বশুরালয় গমনার্থ মাতৃ নিকট বিদায় প্রার্থনা

কবিবর কহে বাণী, কহ যত ভাল জানি,
চিত্তে কিন্তু প্রবোধ না মানে।
শুন শুন কুরঙ্গাক্ষি, সত্য কহি প্রাণ সাক্ষী,
যাতনা যেমন সেই জানে॥
কবি কহে প্রবোধিয়া, শুন শুন প্রাণপ্রিয়া,
মহাগুরু জনকজননী।
শাস্ত্রসিদ্ধ কথা এহ, যা হতে দুর্ল্লভ দেহ,
বিনে মুক্তি উপযুক্ত ধবনি॥
শ্রেষ্ঠ পুত্র হয় যেবা, করে পিতামাতা সেবা,
লয়কালে লয় গঙ্গাতীর।
সজ্ঞানে ত্যজিল তনু, ধন্য মানে নিজ জনু,
গয়াশ্রাদ্ধে সার্থক শরীর॥
যম সম দুষ্ট পুত্র, ধরণীমণ্ডলে কুত্র,
লোকভয় ধর্ম্মভয় নাই।
বৃদ্ধ পিতা মাতা ঘরে, শোকে দেহ ত্যাগ করে,
কুবুদ্ধি কি লওয়াল গোসাই॥
যদি ভাব যাব দূর, থাক নিজে পিতৃপুর,
কিছুকাল কর সুখভোগ।
হও তুমি পুত্রবতী, নিয়া যাব পরে সতী,
কিন্তু দুঃখ সম্প্রতি বিয়োগ॥

হৃদয়েশ ক্লেশ কথা, মরমে পরম ব্যথা,
অভিমানে উঠিল অমনি।
গোযুগে গলিত নীর, গজেন্দ্রগমন ধীর
গতি যথা বৈসেছে জননী॥

দুহিতা দুঃখিতা দেখি, রাণী বলে বাছা একি,
নলিননয়নে কেন নীর।
কার সনে কৈলা দ্বন্দ্ব, কে কহিল কিবা মন্দ,
ফাটে বুক প্রাণ নহে স্থির॥
মায়ের মাথাটি খাও, মাগো মুখ তুলে চাও,
মনের কি দুঃখ নাহি জানি।
বিদ্যা বলে কিবা কব, নিশ্চয় জামাতা তব,
দেশে যান মাগি গো মেলানি॥
সদা পুটাঞ্জলিপাণি, শ্রীকবিরঞ্জনবাণী,
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে।
ভবসিন্ধুপার হেতু, অভয়চরণ সেতু,
উমা আমা উরহ মানসে॥

রাণীর প্রতি বিদ্যার প্রবোধবচন

এ কথা কহিল যদি মুনিমনোহরা। মহীপতি-মহিলা মূর্চ্ছিত পড়ে ধরা॥
চেতন পাইয়া কহে কহ চন্দ্রমুখি। মাতৃহত্যাভয় বাছা নাহি একটুকি॥
কেমনে এমন কথা কহ তুমি ঝিয়ে। বিদেশে পাঠায়ে তোমা অভাগী কি জিয়ে॥
দশমাস গর্ব্ভে বটে দিয়াছি গো ঠাঁই। পাইয়াছি যত কষ্ট তার সীমা নাই॥
পালিলাম এতকাল নিত্য চিত্তসুখে। এখনে ছাড়িতে চাহ ছাই দিয়া মুখে॥
তোমার নাহিক দোষ বিধাতা নিঠুর। শঙ্কা নাই তাই বিদ্যা যাবে এতদুর॥
হরি হরি কারে কব ললাটের লেখা। জীবনে মরণে বুঝি আর নাহি দেখা॥
বিদ্যা বলে মাগো তুমি যে কহ প্রমাণ। ধৈর্য্যাবলম্বন করে আছে যার জ্ঞান॥
কার পুত্র কার কন্যা কার মাতাপিতা। সর্ব্ব মিথ্যা সত্য এক নগেন্দ্রদুহিতা॥
বিষম যাঁহার মায়া সংসারব্যাপিনী। কৌতুক দেখেন কর্ম্মভোগ করে প্রাণী॥
বেদেতে বিদ্বান্ বেদব্যাস মহামুনি। মায়াতে ভুলিলা তেঁহ শাস্ত্রে হেন শুনি॥
শুকদেব জন্মিলেন তাঁহার তনয়। সুখদুঃখহীন তনু জ্ঞানী মহাশয়॥
ভূমিগত হবামাত্র স্বকর্ম্মে প্রস্থান। ফের ফের বল্যে মুনি পাছে পাছে যান॥
কত দূরে নারীচয় করে জলক্রীড়া। নগ্ন তারা শুকে দেখি না করিল ব্রীড়া॥
কালগৌণে তথা উপস্থিত ব্যাসমুনি। সলজ্জিতা কূলে উঠে যত সীমন্তিনী॥
কাঁপে গুরু উরু চারু বসন পরিল। কৃতাঞ্জলি মুনীন্দ্র নিকটে দাঁড়াইল॥
হাসিয়া কহেন মুনি এই কোন কর্ম্ম। বুঝিতে না পারি তোমা সবাকার মর্ম্ম॥

যুবা পুত্র গেল মোর এই পথ দিয়া। লজ্জা না পাইলা মনে সে জনে দেখিয়া॥
বৃদ্ধ আমি আমাকে দেখিয়া এত লজ্জা। বসনাদি পরিলা ধরিলা পূর্ব্ব সজ্জা॥
সবিনয় কহে তারা শুনহ গোঁসাই। মহাযোগী শুকদেব বাহ্যজ্ঞান নাই॥
মায়াতে মোহিত তুমি মুনি মহাশয়। তোমারে দেখিয়া মনে জন্মে লজ্জাভয়॥
সুতস্নেহে তুমি মুনি চলেছ পশ্চাৎ। শুক নাহি ভাবেন ডাকেন পাছে তাত॥
লজ্জা পেয়ে মুনি চলি গেলা নিজ পুরে। প্রবোধ জন্মিল চিত্তে খেদ গেল দূরে॥
সর্ব্বশাস্ত্রবিজ্ঞ মুনি তাঁর এত জ্বালা। কি দোষ তোমার মাগো তুমি ত অবলা॥
নিবৃত্তি মার্গের কথা কহিলাম মাতা। প্রবৃত্তিমার্গের সৃষ্টি সৃজিলা বিধাতা॥
পাছে নাহি বুঝে পরে করে অনুযোগ। কন্যাপুত্র জন্মিলে কেবল কর্ম্মভোগ॥
তুভ্যমহং সম্প্রদদে কহিলে বচন। গোত্র ভিন্ন হয়ে পড়ে দৈবের ঘটন॥
পরপুত্র জননি গো হয় হর্ত্তাকর্ত্তা। শাস্ত্রে কহে রমণীর মহাগুরু ভর্ত্তা॥
রাণী কহে চন্দ্রাননে তুমি রমাসমা। বিশ্বকে বুঝাতে পার গুণ আছে ক্ষমা॥
কিছু কিছু বুঝি বটে এই শাস্ত্রনীত। তথাচ বিদরে বুক মায়াতে মোহিত॥
জল শৈবালের প্রায় মন নহে স্থির। ক্ষণেকে বিবেক ক্ষণে বিদরে শরীর॥
পুনরপি কহে বিদ্যা মন কর দড়। শোকে সর্ব্বধর্ম্মলোপ শোক পাপ বড়॥
সজলনয়নে কহে যত সহচরী। ছাড়িয়া মমতা তুমি যাবে কি সুন্দরি॥
কেন্দে কহে বিমলা কমলা ছেড়ে যাও। জন্মশোধ দেখি. চাঁদমুখ তুলে চাও॥
সঙ্গে যাবে যারা তারা সহর্ষবদন। যে না যাবে কত কব তাহার যাতন॥
রাজার নিকটে রাণী কহে সবিশেষ। দুহিতা জামাতা তব অন্য যান দেশ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাঞ্জলি। শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি॥

বিদ্যাসহ সুন্দরের স্বদেশগমন

বীরসিংহ নৃপ্রধান, শুনিল জামাতা যান,
হায় হায় রোদন বদনে।
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে মহি, খেদ করে রহি রহি,
বিধাতার এই ছিল মনে॥
হৃদয়ে পরম ব্যথা, কহে কথা যাব কোথা,
কার বিদ্যা কে লয়ে চলিল॥
স্বপ্নরূপ কন্যাগুলা, ভেঙ্গে গেল ধূলাখেলা,
শোকশেল হৃদয়ে পশিল॥
ক্ষণকাল মৌনে থেকে, সুন্দর জামাতা ডেকে,
স্তব করে বাক্য সকরুণে।
বাপা এই বৃদ্ধকাল, ভাল তব ঠাকুরাল,
বিহিত করহ নিজ গুণে॥
দিলাম সকল রাজ্য, চেষ্টা পাও রাজকার্য্য,
আনাই তোমার মাতাপিতা।
বেহাই বেহাই সুখে, যাইব উত্তর মুখে,
তুমি রাজা মহিষী দুহিতা॥

শ্বশুরের সন্নিকটে, কবিবর কহে বটে,
স্বরূপ কহিলা মহারাজ।
কিন্তু একবার যাই, দেখি বন্ধু বাপ ভাই,
না যাওন ভাল নহে কাজ॥
সত্য সত্য শুন শুন, আগমন শীঘ্র পুনঃ,
হবে তব রাজ্যে মহাশয়।
সম্প্রতি বিদায় মাগি, আমা দোঁহাকার লাগি,
বৃথা শোক করহ হৃদয়॥
অপরাহ্ণে তরুচ্ছায়, অতি দূরতর যায়,
সে যেমত ছাড়া নহে মূল।
অন্যমত ভাব পাছে, মানস তোমার কাছে,
থাকিল গমন সেই তুল॥
দানে রাজা কর্ণতুল্য, দিলা দ্রব্য বহুমূল্য,
ছত্র গজ রথ দাস দাসী।
হাজার সোয়ার সাথ, হামরাই নিশানাথ,
আনন্দিত কবি গুণরাশি॥
কন্যা কোলে করি রাণী, কহিলা গদগদ বাণী,
তুমি রাজলক্ষ্মী ছিলা মাতা।
ছাড়িয়া চলিলা দেশ, বুঝি পরমায়ু শেষ,
ভূপতিকে বিমুখ বিধাতা॥
পতিপ্রাণা শাস্ত্রে উক্তি তোমা বুঝাবার শক্তি,
ভূমণ্ডলে আর কারু নাই।
কিন্তু ব্যবহার আছে, তেঁই গো তোমার কাছে,
গোটা দুই কথা বাছা কই॥
পুরে গুরুলোক যত, তাহা সবাকার মত,
হবে রবে মানায়্যে সেবায়।
দয়া পরিজন প্রতি, যার থাকে গুণবতী,
সেই সে গৃহিণীপদ পায়॥
জনক জননীপদ, ধরি করে সগদগদ,
কহে বিদ্যা সজল নয়নে।
এই তুমি জন্মদাতা, নিকটে বটেন মাতা,
দুঃখিনীরে যেন থাকে মনে॥
সুন্দর সুন্দর নাম, দেবীপুত্র গুণধাম,
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সুখে।
দশদণ্ড মাত্র দিবা, দম্পতি স্মরিয়া শিবা,
রথে উঠে চলে দেশমুখে॥

গ্রামবাসী যত লোক, সকলের মহাশোক,
সথাচয় চিত্রিত পুতুলী।
শোকে বুক নাহি বান্ধে, রাজা রাণী দোঁহে কান্দে,
কলেবর ধূসরিতধূলি॥
দশ দিবসের পথ, দশ দণ্ডে যায় রথ,
ত্বরা করে গুণের গরিমা।
বিদ্যা কহে প্রভু ক্রোধ, ত্যজ দেখি জন্মশোধ,
জনকের অধিকার সীমা॥
এড়াইল দেশ নানা, দূরে স্বাধিকার থানা,
মনে মনে পরম কৌতুক।
ত্বরাতে নাহিক কাজ, সারথিরে যুবরাজ,
কহে রথ রাখ একটুক॥
ধন হেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত,
প্রসন্না কালিকা কৃপামই॥
সেই বংশসমুদ্ভব, পুরুষার্থ কত কব,
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরল হৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে, কহে কালিকার পদে,
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া॥

সুন্দরকে আনয়নার্থ তাঁহার পিতামাতার প্রত্যুদ্গমন

অধিকারে উপনীত গুণসিন্ধুসুত। শীঘ্রগতি নিজ পুরে পাঠাইলা দূত॥
দূতমুখে নরপতি শুনি শুভ ভায। মৃত যেন পুনরপি পায় জীবশ্বাস॥
আনন্দের ওর নাহি বাহু তুলি নাচে। অমনি উঠিয়া গেল মহিষীর কাছে॥
হাসি কহে কি কর কি কর ভাগ্যবতি। পুত্রবধূ দেখ গিয়া উঠ শীঘ্রগতি॥
রাণী বলে প্রভু তুমি কি কহিলা কথা। সুন্দর গুণের নিধি বাছা মোর কোথা॥
আর কি এমন দিন আমার হইবে। চাঁদমুখে মা কথাটি সুন্দর কহিবে॥
পুরবাসী সহ রাজরাণী রথে উঠে। বাল বৃদ্ধ যুবা লোক পাছে পাছে ছুটে॥
সৈন্যকোলাহল শব্দে কর্ণে লাগে তালি। কাড়া সঙ্গে রঙ্গে চলে লক্ষ লক্ষ ঢালি॥
প্রথমতঃ সাজিল হাবেসি ঘোড়া ঘোড়া। লস্করের আগে যায় নাচাইয়া ঘোড়া॥
ঘন ঘন ডঙ্কা শঙ্কা রিপু চমকিত। উড়িছে পতাকা সিতাসিত রক্ত পীত॥
কটকের পদভরে কম্পিত মেদিনী। ফুকারে নকিব জয় করালবদনী॥

স্বগৃহে শয়নে সুখে ছিল মহাপাত্র। উঠে ছুটে চলিল সংবাদ পাবামাত্র ॥
পথ করে পরিষ্কার চিত্তে কুতূহলী। দোধারি রোপিল চারু শ্রীরামকদলী ॥
আম্রশাখাযুক্ত বারিপূর্ণ স্বর্ণঘট। শীঘ্র করে স্থাপনা শ্রীগৃহ সন্নিকট ॥
পিতামাতা দেখি কবি নামি ভূমিতলে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বস্ত্র দিয়া গলে
সন্তোষসাগর মধ্যে ভাসে রাজরাণী। পুত্র কোলে করে দোঁহে প্রসারিয়া পাণি ॥
সে সময় যত সুখ কথায় কে কবে। সহস্র বদন হয় কৈতে পারে তবে ॥
দ্বিগুণ উথলে প্রেম নিরখিয়া বধূ। সঘনে চুম্বতি রাণী মুখরাকাবিধু ॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

বিদ্যাকে দর্শনার্থে পুরবাসিনী নারীগণের আগমন

মঙ্গলাচরণে কুলাচার যত ছিল। পুত্রবধূ নিয়া নিজ গৃহে প্রবেশিল ॥
গুণসিন্ধু দয়াসিন্ধু কল্পতরুরূপ। রতনভাণ্ডার বিতরণ করে ভূপ ॥
ভাঙ্গিল নগর কেহ ঘরে নাহি রহে। পরস্পর সকলে সকল বার্ত্তা কহে ॥
উপনীত ক্রমে ক্রমে দ্বিজপত্নীগণ। জনে জনে দিলা রাণী রত্নসিংহাসন ॥
আসন থাকুক আগে এসে শুন রাণী। বধূ তব কেমন দেখাও দেখি আনি ॥
কুতূহলী পদধূলি শিরে বান্ধে সতী। সকলে কহেন বাছা হও পুত্রবতী ॥
করে ধরে টেনে নিয়া বসায় নিকটে। হাসি হাসি কহে ঘরভরা বউ বটে ॥
কোন রামা বলে বুঝি পাঁচ মাস পেট। মরমে লজ্জিতা ধনী মাথা করে হেঁট ॥
মুখফোঁড়া মেয়ে বলে হেদে কি জঞ্জাল। আইবড় বাপঘরে ছিল এতকাল ॥
বয়োধিকা কেহ কহে ব্রাহ্মণবনিতা। এ মেয়ে সামান্যা নহে পরম পণ্ডিতা ॥
পণ ছিল শাস্ত্রে যেবা করে পরাভব। তারে দিবে বালা মালা সেই হবে ধব ॥
নিরখিয়া নববধূ দ্বিজবধূচয়। সকলে সদনে গেলা সদয় হৃদয় ॥
জগদীশ্বরীকে কৃপা কর মহামায়া। মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া ॥
যে গাওয়ায় যেবা গায় তাহার মঙ্গল। নায়ক সহিতে শিবা করহ কুশল ॥
ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে। আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে ॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব। কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব ॥
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥

সুন্দরের স্বরাজ্যাভিষেক এবং বিদ্যার পুত্রোৎপত্তি

নৃপ শুভক্ষণে, রত্ন সিংহাসনে, পুত্রে করে অভিষেক।
ধরে ছত্র দণ্ড, সুখী রাজ্যখণ্ড, সম্মত প্রজা যতেক ॥
বামেতে মহিষী, পরম রূপসী, গৌড়াধিকার দুহিতা।
মনে বাসি হেন, রামচন্দ্র যেন, সঙ্গে শশিমুখী সীতা ॥
কবিরাজ রাজা, পুত্র সম প্রজা, পালয়ে পূর্ণাভিলাষ।
ভূপ জরাগ্রস্ত, দারা সহ ত্রস্ত, কৈলা বারাণসী বাস ॥
বিদ্যাবতী সতী, প্রসবে সন্ততি, মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী।
অভেদ সুন্দর, রূপ মনোহর, যেমত শরদশশী ॥

নিজ দেহ ছবি, নিরখিয়া কবি, তনয় তনু নেহালে।
মন্দ মন্দ হাসে, এই মনে বাসে, যেন দীপে দীপ জ্বালে॥
করে বিতরণ, রতন বসন, কুঞ্জর ঘোটক ধেনু।
মহা কুতূহলি, শিরে দিল তুলি, লক্ষদ্বিজপদরেণু॥
জাতদিনাবধি, কুলাচার বিধি, করে কবি গুণধাম।
ষষ্ঠ মাসে মুখে, অন্ন দিল সুখে, পদ্মনাভ রাখে নাম॥
পঞ্চম বৎসরে, কর্ণবেধ করে, বিদ্যারম্ভ শুভ দিনে।
সপ্তদিন মাত্র, লেখে তালপত্র, পঞ্চাশত বর্ণ চিনে॥
বালক ত্বরায়, ব্যাকরণ সায়, ভট্টি অভিধান গণ।
রঘুকুমারাদি, সাঙ্গ হল যদি, অলঙ্কারে দিল মন॥
কৃপান্বিতা চণ্ডী, পাঠ করে দণ্ডী, তদনু কাব্যপ্রকাশে।
ন্যায় শাস্ত্রে ঘৃণ, কত কব গুণ, কবিচিত্তে মহোল্লাসে॥
জ্যোতিষ পিঙ্গল, সাঙ্খ্য পাতঞ্জল, মীমাংসা বেদান্ত তন্ত্র।
কোন ক্ষোভ নাই, জননীর ঠাঁই, নিল একাক্ষরী মন্ত্র॥
যেমন জনক, তেমন বালক, উভয়ত মহাকবি।
কালীপদতলে, শ্রীপ্রসাদে বলে, ভবে ত্রাণ কর দেবি॥

সুন্দরের দক্ষিণকালিকামূর্ত্তি সংস্থাপন এবং শবসাধনোদ্যোগ

ক্রমে ক্রমে বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ। জনকজননীচিত্তে জন্মে মহাহর্ষ॥
বিবাহ দিলেন কুলে তুল্য রাজকন্যা। রূপবতী গুণবতী ধরাতলে ধন্যা॥
কতকাল গৌণে মনে জন্মিল ভাবনা। পুরীমধ্যে থাকে ইষ্টদেবতা স্থাপনা॥
গাঁথিল দেউল উচ্চ স্পর্শে বিষ্ণুপদ। চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান সন্নিকটে হ্রদ॥
পাষাণে নির্ম্মাণ কৈল কালিকা দক্ষিণা। শবারূঢ়া মুক্তকেশী বসনবিহীনা॥
মুণ্ডমালাবিভূষণা খড়্গমুণ্ডধরা। যাম্যে বরাভয় ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা॥
অসংখ্য মহিষ মেষ ছাগ নানা বলি। কনকচম্পক দিল চরণে অঞ্জলি॥
উপহার দ্রব্যভার সীমা কব কত। স্তূপ স্তূপ পর্ব্বত প্রমাণে শ্রদ্ধামত॥
তথাপিও কদাচ প্রসন্ন নহে চিত্ত। শব সাধনার্থে খেদ করে নিত্য নিত্য॥
প্রযত্নে সঙ্গতি করে চণ্ডালের শব। সাধকেন্দ্র সুন্দর সাহস অসম্ভব॥
ভৌমবারযুতা কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী নিশি। শ্মশানে চলিলা সঙ্গে মহিষী রূপসী॥
বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিলে সমস্ত। গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত॥
জ্ঞাত নহি বলে কেহ না করিবা হেলা। বিষম বিষয় কালসর্প নিয়া খেলা॥
স্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা করা চাহি। ভঙ্গীতে সঙ্ক্ষেপে কিছু কিছু কয়ে যাই॥
অকর্ত্তব্য হেতু কত ব্যতিক্রম হবে। আগমজ্ঞ কেহ কোন দোষ নাহি লবে॥
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কৃপাময়ি। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

[শব সাধনা]

পূর্ব্ব উক্ত স্থানে গেল কবি শীঘ্রগতি। সামান্যার্ঘ্যে সুবিধান করে মহামতি॥
যাগভূমি প্রদক্ষিণ পাঠ করে মন্ত্র। সুন্দর সুধীর জ্ঞাত যাবতীয় যন্ত্র॥

গুরুদেব গণপতি বটুক যোগিনী। পূর্ব্বদিগ ক্রমে পূজে কবি শিরোমণি॥
বীরার্দ্দন মন্ত্র কবি লিখিল ভূতলে। যে চাত্র বচন কহে মহা কুতূহলে॥
পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া করে প্রণিপাত। পূর্ব্ব উক্ত ক্রমে বলি দিল নরনাথ॥
অঘোর মন্ত্রেতে শিখা বান্ধে ততক্ষণ। সুদর্শন মন্ত্র করে হৃদয়ে রক্ষণ॥
ভূতশুদ্ধিন্যাস সারে ত্বরায় ত্বরায়। জয়দুর্গা মন্ত্রে দিক্ষু সর্ষপ ছড়ায়॥
তিলোঽসীতি মন্ত্রে তিল ফেলে সেইরূপ। তদন্তরে শবের নিকটে গেল ভূপ॥
শবের লক্ষণ কহি শুন ধীরজন। আছে যে প্রকার তন্ত্রসারের বচন॥
শূলে খড়্গে বজ্রে সর্পাঘাতে কি কুমন্ত্রে। যষ্টি বিদ্ধ জলে মৃত গ্রাহ্য উক্ত তন্ত্রে॥
কিন্তু যে সে ঘায়ে মরে না লবে সে শব। বলেছেন গো-বিপ্র স্ত্রীরূপা গ্রাহ্য ভব॥
সম্মুখ সংগ্রামমধ্যে নষ্ট যে শরীর। সে শব প্রশস্ত লবে হবে যেবা ধীর॥
সর্ব্বদা না লবে ভাই শব পর্য্যুষিত। শাস্ত্রমত কর্ম্ম করে যে জন পণ্ডিত॥
মূলমন্ত্র পাঠ করে পূজাস্থানে নিল। উক্ত মন্ত্রে সুকৌতুকে জলবিন্দু দিল॥
পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়া পুনশ্চ প্রণাম। বিবেশেতি মন্ত্র পাঠ করে গুণধাম॥
ক্ষালন প্রশস্ত শব সুবাসিত জলে। নববস্ত্রে পরিষ্কার কৈল কুতূহলে॥
ধূপেন ধূপিতং কৃত্বা গ্রন্থের বচন। সেইমত চন্দনাদি করিল লেপন॥
রক্ত আভা হয় যদি চন্দন লেপিতে। শবে করে ভক্ষণ সাধকে আচম্বিতে॥
নিজ করে যত্নে ধরে শবকটিদেশ। পূজাস্থানে নিল মহাসুবুদ্ধি নরেশ॥
ততঃপরে কুশশয্যা করে গুণনিধি। পূর্ব্বশির রাখে শব আছে যেবা বিধি॥
এলাইচ লবঙ্গ কর্পূর জায়ফল। তাম্বুলাদি শবমুখে দিলেক সকল॥
পুনরপি সেই শব করে অধোমুখ। তৎপৃষ্ঠে চন্দন লিখে চিত্তে মহাসুখ॥
বাহুমূল কটিদেশ পরিমাণ তার। চতুরস্র মধ্যে পদ্ম তাহে চতুর্দ্বার॥
দলাষ্টক সমন্বিত মধ্যে পৃষ্ঠে মন্ত্র। লিখে কবি তন্ত্রমত জ্ঞাত মন্ত্র যন্ত্র॥
নিবেদন যাবতীয় পণ্ডিত নিকটে। ভিন্ন তন্ত্রে কিন্তু এই কথা ব্যক্ত বটে॥
উপদ্রব যদ্যপি জন্মায় যত্ন করে। নিষ্ঠীবন দিবে শবে কটিদেশ ধরে॥
তদুপরি রক্তকম্বলাদি দিব্যাসন। শীঘ্রগতি করে পুনরপি প্রক্ষালন॥
যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ। দশদিক্ষু পূর্ব্বমত রাখে স্থানে স্থান॥
ইন্দ্রাদি দেবতা পূজে স্বামিসম্বোধনে। বিঘ্ন নিবারণ করে মহা সাবধানে॥
চতুঃষষ্টি ডাকিনী যোগিনীগণ যত। সবাকার পূজা কৈল ভক্তিযুক্ত নত॥
মূলমন্ত্রে শবানন পূজে মহাকবি। ঘোটকারোহণ ক্রমে বৈসে যেন রবি॥
স্বকীয় চরণতলে দিল কুশাসন। শবকেশ ধরে করে যুটিকাবন্ধন॥
গুরুদেব গণপতি দেবীকে প্রণাম। ষড়ঙ্গন্যাসাদি যত কৈল প্রাণায়াম॥
ক্ষেপ করে দশদিক্ষু লোষ্ট্র বিবর্দ্ধনে। তদন্তে সঙ্কল্প কৈল উল্লসিত মনে॥
অর্ঘ্যাদি স্থাপন করে শবযুটিকায়। আসন পূজিয়া পীঠ পূজা কৈল তায়॥
তদন্তরে পূজে দেবী সুখে শক্তিরূপ। শবমুখে কৌতুকে তর্পণ কৈল ভূপ॥
ততঃ শব তুলিলে সম্মুখে দাঁড়াইয়া। বসোমে ভারতি মন্ত্র পড়ে হৃষ্ট হৈয়া॥
পট্টসূত্রে বান্ধে কবি যুগল চরণ। শবপদতলে যন্ত্র লিখিল ত্রিকোণ॥

শবকরযুগ্মপার্শ্ব প্রযত্নে প্রসার্য্য। তদুপরি কুশাসন রাখে যাহে কার্য্য॥
তদুপরি নিজ পদ নৃপতি নিধায়। পুনঃ প্রাণায়াম করে ভক্তিযুক্ত কায়॥
শিবা শিবা গুরু ভাবে হৃদি মধ্যে দেবী। মহাশঙ্খমালা জপ করে মহাকবি॥
করে অসি রূপসী মহষী প্রেমময়ই। কিছু দূর থাকি কহে মা ভৈঃ মা ভৈঃ॥
কহেন করুণাময়ি থাকি বিমানেতে। দেহি মে কুঞ্জর বলি আশু ধরাপতে॥
দৈববাণী শুনি কহে কবি শিরোমণি। অদ্য নহে দিনান্তরে দাস্যামি জননি॥
মহামায়া মহাতুষ্টা মহাকবি প্রতি। বরং বৃণু বরং বৃণু সঘনে ভারতী॥
নলিননয়নে নীর নিরখিয়া ইষ্ট। প্রেমে পুলকিত প্রাণ পূর্ণ মনোভীষ্ট॥
ধরে ধরাধরপুত্রীপদ কবিবর। ধরাতলে ধরাপতি ধুলায় ধুসর॥
সুন্দর সুস্বরে কহে সুধাধিক উক্তি। দর্শনে তোমার মাগো চতুর্ব্বিধ মুক্তি॥
নাহি চাহি কুঞ্জরালী বাজিরাজি রাজ্য। জায়াপত্য দাসদাসী বাসি কিবা কার্য্য।
মনোমম হংস পাদপদ্মে বিহরতু। অঙ্গীকার কৈল মাতা তথাস্তু তথাস্তু॥
কলিকাল বিষম শুনহ শুদ্ধমতি। সবে মাত্র ত্বরা এক বর্ণ ভবিষ্যতি॥
ব্রাহ্মণ করিবে বেদবহিস্কৃত কর্ম্ম। অধর্ম্মণ্য রাজা হবে রাজ্য শূন্যধর্ম্ম॥
অষ্ট বর্ষে রমণীর জন্মিবে অপত্য। মিথ্যা কথা বিনে লোক নাহি কবে সত্য॥
অবলা চঞ্চলা চলা মন্দ ফলা হবে। ভ্রমে কেহ ঈশ্বরের নাম নাহি লবে॥
কলির চরিত্র সব কহিলাম এই। শীঘ্র মৃত্যু হয় যার পুণ্যধাম সেই॥
সাবধানে শুন পুত্র সর্ব্ব কথা কহি শাপভ্রষ্ট তোমা দোঁহাকার জন্ম মহি॥
বিদ্যাবতী হারাবতী তুমি মালাধর। মম পূজা প্রকাশার্থে হইয়াছ নর॥
শাপান্ত নিতান্ত পুত্র পূর্ণ বটে কাল। পুনরপি স্বস্থানে করহ ঠাকুরাল॥
এত কহি কৈলাসশিখরে গেলা দেবী মনে মনে আপনাকে শ্লাঘ্য মানে কবি
লভিল উত্তমা সিদ্ধি ধরণীভূষণ। পুরমধ্যে তিন দিন রহে সঙ্গোপন॥
সেই তিন দিবসেতে আছে কত জ্বালা। সঙ্গীত শ্রবণে সাধকেন্দ্র হল কালা॥
নিত্য নিরীক্ষণে নেত্র নষ্ট এ কৌতুক। যদি কিছু বাক্য কহে তবে হয় মূক॥
দেবতা থাকেন তার দেহে এক পক্ষ। অকর্ত্তব্য বিপ্রনিন্দা হবেক সপক্ষ॥
এই শব সাধনে শিবত্ব পায় নর। ঈশ্বরীকে কহিলেন আপনি ঈশ্বর॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা হও কৃপামই। আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥

পুত্র পদ্মনাভকে রাজ্য দিয়া বিদ্যাসুন্দরের স্বর্গারোহণ

চতুর্থ দিবসে কবি সিংহাসনে ধীর। বিরাজিত তেজোময় যেমত মিহির॥
কুলপুরোহিত ডাকে মহাহর্ষযুক্ত। নিজরাজ্যে নিজপুত্রে করে অভিষিক্ত॥
বিরলে বালক প্রতি কহে রাজনীত। শিশু কিন্তু সর্ব্ব কার্যে বটহপণ্ডিত॥
আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তেকারণে কহি। এইরূপে পালন করহ সুখে মহি॥
পরস্ত্রী জননীতুল্যা থাকে যেন মনে। কদাচ না লোভ যেন হয় পরধনে॥
একান্ত বিহিত নহে মানি মান ভঙ্গ। সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট তবে যাবে নীচসঙ্গ॥
নিরন্তর থাকা ভাল রিপু সঙ্গে শৌর্য্য। সম্পদে বিনয়ী হবে বিপদেতে ধৈর্য্য॥

ব্রাহ্মণ মামকী তনু ঈশ্বরাজ্ঞা বটে। সাবধানে রবে ধরামর সন্নিকটে॥
ভবানী শঙ্কর বিষ্ণু এক ব্রহ্ম তিন। ভেদ করে সেই মূঢ় জন প্রজ্ঞাহীন॥
গুরুমন্ত্র ইষ্টদেব পরমায়ু ধর্ম্ম। ব্যক্ত করা মত নহে এ সকল কর্ম্ম॥
গুরু আজ্ঞা বিনা শিক্ষাগুরু করে যে। গুরু ত্যাগে যে পাপ সে পাপ লভে সে॥
অবচ্ছেদাবচ্ছেদে যে যায় যথা তথা। সেই মন্ত্রে কদাচ না কবে গুহ্য কথা॥
পদ্মনাভ কহে এ কথায় কিবা লাভ। বুঝিতে না পারি মহাশয় তব ভাব॥
পুনরপি কবিবর সবিশেষ কহে। শুনি শিশু শোকে বুকে অশ্রুধারা বহে॥
পর্ব্বতের আড়ে পিতা আছি এতকাল। এত শীঘ্র ছাড়ি যাবা একি ঠাকুরাল॥
এককালে পিতামাতা বিয়োগ যাহার। পৃথিবীতে জীয়া সুখ কি ছার তাহার॥
পুনঃ কহে সুন্দর নৃপতি বিচক্ষণ। অদ্য বাব্দশতান্তে বা নিতান্ত মরণ॥
কার মাতা কার পিতা কার অধিকার। বেদিয়ার বাজি প্রায় অনিত্য সংসার॥
মান্ধাতা প্রভৃতি যত ত্যজিয়াছে দেহ। ভূমণ্ডলে পুত্র চিরজীবী নহে কেহ॥
কাল ক্রমে কহ কে কালের নহে বশ। জ্ঞানী তুমি খেদ কর এত বড় রস॥
কালীপদ সার কর জপ কালী নাম। পরলোক গমন না হবে যমধাম॥
কতমত কহে পুরাণের কথা নানা। বহু যত্নে করে কবি তনয়ে সান্ত্বনা॥
পদ্মনাভ বিদ্যায় হইল যে যে কথা। কহা নাহি যায় তাহা মর্ম্মে লাগে ব্যথা॥
সেই দিন রহে রাজা রাণী উপবাসী। প্রাতঃস্নান করে গুণবতী গুণরাশি॥
দেবীপুরমধ্যে চারু বিল্ববৃক্ষতলে। যোগাসনে দোঁহে তথা বৈসে কুতূহলে॥
হৃদাহ্লাদে দক্ষিণকালিকা করে ধ্যান। যোগবলে এককালে দোঁহে ত্যজে প্রাণ॥
ধরে অপরূপ পূর্ব্ব রূপ কলেবর। আছিল যেমন হারাবতী মালাধর॥
ভক্ত সঙ্গে রঙ্গে মাতা চলিলা বিমানে। মুহূর্ত্তেকে উপনীত শিবসন্নিধানে॥
রত্নসিংহাসনমাঝে পার্ব্বতী শঙ্কর। মালাধর হারাবতী ঢুলায় চামর॥
জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী। যার পাদপদ্ম আমি রাত্রিদিবা সেবি॥
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস॥
ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম। আমাতে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম॥
সর্ব্বাগ্রজ ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা। তার দুঃখ দূর কর জননী কালিকা॥
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা নগজাতা॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া। মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি। শ্রীরামদুলালে মাগো দেহ পদধূলি॥

ইতি জাগরণ সমাপ্ত

অষ্টমঙ্গলা

নমো বিশ্ববিভাবিনী, দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী,
জনমিলা পর্ব্বতেশ ঘরে।
কার্ত্তিকেয় জন্ম হেতু, ভস্মরাশি মীনকেতু,
তদবধি অনঙ্গাখ্যা ধরে॥

দুরন্ত মহিষাসুর, তার দর্প কৈলা চুর,
লীলায় হইলা দশভুজা।
মহিষমর্দ্দিনী নাম, সেতুবন্ধে প্রভু রাম,
প্রকাশিলা শারদীয়া পূজা॥
শুম্ভ নিশুম্ভের গর্ব্ব, সম্মুখ সমরে খর্ব্ব,
শক্তি লভে সুরথ সমাধি।
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা, জন্মজরামৃত্যুহরা,
তব তত্ত্ব না জানেন বিধি॥
বিধি হরি ত্রিলোচনে, মহাকালী দরশনে,
গতমাত্র প্রথমতঃ মায়া।
শেষ জন্মে কৃপালেশ, গত যাবতীয় ক্লেশ,
দিলা পদসরসিজচ্ছায়া॥
নৃপতি বিক্রমাদিত্য, তোমা পূজে নিত্য নিত্য,
লভিল রমণী ভানুমতী।
তুমি আদ্যাশক্তি শিবা, মূঢ়মতি জানি কিবা,
কৃপাময়ি অগতির গতি॥
মালাধর হারাবতী, শাপে জন্ম বসুমতী,
ব্রতকথা জগতে প্রচার।
কালক্রমে ত্যজি প্রাণ, পুনরপি পরিত্রাণ,
কেবা বুঝে চরিত্র তোমার॥
ধন হেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল,
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত,
প্রসন্না কালিকা কৃপামই॥
সেই বংশে সমুদ্ভব, পুরুষার্থ কত কব,
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরলহৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যারে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে, কহে কালিকার পদে,
কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া॥

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ

প্রমাণ গ্রন্থপঞ্জী

১। সংবাদ প্রভাকর—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত ১২৬০, ১লা আশ্বিন, ১লা পৌষ ও ১লা মাঘ সংখ্যা ও ১২৬১ সনের ১লা চৈত্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য
২। প্রসাদ-প্রসঙ্গ—দয়ালচন্দ্র ঘোষ
৩। রামপ্রসাদ—অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৪। কবি চরিত—হরিমোহন মুখোপাধ্যায়
৫। বিবিধার্থ সংগ্রহ (রামপ্রসাদ)—হরিমোহন সেন
৬। কবিরঞ্জন কাব্যসংগ্রহ—যোগেন্দ্রনাথ বসু
৭। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও গ্রন্থাবলী—বসুমতী সংস্করণ
৮। রামপ্রসাদের গ্রন্থাবলী—কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—হিতবাদী
৯। বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী—সাহিত্যপরিষদ মন্দির
১০। বাঙ্গলার গীতিকবিতা (শক্তিধারায় রামপ্রসাদ)—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, গিরিজাশঙ্কর রায়-চৌধুরী সম্পাদিত
১১। সমালোচনা সংগ্রহ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত
১২। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
১৩। সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা—বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ—রামপ্রসাদ ৫ম বর্ষ
১৪। ঐ কালীকীর্ত্তন—শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫। গানে রামপ্রসাদ—অমিয়লাল মুখোপাধ্যায়
১৫। রামপ্রসাদ (নাটক)—দেবনারায়ণ গুপ্ত
১৬। ” —তারক মুখোপাধ্যায়
১৭। ” —বৈকুণ্ঠনাথ বসু
১৮। রামপ্রসাদ—যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৯। সাধক রাজমোহন - কালীচরণ চক্রবর্ত্তী
২০। কালীকীর্ত্তন—শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল নন্দী
২১। সাধক-সঙ্গীত—কৈলাসচন্দ্র সিংহ
২২। তন্ত্রের আলো—মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৩। Mysticism of the Tantras—M. N. Sarker
২৪। Bengali Religious Lyrics, Sakta—E. J. Thompson & A. M. Spencer
২৫। The Saktas—Ernest A. Payne
২৬। Classical Sanskrit Literature—A. B. Keith
২৭। Two Saints of Kali—Sister Nivedita
২৮। The Songs of Ramprasad—Natesan (Madras)
২৯। Religious Lyrics of Bengal—A. Chapman
৩০। The Hindoos (Vol. I & II)—Ward
৩১। History of Bengali Literature—R. C. Dutt
৩২। History of Bengali Literature—Dr. D. C. Sen
৩৩। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ”
৩৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডক্টর সুকুমার সেন